শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

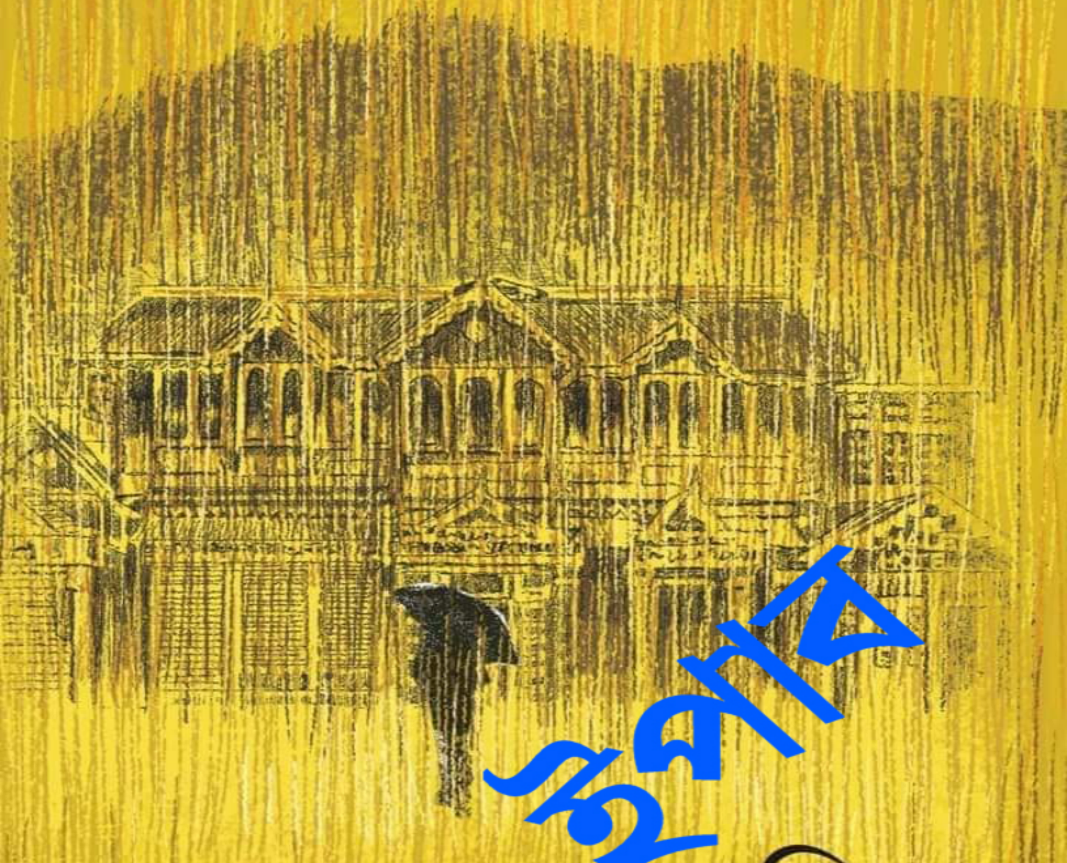

শেষ মৃত পাখি

রহস্য কাহিনী

শেষ মৃত পাখি

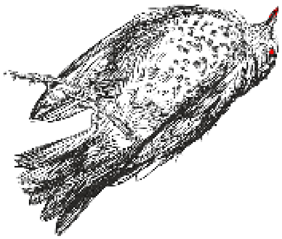

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

যুগান্তর
JUGANTAR
১৭ জুন ১৯৭৫, মঙ্গলবার

অমিতাভ হত্যায় এখনও অন্ধকারে পুলিশ।

দার্জিলিং, ১৭ জুন : তরুণ সাহিত্যিক অমিতাভ মিত্রর মৃতদেহ আবিষ্কারের পর চারদিন কেটে গিয়েছে, কিন্তু দার্জিলিং পুলিশ স্বীকার করেছে যে তারা এখনও মীমাংসার দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। তারা হেফাজতে নিয়েছে জনৈক অরুণ চৌধুরীকে, যিনি নিজেও লেখক এবং অমিতাভর বাল্যকালের বন্ধু। কিন্তু তার পরেও এই হত্যার পদ্ধতি ও মোটিভ বিষয়ে বিশেষ কোনো সূত্র মেলেনি। প্রসঙ্গত, গত বছর একটি সাক্ষাৎকারে অরুণ চৌধুরী বিষয়ে অমিতাভ মিত্র একটি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছিলেন, যা নিয়ে সাহিত্যজগতে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। সেই ঘটনাই আজকের রহস্যের মূলে কিনা, সে বিষয়েও জল্পনা চলছে। মূল তদন্তকারী অফিসার, চকবাজার থানার ইনচার্জ ড্যানিয়েল লামাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে দার্জিলিঙের এক সম্ভাবনাময় কবি, অমিতাভ মিত্র খুন হয়েছিলেন। অভিযোগের তীর ছিল তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু রহস্য-ঔপন্যাসিক অরুণ চৌধুরীর দিকে। কিন্তু নানা পরস্পর বিরোধী প্রমাণে সে অভিযোগ দাঁড়ায়নি।

তনয়া একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক। অমীমাংসিত খুনের কাহিনী নিয়ে ধারাবাহিক লিখছেন পত্রিকায়। অমিতাভ মিত্রের হত্যা-রহস্য নিয়ে লেখার জন্য দার্জিলিঙে এলেন তনয়া। তনয়া কি খুঁজে পেলেন এই হত্যারহস্যের সমাধান?

গ্রন্থের নামকরণ-ঋণ: পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

দাম: ৫২০ টাকা

শেষ মৃত পাখি

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

সু প্রকাশ

Sesh mrito pakhi A novel by Sakyajit Bhattacharya published by Suprokash

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ২০২২ সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০২২

মুদ্রণ
সুপ্রকাশ

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের
কোনো অংশেরই যান্ত্রিক বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন, ডিজিটাইজেশন বা
প্রতিলিপিকরণ আইনত দণ্ডনীয়।

প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী

পাহাড়ের মোটিফ : দুর্লভ সূত্রধর

ISBN 978-81-955495-3-5 Rs. five hundred twenty only. দাম ৫২০ টাকা

বিক্রয়কেন্দ্র
সুপ্রকাশ স্টল ৯, ব্লক ২, কলেজ স্কোয়ার, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ ফোন : ৯৪৭৭৫৩০৪৪০

প্রকাশক সুপ্রকাশ
সুপ্রকাশের পক্ষে স্বাতী কর্তৃক নদীয়া ৭৪১২৪৭ থেকে প্রকাশিত অনলাইন বিপণি : thinkerslane.com ই-মেল : suprokash.publisher@gmail.com ফোন : ৮২৯৩০৯২২২৮

অরুণিমা-কে

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজে
স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএ
জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচা
তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্র
পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হে

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো বে
নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওে
প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষ
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

'তাহলে নিখুঁত খুন ঘটতে পারে না বলেই তোমার মনে হয়?' জিজ্ঞাসা করল প্রণবেশ।

'উঁহু। ঘটতেই পারে। কিন্তু সেটাকে নিখুঁত প্রমাণ করা সম্ভব নয় এটুকু দাবি। সশব্দে নস্যি টেনে শুদ্ধসত্ত্ব উত্তর দিল। তারপর লম্বা শরীরটা টানটান এলিয়ে দিল ইজিচেয়ারের ওপর।

'কেন?'

'দ্যাখো, পৃথিবীর সবথেকে বুদ্ধিমান এবং নিখুঁত খুনি হিসেবে তুমি কাউকেই দাগিয়ে দিতে পারবে না। সহজ কারণ। যে নিখুঁত খুন করবে, সে চিহ্নিত হবে না। ধরাও পড়বে না। তাই দাগানো অসম্ভব।'

'ঠিকই। কিন্তু খুনির বেলায় যে তত্ত্ব খাটে, খুনের বেলায় খাটে না।' 'খাটে, অন্যরকম ভাবে। যে খুনটা নিখুঁত হবে, তাকে তুমি খুন হিসেবে শনাক্ত করতে পারবে না। ভাববে আত্মহত্যা, বা অ্যাকসিডেন্ট। আর শনাক্ত করলে, সেটা নিখুঁত হবে না।

'কেন হবে না? খুনি ধরা না পড়লেই হবে।'

'উফ্! আমরা এখানে হত্যার দর্শন নিয়ে আলোচনা করছি।' বিরক্ত স্বরে শুদ্ধসত্ত্ব বলল। 'খুন হলো একটা শিল্প। আর গোয়েন্দা হলো সেই শিল্পের ক্রিটিক। সমালোচক যেমন শিল্পকর্মের ভেতর থেকে লুকানো নানা চিহ্ন খুঁজে খুঁজে ব্যাখ্যা করেন, গোয়েন্দাও একটা হত্যার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন ক্লু খুঁজে খুঁজে হত্যার ব্যাখ্যা দেয়। শুদ্ধতম শিল্প কী? ব্যাখ্যার অতীত। কবির কথায়, অবাঙ্মনসগোচর। ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন যে নাদ, অথবা ভ্যান গঘের ছবিতে একপার রেকে এসে ঠিকরে পড়া এক অপার্থিব আলো। শুদ্ধতম খুন কী? একইরকম। ব্যাখ্যার অতীত।'

'তার মানে, তোমার কথামতো, নিখুঁত খুন আসলে সেটাই...' প্রণবেশ সামনে ঝুঁকল।

'যা অ্যাবস্ট্রাক্ট। হাইজেনবার্গের যুক্তি স্মরণ করো। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়তে যদি কোনো ঘটনা ধরা না দেয়, তাহলে তার ঘটা অথবা না-ঘটা দিয়ে কিছুই এসে যায় না।'

'কিন্তু আর এক ভাবেও বিশুদ্ধ হত্যা হওয়া সম্ভব।' প্রণবেশ চোখ সরু করল।

'কী? '

'যদি আসল খুনি ছাড় পেয়ে গিয়ে অন্য কেউ অভিযুক্ত হয়!'

'প্রশ্নটা হলো, তাহলেও কি আমাদের জানা মতে সেটা পারফেক্ট মার্ডার? একমাত্র খুনি জানে, সেটা পারফেক্ট। আমি তুমি? বাকি পৃথিবী? তার মানে সবসময়েই পারফেক্ট মার্ডারে শিল্পী এবং ক্রিটিক, এই দুইয়ের মধ্যে ইনফর্মেশন অ্যাসিমেট্রি থাকবেই। থেকেই যাবে। আর সেটাই একটা মার্ডারকে পারফেক্ট হতে দেবে না।'

'তাহলে এই কেসটা যেটা এখন আমরা স্টাডি করব, তুমি বলছ পারফেক্ট মার্ডার হবে না? আগে থেকে বলে দিচ্ছ?'

'আহা আমার কথায় অত ভরসা করবেই বা কেন! নিজের চোখেই দেখবে না হয়। সবে তো গল্প শুরু হচ্ছে হে! এখনই ধৈর্য হারালে চলবে?'

—অমিতাভ মিত্র

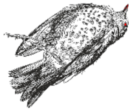

ক্রমশ তোমাকে ঘিরে এত সব অরণ্যসম্পদ
কীভাবে যে বেড়ে উঠছে! অবিন্যস্ত পাতার সবল
বাহুপাশে শুয়ে শুয়ে ভাবি, এই পাহাড় ওই হ্রদ
স্পর্শ করে জিপগাড়ি ছুটে গেলে ওই বনস্থল

কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে স্বপ্ন, দ্বিপ্রহর।.....

-প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

আধো তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখলাম, সল্টলেকের ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়েছি। ক্যাঁচ করে দরজা খুলছে, আমি ঢুকে পড়ছি ধুলো আর মাকড়শার জাল ভর্তি ড্রইং রুমে। দেখতে পাচ্ছি, আধো অন্ধকারে ওলটানো সোফা, যার ছেঁড়া চামড়া দিয়ে পুঁজের মত বেরিয়ে এসেছে লালচে তুলো। একটা হাওয়া দিচ্ছে আমচকা, ঘুলঘুলির কাছ থেকে টিকটিকি ডেকে উঠছে, আর হা হা নির্জনতার মধ্যে বসে পড়ছি ধুলোমাখা চেয়ারে, মেঝেতে পায়ের আঙুল পেতে শুনছি অকরুণ পাথরের হিম, টেবিলে বহুদিনের পুরোনো বোতলের জলে শ্যাওলা ভাসতে দেখছি। আমার হাত চলে যাচ্ছে টেবিলের এককোণায় পড়ে থাকা ছোটোবেলার মাদার ডেয়ারির কার্ডে, যেটার গায়ে অজস্র টিকচিহ্নের আশ্চর্য জ্যামিতি আমাকে কাটাকুটি দেখিয়েছে। ওষুধের রুপোলি স্ট্রিপের ত্বকে তখন হলদে আভা, আধখাওয়া আপেল শুকিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে অনাদরে, কানা ফাটা স্টিলের বাটির আলগোছে ঝরে থাকা মুড়ির টুকরো যাদের কখনো কেউ কুড়িয়ে নেবে না। তখন আমার চোখ যাচ্ছে বন্ধ দরজার দিকে, যার ওপাশে বেডরুম। আস্তে আস্তে হেঁটে সেই দরজার সামনে দাঁড়াচ্ছি। কাঠের গায়ে কান পেতে শুনছি ওপাশের নৈঃশব্দ, যা তীব্র চিৎকারে কয়েকশো টুকরো হয়ে ফেটে ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার ভেতর।

পাইলটের যান্ত্রিক গলার ঘোষণায় স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল... প্লেন এবার নামছে। মেঘ আর কুয়াশার কম্বলের ভেতর দিয়ে পেঁজা তুলোর মতো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে পাহাড়, রাস্তা, সবুজ ক্ষেত, খেলনাবাড়ির জলছবি।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার মুখে নতুন করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পশ্চিমদিকের আকাশ কালো। মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে রাস্তার দুইধারের গাছের দল এসে নুয়ে পড়ছে গাড়ির ওপর। সবে দুপুর তিনটে, কিন্তু এখনই অন্ধকারের একটা পাতলা চাদর জলরঙের মতো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর গায়ে। পাহাড়ে সন্ধে নামছে

পঁচাত্তর মিনিটের বিমানযাত্রা যদি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে পাঁচ ঘণ্টা লেট হয়, তাহলে মনমেজাজ যেরকম খিঁচড়ে থাকে, সেটাকেই যোগ্যভাবে সঙ্গত করছে আবহাওয়া। পাঁচ ঘণ্টা দমদমের লাউঞ্জে বসে থেকে পা গিয়েছে। কত আর কালো কফি গেলা যায়! একেই আমার অনিদ্রার প্রবণতা। চোখ লাল হয়ে থাকে সবসময়ে। বুজে আসতে চায় কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও। যেটুকু তন্দ্রা এসেছিল প্লেনের ভেতর, সেখানেও চোরাশিকারীর মতো হানা দিয়েছে ছেঁড়া স্বপ্ন ও দুর্ভার দৃশ্য। ঘুম হয় না তাতে, শুধু অস্বস্তি। এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা ছিল। হয়তো সিনক্লেয়ারের ঘরে হাত পা ছড়িয়ে শুয়েও নিতাম, যাতে চোখদুটোকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দেওয়া যেতেই পারত। কিন্তু চলন্ত গাড়ির ভেতর ঘুমোতে পারি না। যেহেতু লেট হচ্ছে, পৌঁছেই ছুটতে হবে চৌধুরি ভিলা। ক্লান্তি এবং

আবগারি আবহাওয়া, এই দুই মিলে শরীরকে শিথিল করে দিচ্ছে। স্কার্ফটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিলাম। ঠাণ্ডা লাগার ধাত ছোটোবেলা থেকেই। শেষবার এখানে এসেছিলাম ২০০৮ সালে। প্রেসিডেন্সির বন্ধুদের সঙ্গে। সেবারেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার প্রকোপে জ্বর এসেছিল। গত দশ বছর ধরে দিল্লির বাসিন্দা হয়েও, এবং তার চরমপন্থী জলবায়ু ও দূষণের সঙ্গে লড়তে লড়তেও, আমার ফুসফুস সহনশীল হয়নি।

শিলিগুড়ি থেকে বেরোবার মুখে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এল। রাস্তার একধার খোঁড়া হয়েছে। অনেকটা দূর অবধি পথের চেহারা অনেকটা ওম পুরীর গালের মতোই এবড়ো খেবড়ো। বৃষ্টির ঝাপটা আর ঘন মেঘের নীচে বিহারি বস্তি, তাদের নোংরা উঠোন, কাঁচা নর্দমার উথলে ওঠা পাঁক, প্লাস্টিকের পর্দা, বৃষ্টিতে ভিজতে থাকা একলা কুকুর। রাস্তার দুধারে সার বেঁধে ভিজছে নিভে যাওয়া ট্রাক। ধাবাগুলোর পর্দা ফেলা, ভেতর থেকে হিন্দি গানের সুর গড়িয়ে আসছে। একটা বালতি হাওয়ার থাপ্পড় খেয়ে উলটে পড়ল দুম করে, আর শাড়ির আঁচল মাথায় এক দেহাতি মেয়ে বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল আমার গাড়িটার দিকে। এই আবহাওয়াতে পাগল না হলে কেউ পাহাড়ে যায়? গাড়ির চালক মদন গুরুং রেডিয়োর দিকে হাত বাড়ালেন, ‘এফ এম শুনোগে ম্যাডাম?'

চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। এই মুহূর্তে একটা বিছানা ছাড়া আর কিছুই চাই না আমি।

গাড়ি আস্তে আস্তে পাহাড়ি পথ ধরছে। পালটে যাচ্ছে আশেপাশের গাছেদের ধরণ। জঙ্গল দূর থেকে এগিয়ে আসছে গাড়ি লক্ষ্য করে। বৃষ্টির ছাঁট এখন কম কিন্তু ভ্যাপসা বাষ্প উঠে কাচ ভাপিয়ে দিচ্ছে। মদনদা বাধ্য হচ্ছেন হালকা করে এসি চালাতে, নাহলে কাচ পরিষ্কার হচ্ছে না। মাঝে মাঝেই কাতর গলায় অনুরোধ জানাচ্ছি, 'প্লিজ এসিটা বন্ধ করে দিন।' আগামী কয়েক দিন আমাকে অসুস্থ হলে চলবে না। একটা বড়ো বোল্ডারকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে মদনদা সামনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'ম্যাডাম জার্নালিস্ট হো ক্যায়া?’

‘হ্যাঁ।’মদনদা জানবেন, স্বাভাবিক। অফিসের শিলিগুড়ি ব্যুরো থেকে এই গাড়িটার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সামনের কয়েক দিন আমার সঙ্গে থাকবে।

ইধার কি ভ্যাকেশন কাটাতে এসেছেন?' মদনদা হিন্দি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে অদ্ভুত একটা ভাষায় কথা বলেন ৷

‘নাহ ৷ কাজ আছে।'

মদনদার বকবক করবার অভ্যেস আছে। তাতে এমনিতে সমস্যা হতো না কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে না। তবে আগামী কয়েক দিন আমার সঙ্গী হিসেবে থাকবেন যখন, চটালে চলবে না। খোশগল্প, ঠিক গল্প না হোক, অন্তত গোপ্পে মানুষকে মুখ নাড়াবার সুযোগ করে দিয়ে হুঁ হুঁ করে তাল ঠুকে যাওয়াটাও একটা শিল্প। ‘আপনার কি দার্জিলিঙেই বাড়ি, মদনদা?’ '

‘হ্যাঁ ম্যাডাম। জন্ম থেকেই এখানে। আমার বাপ-দাদারাও তাই। চকবাজারের নীচে পুলিশ স্টেশন দেখবেন, তার বাঁ পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। ভুটিয়া বস্তির ধার ঘেঁসে। ওখানে বাড়ি। লাস্ট বত্রিশ বছর এই লাইনে ম্যাডাম ৷ কোনোদিন গাড়ি ঠুকিনি। কেউ বলতে পারবে না যে বেগড়াবাঁই করেছে। আপনাদের কোম্পানির লোকজনকেও আগে অনেকবার নিয়ে এসেছি এখানে। উইন্ডমেয়ারে এসেছিলেন, কাগজের বিশাল বড়ো সাহেব। আমাকে একটা সোয়েটার গিফট করে গেছেন। বহুত জেন্টলম্যান থা। আপনি কি কলকাতায় থাকেন ম্যাডাম? '

হ্যাঁ, জন্ম, বড়ো হওয়া সব কলকাতায়। তার পরে দিল্লি চলে যাই।'

শালের জঙ্গল এখন ঘিরে ধরেছে আমাদের। সেই কারণেই বৃষ্টির ঝাপটা জোরে আসছে

না। আমার টনসিলের পক্ষে বিপজ্জনক জেনেও গাড়ির কাচ নামানোর লোভ সামলাতে পারলাম না। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস গড়িয়ে ভেতরে। একটা বুনো ঝোপ রাস্তার প্রায় মাঝবরাবর পর্যন্ত মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে, যেন লাফ দিয়ে ঢুকে পড়বে জানলার ফাঁক গলে। আঙুল দিয়ে ভেজা পাতার গায়ে বুলিয়ে দিলাম। গাড়ির ছাদ চুঁইয়ে টপ করে এক ফোঁটা জল কপালে এসে পড়ল। শিউরে ওঠার মতো একটা ঠান্ডা মন কেমন অনুভূতি। আগে হলে বাবা এই সময়টায় টিভিতে বিশেষ বিশেষ খবর চালিয়ে দিত।

‘কাচ তুলে দিন! এই সময়ে জঙ্গলে মশাদের দাপট বড়ে। আপনারা তো প্লেন এরিয়ার মানুষ, রক্ত বেশি মিষ্টি হয়। গন্ধে গন্ধে শালাদের দল ঢুকে পড়বে।' অর্ধেকটা কাচ তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। প্রায় নয় ঘণ্টা সিগারেট খাইনি, কিন্তু মনেই ছিল না। এমনকি বাগডোগরাতে নেমেও খাবার কথা মনে হয়নি। জোরে একটা টান মেরে মাথার কোষে ধোঁয়াটাকে চারিয়ে দিতে দিতে চাঙ্গা লাগল অবশেষে। এবার কিছু জরুরি কথা বলে নেওয়া যায় ৷

‘আমি হোটেল সিনক্লেয়ারে থাকব। কাল সকাল সাতটার মধ্যে ওখানে চলে আসবেন। আর আজ আপনাকে রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সিনক্লেয়ার। বড়িয়া হোটেল। ম্যালের পাশেই। আপনাদের কাগজের সাবরা এসে আগেও থেকেছেন।'

আমি যে ভারত-বিখ্যাত কাগজটির সরাসরি কর্মচারী নই, বরং তার সিস্টার অর্গানাইজেশন হিসেবে আর একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের সাংবাদিক, সে-সব মিহি পার্থক্যের কথা মদনদাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। একটা সিগারেট বার করে মদনদার কাঁধে টোকা মারলাম, 'চলে?'

লাজুক হাসলেন মদনদা, ‘ভেরি কস্টলি! দিন একটা!'

আয়েশ করে সিগারেট টান মেরে মদনদা আবার মুখ খুললেন, ‘ভুল সময়ে এসেছেন ম্যাডাম। এই সিজনে দার্জিলিং-এ কেউ থাকে না। সারাক্ষণ খালি বৃষ্টি, আর ফগ। চার হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার আশা ছেড়েই দিন। হোটেল থেকেই বেরোতে পারবেন না সাইটসিইং-এর জন্য।'

সিগারেট টান মেরে জানলার গায়ে মাথা রাখলাম। মদনদা যদি জানতেন, এই আসাটুকুর জন্য কতখানি কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমায়! চুয়াল্লিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক রহস্যকাহিনীকে কবরখানা থেকে তুলে এনে স্নান করিয়ে, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরিয়ে এবং কঙ্কালের উপর রক্তমাংসের প্রলেপ দিয়ে জীবন্তভাবে তাকে ভদ্রসমাজে হাজির করানোটা এতটাই কঠিন যে তার কাছে দার্জিলিং-এর এই অকরুণ আবহাওয়াও আপাতত তুচ্ছ। না, অরুণ চৌধুরী আমাকে দার্জিলিং আসতে বলেননি। বরং ফোন করে যখন তাঁকে আমার উদ্দেশ্য বলেছিলাম, একটুক্ষণ চুপ থেকে মৃদু কিন্তু কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘পুরোনো কথা খুঁচিয়ে ঘা করতে চাইছেন কেন?

সামান্য হাসির আভাস এনেছিলাম গলাতে, 'আপনি কি চান না, সত্যিটা সকলের সামনে আসুক? যে রহস্য গত চুয়াল্লিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যজগৎকে আন্দোলিত করেছে, সারা জীবন সন্দেহের খাতা থেকে আপনার নাম মুছে দিতে বাধা দিয়েছে, তার একটা কিনারা হোক, এটা কি আপনার অভিপ্রায় নয়? আমি কিনারা করব বা পারব আদৌ, সেটা বলছি না। আমার কাজ তো আর তদন্ত করা নয় ৷ কিন্তু আমি যেটা পারি, সেটাই করতে চাইছি। ঘটনাটায় আপনার বয়ানটা তুলে ধরতে চাইছি পাঠকের সামনে।

‘কেন? হঠাৎ আমার উপর এতদিন পরে এতটা সদয় কেন হয়ে উঠল ভারতের মিডিয়া?'

‘কারণ কেসটা পড়বার পর আমার মনে হয়েছিল যে আপনার কথাটা ঠিকভাবে উঠে আসেনি। আপনার কি মনে হয় না যে বাংলাভাষার সম্ভবত সবথেকে বাণিজ্যসফল লেখক নিজের কথাটুকুই প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন? আমার সিরিজটা পড়েছেন কিনা জানি না। পড়লে দেখবেন, আমি পুলিশের রিপোর্ট অথবা কোর্ট প্রসিডিংসের থেকে সাধারণত

বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান, সাধারণ মানুষের সাক্ষ্য ইত্যাদির ওপরে। পুলিশ অনেক সময়েই আমার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও এনেছে এই কারণেই। কিন্তু যেটা দেখাতে চাই, তা হলো সন্দেহভাজনের নিজস্ব বক্তব্য, যেটাকে সরকারি দলিল অতটা গুরুত্ব দেয় না।'

'হুঁ। আমি এখনই কিছু জানাতে পারছি না। আপনি কাল ফোন করুন একবার। তখন জানাব, মুখ খুলতে রাজি কিনা। আজকের রাতটা ভেবে দেখি।

পরদিন অরুণ চৌধুরী নিজেই সকালে ফোন করে জানালেন যে তিনি চাইছেন না থিতিয়ে পড়া জল আবার ঘোলা করতে। কাজেই, আমি যেন দার্জিলিং না আসি।

তারপর থেকে সাতদিন বার চারেক ফোন করেছি। বারে বারে বুঝিয়েছি। ভেবে দেখবার অনুরোধ করেছি। অরুণ কর্ণপাত করেননি। তাঁর একটাই, বক্তব্য, ১৯৭৫ সালে যা ঘটে গিয়েছে তাকে ২০১৯-এ খুঁচিয়ে তুলে অকারণ বিতর্ক তৈরি করতে চান না। তাঁর ভাবমূর্তি? সেটার অস্বচ্ছতা এতদিন বাদে আর কাটবার নয়।

শেষে আমার এডিটর মহেশ যোশি হতাশ গলায় বলেছিল, 'এটা আর হবে না তনয়া। লুক ফর সামথিং এলস।'

আমি এত সহজে ছাড়তে প্রস্তুত ছিলাম না অবশ্য। ছোটোবেলা থেকেই অপরাধকাহিনী, গোয়েন্দাগল্প আর রহস্যের পোকা হিসেবে অরুণ চৌধুরীর নাম আমার অজানা ছিল না। কারণ অরুণ চৌধুরী স্মরণযোগ্য অতীতে বাংলা, শুধু বাংলা কেন, ভারতীয় রহস্য সাহিত্যের অন্যতম ব্যাংকেবল নাম, যাঁর এক একটা বই গড়ে তিরিশ হাজার কপি বিক্রি হয়। ইংরেজিতে অনুবাদ হয় তাঁর বই। সিনেমাও হয়েছে বেশ কয়েকটা। তিন বছর আগে সাহিত্য আকাদেমি পেয়েছেন। একমাত্র ভারতীয় লেখক, যাঁর বই রহস্য উপন্যাসের নোবেল, ইন্টারন্যাশনাল এডগার পুরস্কারের জন্য একবার শর্টলিস্টেড হয়েছিল। কলকাতা থেকে সারাজীবন বহুদুরে। দার্জিলিং-এ থেকেও অরুণ চৌধুরী সেই বিরল বাঙালিদের একজন যাঁরা মেধায়, মননে ও স্বীকৃতিতে আন্তর্জাতিক। সবথেকে বড়ো ব্যাপার তাঁর উপন্যাসের সাহিত্যগুণ উৎকৃষ্ট মানের, গদ্যভাষা সমৃদ্ধ, শৈলী অভিনব, এবং সামগ্রিকভাবে সিরিয়াস সাহিত্যের সারিতে স্থান পাবার যোগ্য। এমনকি মাঝে মাঝে সমালোচকেরা এই অভিযোগও এনেছেন যে অরুণ নিজের সিরিয়াস লেখকের তকমা ধরে রাখতে এতই উদ্বিগ্ন যে সাহিত্যিক স্টাইলের বাড়াবাড়িতে গোয়েন্দা কাহিনীর রোমাঞ্চকে বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্লট, মোটিভ এবং মনস্তত্ত্ব বয়নের ক্ষেত্রে অরুণ কোনো কোনো বইতে আন্তর্জাতিক ক্রাইম কাহিনীর মানে পৌঁছে গিয়েছেন বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছিল।

আর অরুণ চৌধুরীর সূত্রে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রহস্যটার ব্যাপারে অবগত ছিলাম। বাবা প্রথম গল্প করেছিল, এবং প্রচণ্ড ইন্টারেস্টিং লেগেছিল শুনেই। একটা গোটা ছুটির দুপুর আমি আর বাবা বসে বসে অপরাধটা নির্মাণ পুনর্নির্মাণের খেলায় মেতেছিলাম। তারপর বড়ো হয়ে ইন্টারনেট ঘেঁটে এই বিষয়ে আরও পড়েছি। জেএনইউ থেকে বেরিয়ে যখন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমে ঢুকি, সেই সময়ে আবার কী একটা আলোচনায় অরুণ চৌধুরীর নাম সামনে এসেছিল। চাগাড় দিয়ে উঠেছিল পুরোনো কৌতূহল। কয়েকদিনের ছুটিতে কলকাতায়, ফিরে পুলিশ রেকর্ড জোগাড় করে আবার খুঁটিয়ে পড়েছিলাম।

অন্যমনস্কভাবে কখন যে ডান হাতের পোড়া জায়গাটায় আঙুল বোলাতে শুরু করে দিয়েছি, জানি না। চমক ভাঙল সিগারেটের ছ্যাঁকায়। লম্বা ছাই টুপ করে গাড়ির ভেতর ঝরে পড়ল। তাড়াতাড়ি সিগারেটটা জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে কাচ তুলে দিলাম।

রাস্তার অনেকটা নীচে চোখ ভাসিয়ে দিলে এখন দেখতে পাচ্ছি, হালকা ছাইরঙা বৃষ্টির দল ধীরে ধীরে দখল নিচ্ছে উপত্যকার। সারি সারি বস্তি আর তাদের টিনের খুপরি, মোমোর দোকান, উগ্র হোর্ডিং, পাহাড়ের গা বেয়ে চাবড়া চাবড়া ক্ষতের মতো বাদামি খেত—ধূসর

মেঘে ছুপিয়ে দিচ্ছে। একশো বছর আগের বস্তি ও বিজ্ঞাপনহীন উপত্যাকার সরল সবুজ চেহারাটা ধরা আছে একটি ভুলে যাওয়া ইংরেজি কবিতায়, যা এখন আমার ব্যাগের ভেতর একটি পুরোনো বইয়ের পৃষ্ঠার হলদে ভাঁজে শুয়ে আছে। ব্যাগের চেন খুললাম। একটা সুডোকুর ম্যাগাজিন, অর্ধেক পড়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাড়াহুড়োয় ব্যাগেই থেকে গেছে। মার্ডার অফ রজার অ্যাক্রয়েড, সেই স্কুল জীবনে বাবা কিনে দিয়েছিল। প্লাস্টিকের তাপ্পি মারা, স্পাইন ভেঙে গিয়েছে... কতদিন হয়ে গেল পড়িনি! তার নীচে সেই হলদে ভাঁজের পুরোনো বই। এতদিন ধরে যে যে শহরে থেকেছি, বইটাকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি, রজার অ্যাক্রয়েডের পিঠোপিঠি ঘুমিয়েছে আমার সুটকেসের অন্ধকারে, কী বইয়ের তাকের ভুলে যাওয়া কোণায়। এমন নয় যে খুব পড়তাম, বা প্রিয় বই ছিল। হয়তো অভ্যেসের বশেই। পাতা লালচে হয়ে গেছে, কিন্তু ভেতরের মলাটে সৌখিন ক্যালিগ্রাফিতে 'অমিতাভ মিত্র' নামটা এখনও জ্বলজ্বলে। পাতলা, স্যাঁতসেঁতে পাতাগুলো নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকলাম। যে সময় হারিয়ে গেছে, যে মানুষকে সবাই ভুলে গেছে, তার কিছুটা অবশেষ কি মিলবে এখানে? পুরোনো কাগজের গন্ধ পেলাম না। মায়ের হাতের রান্নার মতো, অথবা বাবার ড্রয়ারে লুকানো কড়া চারমিনারে প্যাকেটের মতোই, পুরানো বইয়েরও স্বাদ কিছু থাকে না। থাকে শুধু স্মৃতি। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আনসলভড্ ক্রাইমগুলো নিয়ে আমার সিরিজটা শুরু করবার

সময়েই স্থির করে নিয়েছিলাম যে সিরিজের শেষ স্টোরি হবে অরুণ চৌধুরীর রহস্যময় ঘটনা, যার এখনও কিনারা হয়নি। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, ছটা ঘটনা নিয়ে কাজ করব। কিন্তু লেখাগুলো তুমুল জনপ্রিয় হয়ে গেল । আমি সাংবাদিকতার একটা ছোটোখাটো পুরস্কার পেলাম। একটা প্ল্যাটফর্ম চুক্তি করতে চাইল এই লেখাগুলো নিয়ে ওয়েব সিরিজ বানাবে। ম্যাগাজিনের তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার ফলে যেটা হলো, স্টোরির সংখ্যা আরও বাড়াতে হলো। ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিল, অন্তত দুই বছর ধরে টানবার মতো রসদ চাই। ফলে, শেষ দুই বছর অবিশ্রান্ত ভাবে ছুটতে হলো সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে। উদ্দেশ্য, অমীমাংসিত রহস্যদের মানুষের চোখের সামনে আনতে হবে। ছটা ঘটনা শেষে পনেরোটায় এসে ঠেকল। কিন্তু তার পরেও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম যে অরুণ চৌধুরীকে দিয়েই সিরিজ শেষ হবে। আমার ছোটোবেলা, আমার বাবা, আমাদের একসঙ্গে বই পড়া, আমাদের সেই দুপুরটা, এই সবকিছুর প্রতি এর থেকে ভালো হোমাজ আর কী-ই বা হতে পারতো!

কিন্তু অরুণ চৌধুরী রাজি হলেন না। মহেশের সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করলাম আমাকে আরও সময় দেবার জন্য। কিন্তু ততদিনে সিরিজের জনপ্রিয়তা এতটাই বুদ্ধি পেয়েছে যে একটা সপ্তাহও স্টোরি ছাড়া ম্যাগাজিন ছাপানোর কথা ভাবা যাচ্ছে না। হিসেবটা ছিল, প্রতি দুই মাসে একটা নতুন স্টোরি দেব। এক মাস লাগবে গবেষণার জন্য, আর এক মাস লেখা এবং সম্পাদনার জন্য। গড়ে ষোলো হাজার শব্দের স্টোরি, যা প্রতি সপ্তাহে দু হাজার শব্দের হিসেবে আট সপ্তাহ ধরে বেরোবে। এখন আমি যদি সময় চাই, তাহলে কয়েক সপ্তাহ স্টোরি ছাড়াই ম্যাগাজিনকে প্রেসে পাঠাতে হবে। ম্যানেজমেন্টের কাছে উত্তর দিতে হবে মহেশকে। মহেশ শেষে রেগে গিয়ে বলেছিল, 'এতদিন চাকরি করে ডেডলাইনের মর্ম বোঝো না? ইয়ার্কি হচ্ছে? যদি এই স্টোরি ক্লিক না করে তো অন্য স্টোরি খোঁজো।'

মাথা গরম করে মহেশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেও, বুঝতে পারছিলাম ও ঠিক। আর অরুণ মুখ না খুললে এই স্টোরির কোনো মূল্যও থাকে না। অফিস থেকে বেরিয়ে খান মার্কেট থেকে এক বোতল ওয়াইন কিনে ফ্ল্যাটে চলে এলাম। সারা সন্ধে ওয়াইন খেতে খেতে গুড ওমেনস দেখলাম ল্যাপটপে। অফিসের ফোন তুললাম না। মহেশের ফোন পর্যন্ত কেটে দিলাম। এই সন্ধেটার দরকার ছিল, কারণ যদি সত্যিই স্টোরিটা করা না যায় তাহলে

আগামিকাল থেকেই অন্য স্টোরি খুঁজতে হবে। তার আগে একটা সন্ধে আমার অন্তত চাই মাথাকে অরুণ চৌধুরীর গল্প থেকে বার করে আনবার জন্য। আর ঠিক পরের ভোরবেলাই, আমি তখনও গভীর ঘুমে, ফোন বাজল। হ্যাংওভার আচ্ছন্ন মাথা অনেকটা সময় সিদ্ধান্তই নিতে পারছিল না যে ফোন ধরবে নাকি সুইচ অফ করে দেবে— অবশেষে কোনোরকমে ফোন তুলে ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, 'হ্যালো।'কে ফোন করেছে সেটাও দেখিনি।

'আমি অরুণ চৌধুরী বলছি। আপনি দার্জিলিং আসতে পারেন।'

কয়েক মুহূর্ত আমার মাথা কাজ করছিল না। স্বপ্ন দেখছি কিনা সেটাও ভাবছিলাম, এবং বিশ্বাস নামক ট্র্যাপিজের তারে দুলতে দুলতে যে প্রশ্নটা আমার নেশাজড়ানো জিভ থেকে গড়িয়ে পড়ল তার থেকে হাস্যকর কিছু ওই মুহূর্তে আর হয় না 'কেন?'

'কেন মানে? আপনি কি গল্পটা লিখতে চান না? '

'না মানে', নিজেকে ধাতস্থ করে নেবার প্রবল চেষ্টায় অবশেষে কিছুটা থিতু হলাম। দুরুদুরু বুকে উঠে বসলাম খাটের ওপর। সত্যিই কি অরুণ রাজি হচ্ছেন? নাকি এর মধ্যেও কোনো প্যাঁচ আছে? 'আপনি মত বদলালেন কেন?'

'ভেবে দেখলাম, আপনিই ঠিক। আমি মারা যাবার পর আমার ভাবমূর্তি কী হলো সেটা দেখতে আসব না। কিন্তু জীবদ্দশায় আর একবার চেষ্টা করতেই পারি।' একটু থেমে অরুণ আবার বললেন, 'কিন্তু আমার কথা আপনি বিশ্বাস নাও করতে পারেন। এর আগেও বহু মানুষ করেনি। তাই আপনাকে একটা টাস্ক দেব। সেটা যদি করতে পারেন, তাহলে সত্যিটা আপনিই বুঝতে পারবেন।

'কী টাস্ক?' ঢোক গিললাম। তাহলে সত্যিই প্যাচ আছে।

'ভয় পাবেন না। দৈহিক পরিশ্রমের কিছু নয়। মাথা খাটানোর রসদ দেব আপনাকে। বাকি কথা পরে, যখন দার্জিলিং আসবেন। আমাকে আগে থেকে তারিখ আর সময় জানিয়ে দেবেন।' ফোন রেখে দিলেন অরুণ।

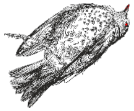

কার্শিয়াং পৌঁছে গেছে গাড়ি। হিলকার্ট রোডে এরপর থেকে যানজট শুরু হবে। গাড়ি উঠে পড়ল ওপরের বাইপাসে। পাহাড়ের গা বেয়ে কুয়াশা উঠে আসছে গুঁড়ি মেরে। পাইন ফার্ণের দল গা জড়াজড়ি করে দলা দলা অন্ধকার তৈরি করেছে রাস্তার ধারে। উঁচু উঁচু পাহাড়ের আবছায়া শিল্যুয়েট দেখতে পাচ্ছি। তারা কাছে আসার আগেই বৃষ্টির ছাট এসে আবছা করে দিচ্ছে সামনের কাচ

‘মদনদা। প্রথমে জলপাহাড় রোড যাব। চৌধুরী ভিলা। আপনাকে বলে দেব ঠিক কোন্ জায়গাটায়।' জিপিএস যদি কাজ না করে, ফোন করতে হবে অরুণ চৌধুরীকে।

আরও বেশ কিছুটা রাস্তা চলার পর পাহাড়ি ঝোরা চোখে পড়ল। কয়েকজন স্থানীয় মহিলা একটা পাথরের উপর ছাতা মাথায় বসে আছেন। উঁচু পাহাড়কে আর কুয়াশার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, শুধু জেগে আছে নেসলে কোম্পানির একটা কুৎসিত সাইনবোর্ড। আর কুয়াশার চাদরের আঁশ ফুঁড়ে মাথা গলানো মিটমিটে আলোর দল। আশেপাশের পাহাড়ের গায়েও রিসর্ট আর হোটেলের ছোটোবড়ো বোর্ড। এগিয়ে গেলে কাঠচেরাইয়ের গুদাম। কয়েকটা সস্তা কেক পেস্ট্রির দোকান, চায়ের গুমটি, ধাবা, মোমো স্টল। আবছা অন্ধকারকে কিছুটা ঠেলে সরিয়ে রাখছে এখানে-ওখানে জ্বলে ওঠা আলো। রং-বেরঙের জামা পরা একটা ভুটিয়া মেয়ে একদল ছাগল নিয়ে গাড়ির সামনে রাস্তা পেরোচ্ছে। গাড়ি থেমে গেল।

‘প্রায় এসে গেছি। চা খাবেন নাকি ম্যাডাম? '

'নাহ, আপনি খান।'

‘সে কী!’ অবাক হয়ে পেছন ফিরে তাকালেন মদনদা। ‘চায়ের জায়গাতে এসে চা খাবেন না?’

‘চা খাই না।’ অল্প হেসে জানালাম।

বৃষ্টি এখন কম। পরনের বাদামি জিনস কী কারণে যেন নোংরা হয়ে গেছে। কালো কালো দাগ পড়েছে জিনসের গায়ে। গাড়ি থেকে নেমে মুখে হাত বোলালাম। একটা তেলতেলে ভাব, যার ওপর কুয়াশা এসে বসবার আগেই পিছলে যায়। আইলাইনার ধেবড়ে গেছে নিশ্চয়। এই চেহারা নিয়ে ওরকম সম্ভ্রান্ত পরিবেশে না যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আমার হাতে তো সময় বেশি নেই। এমনকি লিপগ্লসটাও হ্যান্ড লাগেজে রেখেছিলাম কিনা মনে পড়ছে না।

মদনদা আয়েশ করে চা খাচ্ছেন। আমি একটা আড়মোড়া ভেঙে সামান্য হাঁটাহাঁটির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। হঠাৎ চমকে দেখি, ঘন কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমার রাস্তা রোধ করে দাঁড়িয়েছে এক হাট্টাকাট্টা লোক। হয়তো কুয়াশা না থাকলে দূর থেকে দেখতে পেতাম, কিন্তু এখন মনে হলো লোকটা অদৃশ্য অবস্থা থেকে আবির্ভূত হয়েছে, আর তার জন্যই ধক করে উঠল বুকটা। রুক্ষ এবড়োখেবড়ো মুখ, গালের দুই পাশ দিয়ে ঝুলে পড়া গোঁফ এবং কুতকুতে চোখ মেলে আমার সর্বাঙ্গ ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে মেপে নিল। দেশের মধ্যে নানা জায়গাতে গিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টির সম্মুখীন হওয়া আমার কাছে নতুন না হলেও, অবাঞ্ছিত চোখ এবং স্পর্শ বিষয়ে ভয়ংকর একটা অস্বস্তি এখনও মন থেকে তাড়াতে পারিনি।

‘হোটেল চাহিয়ে ম্যাডাম?' কর্কশ স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল লোকটা।

মুখ খোলবার আগেই দেখি মদনদা আমার পাশে চলে এসেছেন। মদনদা নেপালি ভাষায় কিছু বললেন। আমার নাম আর কাগজের নাম, এই দুটো শব্দ শুনতে পেলাম। ‘চৌধুরী

ভিলা' শুনে লোকটা সচকিত হলো। আমাকে মাপলো আর একবার। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। তারপর প্রায় নিজের মনেই বলল, 'জার্নালিস্ট? চৌধুরী ভিলা যাবেন? কেন?

‘কাজে। আপনি চেনেন?’

লোকটা উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল আর একবার। তারপর ঘন কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। যাবার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল আমাকে।

গাড়ি স্টার্ট করতে করতে মদনদা বললেন, ‘এখন অফ সিজন, টুরিস্টের আকাল। দার্জিলিং-এ এখন কেউ পা দেবার আগেই তাই দালালদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, কে কাকে নিয়ে কোনো হোটেলে পৌঁছে দিতে পারবে। তবে এই যে দেখলেন, গিরিরাজ, এ মহা ধুরন্ধর। এককালে অনেক গুণ্ডামি, মারামারি করেছে। লক আপেও গেছে কয়েকবার। এখানকার হোটেল আর জিপগুলোকে কেন্দ্র করে দালাল চক্র আছে কয়েকটা। তার মধ্যে এ একটার পাণ্ডা।'

‘কিন্তু চৌধুরী ভিলার কথা শুনে এরকম অবাক হলো কেন?’

‘চেনে হয়তো। ওদের বাড়ি জলাপাহাড়ের নীচের বস্তিতেই। ওর বাপ কাকারাও জলাপাহাড়ের বাড়ি, মালের হোটেল এসব জায়গাগুলোতে কাজ করে এসেছে সারাজীবন। ও এখানকার প্রায় সবাইকেই মুখে চেনে।’

খটকা লাগল। চেনা এক কথা। কিন্তু গিরিরাজ যেরকম প্রতিক্রিয়া দিল, সেটা শুধুমাত্র জানাচেনা থেকে আসে না।

শহরের বহির্ভাগ এগিয়ে আসছে। চারপাশে লোকজন কম। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে শুধু আশেপাশের দোকানের আলো। কুয়াশার মধ্যে কোথাও কোথাও জটলা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। বাকি জায়গাটা ফাঁকা এবং অস্বচ্ছ অন্ধকার। অনুমান করলাম, ভিড়ের জায়গাগুলো হোটেল, পাব অথবা রেস্তোরা। এই শহরে বর্ষার নির্জনতায় যখন রাত্রি নামে, নির্জন হোটেলদের ধ্বংসস্তূপ আর পলিথিনের কম্বলে ঘুমিয়ে থাকা জিপগাড়ির দল যখন গুটিয়ে ফেলে নিজেদের, তখন মনে হয় পাহাড়ের আদিম হিমশীতল জঙ্গল এসে দখল নিচ্ছে গোটা জায়গাটার। মনে হয়, এই অবিশ্রান্ত ছিপছিপে বৃষ্টির থেকে পরিত্রাণ নেই।

জলাপাহাড়ের রাস্তা দিয়ে সাবধানে গাড়ি উঠছে। কুয়াশা এখন কম। হয়তো ওপরে উঠতে সময় নিচ্ছে। আশেপাশে অভিজাত মহল্লা। জিপিএস খুলে দেখলাম, আর চারশো মিটার। অধিকাংশ বাড়ির সামনে বাগান। লনে আলো জ্বলছে। দু-একটা হোটেল। বাড়িগুলির গড়ন পুরোনো ব্রিটিশ উপন্যাসকে মনে করিয়ে দেয়। মদনদাকে জিপিএস দেখে রাস্তার নির্দেশ দিতে দিতেই চোখ তুলে দেখলাম, বৃষ্টিভেজা নির্জনতার মধ্যে একটা নিঃসঙ্গ ছায়ামূর্তি পাহাড়ের ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আমার গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ চোখ কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর রেনকোট পরা। মাথায় হুড চাপানো। মূর্তিটা নিস্পন্দ ভাবে নীচের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু বুঝতে পারছি তার দৃষ্টি অনুসরণ করছে গাড়িকে। গাড়িটা মূর্তির সমান ধাপে উঠল। মূর্তিটা আস্তে আস্তে মুখ তুলে গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল। এখন গাড়ি আর মূর্তি একই সমতলে, পঞ্চাশ মিটার মতো দূরত্বে দাঁড়িয়ে। মুখ এখনও দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তাই লোকটার পুরো চেহারাই কালো একটা অবয়বের মতো লাগছে। গাড়িটা আর একটা বাঁক ঘুরল। পেছন ফিরে তাকালাম। শুধু আবছা কুয়াশা। আর কিছু নেই।

মদনদা গাড়ি থামালেন। সামনে একটা বড়ো ফটক। তার গায়ে ইংরেজিতে লেখা ‘চৌধুরী ভিলা'।

এগিয়ে এসে চোখকে ধাতস্থ করতে হলো। ভেতরে প্রশস্ত বাগান পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। বাগানের ভেতর আলো জ্বলছে। গাড়ির শব্দ শুনে সিকিউরিটি এসে গেট খুলে দিচ্ছে। ঘড়ঘড় শব্দ করে দুই দিকে হাঁ হয়ে গেল পুরানো লোহার ফাটক। বাগানের ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটা-পথ এঁকে বেঁকে উঠে গিয়েছে একটা দোতলা বাড়ির কাচের দরজায়। দরজার পাশে প্রশস্ত ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। বাড়ির পুরোটাই কাঠের। তার ওপর

পোড়ামাটির রঙের একটা এফেক্ট আনা হয়েছে। দোতলার মাথায় টালি। বিভিন্ন অর্কিড, লতাপাতা দিয়ে সাজানো। একটা চিমনি উঠে গেছে তার মধ্যে থেকে। বাড়ির একপাশে লাগোয়া আর একটা ছোটো টালির চালওয়ালা একতলা বাড়ি। সম্ভবত গেস্টহাউস। বাগানের ডানদিকে একটি ছাউনির নীচে গা এলিয়ে পড়ে আছে ঝকঝকে হণ্ডা সিটি। সম্পূর্ণ ভিক্টোরিয়ান পরিবেশের মধ্যে গাড়িটাই যা বেমামান। হয়তো মনে মনে আশা করেছিলাম যে পুরোনো দিনের ল্যান্ডরোভার বা নিদেনপক্ষে ফিয়াট দেখতে পাব

এটাই সেই বাড়ি। বিখ্যাত লেখক অরুণ চৌধুরীর বাড়ি। এই বাড়ি থেকেই চুয়াল্লিশ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন প্রতিশ্রুতিবান সাহিত্যিক অমিতাভ মিত্র। দুই দিন পরে তাঁর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায়। যে হত্যারহস্যের সমাধান আজও হয়নি।

২৭/০৯/১৯৬৯

ভাষা এসো সোনম প্রধানের শরীর ছুঁয়ে, এসো দিগ্বিদিক
প্রাণ এসো শেষ তুষারে পাইনের পা ভিজিয়ে
আর গাথা এসো জলচর শামুকের শাঁস যেভাবে নিংড়ে আনে প্রতিধ্বনি
আমাদের বিষাদনাভির গল্পে ছুটে আসুক পার্বত্য হরিণের দল
এসো স্বপ্নবিষ, হত্যাময় বরফ

আরও কয়েকটা লাইন যাবে,
এমন হতে পারে যে

শোন, কলকাতা থেকে কিছু ভালো লেখার কাগজ পাঠাস, ভালো তামাক। তোর আর টাকাপয়সার হাল কেমন? বাড়ি থেকে টাকা দেয়? নাহলে থাক। তবে ম্যাগাজিনগুলো পাঠাস মনে করে । ইমন যা কিছু পুরোনো কাগজ আছে, সব দিবি।

দশকের সঙ্গে কবিতাকে বেঁধে দেয় কোন শালা। সব অশিক্ষিত। তবু মনে হচ্ছে যেদিকে এগোচ্ছে ব্যাপারস্যাপার, বেশ কিছু রাগী চিৎকার শোনা যাবে। তারপর বলা হবে, এ দশক ক্রোধের দশক। হবেই। আমি শালা সমালোচক আর সাহিত্যবেত্তাদের হাড়ে হাড়ে চিনি। সবে এপ্রিল মাস, তার মধ্যেই এদিক ওদিক বলাবলি হচ্ছে, মুক্তির দশকে মুক্তির কবিতা এসব হাবিজাবি। ধুস! এদিক অনুকৃত আঙ্গিকের ওপর অধিকৃত আঙ্গিকের জয় ঘোষণার যে ব্যাপারগুলো আমরা ভেবেছিলাম, সেসব কই। সেই তো একই ধাঁচ, যেরকম পঞ্চাশের দশক থেকে চলে আসছে। সর্বনাশ করে দিয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারও আগে জীবনানন্দ দাশ। ভয়ানক প্রতিভাবান কবি আসলে কবিতার সর্বনাশ করে। পরের কয়েক দশক জুড়ে উত্তরসূরি কবিরা সেই ভাষা আর সেই আঙ্গিকের প্রভাব থেকে বেরতে পারে না। এই সর্বনাশ মধুসূদন দত্ত করেছে, রবি ঠাকুর করেছে, আর তারপর এরা। কী ফ্রাস্ট্রেটিং। গদ্যে মনে হয় কমলবাবু এতটা করতে পারবে না, কারণ ও জিনিস নকল করা কঠিন। আর গদ্য ফদ্য অন্য জিনিস, মাথা না ঘামানোই ভাল। এদিকে উত্তরবঙ্গে কী সাংঘাতিক লেখাপত্র হচ্ছে, কলকাতা আর কবে জানবে। আগের মাসে একটা নতুন কাগজ বার করল অরুণদা। কবিতা চাইছে। কলকাতার কাগজে আর লিখব না শালা। কলোনির ইয়ে মারি। বেঁচে থাক আমার নর্থবেঙ্গল। অরুণটা যদি এসব বুঝত। ল্যাপ্প্যাড় করছে, কলকাতার কাগজে জায়গা পাবে বলে। এরকম গাণ্ডুমার্কা ভাবে কেন? পড়তে গিয়ে কলকাতা দেখে মাথা-ফাথা ঘুরে গেছে ওর। পাছায় ক্যাত ক্যাত করে দুটো লাথ কষিয়ে লেউড়েপনা বার করতে হয়।

২৩/১০/১৯৭০

প্রিয় পার্থ,

চিঠির উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল অনেকটা। জানিসই তো, জুতোয় পেরেক ছিল। 'আকাশ' সেবার কলকাতায় গিয়ে পড়া হয়ে ওঠেনি, যাবার পথে জোগাড় করে এনেছিলাম। দিব্যি বার করছিলি তো, থামলি কেন দুম করে? তোর পাঠানো কবিতাটাও পড়লাম। কিন্তু এই এই যে লাইনগুলো— নীলোৎপল নাও, নাও এ কোমল হৃদয়ের তোমার রূপ দাও, তোমার জয় দাও অভয়ের- এখনও কাঁচা লাগছে কিছুটা। এ একরকম মন্ত্র-তন্ত্র আধারে তুই ক্লাসিক আবহ আনছিস, এতে উৎসাহ পাই না। প্রসাদে করো তারে যুধিষ্ঠির, উন্মোচিত হোক মহাতিমির— মানে, কেন? প্রার্থনার ফর্মে কবিতা লেখার নির্যাস তো আমাদের নয়, ছিল না। আবার— রণপ্রণয় দাও আর্ত পৃথ্বীকে— তোকেও কি তিমিরবরণদের রোগে ধরল নাকি? কানুবাবুদের শহীদ মিনারের সভায় গেছিলি টেঁছিলি মনে হচ্ছে? সে যাক, যা ভাল বুঝবি করবি। এদিকে কবে আসছিস জানা। যদিও দার্জিলিং শহর দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠছে,

তবে তোকে নিয়ে নিবেদিতার সমাধি দেখতে যাব একবার।

ভাল কথা, সুব্রতর মেসের গদি নাকি সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে এসেছি। শুনলাম খুব রাগারাগি করছে। ওকে পারলে কিছু দিস। আমার পকেট তো বুঝতেই পারছিস!

-অমিতাভ

অমিতাভ গুপ্তর কবিতা পড়েছিস? নাকি দারুণ লিখছে টিখছে? আমি কয়েকদিন আগে শুনলাম। পাঠাতে পারবি, কয়েকটা স্যাম্পল?

সমীক্ষা, অলিন্দ, এ সময়ের কবিতা, নক্ষত্র, এই কাগজগুলো পাঠাবি

সাদা পাহাড়ের ঈশ্বর

উপত্যকায় অনেকক্ষণ বৃষ্টি হলো। অনেকটুকু ঝড়ও চামচে করে ঢেলে দিল। এখন আকাশ ভারমুক্ত। আর চূড়ায় উঠলে হাত দিয়ে আকাশের গায়ে টোকাও মারা যেতে পারে। ঠিক যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘা ছুঁচালো ঠোঁট আকাশকে চুমু খায়। আমার শহরে একফালি মনাস্ট্রি। দরজায় বসে আছে আহত বালিকা। কবাট থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে।

রাত্রির নির্জনতায় ওটুকু করুণ চোখের সেদ্ধজলে বেঁচে থাকা। শোঁ শোঁ ঝড়ের শব্দে পাথুরে হৃদয় জেগেছিল। এরপর তুষারপাত হবে। হিম জ্যোৎস্নায় শুয়ে থাকবে বিবর্ণ বালিকাজন্ম। কে তাকে দেখবে? মৃতের শহরে কেউ বেঁচে নেই। শুধু একপাল জিপগাড়ি মাথায় প্লাস্টিক চাপিয়ে ঘুমে। গাঢ় নির্জনতা। বালিকার পায়ের আঙুল মাটি খুঁজছে। কেঁচোর স্বপ্নে ফিরে আসে ভয়। জামা ভেসে যায় রক্তে। একান্তে লুটিয়ে থাকা একটি বোতাম, ছেঁড়া। শান্ত শ্বাস ফেলে। ওই, ওই যে আবার বৃষ্টি এসেছিল। ছোটো গাছেরা লম্বা হয়ে উঠেছিল। রক্তাক্ত জামার ভেতর মুখ গুঁজেছিল ভিতু কেঁচো। চোর স্বপ্নখনির গহ্বর নেমে গেছিল অন্ধকার পাতালে। সে জানেনি। এখন গোল পতঙ্গের নিঃশ্বাস বৃষ্টির মনাস্ট্রিকে ঘিরে। ঝাঁকে ঝাঁকে হলুদ প্রজাপতি উড়ে আসবে। মুখ গোঁজা আহত বালিকা চাখবে আমাদের গল্পকথা। উপত্যকায় চাঁদ উঠবে। জন্মদিনের পায়েসের থালার মতো। মৃত বাবার কপালে চন্দনের ফোঁটার মতো। কেঁচোদের দল সে পায়েস বুক ভরে দেখে নেবে। মুখ ভরে।

আর কতদূর বাকি আছে আমাদের সমবেত কবিজন্ম, হে সাদা পাহাড়ের ঈশ্বর?

১৯/১২/১৯৭০

পার্থ,

নতুন দশক তাহলে তোর কবিতার বই দিয়েই শুরু হলো, কী বল? এপ্রিলে কলকাতা যাবার ইচ্ছে আছে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের শুওরের ঝোল খাওয়াবি, মনে থাকে যেন। তবে শুধু এটুকুতেই কি আর উদযাপন শেষ হবে আমাদের? আগেরবার মেটিয়াবুরুজের একটা বেশ্যাপট্টিতে প্রচুর ফূর্তিফার্তা হয়েছিল, ছিলিস না সেবার, স্বাভাবিক, তুই তো আর যাবি না ওসব জায়গাতে টকটকে লাল মাংসের ঝোল আর মোটা মোটা পোড়া রুটি, সঙ্গে লংকার আচার, লেবুর রস দিয়ে বাংলা। তবে বাদ দে এসব। তোকে নিয়ে সারারাত তোদের গঙ্গার কীসের ঘাটগুলো আছে, বড়বাজারের দিকে, ওগুলোতে ঘুরব, আর চিৎকার করে করে তোর বইটা থেকে কবিতাগুলো পড়ব সারারাত, আর যারা জেগে থাকবে তাদের দেখিয়ে বলব— দেখুন শ্রদ্ধেয় বানচোদের দল, আমার বন্ধুর কবিতার বই দিয়ে দশক শুরু হলো। যারা ঘুমাবে, তাদের কানের কাছে গিয়ে তারস্বরে ফাটিয়ে বলব— পতনজাত ভয় রুদ্ধনিশ্চয় শঙ্কাশীল / লাল লেলিহান কৃষ্ণ খরশান রক্তাবিল— কী সব লিখেছিস শালা! এভাবে অন্য

গ্রহের ভাষায় লিখতে পারে কেউ? বাকি কথা কলকাতা গিয়ে। দামী মদ খাবো তোর ঘাড় ভেঙে।

তিনটে কবিতা পাঠালাম। দরকার পড়লে এডিট করে নিস। জামশেদপুরের কমলকে দুটো পাঠাতে বলেছে, ওখানকার কাগজের জন্য। চমৎকার লিখছে ছেলেটা। ওর কালিমাটি রোড বলে একটা কবিতা পড়ে হাঁ হয়ে যাচ্ছি। আর শোন, অরুণকে আবার বলিস না তোর থেকে টাকা নিয়েছিলাম। ও শালা ফালতু গরম নেবে আমার ওপর। এমনিতেই হুমকির ওপর রেখেছে, মদ না কমালে বোতল ভেঙে পেটে ঢুকিয়ে দেবে। আমি কলকাতায় গিয়ে টাকাটা দিয়ে দেব।

কখনো মনে হয় স্ক্র্যাপরুমে দীর্ঘ বসে আছি, চারিদিকে নষ্ট যন্ত্রপাতি ভাঙা লেড জং ধরা স্ক্যাংক ক্র্যাফট পড়ে এদের এড়িয়ে গিয়ে অন্য কোনো শহরের কথা আর ভাবা যায় না তেমন —কমলের কালিমাটি রোড। যদি না পড়ে থাকিস। স্বদেশ সেনও জামশেদপুরের না? একে একদমই চিনি না, বয়েসে অনেক বড়ো শুনেছি। তোর আলাপ আছে?

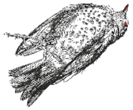

সে কি রাত্রির শেষ মৃত পাখি, যার স্মৃতি আঁচড়াল
মৃত্যুর ঘন ছায়ায় দেবযান
ভয়ের মতন মৃদুসঞ্চারী স্বপ্নের পিছু নিতে?
স্বপ্নের মত আয়ু চলে যায়, কখনো বা দ্রুত, কখনো বিলম্বিতে।
—পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

বছর ষাটেকের এক ভৃত্যস্থানীয় এসে দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। পুরানো আমলের ড্রইংরুম। ওক কাঠের টেবিল। সোফাতে বসলে কয়েক ইঞ্চি ভেতরে ডুবে যাওয়ার অনুভূতি হয়। ইতিউতি গাঢ় রঙের ল্যাম্পশেড। ঘরের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। দেওয়ালজোড়া সিলিংছোঁয়া আলমারি ঠাসা বই। উঠে গিয়ে বইগুলো দেখলাম। দুটো আলমারি ভর্তি ক্রাইমকাহিনী। শুধুমাত্র আগাথা ক্রিস্টি বা জন ডিকসন কারের মতো ধ্রুপদি লেখক নন। এমনকি ২০১৭ সালে প্রকাশিত ফরাসি বেস্টসেলার রহস্যোপন্যাসটিরও এক কপি সেখানে রাখা আছে। অর্থাৎ অরুণ চৌধুরী শুধুমাত্র গোল্ডেন এজ অফ ডিটেকটিভ ফিকশনেই আবদ্ধ নেই, সমসময়ে কী কী ঘটছে সেটাও তাঁর প্রখর চোখের বাইরে নেই। অন্য আলমারিগুলোতে বইগুলো বিষয় এবং অঞ্চলভিত্তিক সাজানো। ইংরেজি, আফ্রিকান এবং লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের তিনখানা আলাদা সারি। একটা আলাদা আলমারিতে শুধু বাংলা উপন্যাস। পরেরটায় বাংলা কবিতা। বাঁধানো লিটল ম্যাগাজিনের সারি। মনস্তত্ত্ব, সংগীত, অপরাধবিজ্ঞান, ইতিহাস, বৌদ্ধ দর্শন— লোকটা এত এত পড়ে, তাহলে লেখে কখন?

ড্রইংরুমের প্রশস্ত ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর বাইরে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া বাগান। দূরে গেট, সিকিউরিটির ঘর, যেখানে এখন টিমটিমে আলো জ্বলছে। কতখানি জায়গা নিয়ে এমন বাড়ি বানানো হয়, সামনে পেছনে কতটা ছাড়া হয়, বিশেষত যাকে প্যাটিও বলে, সেগুলো নিয়ে আমার বরাবরের কৌতূহল। সল্টলেকে কলেজ থেকে ফেরবার সময়ে এরকম অভিজাত একটি বাড়ির সামনে আমার গায়ের গতি শ্লথ হয়ে যেত। হাঁ করে বাড়িটার সাজানো ব্যালকনি, তার সুদৃশ্য টব, সামনের আলোকিত বাগান, বাহারি টালির দিকে তাকিয়ে ভাববার চেষ্টা করতাম কারা থাকে এরকম বাড়ির ভেতর। তারা কি খুব বড়োলোক হয়? পরে দিল্লিতে গিয়ে এই শ্রেণীটার সঙ্গে পেশাগত সূত্রে ওঠাবসা করতে করতে সেই বিহ্বল ভাবটা কেটেছে। এরকম বাড়িতেও প্রচুর গিয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা লুকানো ইচ্ছে হয়তো মনের ভেতর থেকেই গিয়েছে, যে আমারও একদিন এরকম একটা বাড়ি হবে।

‘এতক্ষণ ধরে জার্নি করবার পরে নিশ্চয়ই ক্লান্ত? কফি খাবেন?’

মৃদু গলায় বললেন কেউ। পেছনে ফিরে দেখি, সোফার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আকাশি জিন্স আর খাদির পাঞ্জাবি পরা এক প্রৌঢ়। ছবিতে বহুবার দেখলেও সামনে থেকে মুখের বলিরেখাগুলো বেশি স্পষ্ট বোঝা যায়। তথ্য অনুসারে, অরুণ চৌধুরীর জন্মদিন আঠোরোই মে, ১৯৪৭। কিন্তু বাহাত্তর বছর বয়েস সত্ত্বেও বৃদ্ধ না বলে প্রৌঢ় বললাম, কারণ দেখে ষাটের বেশি মনে হয় না কিছুতেই। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। শীর্ণ চেহারা। বিশেষ লম্বা নন, দোহারা। খাড়া নাক, পুরু ঠোঁট, গালে বহুকাল আগে হওয়া বসন্তের দাগ এখনও বিদ্যমান। মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। দৃষ্টিতে একপ্রকার বিষণ্ণতা। অরুণ আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসি চোখ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল।

মুখোমুখি বসলাম। ‘একটানা বসে থাকাকে যদি ধকল বলেন, তা কিছুটা গেছে। আমার কালো, দুধ চিনি কিছু চলে না।

'আমার স্ত্রী আজ সামান্য অসুস্থ, তাই নীচে এলেন না। কফিটা বানিয়ে ফেলি, তারপর বাকি কথা হবে। অমাদের বাড়িতে যে ছেলেটি সারাক্ষণের ফাইফরমাশ খাটে, সে এখনও কফিমেকার নামক বস্তুটির খুঁটিনাটি শিখে উঠতে পারেনি।'

ড্রইংরুমের পাশে খোলা রান্নাঘর। ড্রইংরুম আর রান্নাঘরকে অর্ধেকটা ভাগ করেছে একটা পাথরের স্ল্যাব। তার উপর কফিমেকার বসানো। দেখলাম, অরুণ তাড়াহুড়ো না করে সময় নিয়ে কফির মাপ নিলেন। জল ঢাললেন। মনে হচ্ছে, গভীর কিছু চিন্তা করছেন। সময় দিচ্ছেন নিজেকে। এই ধরনের মানুষ ঠিক কম কথা বলেন এমনটা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যত কথাই বলুন না কেন, এত মেপে মেপে এবং শান্ত স্বরে বলেন যে শেষমেষ মনে হয় অপরপক্ষই সবকিছু বলে গেল, আর তিনি শুনে গেলেন। পাশে সার সার কাপ রাখা। উঠে দুটো কাপ অরুণের হাতে দিলাম। অরুণ ভুরু কোঁচকালেন— দুটো কাপের গড়ন এক নয়। একটা গোল, আর একটা চৌকো। বার বার বলেছিলাম গোবর্ধনকে, যেন না মিশিয়ে ফেলে। গোল কাপে কালো কফি ঢাললে একই আকারের চৌকো কাপের তুলনায় তাপ বিকিরণের মাত্রা বেশি হয়। ফলে কফি ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। দাঁড়ান, কাপ বার করছি।'

আমি অরুণকে নিজের কার্ড দিলাম। অরুণ কার্ডটা উলটে-পালটে দেখে মুখ তুললেন।

'আজকাল ফেসবুক বা লিঙ্কড়ইনের যুগে কারও সম্বন্ধে তো তথ্য জোগাড় করা কঠিন কিছু নয়। আমি হয়তো আপনার অনুমতি ছাড়াই কিছু জেনে ফেলেছি। সেগুলোর কিছুটা দরকারি, আবার সামান্য কিছুটা আপনার ব্যক্তিগত জীবন। সেই ব্যক্তিগত অংশটা জানবার দরকার ছিল না। কিন্তু চোখে পড়ে গিয়েছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার বাড়িতে যিনি এতদিনের পুরোনো একটা ঘটনার তদন্ত করতে আসবেন, তাঁকে নিয়ে মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ছিলই। আপনার আগের লেখাগুলোও পড়েছি। ইন্টারেস্টিং, ভালো লেগেছে।'

কী জেনেছেন আমার সম্বন্ধে?' হেসে ফেললাম। ফেসবুকে স্টক করবার জন্য কাউকে এরকম ক্ষমা চাইতে দেখিনি এর আগে।

'তনয়া ভট্টাচার্য। ডাক নাম টিনা, যেটা বন্ধুমহলে বেশি প্রচলিত। বত্রিশ বছর বয়েস। ফেসবুকে জন্মসাল লেখা আছে। সম্ভবত একমাত্র সন্তান। বাবা-মা দুজনেই মারা গিয়েছেন। বাবা সম্ভবত বছর দুই আগে। এটা ঠিক বললাম কি? সল্টলেকে বাড়ি, যদিও ছোটোবেলার কিছুকাল কেটেছে বালিগঞ্জে। ছোটোবেলার দুই একটা ছবি ফেসবুকে পেয়েছি। সঙ্গে মন্তব্য। সেখানেই জানলাম, আপনার নেশা হলো সুডোকু আর পাজল সলভিং। এরপর লিঙ্কড্রইন। পড়াশোনা প্রেসিডেন্সি, তারপর জেএনইউ। বিষয় ইংরেজি। জেএনইউ থেকে বেরিয়ে কিছুকাল টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে সাংবাদিকতা করেছেন। তারপর এই ম্যাগাজিনে। গত বছর একটা পুরস্কার পেয়েছেন দেশের অমীমাংসিত রহস্যকাহিনীগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখে যাবার জন্য। ও হ্যাঁ, সম্পর্কের স্টেটাস ফেসবুকে আপনিই লিখে রেখেছেন, কমপ্লিকেটেড। ওটুকু বাদে, বলতেই হবে যে তনয়া ভট্টচার্য নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রাইভেট।'

কাপে সাবধানে কফি ঢাললেন অরুণ। একটা ফোঁটাও যেন বাইরে না পড়ে। লক্ষ করে দেখলাম, দুটো কাপে কফির পরিমাণ নিক্তিতে মিলিয়ে সমান।

'আপনি সোশাল মিডিয়ার ব্যাপারে বেশ উৎসাহী। এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং।' কফির কাপে চুমুক দিলাম আমি ৷

'কেন? আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে উৎসাহী না হওয়াটাই কি বেশি অদ্ভুত ছিল না?'

'না, মানে...'

'বুঝেছি।' মৃদু হাসলেন অরুণ, 'আপনি হয়তো বয়েসের দিকে ইঙ্গিত করছেন। এই বয়সে এসে টিভি দেখা অথবা বই পড়া যত স্বাভাবিক, ফেসবুক করা ততটা না ৷'

'না না...' এবার সত্যিই লজ্জা পেলাম আমি। কারণ ইঙ্গিতটা বয়েসের দিকেই ছিল।

এই 'লজ্জা পাবেন না তনয়া! আপনিই হয়তো ঠিক। আপনাদের মনে হয়, পৃথিবীতে বৃদ্ধরা

আপনাদের সাজানো বাগানে অনুপ্রবেশ করছে। সম্ভবত সেটাই করছে। কিন্তু কী করব বলুন! আমাকে তো মানবচরিত্র সম্বন্ধে লিখতে হয়। একজায়গায় জড়ো হয়েছে এত হাজার হাজার বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ, এরকম আর কোথায় পাব?' গলায় একফোঁটাও তিক্ততা না মিশিয়ে, স্মিত মুখে বললেন অরুণ।

আমার কী মনে হল, জানি না। বলে ফেললাম, 'আপনি আমাকে টিনা বলে ডাকতে পারেন।'

'বেশ। এবার তাহলে কাজের কথা হোক? আপনিই শুরু করুন।'

'আপনি জানেন আমি কেন এসেছি।' সোফায় বসে উত্তর দিলাম। 'অমিতাভ মিত্র হত্যারহস্যে মূল সন্দেহভাজনের বক্তব্য শুনতে চান, তাই তো? '

'হ্যাঁ। একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই। তবে শুধু আপনিই না। এই কেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন যে কেউ, যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলতে চাই। কয়েকজনের নাম পেয়েছি। এর বাইরে আপনি যদি কারও কথা জানেন, তাহলে তাঁদের সঙ্গেও দেখা করতে চাই।'

অরুণ মাথা নীচু করে অন্যমনস্কভাবে কফির কাপে চামচ নাড়ালেন কিছুক্ষণ। কয়েক মুহূর্ত পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ তুললেন, 'আপনার কাজ কমিয়ে দিতে পারি। আমি কনফেস করছি। অমিতাভকে আমিই খুন করেছিলাম।'

কয়েক সেকেন্ড দুজনেই চুপ। টিকটিক করে শুধু ঘড়ির কাঁটার শব্দ চলছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ঘরের ডানপাশে কাচের অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছের দল নিঃশব্দে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে বুদবুদ ছাড়ল একটা মাছ বিজকুড়ি কেটে বুদবুদ ওপরে উঠছে। একটা ফাটল। অরুণ পুরু কাচের মোটা কালো ফ্রেমের চশমার আড়াল থেকে আমাকে লক্ষ করে যাচ্ছেন শান্ত চোখে।

'এটা তো ফোনেই বলতে পারতেন। আমাকে এখানে ডাকলেন কেন?'

'পারতাম। কিন্তু তাতে কি আপনার সুবিধে হতো? শুধু আমি খুন করেছি, এটাই শুনবেন?' হাসলেন অরুণ। 'কীভাবে করলাম, কীভাবে পুলিশকে ধোঁকা দিলাম, সেটা শুনবেন না? আপনি তো আর পুলিশ নন যে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করলে দায়িত্ব শেষ। আপনাকে একটা গল্প বলতে হবে। তাই না? সেটা কি শুনতে চান না?'

'এখন স্বীকার করছেন কেন? এতদিন পরে?' অজান্তেই আমার হাত ফোনের রেকর্ডার অন করল।

'এখন ওটা থাক প্লিজ!' আঙুল তুললেন অরুণ। আঙুল বাদে শরীরের একটা পেশিও কাঁপেনি তাঁর। গলার স্বর একইরকম মৃদু তারে বাঁধা, এবং ভঙ্গিটাও অনুরোধেরই। কিন্তু তবুও সেই আঙুল আর বলার ভঙ্গির ভেতর কোথাও একটা কাঠিন্য একঝলক দেখা দিয়েই নিজেকে লুকিয়ে ফেলল আবার। রেকর্ডার অফ করে দিলাম।

'আগে বলুন, আপনি কতটুকু জানেন এই কেস নিয়ে।'অরুণ চোখ বন্ধ করলেন।

বাইরে কুয়াশা ঘন হয়ে এসেছে। এখন আর বাগানের গেট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কফিতে চুমুক দিয়ে উত্তর দিলাম, 'যেটুকু জেনেছি, পুরোনো খবরের কাগজের কাটিং, আর পুলিশ আর্কাইভ থেকে।

চোখ বুজেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন অরুণ। তারপর বাম হাত বুকের উপর আড়াআড়ি রেখে, তার উপর অন্য হাত দাঁড় করিয়ে গালের ভর দিলেন ডান হাতের মুঠোর উপর।

'অরুণ চৌধুরী আর অমিতাভ মিত্র, দুই ছোটোবেলার বন্ধু। অরুণ বড়োলোকের সন্তান। তাঁর পরিবারের চা বাগান আছে। অমিতাভ অনাথ। শিলিগুড়ির এক স্থানীয় গির্জার টাকায় চলা অনাথ-আশ্রমে মানুষ হয়েছিলেন। দুজনের আলাপ দার্জিলিং-এর সেন্ট পলস্ স্কুলে পড়তে এসে। অমিতাভ চার্চের কল্যাণে, বলা যায় কোটার সুবিধাতে, সেই স্কুলে চান্স পেয়েছিলেন। কাগজের প্রতিবেদন জানাচ্ছে যে দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সূত্রপাত তখন

থেকেই। স্কুলের পর অমিতাভ চলে যান সেন্ট জোশেফস্ কলেজে কমার্স পড়তে। অরুণ দার্জিলিং সরকারি কলেজে ইংরেজি নিয়ে ভর্তি হন। তখনও দুজনের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। অমিতাভ ছিলেন অন্তর্মুখী, পাগলাটে স্বভাবের। স্কুলজীবন থেকে কবিতা লিখতেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অরুণ ছিলেন প্রিয়তম। সম্ভবত অমিতাভের প্রভাবেই অরুণ লেখালেখিতে আকৃষ্ট হন। কিন্তু অমিতাভ লিখতেন কবিতা, আর অরুণের ঝোঁক ছিল গোয়েন্দাকাহিনীর প্রতি। এসবই পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সাল নাগাদ। অমিতাভর কবিতা তখন বাংলার অনেক লিটল ম্যাগাজিনেই প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সূত্রে সেই সময়কার কবি-সাহিত্যিক মহলেও কিছুটা পরিচিত নাম হয়ে উঠছেন। আমি গবেষণার কাজে কয়েকটা বহু পুরোনো ম্যাগাজিনের কপি সংগ্রহ করেছিলাম সন্দীপ দত্তের লিটল ম্যাগ লাইব্রেরিতে গিয়ে। দেখলাম, অমিতাভর রেঞ্জ বেশ বড়ো। কুচবিহারের ত্রিবৃত্ত পত্রিকা থেকে শুরু করে আসানসোলের কবিকণ্ঠবা কলকাতার ইমন, প্রায় গোটা বাংলা জুড়ে অমিতাভর কবিতা বিভিন্ন কাগজে বেরিয়েছে। বাংলা কবিতা বেশি বুঝি না, কিন্তু অদীক্ষিত চোখেও মনে হয়েছে যে অমিতাভ অন্যরকম কবিতা লিখতেন। অথবা এটাও হতে পারে যে সত্তর দশকের কবিতার মেজাজের সঙ্গে অমিতাভর চরিত্র মানানসই ছিল।

'এর মধ্যে দুজনেই কলেজ পাশ করেছেন। অমিতাভ পাশ করে বেরিয়ে দার্জিলিংএর একটি হোটেলে কিছুকাল অ্যাকাউন্টের কাজ করেছিলেন, পরে ছেড়ে দেন। এমনিতেই তাঁর নানারকম পাগলাটে স্বভাবের কারণে পৃথিবীতে কোনো চাকরিই তাঁর জন্য বিশুদ্ধ ছিল না। এখানে, ওখানে টিউশন পড়াতেন। আমার নিজের ধারণা যে বেশ কিছুকাল অরুণ অমিতাভকে অর্থসাহায্য করেছেন। অরুণ কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন দুবছরের জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ পাস করে দার্জিলিং ফিরে আসেন এবং পারিবারিক ব্যবসায় কিছুকাল জড়িয়ে পড়েন। সেটা ১৯৭০ সাল। অমিতাভ তখন পুরোদস্তুর কবিতায় মজে আছেন। ও হ্যাঁ, অরুণ যখন কলকাতায় পড়াশোনা করছেন, অমিতাভ সেই সময়কালে বেশ কয়েকবার কলকাতায় গিয়েছেন, অরুণের মেসে থেকেছেন, অন্যান্য কবিবন্ধুদের মেসেও। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় সেই সময়কার তরুণ কবিদের। তাঁদের স্মৃতিচারণা বেরিয়েছে অনেক পত্র-পত্রিকায়, সেগুলোও বিভিন্ন সূত্রে জোগাড় করেছি। এঁদের সঙ্গে অরুণের বন্ধুত্ব ছিল কিনা, সেটা অবশ্য জানি না। ডিটেকটিভ গল্প-লেখককে কি লিটল ম্যাগাজিনের রাগী তরুণদের প্রজন্ম ব্রাত্যই করে রেখেছিল?

'যাই হোক, অরুণ পঁচিশ বছর বয়সে পৌঁছাবার আগেই একটি উপন্যাস লেখেন। ক্রাইমকাহিনী। একজন ছোটো প্রকাশকও পেয়ে যান। দুঃখের বিষয়, বইটি জনপ্রিয় হয়নি। বাংলা কোনো কাগজে আমি অন্তত এই বই নিয়ে আলোচনার কাটিং দেখতে পাইনি। এমনকি অরুণের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও এই বইটার নামটুকুই মাত্র আছে। গল্পের সংক্ষিপ্তসারটুকুও নেই। হয়তো অরুণ বইটার কথা ভুলে যেতে চান। যাই হোক, বই বিক্রি কত হয়েছিল, জানি না। কিন্তু এরপর অরুণ দ্বিতীয় একটি বই বার করেন। সেটাও ফ্লপ করে। প্রসঙ্গত, এই দ্বিতীয় বইটা যে অরুণের নিজের টাকায় বেরিয়েছিল, সেটা তিনি নিজেই পরে নানা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন। মোদ্দা কথা, গোয়েন্দা গল্পকার হিসেবে অরুণের জায়গা তখনও নড়বড়ে। এদিকে অমিতাভর কোনো বই তখনও না বেরোলেও টুকটাক কবিতা অথবা ছোটোগল্প এখানে ওখানে বেরোচ্ছিল। সবটাই অবাণিজ্যিক পত্রিকায় যদিও। দুজনের লেখার জগৎ ছিল বিপরীতমুখী। একজন নিরীক্ষকমূলক ভিন্নধর্মী কবিতা চর্চা করতে চাইছিলেন। অপরজন চাইছিলেন বাণিজ্যিক এবং বুদ্ধিদীপ্ত গোয়েন্দাগল্প লিখতে।

'১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার একটি কাগজে তখনকার প্রতিশ্রুতিবান নতুন কবি ও লেখকদের একটা তালিকা আর তাঁদের সম্বন্ধে দু-চার কথা বেরিয়েছিল। সেখানে অমিতাভ-র নাম ছিল। কিন্তু অরুণের নাম ছিল না। সেটাই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের চিড় ধরাবার প্রথম সূত্র কিনা, জানি না। হতেও পারে, কারণ সাহিত্য ছিল দুজনেরই ধ্যান-জ্ঞান। এই তালিকা যিনি প্রস্তুত করেছিলেন, বিখ্যাত সাংবাদিক সঞ্জয় অধিকারী, তিনি অমিতাভর

পরিচিতির পাশে এটাও জানিয়েছিলেন যে কৃত্তিবাসের কবিকুলের পরের প্রজন্মের যে কয়েকজন শক্তিশালী কবি বাংলা সাহিত্যে এসেছেন, দেবারতি মিত্র, মৃদুল দাশগুপ্ত অথবা রণজিৎ দাশ — অমিতাভ মিত্র-র নাম তাঁদের পাশে থাকবার মতো শক্তিশালী।

'এই তালিকা নিয়ে কতখানি হইচই হয়েছিল সেটা আজ আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে এর পরেই অমিতাভর কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা এবং দুটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। তালিকায় পাচ্ছি কবিপত্র এবং ধানসিড়ির মতো লিটল ম্যাগাজিনের নাম। প্রথমটি কলকাতা থেকে বেরোতো, পরেরটি পশ্চিম মেদিনীপুর। এর আগেও অমিতাভর কবিতা অনেক পত্রিকাতে বেরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কবিপত্রর মতো নামকরা কাগজের একমাত্র দীর্ঘ কবিতাটি অমিতাভ মিত্রর, এরকম আগে কখনো হয়নি। ভিড়ের অন্যতম মুখ থেকে তার মানে আস্তে আস্তে একক পরিচিতির জায়গা করে নিচ্ছেন। অনুমান করতে পারি, গোয়েন্দাসাহিত্যকে সিরিয়াস সাহিত্য হিসেবে গণ্য না করবার প্রবণতা অরুণকে এই তালিকায় জায়গা দেয়নি। সাহিত্যিক অসাফল্য তো ছিলই।'

অনেকটা কথা বলবার পর গলা শুকিয়ে গেছে। কফির কাপ তুলে চুমুক দিলাম। অরুণ চোখ খুললেন। 'আপনি সিগারেট ধরাতে পারেন যদি চান '

'আমার সিগারেট খাবার কোনো ছবি বা তথ্য ইন্টারনেটে নেই! '

অরুণ আবার হাসলেন, এবং আবারও চোখ অবধি ছড়িয়ে গেল হাসি। 'আঙুলের পাশের হলদে দাগ, কফি খাবার সময়ে নিজের অজান্তেই তর্জনি আর মধ্যমা একসঙ্গে করে ফেলা, বুড়ো আঙুল দিয়ে অন্য দুটোর ওপর বারে বারে ঘষা, এগুলোকে লুকোবেন কী করে! অস্বস্তি হচ্ছে সে তো বুঝতেই পারছি। আর আপনি ধরালে, আমিও একটা খেতে পারি। ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও ছাড়া কঠিন।'

সিগারেট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সোজাসুজি তাকালাম অরুণের চোখের দিকে— 'একটা ছোট্ট অবজার্ভেশন আছে। আপনি যেমন আমাকে লক্ষ করেছেন, আমিও করছি। যতক্ষণ কথা বলে গেছি, আপনার শরীরের একটা পেশিও কাঁপেনি। অথচ অল্প আগেই আপনি একটা খুনের স্বীকারোক্তি করেছেন। তার পরেও স্থির বসে গভীর মনোযোগ নিয়ে গল্পটা শুনে গেছেন, যদিও আপনার নতুন করে শোনবার কিছু নেই। এটা জেনেই শুনে গেছেন যে আমি এখান থেকে বেরিয়ে পুলিশে ফোন করতে পারি। এই শান্তভাব নিয়ে অমিতাভকে খুন করলেন কী করে? '

সাবধানে ছাই ঝাড়লেন অরুণ, অ্যাশট্রের ওপর লেগে থাকা ছাইয়ের গুঁড়ো আঙুল দিয়ে পরিস্কার করতে করতে উত্তর দিলেন, 'এর আগে ভেবে দেখিনি এখন চিন্তা করতে গেলে মনে হচ্ছে, মনটাকে ধ্যানী বুদ্ধের মতো শান্ত স্তরে নিয়ে যেতে না পারলে জটিল অপরাধ বোনা সম্ভব হয় না।' তারপর আমার দিকে আবার গভীর দৃষ্টি মেললেন, 'কেন জানি না মনে হচ্ছে আপনিও ক্রাইমকাহিনীর পোকা।'

'কী দেখে মনে হলো? পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা?'

'না। আপনি যেটুকু দেখেছেন, সেটা সাধারণ একটা দেখা। প্রশ্নটাও যে কারও মাথাতেই আসতে পারত। কথাটা মনে হলো আপনার লেখাগুলো পড়ে, এবং এখন এতক্ষণ কথা বলে। ভুলও হতে পারি, কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে আপনি ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং, কারণ রহস্য-কাহিনীর ভক্তরা সকলেই আমার কাছে খুঁড়ে খুঁড়ে স্টাডি করবার মতো ইন্টারেস্টিং।'

হালকা হাসলাম, 'ভুল। আমি খুবই বোরিং।'

অরুণ মাথা নাড়ালেন। 'সেটাও ঠিক। বোরিং। বেশি হাসেন না। ড্রাই হিউমার আছে একটা। অল্পতেই ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেন। ভেতরে ভেতরে সিনিক। আবার অন্যদিকে সুডোকুর ভক্ত। একজন খুনির মুখোমুখি বসেও আপনার গলার স্বরের ওঠানামা হয় না। আপাতত এটুকুই আমার কাছে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং।'চশমার ওপর দিয়ে শান্ত চোখ দুটো আমার দিকে নিবদ্ধ করলেন, আর এক গোছা নুন-মরিচ চুল ঝুলে পড়ল তাঁর কপালের ওপর। বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। বাবার এরকম চুল ছিল।

‘কিন্তু আপনার গল্পটা আগে শেষ হোক। তারপর বাকি কথা।’

সিগারেটে আর একটা টান মেরে বলতে শুরু করলাম, ‘১৯৭৪ সালের পুজো সংখ্যাতে অরুণকে উপন্যাস লেখবার জন্য যোগাযোগ করে বাংলার একটি ছোটোখাটো মানের বাণিজ্যিক পত্রিকা। ব্যাপারটা অদ্ভুত, কারণ অরুণের বই বিক্রি হয়নি। প্রশংসাও পায়নি। অরুণ নিজেও, বাংলার বুদ্ধিজীবীদের বিচারে, সিরিয়াস সাহিত্য করেন না। তার পরেও এরকম একটা পত্রিকাতে সুযোগ পাওয়া, সে যতই বিক্রির হিসেব ছোটোখাটো হোক না কেন, এর মানে অন্তত অরুণের কাছে বেশ বড়ো ব্যাপার। এপ্রিল মাসে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোলো, কারা কারা লিখছেন। সেখানে অরুণের নামও ছিল। আর মে মাসের শুরুতে অমিতাভ মিত্র একটা বিস্ফোরক দাবি করলেন সঞ্জয় অধিকারীর কাগজে - অরুণের মতো বাজারি সাহিত্যিকেরা - টাকা খাইয়ে পুজো সংখ্যাতে লেখার বরাত পায়।

‘অরুণ যে পত্রিকায় লেখার বরাত পেয়েছিলেন, সেই পত্রিকাটি একটি কাগজের গ্রুপের অধীনে ছিল। সঞ্জয়ের কাগজ ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। সঞ্জয় তখন অন্যান্য খবরের পাশাপাশি সাহিত্যের পাতাও দেখতেন। একটা খবর করেছিলেন, যার বিষয়বস্তু ছিল— বাণিজ্যিক পত্রিকার ফরমায়েশি সাহিত্য লিটল ম্যাগাজিনের সিরিয়াস লেখাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না, এই অভিযোগের সারবত্তা কতখানি। সেখানে বিখ্যাত এবং অবিখ্যাত নানা সাহিত্যিকের মতামত ছিল। লিটল ম্যাগাজিনের তরুণ প্রজন্ম রাগী গলায় কথা বলবে সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু অমিতাভ যেটা করলেন সেটা কেউই ভাবতে পারেনি। অমিতাভ একেবারে অরুণের নাম করে অভিযোগ করলেন। সঞ্জয়ের প্রতিবেদনে ক্লাবের মধ্যে বড়ো হরফে প্রকাশিত হলো অমিতাভর সেই উক্তি।

'আমি লিটল ম্যাগাজিন জগৎ সম্পর্কে যতটুকু জানি... এখানে অন্যধারার সাহিত্য যাঁরা করেন, তাঁদের অনেকেই বাণিজ্যিক পত্রিকার বিগ হাউজ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। সেটার কারণ কিছুটা নীতিগত, আবার কিছুটা ব্যক্তিগতও বটে। তাঁদের লেখা ছাপানো হয় না সেটাই হয়তো ব্যক্তিগত রাগের একটা কারণ থাকে। সবার লেখাই তো সমান বাজারজাত হয় না। অমিতাভর ক্ষোভটা এই দ্বিতীয় সারিতে থাকবে। কারণ তিনি সরাসরি বলেছিলেন যে ক্ষমতাবান সাহিত্যিক হয়েও তিনি কখনও ডাক পান না। আর অরুণ চৌধুরী অর্থ, এবং অন্যান্য উপঢৌকনের বিনিময়ে নিজের অন্তঃসারশূন্য সাহিত্যকে বিশাল সংখ্যক পাঠকের বাজারে তুলে ধরতে পারেন। এই অভিযোগটা সিরিয়াস, এবং লিটল ম্যাগাজিনের এ যাবৎকাল চলে আসা অভিযোগগুলোর তুলনায় চরিত্রগতভাবে আলাদা। কারণ এখানে সাহিত্যের নীতি নয়, প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কর্পোরেট হাউজের স্বচ্ছতা নিয়েই। কাজেই এটা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হইচই হতোই। এবং হলো। অমিতাভর এই অভিযোগ বাংলা সাহিত্যের পানাপুকুরে সুনামি আনতে পারেনি, তবে কয়েকটা ছোটোখাটো ঢেউ তুলেছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অন্নদাশংকর রায়, অনেক সাহিত্যিকই অমিতাভর পক্ষে বিপক্ষে নানা রকম মতামত রাখলেন। সঞ্জয় অধিকারী অমিতাভর ছবি সহ একটা সাক্ষাৎকার নিলেন। অরুণের যেটা লাভ হলো, তাঁকে এতদিন পাঠকমহলে প্রায় কেউই চিনত না, এবার অনেকেই চিনে গেল। আর যেটা ক্ষতি হলো, সাহিত্যপত্রিকাটি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করে দিল যে অরুণ চৌধুরী এবং অমিতাভ মিত্র, কারও লেখাই তারা আর ছাপাবে না, যতদিন না এই বিতর্কের পূর্ণ মীমাংসা হচ্ছে।

‘অনুমান করতে পারি, অরুণের তখনকার মনের অবস্থাটা। যে-সাফল্য এতদিন ধরে তাঁর অনাঘ্রাত ছিল, সেটা যখন হাতের মুঠোয় আসব আসব করছে, এক অজ্ঞাতকুলশীল কবির অভিযোগে সারাজীবনের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল। সেই সময়ে অরুণকে বেশ কিছুদিন নাকি জনসমক্ষে দেখা যায়নি। নিজের বাড়ি থেকে বেরোননি। আর এর মধ্যেই প্রকাশিত হলো অমিতাভর লেখা একটি ছোটো উপন্যাস। শোনা যায়, বাংলার এক নামকরা প্রকাশক নাকি দার্জিলিং-এ গিয়ে অমিতাভর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। চেয়েছিলেন চুক্তিপত্র করতে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়নি মনে হয়। কারণ উপন্যাসের প্রকাশক হিসেবে অন্য একটা

নাম পাচ্ছি, ছোটো পাবলিশিং হাউজ। সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে উপন্যাস। প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে, পুজোর আগে আগে। ব্যাপারটা বেশ আয়রনিক। অরুণের উপন্যাস বেরবার কথা ছিল, তার বদলে বেরল অমিতাভর উপন্যাস। শুধু সেটাই নয়, উপন্যাসটা কিছুটা প্রশংসাও পেয়েছিল। কয়েকটা ম্যাগাজিনে আলোচনা হলো বইটা নিয়ে। যদিও আমার ধারণা, অমিতাভ এই বিতর্কটা তৈরি না করলে নতুন লেখকের প্রথম বইয়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না। সে যত ভালো লেখাই হোক না কেন।

'১৯৭৫ সালের জুন মাসে ঘটল সেই ঘটনা।'

আমি চারপাশে তাকালাম। এই বাড়িতে। হয়তো এই ঘরে, যেখানে বসে আছি সেই জায়গাটাতেই। অরুণ চৌধুরী পাথর। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না কী ভাবনা চলছে ভেতরে।

'অরুণ আর অমিতাভ একজন অবহেলিত অবস্থা থেকে উঠে এসে বাংলা সাহিত্যের নতুন আবিষ্কার। অপরজন প্রচুর স্ট্রাগল করেও আস্তে আস্তে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। অমিতাভর উত্থান দেখে অরুণ মনে মনে কী ভাবতেন, সেটা আজ আর জানা যাবে না। কিন্তু অরুণ নাকি ঘনিষ্ঠমহলে বলেছিলেন যে তিনি লেখা ছেড়ে দেবেন। অপরদিকে, শোনা যাচ্ছিল অমিতাভর সঙ্গে পরপর তিনটি বইয়ের চুক্তি করেছে তাঁর প্রকাশক। সেটার সত্যি মিথ্যে অবশ্য জানি না। কিন্তু জুন মাসের এগারো তারিখে অরুণ কেন অমিতাভকে তাঁর এই বাড়িতে ডেকেছিলেন, সেটার কারণ অজ্ঞাত। আর কেনই বা রাত সাড়ে নটার সময়ে বাড়ি থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল, সেটারও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

'অরুণের পুলিশি জবানবন্দি অনুযায়ী সেদিন তাঁর বাড়িতে অমিতাভ আসেনইনি। এসেছিলেন চা-বাগানের এক শ্রমিক নেতা, প্রশান্ত গুরুং। বাগানের শ্রমিক অসন্তোষ বিষয়ে কথা বলতে। গুলি ছোটার ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে লেবার আনরেস্ট বিষয়ে উত্তেজিত তর্ক-বিতর্ক করবার ফাঁকে অরুণ হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন এবং গুলি ছুটে যায়। এবার, এই প্রশান্ত গুরুং-এর জায়গাটা জটিল, এবং পুলিশ এটা নিয়ে এখনো ধাঁধায়। এই বিষয়ে পরে আসছি। গল্পের খাতিরে আপাতত ধরে নিচ্ছি যে অমিতাভই এসেছিলেন অরুণের সঙ্গে দেখা করতে। কিছুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল, এবং সেই রাত্রেই একটা ল্যান্ডস্লাইড হয়। দার্জিলিং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সমতলের থেকে। কিন্তু তার আগেই অরুণের বাড়ি থেকে গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল। জলাপাহাড় রোডে এই বাড়ির লাগোয়া যে কটেজটি আছে, তার বাসিন্দা মিসেস বাসুর বিবরণ অনুযায়ী, অমিতাভ ছুটতে ছুটতে অরুণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নীচের দিকে নামতে থাকেন। তাঁর হাত থেকে রক্ত পড়ছিল। পেছন পেছন আসেন অরুণ। তাঁর হাতে একটা রাইফেল ঝুলছে। অরুণ কয়েকবার অমিতাভর নাম ধরে চিৎকার করেন। কিন্তু অমিতাভ পেছন না ফিরে নীচে নেমে যান। অরুণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে এসে গেট বন্ধ করে দেন।

'সেদিন মাঝে মাঝেই বৃষ্টি পড়ছিল। কখনও হালকা, কখনও মুষলধারে। যখন গুলি চলে সেই সময়ে মুষলধারে না হলেও ভালোই বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যে অমিতাভর রক্তপাত দূর থেকে দেখতে পাবার কথা নয়। কিন্তু মিসেস বাসু দেখতে পেয়েছিলেন কারণ ওই সময়টায় তিনি বারান্দায় বসে থাকতেন নৈশাহারের পর। আর তখন বাগানের আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল। মিসেস বাসু শেষদিন পর্যন্ত দাবি করেছেন যে অরুণ অমিতাভর নাম ধরে চিৎকার করছিলেন, এবং প্রশান্ত গুরুং নামের কোনো নেপালি মানুষকে তিনি দেখেননি। যার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছিল, তার বাঙালি চেহারা। এটাও বলেছিলেন যে অরুণের হাতে রাইফেল ছিল। সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে প্রশান্ত গুরুং আসার ঘটনাটা মিথ্যে। আপাতত ধরে নিচ্ছি যে অমিতাভর হাত থেকে রক্ত পড়ছিল। বাগানের গেটের

আলো অমিতাভর মুখের ওপর এসে পড়ছিল, তাঁর পেছন পেছন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন অরুণ। অমিতাভর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে। অমিতাভ সাড়া না দিয়ে এক হাত দিয়ে অন্য হাত চেপে ধরে ছুটে গেলেন। অরুণ ভেতরে চলে এলেন। তখন রাত সাড়ে নয়। ন-টা পঁয়ত্রিশে থানায় ফোন করলেন মিসেস বাসু। পুলিশ এল দশটা নাগাদ। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমেছে। অরুণ পুলিশকে দেখে অবাক হননি। কিন্তু অমিতাভর নাম শুনে অবাক হয়ে যান। কারণ তিনি ভেবেছিলেন প্রশান্ত গুরুং-এর ঘটনায় তাঁর বাড়িতে পুলিশ এসেছে। অরুণ জানালেন যে কথা কাটাকাটি থেকে ধস্তাধ্বস্তিতে গুলি বেরিয়ে গেছে কিন্তু কেউ আহত হয়নি। অমিতাভ আসেনইনি। আর অরুণও অমিতাভর পেছন পেছন ছোটেননি। তাহলে কি মিসেস বাসু মিথ্যে বলছেন? সামান্য প্রাথমিক তদন্তের পরেই কিন্তু পুলিশ বাগানের ঘাসের ওপর কিছু পায়ের ছাপ আর রক্ত খুঁজে পেল। রক্তের রেখা চলে গেছে গেট অবধি, তারপর বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। এ ছাড়াও অরুণের হাতে দুটো টাটকা আঁচড়ের দাগ পেল তারা। যেন ধস্তাধস্তিতে আঁচড়া-আঁচড়ি হয়েছে। যদিও অরুণের কথামতো গুলি চলেছিল বাড়ির ভেতর, এবং তাতে কেউ আহত হয়নি। পরে প্রশান্ত গুরুং-ও সেই বক্তব্যকে সমর্থন করেন। তাহলে বাগানের ঘাসে রক্ত আর অরুণের হাতে আঁচড়ের দাগ? পুলিশ অরুণকে আটক করল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বৃষ্টিতে পায়ের ছাপ যাতে ধুয়ে না যায়, তার জন্য থানা থেকে একটা ছাউনি নিয়ে এসে বাগানের উপর টাঙিয়ে দেওয়া হল। অরুণের কথাবার্তার মধ্যে আরও নানা অসংগতি খুঁজে পেল পুলিশ। তারা সিদ্ধান্ত নিল, অমিতাভকে খুঁজে বার করবে। সেই সঙ্গে প্রশান্তকেও। কিন্তু সেই রাত্রেই প্রবল বৃষ্টিতে ল্যান্ডস্লাইড হলো। অমিতাভ বা প্রশান্ত গুরুং কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারল না পুলিশ। শেষরাতে অরুণকে পুলিশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। পরের দুইদিন ধরে অমিতাভর খোঁজ পাওয়া গেল না। সে বেশ কিছুদিন আগেই শহর ছেড়ে দিয়েছিল। থাকত একটি স্থানীয় গ্রামে ঝুপড়ি ভাড়া করে। সেখানে কখনও থাকত, কখনও থাকত না। রাত্রিবেলা আকণ্ঠ মাতাল হয়ে ঘরে ফিরত। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও আলাপ পরিচিতি ছিল না, কারণ সারা দিন ধরে ঘুরে বেড়াত এখানে ওখানে, উদ্দেশ্যহীনভাবে। সন্ধেবেলায় হয় কোনো সস্তা মদের ঠেকে পড়ে থাকতো, আর নাহলে ঘরের দরজা বন্ধ করে পাগলের মতো লিখতো। গ্রামে গিয়ে দেখা গেল ঝুপড়িতে তালা দেওয়া। ছবি দেখানো হলো এদিকওদিক। কেউ কিছু বলতে পারল না। তখন সমতল থেকে পুলিশের কুকুর আনতে হতো। হিলকার্ট রোড পরিষ্কার হতে গোটা একদিন লেগে গেল। তার আগে কিছুই করা গেল না।

দু-দিন পরে তেরোই জুন পুলিশের কুকুর এল। আধবেলার মধ্যেই পাওয়া গেল অমিতাভর লাশ। কার্ট রোডে সাহেবদের পুরোনো গোরস্থানের পেছন দিকটায় একটা বড়ো পাথরের ফলকওয়ালা সমাধির পেছনে পড়েছিল অমিতাভ। মুখ বলে কিছু ছিল না। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট বলছে, কাছ থেকে মুখে দুবার গুলি করা হয়েছিল। আর একটা গুলি লেগেছিল বুকে। ফুসফুস ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর চতুর্থটা বাম হাতে। সময়ের হিসেবে দেখলে অবশ্য বাম হাতের গুলিটাই প্রথম গুলি। কারণ মিসেস বাসুর জবানবন্দি অনুযায়ী সেটা অরুণের বাড়িতে লেগেছিল এবং সে গুলি লাগার পরেও অমিতাভ জীবিত ছিল। অমিতাভর রক্তের সঙ্গে অরুণের বাগানের ঘাসে পড়ে থাকা রক্ত মিলে গেল। যেহেতু মুখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লাশ সত্যি অমিতাভর কিনা তা নিয়ে ধন্দে ছিল পুলিশ। প্যান্টের হিপ-পকেটে কিছু হাবিজাবি কাগজ বাদে আর কিছু মেলেনি। সেই কাগজগুলো আবার বাংলায় লেখা। কয়েকটা আধখ্যাচড়া কবিতার খসড়া, ধোপার বিল, প্রকাশকের কাছে পাওনা টাকার হিসেব। নাম ধাম কিছু ছিল না। ফোর্সের মধ্যে বাংলা পড়তে পারে এমন পুলিশ ছিল। সম্ভবত একজন অফিসার, তাঁর নাম রিপোর্টে উল্লেখ নেই, তাঁর ওই কবিতার খসড়াগুলো দেখে সন্দেহ হয়েছিল লাশ অমিতাভর হতেও পারে। কারণ তিনি অরুণকে জেরায় জেনেছিলেন যে অমিতাভ কবি। পুলিশ অরুণকে থানায় নিয়ে এল আবার অরুণ বলেন যে

তিনি নিশ্চিত নন, কারণ মুখ বলে কিছু ছিল না। তবে অমিতাভ হবার সম্ভাবনাই বেশি। সেই রাত্রে জেলা হাসপাতালের মর্গে গিয়ে লাশ শনাক্ত করলেন সঞ্জয় অধিকারী। তিনি খবর পেয়ে ঘটনাটা কভার করতে সেইদিনেই দার্জিলিং চলে এসেছিলেন। এ ছাড়াও অমিতাভ যে অনাথ-আশ্রমে মানুষ হয়েছিল, তার যাজক ফাদার স্যামুয়েলসও শনাক্ত করলেন। অমিতাভর ডেরাতেও হানা দিল পুলিশ। সেখনে পড়ে থাকা চিঠিপাত্র, লেখালেখি এবং অমিতাভর পকেট থেকে পাওয়া কাগজের হাতের লেখা মেলানো হলো। লাশের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে অমিতাভর ঘরে ছড়িয়ে থাকা হাতের ছাপও মিলে গেল, এবং আর সংশয় থাকলো না।

'তুমুল হইচই পড়ে গেল চারদিকে। প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তখন এই খবর। সাহিত্যিক খুন, তাও আবার প্রতিশ্রুতিবান তরুণ কবি, মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়েসে খুন হলেন, হয়তো নিজের বন্ধুর হাতে, ব্যাপারটা এতই অভিনব যে বাংলার কাগজগুলোতে তখন এই খবর হটকেকের মতো বিক্রি হয়েছিল। যে অমিতাভকে একটা নির্দিষ্ট ছোট্ট বৃত্তের বাইরে কেউ চিনত না, তিনি ধীরে ধীরে কাল্ট হয়ে উঠলেন। তাঁর পসথুমাস কবিতা ছাপল পরমার মতো কাগজ, ১৯৭৯ সালে তাঁকে নিয়ে ক্রোড়পত্র করল কুচবিহারের কবি স্বপনকুমার রায়ের অন্যস্বর পত্রিকা। এমনকি নাকি এটাও ঘটেছিল যে ১৯৭৬ সালের ১১ই জুন, অমিতাভর মৃত্যুদিন উদযাপন করতে কলকাতা থেকে দার্জিলিং এসেছিলেন তাঁর কিছু সাহিত্যিক বন্ধু এবং কবরখানায় মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁরা অমিতাভকে স্মরণ করেছিলেন। এই ঘটনাটা সত্যি কিনা আপনি কনফার্ম করতে পারবেন। যাই হোক, এসবই পরের দিককার ঘটনা, যখন আসল রহস্যের উত্তেজনা থিতিয়ে এসেছে। তার আগে, ৭৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে যে চাঞ্চল্য ছিল, তার চরিত্র সাহিত্যগত যত না, তার থেকে বেশি ক্রাইমকাহিনীর রোমাঞ্চের সঙ্গে সংপৃক্ত। সঞ্জয় অধিকারী টাটকা এবং সেনসেশনাল রিপোর্ট পাঠাবার সূত্রে তখন ঘরে ঘরে পরিচিত নাম হয়ে উঠছিলেন। পুলিশ প্রথমে বুঝতেই পারছিল না, কাকে গ্রেপ্তার করবে। কারণ অরুণের মোটিভ কী, সেটা তারা তখনও জানত না। সঞ্জয়ই পুলিশকে অরুণ আর অমিতাভর সাম্প্রতিক শত্রুতা, এবং অমিতাভর কারণে অরুণের লেখালেখিতে ক্ষতি হয়ে যাবার ব্যাপারে জানালেন। বদলা নেবার যথেষ্ট শক্তিশালী মোটিভ থাকার কারণে অরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। কিন্তু অরুণ অটল থাকলেন এই বক্তব্যে যে তিনি নির্দোষ।

তাঁর বাড়িতে অমিতাভ আসেননি। বারো দিনের মাথায়, মানে ২৪ জুন, অরুণকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো পুলিশ। কারণ হিসেবে বলা হলো, অরুণের বিরুদ্ধে এমন কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে চার্জশিট বানানো যাবে।

আর একটা সিগারেট ধরালাম। 'এই জায়গাটা অস্পষ্ট। অরুণকে পুলিশ কেন ছেড়ে দিল। বলা হয়েছিল যে অরুণের অ্যালিবাই আছে। ময়নাতদন্তে খুন হবার যে সময়টা শনাক্ত করা হয়েছে, তখন অরুণ থানায় বসে ছিলেন। আমার কাছে অন্তত এই অ্যালিবাই ভাসাভাসা। সেই সময়ে অনেকেই সন্দেহ করেছিলেন যে এর পেছনে প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অর্থের কিছু চাপ থেকে থাকবে, যেহেতু অরুণের পারিবারিক চা বাগানের ব্যবসা ছিল। কিন্তু এখনও অরুণকে বহু মানুষ অমিতাভর খুনি হিসেবেই বিশ্বাস করেন।

কথা শেষ হবার পরেও অরুণ নীরব থাকলেন বেশ কিছুটা সময়। তারপর লম্বা নিশ্বাস ছাড়লেন, 'আপনি ভালোই গবেষণা চালিয়েছেন। কোনো খাতা বা বই না দেখে যেভাবে গড়গড় করে বলে গেলেন, বোঝা যাচ্ছে বহুবার পড়েছেন। এতদিন আগেকার ঘটনা এভাবে খুঁড়ে বার করে আনা সহজ কাজ নয়। কিন্তু তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন?

'এসেছি, কারণ আপনার ভার্সন আমি শুনতে চাই। যদি আপনি সত্যিই খুন করে থাকেন, তাহলে সেটা কেন, আর কীভাবে, সেই নিয়ে জানতে চাই। দ্বিতীয়ত, পুলিশের রিপোর্টের ওপর আমার ভরসা নেই। মোটিভ এবং অ্যালিবাই সম্বন্ধে যা যা বলেছে, তার কোনোটাই

বিশ্বাসযোগ্য কি? আপনি পেশাগত ঈর্ষা থেকে খুন করতেই পারতেন। কিন্তু এই তত্ত্ব বেশ দুর্বল। এছাড়াও এই গল্পে বহু প্রশ্নের উত্তর পাইনি, এবং পুলিশও অদ্ভুতভাবে সেগুলো পারস্যু না করেই ছেড়ে দিয়েছে। এক এক করে সেগুলো তুলে ধরব, এবং আপনি যতটা জানেন উত্তর দেবেন। এই প্রশ্নগুলোর ওপরে লেখার ভিত দাঁড়িয়ে আছে।'

'মোটিভ দুর্বল, কেন বলছেন?'

'কারণ আপনার সারা জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়নি। আর অমিতাভও বিরাট বড়ো লেখকে পরিণত হননি। অমিতাভর উক্তি এবং তারপর সাহিত্যজগতে একঘরে হওয়াটা সাময়িক সেটব্যাক ছিল মাত্র। হয়তো হতাশার চোটে বন্ধুবান্ধবকে বলে থাকবেন যে আর লিখবেন না। সে আমরাও অফিসে বসের কাছে বকা খেয়ে হামেশাই বলি যে চাকরি ছেড়ে দেব। কিন্তু আপনি চাইলে লিখতেই পারতেন। বইও বার করতে পারতেন। আপনার আগের বইগুলোও ফ্লপ ছিল। তার থেকে আর কত খারাপই বা হতে পারত? দ্বিতীয়ত, ঈর্ষা হতে পারত যদি অমিতাভ অনেক উঁচুতে উঠে যেতেন। কিন্তু তিনি তখনও নতুন লেখক। একটাই উপন্যাস সবে বেরিয়েছে। হয়তো কিছু প্রশংসাও পেয়েছে। তাতে কি তাঁকে ঈর্ষা করবার মতো কিছু হয়ে গেল? তাহলে তো আপনার সম্পদশালী পরিবারকে অনাথ অজ্ঞাত অমিতাভর দশ বার খুন করবার কথা। আর তার থেকেও বড়ো যেটা ব্যাপার, আমরা ভাবি খুন করা অতীব সহজ। প্রফেশনাল ঈর্ষা হলেই সঙ্গে সঙ্গে কেউ কাউকে খুন করে দিতে পারে। একটা জীবন্ত বস্তুকে মেরে ফেলা অতটা মুখের কথা নাকি? মানুষ ছেড়ে দিন। একটা সাপকে পিটিয়ে মারতে পারবেন?'

'পারব না।' বলে কিছু চিন্তা করলেন। তারপর যোগ করলেন, 'একটা সাপ বা একটা কুকুর, এদের গুলি করা সোজা নয়, কারণ এদের অসহায়তা আমাদের মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কি সেই যুক্তি খাটে?'

'আমার সিরিজের তৃতীয় গল্পটা যদি পড়েন, নাসিকের শিভালকর পরিবারের জোড়া হত্যা রহস্য। একই পরিবারের কুড়ি বছর বয়সি মাধুরী শিভালকর এবং তার মা খুন হয়েছিল। অপরাধী অজ্ঞাত। ঘটনাটা অষ্টআশি সালে ঘটেছিল। পুলিশ প্রথমে আটক করেছিল প্রতিবেশী পরিবারের এক যুবককে। কারণ সেই যুবক, শংকর কুণ্ডে, তার সঙ্গে মাধুরীর প্রেম ছিল। মাধুরীর মা এই প্রেমে বাধা দেন এবং মাধুরীর বিয়ে ঠিক করেন এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। শংকর বেকার ছিল। তাই মাধুরীও বিয়েতে শেষমেষ মত দেয়। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের তত্ত্ব ছিল যে ঈর্ষাজনিত কারণে শংকর মাধুরী ও মাধুরীর মা-কে খুন করেছিল। যাই হোক, শংকরকে পুলিশ পরে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, কারণ তার জোরালো অ্যালিবাই প্রমাণ করা গিয়েছিল।'

শংকর কুণ্ডে এখনও বেঁচে আছেন। আমি তাঁর ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। একটা জায়গায় অদ্ভুত একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি খুন করতে চেয়েছিলাম। আর তার জন্য চেয়েছিলাম আমার ঈর্ষা, হিংসে, ঘেন্না যতটা পারা যায় বেশি হোক। প্রতিদিন রাত্রে নিজের খোলিতে শুয়ে শুয়ে মনের ভেতর নানাভাবে নিজের অবস্থার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারের অবস্থার তুলনা করতাম ৷ আস্তে আস্তে রাগ হতো। ভয়ংকর ঈর্ষায় অবশ হয়ে যেত মন। তখন দেখতে পেতাম, মাধুরীর ওপর আমি অত্যাচার করছি। ওর মায়ের শরীর টুকরো টুকরো করে কাটছি। এই দেখাটার জন্যই ভেতরের হিংসেটাকে আমাকে জাগিয়ে তুলতে হতো প্রতি রাতে ৷' জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তারপর?' 'তারপর আর কী! ঘুমিয়ে পড়তাম। আবার সকাল হতো। আবার নতুন একটা দিন। আবার রাত আসত ৷ আবার নিজেকে জাগাতে হতো।' 'তাহলে খুনটা করলেন না কেন?' কী করে করব? প্রতি রাত্রে অপেক্ষা করতাম যে ভয়ংকর ঈর্ষা আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাক। বাইরে বার করুক। হাতে একটা চাকু তুলে দিক। কিন্তু এতটাই অবশ আর অবসন্ন লাগত যে সেই পর্যায় অবধি হিংসে পৌঁছতই না।'

একটা টান দিলাম সিগারেটে— 'খুন করবার মতো ঈর্ষা গাছের পাকা আম নয় মিস্টার চৌধুরী, যে চাইলেই টুপ করে পেড়ে আনবেন। তার জন্য দীর্ঘ সময় আর পরিস্থিতি লাগে।

আপনি কোনোটাই পাননি।'

অরুণ বাগানের দিকে মুখ ফিরিয়ে কিছু ভাবছিলেন। আবার বললাম, 'কিন্তু শুধু আপনার ভার্সনটাই নয়। আমার স্টোরির মাধ্যমে আরও একটা জিনিস করতে চাই। বাংলার একজন ভুলে যাওয়া কবিকে নতুন করে আবিষ্কার। অকালপ্রয়াত এক কবিকে যদি পুনরুদ্ধার করা যায়, সেটা লেখার ক্ষেত্রে কতটা কাজে লাগবে জানি না। ইংরেজি পাঠকের স্বাভাবিকভাবেই এসব নিয়ে উৎসাহ থাকবার কথা নয়। কিন্তু তবুও, কেন জানি না মনে হচ্ছে এটা করা উচিত।'

'কেন? আপনি তো বাংলা কবিতা বিষয়ে ইন্টারেস্টেড নন বলেই মনে হলো।' মুখ ফেরালেন অরুণ। তাহলে কী উদ্দেশ্যে করবেন?

ব্যাগ থেকে বইটা বার করলাম। ছিন্ন হলুদ মলাট, পোকায় খাওয়া পাতা, স্পাইন ভেঙে গেছে। পুরোনো দিনের ক্যালিগ্রাফিতে সোনার হরফে বইয়ের ওপর লেখা 'দার্জিলিঙ ডিটিস অ্যান্ড আদার পোয়েমস্'। লেখকের নাম জে এ কেবল। বইটা এগিয়ে দিলাম, 'চিনতে পারেন?'

হাতে নিয়ে পাতা উল্টে অরুণের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'এটা তো অমিতাভর কপি! আপনার কাছে কীভাবে এল?'

'বলতে পারেন, নিয়তির যোগাযোগ।' অল্প হাসলাম আমি। 'আজকের বই নয়। বহুদিন আগে, তখন কলেজে পড়ি, কলেজ স্ট্রিটে পুরোনো বইয়ের ফুটপাতে বইটা পাই। অমিতাভ মিত্রর নাম লেখা ছিল। সঙ্গে দার্জিলিং-এর ঠিকানা। ততদিনে অমিতাভর গল্প আমার জানা হয়ে গিয়েছে। তাও বুঝতে পারছিলাম না, এটা সত্যিই অমিতাভর কপি কিনা। কী মনে হতে বইটা কিনে নিই। বাড়ি ফিরে ওলটাতে গিয়ে শেষ পাতায় আগের পাতায় মার্জিনে দেখি—

'জানি। অমিতাভ মার্জিনে কবিতা লিখত। এই বই ওর কাছে আমিই দেখেছি। কবিতা কী লিখেছে তা যদিও মনে নেই।'

'বিজনবাড়ির একলা ঘোড়ার কেশর থেকে বৃষ্টির মতো সময় ঝরে যাচ্ছে, এই থিমে একটা কবিতা। অদ্ভুত লেখা। বাংলা কবিতা এরকম আগে পড়িনি।'

'সিগনেচার অমিতাভ। আপনি পড়েননি, কারণ হয়তো বাংলা কবিতা অত পড়েন না। কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গে অন্তত ম্যাজিকাল কিছু কবিতা একসময়ে লেখা হয়েছে। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণেশ ঘোষ, বিজয় দে, নিত্য মালাকার— সবাই উত্তরবঙ্গেই। নিত্য মালাকার লিখেছিলেন একবার, 'হাওয়ায় হারপুন ও কুডুল ভেসে আসে।' সেই লাইন পড়ে আমাদের অনেকেরই শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমি সারাজীবন ক্রাইমকাহিনী লিখেও এর সমতুল্য একটা লাইন লিখতে পারিনি। অরুনেশদা লিখেছিলেন— নিরাশ্রয় যে তার দিকে তাকিয়ে হাসি/চল তোকেও সেখানে রেখে আসি/ যেখানে স্বপ্ন, আগুন আর কুয়াশা/ আমার সঙ্গী এক ভিখারি বালিকা/ আমার সঙ্গী এক পথের গণিকা/আমার সঙ্গী এক ব্যর্থ বিপ্লবী/যার সামনে দাঁড়িয়ে এই স্তব্ধ নমস্কার।' এঁরাই ছিলেন আমাদের এই ছোট্ট শহরটার লেখালিখি করা যুবকদের ঈশ্বর। সমীর চট্টোপাধ্যায়, সুজয় বিশ্বাসের মতো নিভৃতচারী অসামান্য সব কবির দল। যদিও আমি সারাজীবন গোয়েন্দাকাহিনী লিখে গেছি যা চরিত্রে এইসব লেখালেখির থেকে যোজন দূর, কিন্তু এঁদের কাছে রেখে আসা ঋণ কি আর অস্বীকার করা যায়? আরও অনেকে ছিলেন, হারিয়ে গিয়েছেন। মানুষ ভুলে গিয়েছে তাঁদের লেখা। অমিতাভ সেই ধারারই হয়তো শেষ প্রতিনিধি ছিল।' তারপর নিজের মনে বললেন, 'আর তার সংগ্রহের বই আপনার হাতে। কী অদ্ভুত সমাপতন।'

'সমাপতন বলব না। বইটা আমার কাছে বহুদিন ধরেই ছিল। সেই তখন থেকে, আজ থেকে ধরুন বারো বছর আগে, যখন এই স্টোরি করবার কোনো প্ল্যান আমার নেই। আপনাদের বিষয়ে আমজনতার যতটুকু কৌতূহল, তার বেশি কিছু আমার ছিল না তখন। কিন্তু অমিতাভর কপি বলেই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং, তেমন নয়। এই বইটা যার লেখা, জে এ কেবল্, তিনিও ঊনবিংশ শতকের আরেক হারিয়ে যাওয়া কবি। মাল্টায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর

একসময়কার ক্যাপ্টেন। পরে হ্যাপি ভ্যালি টি এস্টেটের ম্যানেজার পদে যোগ দেন। এই শহরে থাকার সময়ে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দার্জিলিং এবং তার জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কবিতা লেখেন, যা স্থানীয় বিদ্বজ্জন ও বিশিষ্টদের উৎসাহে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার কাছে যেটা, ১৯১২ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ। মনে হয় না তার পরে আর কোনো এডিশন বেরিয়েছিল। কেবল কবে কোথায় মারা যান সেটাও জানি না। কবিতাগুলো উচ্চমার্গের নয়। কেবল নিজে সেটা দাবিও করেননি। ১৮৭০ সালের একটি শহরকে ঔপনিবেশিক চোখ থেকে কেমন ভাবে দেখা যেতে পারে, সেই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বাইরে এই বই আর কেউ কখনও পড়বে না। কেবল কালের নিয়মে হারিয়েই গিয়েছেন। ঠিক যেমন হারিয়ে গিয়েছেন অমিতাভ। আর এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া কবি লেখকদের নিয়ে আমার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। ঠিক যেভাবে ক্রাইমকাহিনীতে অপরাধীকে খুঁজে খুঁজে বের করা হয়, তেমনভাবেই ইচ্ছে করে হারানো কবিদের খুঁড়ে চলতে। এখানে একজন না, দুজন হারানো কবি। দুজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান একশো বছর। একজনের বই রেখে দিয়েছিলেন অন্যজন। কে জানে, হয়তো অমিতাভ কেবল সাহেবকে খুঁজে গিয়েছিলেন। রোমান্টিক লাগতে পারে, তবে ভাবতে দোষ কী? হয়তো কেবলের চোখ দিয়ে দার্জিলিংকে খুঁজেছিলেন অমিতাভ। আর সেই বই হাতফেরতা হয়ে আমার কাছে। আমি খুঁজছি অমিতাভর সেই খোঁজাটুকুকে। মানুষ অমিতাভকে। এভাবেই শুরু করতে চাই। একটা বৃষ্টিভেজা দিনে কলেজফেরতা আমি ফুটপাত থেকে তুলে নিচ্ছি অমিতাভ মিত্রর সংগ্রহের একটা হারানো কবিতার বই। ব্যাপারটা কি ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে, মিস্টার চৌধুরী?'

অরুণ মাথা নাড়লেন, 'অমিতাভ নেশা করবার জন্য নিজের সংগ্রহের সব বইপত্র বেচে দিত। সেভাবেই হয়ত... বইটা আমাকে দেবেন? কয়েকদিনের জন্য রাখব তাহলে নিজের কাছে।

অপেক্ষা করে আবার মুখ খুললাম, 'বাংলা কবিতা নিয়ে কিছুই জানি না হয়তো আপনার সংগ্রহের কবিতার বইয়ের কালেকশন ঈর্ষণীয়। তবে এখানে আসবার আগে কিছুটা পড়াশোনা করেছি। সামান্য কিছু কবিতাও... অমিতাভদের আবিষ্কার করতে গেলে একদম অজ্ঞ থাকলে চলে না। এই গল্প যেমন আপনার গল্প, তেমনই অমিতাভরও গল্প হবে। আর আমাকে সেই গল্প বলবেন আপনি।'

বইয়ের গায়ে মমতার হাত বোলাতে লাগলেন অরুণ। 'তাহলে হয়তো কিছুটা বুঝবেন, অমিতাভরা সবাই, ওই সময়ে, কবিতা লেখা ওদের কাছে নিছক শিল্প ছিল না। যাপন ছিল। বেশিরভাগ কবিই তখন কলকাতা নয় জেলা থেকে আসতেন। হাজার হাজার কবিতার ম্যাগাজিন বেরোতো তখন। জিরাফ বার করতেন অরুণেশদা। অমিতাভর কিছু কবিতা ওখানেই। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের কবিকুল মধ্যরাতের কলকাতা শাসন করতেন। আর সত্তর দশকের কবিকুল, যাদের অনেকের সঙ্গেই কলকাতার তেমন যোগ ছিল না, ইতিউতি মাথা তুলছে যেখানে বীরভূম, বাঁশবেড়ে, মাথাভাঙা বা চাকদার মতো বিদ্রোহের স্তম্ভগুলো, সটান বলে দিল যে তারা আরব গেরিলাদের সমর্থন করে। এই বদলটা, হ্যাঁ এটার সঙ্গে রাজনীতি ইত্যাদির যোগ তো ছিলই, এটাকে যদি না ধরতে পারেন, অমিতাভকে প্রোফাইল করতে পারবেন না। ওর গোটা জীবনটাই ছিল যেন কবিতার জন্য বাঁচা। শুধু ওর কেন, অনেকেরই।'

'মানে, আমি তো জানতাম অমিতাভ অরাজনৈতিক ছিলেন। তাহলে রাজনীতির প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে?'

'আসছে, কারণ রাজনীতি বাদ দিয়ে সত্তরের কবিতা হয় না। ধরুণ, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সত্তর শুরুই হল বলা যায় দুজন তরুণ কবির বই দিয়ে, আর বিস্ফোরণ ঘটল বাংলা কবিতায়। অমিতাভ গুপ্তর 'আলো' আর পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের 'দেবী'। মনে হলো, বাংলা কবিতায় যেন নতুন স্বরের শঙ্খধ্বনি ঘটালো এই দুজন। পার্থ স্কটিশে পড়ত, আর অমিতাভর

সঙ্গে ওর ছিল ভালো বন্ধুত্ব, মানে অমিতাভ মিত্রর কথা বলছি। সেসবের ইতিহাস দীর্ঘ। সে যাক। অমিতাভ গুপ্ত নকশালপন্থী ছিলেন, কিন্তু ওখানেই আবদ্ধ না থেকে তাঁর কবিতায় উত্তর আধুনিকতার কনসেপ্ট নিয়ে এলেন। আর পার্থপ্রতিম আনল মন্ত্রতন্ত্র পুরাণের গোপন বীজের আখরে গ্রিক ভাস্কর্যের মতো পাথরে খোদাই গড়ন। আনল ক্লাসিকাল আবহ। কিন্তু সেই পার্থও যখন লেখে— 'তোমার ও রক্তবর্ণ আনন ফেরাও, হে দারুণা, তুমি খড়্গ তোলো/অস্ত্র উপচারে তুমি পূজা করো এই রোগগ্রস্ত মানুষের তখন/ও লেখা সত্তরের গর্জন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না ৷ এবার অমিতাভ এই দুজন কবিকে নিয়ে ১৯৭১-এ কবিতা লিখেছিল, 'দেবীর আলো'। অমিতাভ গুপ্ত আর পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের দুটো বইয়ের প্রতি ট্রিবিউট। সেখানে এরকম পঙক্তি আছে। উগ্রাপ্রহরণে/সৌম্যমূর্তিতে/অবিশ্রাম ঝড় তুচ্ছ করেছিল/প্রেক্ষাপটটিও। এই গোটা লাইনটাই দুটো বইয়ের দুটো কবিতার পঙক্তিকে জুড়ে অদ্ভুত জাক্সটাপোজিশান করেছে অমিতাভ। তো, আপনি যখন অমিতাভর কবিতা পড়বেন, ওই প্রেক্ষিতটা না জানলে তো ধরতে পারবেন না।

'আর অমিতাভর মৃত্যু? সেটাও কি সৎ সাহিত্যের জন্যই?'

অরুণ চোখ বুজে অনেকটা নিজের মনেই অস্ফুটে বললেন, 'সকল রৌদ্রের মতো ব্যপ্ত আশা যদি গোলকধাঁধায় ঘুরে আবার প্রথম স্থানে ফিরে আসে, শ্রীজ্ঞান কী তবে চেয়েছিল?'

চোখ খুলে মৃদু হাসলেন কয়েক মুহূর্ত পর, 'আমার প্রিয় কবিতা। অমিতাভরও প্রিয় ছিল। জীবনানন্দ। মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়.... সূর্য যদি কেবলই দিনের জন্ম দিয়ে যায়, রাত্রি যদি শুধু নক্ষত্রের, মানুষ কেবলই যদি সমাজের জন্ম দেয়, সমাজ অস্পষ্ট বিপ্লবের, বিপ্লব নির্মম আবেশের, তা হলে শ্রীজ্ঞান কিছু চেয়েছিল? মাঝে মাঝে নিজের মনে কথাগুলো বলে ফেলি।' ,

'অদ্ভুতভাবে আপনার অনেক উপন্যাসেই এই অ্যাবসার্ডিটি ঘুরে ফিরে আসে। ক্রাইম আর তার সমাধান এই দুইয়ের অর্থহীনতা....'

'আমি তো কবিই হতে চেয়েছিলাম। লিখতে পারতাম না। অমিতাভ বলত, তোর দ্বারা অক্ষরবৃত্তের বেশি ওঠা হবে না। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে কবিতার সবথেকে কাছাকাছি যেটা, সেটাতেই গেছি। ক্রাইম কাহিনী।'

'মানে রহস্যের সমাধান আর কবিতার অর্থ খুঁজে বার করা আসলে একই বলছেন?' তরল গলায় বললাম। বাংলা কবিতা নিয়ে এরকম আলোচনা আমার পরিমণ্ডলে হয়নি এর আগে। যেটা মজা লাগছিল, অরুণ যখন কথা বলেন, ধরেই নেন যে আমি সব বুঝে যাব। যেসব কবির নাম কখনো শুনিনি তাঁদের ব্যাখ্যাও।

'পার্থপ্রতিম কী বলেছিল জানেন না? বলেছিল, কবিরা অতীব লঘু, বজ্রমণির মতোই লঘু, গুরুত্ব ফুরুত্বের মতো শব্দকে এরা পায়ে পায়ে কুকুরের মতো খেলিয়ে বেড়ায়। কবিরা হলো নির্বাসিত যুধিষ্ঠির ও ব্যোমকেশ। যুধিষ্ঠিরের মতো লঘু। ব্যোমকেশের মতো যশহীন। কারণ তাদের কাজই হলো ভ্রমণ ও গোয়েন্দাবৃত্তি। হ্যাঁ, কঠিন কবিতার মানে খুঁজে বার করবার আনন্দ তো অপরাধীকে শনাক্ত করবার থেকে কম নয়।

'আর অমিতাভকে হত্যার মতো একটা পারফেক্ট মার্ডার তাহলে কীরকম ছিল? মনে হয়েছিল কি, একটা দুরূহ অবোধ্য কবিতা আপনি ছুড়ে দিয়েছেন সবার সামনে, যার প্রকৃত অর্থ ভেদ করবার চ্যালেঞ্জ কেউ শেষমেশ নিল না?'

অরুণ আর একটা সিগারেট ধরালেন, 'আপনি আমার লেখা কতগুলো বই পড়েছেন?

'প্রায় দশ-বারোটা তো বটেই৷'

'কী মনে হয়েছিল বইগুলো পড়ে?'

'অন্যরকম লেগেছিল।'

'কীরকম?'

'আপনার লেখায় অপরাধীরা ধরা পড়ে না।'

চশমার ভারী কাচের আড়ালে দুটো স্ফুলিঙ্গ চমকে উঠল, 'সেটা কেন বলে আপনার মনে হয়?'

'জানি না। হয়তো অপরাধ আর শাস্তি বিষয়ের চিরাচরিত ধারণাটাকেই আঘাত করতে চান। অথবা ন্যায়, বিচার এবং সমাজ বিষয়ে আপনি নৈরাজ্যবাদী। অথবা, যেটা বললাম অপরাধ বা সমাধান, সবই আপনার কাছে অ্যাবসার্ড, মিনিংলেস আর এখন মনে হচ্ছে,'সামনে ঝুঁকে স্পষ্ট চোখ রাখলাম অরুণের দিকে 'যেহেতু আপনি নিজে ধরা পড়েননি, তাই প্রতিটা বইতে নিজের অপরাধকেই সেলিব্রেট করে চলেছেন।'

অরুণও আমার দিকে স্থির চোখ মেললেন। আমরা দুজনে দুজনের মুখোমুখি। যেন দাবার বোর্ডের দুপাশে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। একটা অস্পর্শ বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘরের মধ্যে বয়ে চলেছে। এই প্রথম আমি অরুণ চৌধুরীর চেখের ভেতর একটা ইস্পাতের তলোয়ার ঝিকিয়ে উঠতে দেখলাম।

'অথচ আপনি যদি আমার প্রথমে দুটো ফ্লপ বই পড়তেন, তাহলে দেখতেন সেখানে অপরাধী ধরা পড়েছে।'

'সেটা আমার থিওরিকেই প্রমাণ করে', মাথা নাড়ালাম।

'অথবা এটা প্রমাণ করে যে আমি অপেক্ষা করে আছি ভবিষ্যতের সেই সত্যান্বেষীর দিকে তাকিয়ে, যে অপরাধীর মেধার সঙ্গে পাল্লা দেবে।'

'অপরাধীর মেধা? নাকি আপনার মেধা? '

'আমারই মেধা। কারণ আমার গল্পের শেষ আজ অবধি কোনো ডিটেকটিভ ধরতে পারেনি।'

'আপনি মেগালোম্যানিয়াক।'

'অথবা, বাকি পৃথিবী মিডিওকার।

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম কয়েক মুহূর্ত। অরুণ চোখ বুজলেন। বড়ো নিঃশ্বাস নিলেন একটা। আবার সেই স্মিত মানুষটা ফিরে এল। কয়েক মুহূর্ত পর উঠে দুটো ফাইল বার করে আনলেন বইয়ের আলমারির পেছন থেকে।

'আপনাকে একটা টাস্ক দেব বলেছিলাম। এটাই সেই টাস্ক। একটা গোয়েন্দা কাহিনী। বলা ভালো, একটা মার্ডার মিস্ট্রি। কিন্তু শেষটা নেই। এটার সমাধান যদি করতে পারেন, তাহলে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। কেন অমিতাভকে মেরেছিলাম, আর কীভাবেই বা মেরেছিলাম।' একটা ফাইল টেবিলের উপর রেখে অন্যটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ফাইলটা হাতে নিলাম, 'আমাকে এখন বসে বসে ধাঁধার সমাধান করতে হবে? আমি তো একটা কাজে এসেছি।'

'আমি জানি টিনা। সময় আপনার কাছে মূল্যবান। দুঃখিত, কিন্তু এটাই আমার শর্ত। আমি জানি, আপনি পারবেন।'

'কেন মনে হলো, পারব?'

'আপনার সিরিজের অন্তত দুটো স্টোরিতে নিজের ডিডাকশন প্রয়োগ করে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, প্রকৃত অপরাধী কে হতে পারত। সেটা পড়ে মনে হয়েছিল, আপনার যুক্তিকাঠামো অঙ্কের মতো নিখুঁত রেখায় চলে। সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তাগুলোকে একদম মিনিমাম লেভেলে নামিয়ে আনে। সাধে কি আপনাকে ইন্টারেসস্টিং বলেছিলাম?' হাসলেন অরুণ।

'এটা কি সম্ভব? আপনি নিজে ভেবে দেখুন। আমি তো অনির্দিষ্টকালের জন্য এখানে থাকতে আসিনি। দুদিন পরেই অফিস থেকে তাড়া আসবে, কবে ফিরতে পারব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করে এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। তার আগে এতগুলো জায়গায় যাওয়া, ইন্টারভিউ...'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনিও ভেবে দেখুন, আমি তো চাইলেই সমাধানটা বলে দিতে পারি। সেটা না করে যেহেতু এই ফাইলটা দিচ্ছি, তার হয়তো কোনো কারণ থাকতে পারে, তাই না?'

একটুক্ষণ থেমে আমার দিকে চেয়ে থাকলেন। বুঝতে পারছিলাম না কী বলব। ‘আচ্ছা বেশ। আপনি চাইছেন না বুঝতে পারছি। সেক্ষেত্রে এই মিটিং আর চালিয়ে লাভ নেই।' অরুণ ফাইলটা ফিরিয়ে নিতে গেলেন।

‘না’, ফাইল খামচে ধরলাম। ‘এটাই যদি আপনার শর্ত হয়, যদি শর্ত হয় যে বুদ্ধির খেলায় আপনাকে পাল্লা দেব, তাহলে সেই চ্যালেঞ্জ আমি রাখতে পারব না। এই বয়সে এসে কারও কাছে নিজেকে প্রমাণ করবার তাগিদ আমার নেই। আগেও বলেছিলাম, আমি বোরিং। কোনো রকম থ্রিল পছন্দ নয়।'

‘তাহলে ফাইলটা চান কেন?’

‘আপনি বুঝতে পারছেন না?'

‘এটুকু বুঝছি, নিজেকে বোরিং বলাটা আপনার অভ্যেস। নিজেও জানেন যে আপনি বোরিং নন। আর তাই...'

‘আর তাই...? ’

'তাই, এই রহস্যটার সমাধান আপনি করবেন।' আমার হাতে ফাইলটা ধরিয়ে দিলেন অরুণ।

ভুল হলো। আপনার ছেলেমানুষিতে আমি থাকব না আগেও বলেছি। এটা আপনার শখ হতে পারে, কিন্তু আমার চাকরি। আমাকে গল্পটা লিখতে হবে। ফাইলটা চাই, কারণ আপনার লেখা একটা উপন্যাস প্রকাশিত হবার আগেই পড়তে পারা আমার কাছে রোমাঞ্চকর।'

‘কিন্তু এটা তো আমার লেখা নয়।’

‘মানে? তাহলে কার লেখা?’

‘অমিতাভর।’

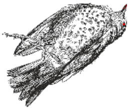

ঐ দ্যাখ নীচু হয়ে আসে ধূর্ত চিল,
গ্রাম-শকুনের দল মাথার ওপর
চক্রাকারে উড়ে উড়ে বেড় দেয় সুখে
তোমার সংকল্প ওরা খাবে বলে ঠিক
নিচু হয়ে নেমে আসে মেধার ওপর।

—কৃষ্ণা বসু

সম্ভবত অমিতাভ মিত্র নিজে সামনে এসে দাঁড়ালে এতটা হতভম্ব হতাম না।

ফ্যালফেলিয়ে হাতের জিনিসটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'এটার মানে কী?' অরুণ কিছু বলতে যাবেন, কিন্তু বাধা পড়ল। সিঁড়ির মুখ থেকে এক মহিলা ডাক দিলেন, 'অরুণ।'

তথ্য বলছে, অনন্যা চৌধুরীর বয়স সত্তর। দেখেও সেটাই মনে হয়। অরুণের থেকে বড়ো লাগে। কিন্তু একটা আলগা সৌন্দর্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি পেয়েছে, ঝলসে উঠছে ঘন কালো চোখের ভেতর, গালের দুই পাশের ভাঁজে এবং মাথার ধবধবে সাদা চুলের মধ্যে থেকে। হাউসকোট পরে আছেন। রোগা, ছোটোখাটো চেহারা। মুখের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা, বয়সকে সঙ্গে নিয়েই চোখ ফেরাতে দেয় না। অনন্যা সেন্ট পলস্ কলেজে অঙ্কের অধ্যাপিকা ছিলেন। বছর দশেক হলো অবসর নিয়েছেন। ক্রনিক হাঁপানির সমস্যা ছোটোবেলা থেকে। একটা সাক্ষাৎকারে অরুণ নিজেই জানিয়েছিলেন।

'তুমি আবার নামতে গেলে কেন। সিঁড়িটা না ভাঙলেই তো পারতে আজ।' ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন অনন্যা। অরুণ হাত ধরে তাঁকে সাবধানে বসিয়ে দিলেন সোফায়। অন্যন্য একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলে হাসলেন, 'বিরক্ত করছি না তো? আমার নিজেরই ইচ্ছে করল, প্রশ্নোত্তর পর্ব কেমন চলছে সেটা দেখে আসি একবার।'

অরুণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন। অনন্যা আমার দিকে কালো চোখ মেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তখনও আমার অমিতাভর পাণ্ডুলিপি বিষয়ে স্তম্ভিত ভাব কাটেনি। কোনোরকমে নিজেকে সামলে পরিচয় দিলাম।

'আমি জানি। সব শুনেছি আপনার সম্বন্ধে। তবে আপনার লেখাগুলো সব পড়া হয়নি। আপনি কি পারবেন সত্যিটা বাইরে আনতে?'

আমি তো গোয়েন্দা নই! আর সত্যিটা বাইরে আনা আমার কাজও নয়। আমি শুধু কিছু প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই পাঠকের সামনে। তবে হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী সঠিকভাবে ধরতে পেরেছেন যে আমি রহস্য কাহিনীর ভক্ত। সেই হিসেবে পেশার বাইরেও এই ঘটনার প্রতি অন্যরকম একটা আকর্ষণ ছোটোবেলা থেকেই আছে।' হালকা গলায় উত্তর দিলাম।

'আপনার কি কলকাতাতেই জন্ম?'

হ্যাঁ। যদিও কলকাতায় আজকাল কম যাওয়া হয়। আপনি এসেছেন, একদিক থেকে ভালো হয়েছে। যদি কিছু মনে না করেন, থাকতে অনুরোধ করব।'

অনন্যা হাসলেন, 'রহস্য কাহিনী বিষয়ে আমার জ্ঞান আগাথা ক্রিস্টির বাইরে এগোয়নি। ওটা অরুণের ডিপার্টমেন্ট। আমার আগ্রহও নেই বেশি। জটিল অঙ্কের ফর্মুলা আমাকে যত টানে, অপরাধ বিজ্ঞান তত নয়।

হাতের ফাইলটা টেবিলে নামিয়ে রাখলাম। অনন্যার সামনে এই বিষয়ে কথা বলব না। অরুণের স্বীকারোক্তি নিয়েও মুখ খুলব না। কিছু ধাঁধার সমাধান একলাই করতে হবে।

'আমি ধরেই নিচ্ছি যে অমিতাভ মিত্রর ঘটনাটা আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খ জানেন। আমার নিজের বেশ কিছু প্রশ্ন আছে। যার উত্তর পুলিশ ফাইল থেকে পাইনি। এবার সেখানে সমস্যা হলো, আমি এবং আপনার স্বামী, দুজনেই এই কেসটায় ভীষণ বেশি রকম ইনভলভড় হয়ে পড়েছি। মিস্টার চৌধুরী একজন সন্দেহভাজন হিসেবে জীবনের চল্লিশটা বছর এর মধ্যে থেকেছেন। আর আমি শেষ কিছুদিন ধরে শুধু এটা নিয়ে পড়ে আছি। তাই হয়তো নিরপেক্ষভাবে ঘটনাটাকে দেখার জায়গাতে আমরা কেউ নেই। আপনি এই কাহিনী জানলেও, অনুমান করতে পারি যে কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই হয়তো আমাদের থেকে বেশি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখতেও পারেন। আমি যদি আপনাদের দুজনের সামনে এই প্রশ্নগুলো রাখি, তাহলে কি আপনি অস্বস্তিতে পড়বেন?

অরুণ অপরাধী হলেও যদি সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তর না দেন, তার বদলে একটা রহস্য কাহিনী হাতে ধরিয়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন, সেই ফাঁদে পা দেব না। আমাকে চলতে হবে নিজের মতো করে। গোয়েন্দা গল্পের শেষটুকু অনুমান করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ নিজের গল্পটাকে দাঁড় করানো। মাথার ওপর ডেডলাইনের খাঁড়া ঝুলছে।

অরুণ কফি বানাচ্ছেন নতুন করে। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, বৃষ্টি এখন আর পড়ছে না, কিন্তু কুয়াশায় সব কিছু ঢাকা। বাগানের আবছা আলোটুকু বাদে আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

'কিন্তু আমি কি পারব?' অনন্যা মনে হলো নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। 'তাহলে তো এতদিনেই পেরে যেতাম। বেশ, আপনি প্রশ্ন করুন।

একটা বড়ো নিশ্বাস নিলাম। তারপর নিজের খাতা বার করে প্রশ্নের তালিকাগুলো দেখে নিয়ে বলতে শুরু করলাম পর পর

'প্রথম খটকা যেটা। পুলিশ অরুণ চৌধুরীকে ছেড়ে দিয়েছিল কারণ তাঁর নাকি অ্যালিবাই আছে। কীরকম সেই অ্যালিবাই? পোস্টমর্টেম অনুসারে, অমিতাভ খুন হয়েছিল এগারোই জুন রাত বারোটা থেকে বারোই জুন ভোর ছটার মধ্যে। সেই সময়টায় অরুণ পুলিশ স্টেশনে বসেছিলেন। কিন্তু অরুণের যে কোনো সহকারী ছিল না, সেই বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত হলো কী করে?'

'দ্বিতীয় ধাঁধা প্রশান্ত গুরুংকে নিয়ে। পুলিশ প্রশান্ত গুরুং-এর খোঁজ চালিয়েছিল, কিন্তু সেই রাত্রে প্রশান্ত নিজের ঘরে ফেরেননি। ফিরেছিলেন পরের দিন। প্রশান্তর দাবি অনুসারে, সেই রাত তিনি শহরের একটি নিষিদ্ধপল্লিতে কাটিয়েছিলেন। যাই হোক, প্রশান্তর বয়ান অনুযায়ী, তিনি সত্যিই অরুণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নটা দশ নাগাদ এসেছিলেন, এবং পৌনে দশটায় বেরিয়ে যান। প্রশান্তর বক্তব্য অনুসারে, অরুণের বাড়িতে তিনি অমিতাভকে দেখেননি। হ্যাঁ, অরুণের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়েছিল, এবং রাইফেল নিয়ে ধস্তাধস্তিতে গুলি বেরিয়ে যায়। কিন্তু তখন অরুণ একাই ছিলেন। তাহলে প্রশ্ন হল দুটো। মিসেস বাসু অরুণ এবং অমিতাভকে দেখেছিলেন সাড়ে নটার সময়ে। কিন্তু তখন প্রশান্ত অরুণের বাড়িতে, এবং তিনি কিছু দেখতে পাননি। তাহলে কে মিথ্যে বলছেন? প্রশান্ত না মিসেস বাসু?

প্রশান্ত এবং মিসেস বাসুর বয়ান অনুযায়ী আমি এই গল্পের তিনটে সম্ভাব্য ছবি তৈরি করেছি। সেগুলোর টাইমলাইন এরকম—

১. মিসেস বাসুর বয়ান সত্যি, প্রশান্তর বয়ান মিথ্যে।
   সন্ধেবেলা অমিতাভ আসেন অরুণের বাড়ি।
   দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।
   দুজন বাগানে বেরিয়ে আসেন। তখন রাত সাড়ে নটা। অরুণের হাতে রাইফেল ছিল।
   অরুণ গুলি করেন। অমিতাভর হাতে সেই গুলি লাগে। গোটাটাই ঘটে বাগানে।
   মিসেস বাসু গুলির আওয়াজ শুনতে পান।

অরুণ আর অমিতাভ ছুটতে ছুটতে গেট অবধি আসেন। অমিতাভ বেরিয়ে যান। অরুণ বাড়ির দিকে ফিরে যান।

২ প্রশান্তর বয়ান সত্যি, মিসেস বাসুর বয়ান মিথ্যে

নটা দশ নাগাদ প্রশান্ত অরুণের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

পৌনে দশটার আগে, সম্ভবত সাড়ে নয়টা নাগাদ প্রশান্ত আর অরুণের মধ্যে উত্তেজিত কথা কাটাকাটি হলো।

অরুণ বাড়ির একটা রাইফেল থেকে ঘরের ভেতর গুলি ছুড়লেন

পৌনে দশটা নাগাদ প্রশান্ত বেরিয়ে গেলেন। একাই।

৩ মিসেস বাসুর বয়ান সত্যি, প্রশান্তর বয়ান আংশিক সত্যি।

অমিতাভ অরুণের বাড়িতে সন্ধেবেলা এলেন। প্রশান্ত এলেন নটা দশ নাগাদ।

অমিতাভ বাগানে বেরিয়ে এলেন সাড়ে নটার সময়ে। তাঁর পেছনে অরুণ, অথবা অরুণ এবং প্রশান্ত দুজনেই। অরুণের হাতে রাইফেল।

বাসু বাগানে দাঁড়িয়ে অমিতাভকে গুলি করলেন অরুণ। অথবা প্রশান্ত। মিসেস সেই গুলির শব্দ পেলেন। প্রশান্ত যদি বাগানে থেকেও থাকেন, মিসেস বাসুর দৃষ্টির আড়ালে ছিলেন।

অমিতাভ বেরিয়ে গেলেন।

অরুণ (অথবা অরুণ ও প্রশান্ত) ফিরে এলেন।

প্রশান্ত রাত পৌনে দশটায় বেরিয়ে গেলেন।

‘প্রথম সম্ভাবনা দেখা যাক। ধরে নিলাম মিসেস বাসু সত্যি বলছেন এবং প্রশান্ত মিথ্যে বলছেন। বলতেই পারেন, কারণ হতে পারে যে অরুণ প্রশান্তকে টাকা দিয়ে মিথ্যে বলিয়েছেন। যদিও পুলিশ সেই প্রমাণ পায়নি, বরং প্রশান্তর সঙ্গে অরুণের শত্রুতার কথাই সকলে জানত। তাও, আমরা তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি যে শত্রুতা হয়তো লোকদেখানো ছিল। হয়তো ভেতরে ভেতরে টাকাপয়সার ব্যাপার ছিল। কিন্তু পুলিশ বাগানে প্রশান্তর পায়ের ছাপ পেয়েছিল। একজোড়া জুতো, একবার বাগান থেকে বাড়িতে এসেছে, পরে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে গেছে। তার মানে, প্রশান্ত এসেছিলেন। এদিকে, মিসেস বাসুর মতে গুলি ছুটেছিল বাগানে। অরুণের হাতে রাইফেল দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু বাগানে কোনো বুলেট বা কার্তুজের খোল মেলেনি। মিলেছে অরুণের ঘরের মধ্যে। কাতুর্জের খোলও ঘরের মধ্যেই পড়েছিল। কার্বন প্রিন্ট আর খোলের অবস্থান মিলিয়ে পুলিশের গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন যে গুলি ঘরের বাইরে চালানো হয়নি। তাহলে কি মিসেস বাসু মিথ্যে বলছেন?

‘এবার মিসেস বাসু মিথ্যে কথা বলছেন যদি ধরে নিই, তাহলে অমিতাভকে তিনি দেখেননি। কিন্তু তাহলে বাগানের রক্ত অমিতাভর রক্তের সঙ্গে মিলল কী করে? অরুণের হাতে আঁচড়ের দাগই বা এল কোথা থেকে? প্রশান্ত গুরুঙের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রকার ধস্তাধস্তি হয়নি, সেটা অরুণ এবং গুরুং দুজনেই স্বীকার করেছেন। ফরেনসিক গুরুঙের নখ পরীক্ষা করে দেখেছে, সেখানে অরুণের চামড়ার কোনো টিস্যু নেই। অরুণ তাঁর হাতের আঁচড়ের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। বলেছেন, তাঁর মনে নেই কীভাবে হলো।

‘এবার তৃতীয় বিকল্প। ধরে নিলাম মিসেস বাসু পুরোটা সত্যি বলছেন। এবং প্রশান্ত আংশিক সত্যি বলছেন। মানে, প্রশান্ত এসেছিলেন। কিন্তু অমিতাভও এসেছিলেন এবং প্রশান্ত তাঁকে দেখেছিলেন। তাহলে হিসেব মতো অমিতাভকে গুলি করেন প্রশান্ত অথবা অরুণ। অরুণ নিজে স্বীকার করেছেন যে, গুলি তাঁর হাত থেকেই বেরিয়েছে। মুশকিলটা হলো, আগেও বলেছি, সেই গুলিটা চালানো হয়েছে ঘরের ভেতর, যার বুলেটটাও পাওয়া গিয়েছে। আলমারির ওপর রাখা একটা কাচের জারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে বুলেট

একপাশে পড়েছিল। কার্তুজের খোলও পাওয়া দিয়েছে ঘরের মধ্যেই। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে সেই বুলেট মানবশরীরের সংস্পর্শে আসেনি। আবার ব্যালিস্টিক রিপোর্ট এটাও বলছে যে রাইফেল থেকে একটামাত্র গুলিই করা হয়েছিল। তাহলে অমিতাভর হাত থেকে রক্ত ঝরা, অথবা তার মৃতদেহের বাম হাতে যে গুলি লেগেছিল, সেটা কীভাবে সম্ভব হলো? ব্যালিস্টিক অনুসারে, অমিতাভর হাতে লেগে থাকা গুলিটাও সেই একই রাইফেল থেকে এসেছে। এদিকে মিসেস বাসু জোর দিয়ে বলছেন তিনি একটাই গুলির আওয়াজ শুনেছেন। এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে মিসেস বাসু এবং প্রশান্ত দুজনে একই সঙ্গে সম্পূর্ণ সত্যি বলতে পারেন না। কারণ প্রশান্ত ছিলেন পৌনে দশটা পর্যন্ত এবং মিসেস বাসু সাড়ে নটার সময়ে অমিতাভকে দেখেছেন।

‘এবার আসি রাইফেল প্রসঙ্গে। রাইফেল থেকে একটাই গুলি ছোঁড়া হয়েছে, এবং ছুঁড়েছিলেন অরুণ। কিন্তু ট্রিগারে এবং রাইফেলের বাঁটে অরুণ ছাড়াও অমিতাভর হাতের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। তার মানে সেই রাত্রে অমিতাভ সত্যিই এসেছিলেন। তিনি যদি রাইফেল ব্যবহার করে থাকেন, কেন? কীসের উদ্দেশ্যে? কার প্রতি?

‘এবার তৃতীয় রহস্য। বাগানের মাটিতে পায়ের ছাপ। কিছু ছাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। কিন্তু পুলিশ ছাউনি খাটিয়ে অনেকটাই বাঁচাতে পেরেছিল। সেগুলোর মধ্যে থেকে অরুণ, অমিতাভ এবং প্রশান্তর জুতোর ছাপ আলাদা করে পাওয়া গেছে। অরুণ একবার দৌড়ে বাগানের দিকে গেছেন। সেই পদক্ষেপগুলোয় পায়ের ছাপ একটা অপরটার থেকে দূরে দূরে এবং গভীর। আবার উত্তেজিতভাবে বাড়ির দিকে ফিরে এসেছেন। সেই পদক্ষেপগুলোও মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত। প্রশান্ত গুরুঙের পায়ের ছাপও পাওয়া গেছে, যার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু অমিতাভর জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে শুধু একবারই, যেটা বাড়ি থেকে বাগানের দিকে চলে গিয়েছে। বাগান থেকে বাড়ির দিকে আসার ফুটপ্রিন্ট মেলেনি। কেন? এর একটা ব্যাখ্যা হতে পারে যে অমিতাভ যখন এসেছিলেন, তার পরে একপ্রস্থ মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে তাঁর পায়ের ছাপ ধুয়ে যায়। কিন্তু প্রশান্ত গুরুঙের পায়ের ছাপ ছিল, দুইদিকেরই। এই থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে অমিতাভ এলেও প্রশান্ত গুরুঙের বেশ কিছুটা সময় আগে এসেছেন। মানে সন্ধে নাগাদ। কিন্তু তাহলে একটা অন্য প্রশ্নের ব্যাখ্যা মেলে না।’

এই পর্যন্ত বলে থামলাম। অরুণ সামনে কফির কাপ কখন রেখে গেছেন খেয়াল করিনি। উলটোদিকে বসে কফিতে চুমুক দিয়ে হালকা হাসলেন। বুঝতে পারছি, এই প্রশ্নগুলো তাঁকে আগেও বহুবার করা হয়েছে।

অনন্যা নিমীলিত চোখে শুনছিলেন। এবার আমার দিকে চোখ তুললেন। ‘এই?’

‘না। আরও আছে। ইনফ্যাক্ট, এই কেসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এত খটকা, এবং পরস্পরবিরোধী সূত্র ছড়িয়ে আছে যে আমি জানি না কীভাবে এর সমাধান সম্ভব।'

‘তবুও আপনি আমার কাছে সমাধান চাইছেন?

‘সমাধান চাইছি না। আপনার কী মনে হয় জানতে চাইছি।'

‘অরুণের সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৭৭ সালে। ১৯৮০ সালে আমরা বিয়ে করি। আমি নিজের গবেষণা আর কলেজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি সারা জীবন। আর অরুণ তার লেখালেখি নিয়ে। ওকে নিয়ে এই যে সেনসেশন, সেটাকে কোনোদিনই গুরুত্ব দিইনি। আমার কাছে ওটা একটা তুচ্ছ অতীত। তুচ্ছ, কারণ আমার স্বভাবের সঙ্গে ওটা যায় না।' কাঠকাঠ গলায় উত্তর দিলেন অনন্যা।

‘আপনার কি সত্যিই কোনো ইন্টারেস্ট নেই?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

‘নেই। কারণ আমি অঙ্কের মানুষ। কাঁচা আবেগের ব্যাপার বুঝি না। সেটা হয়তো আমারই অক্ষমতা। লেখালেখির জগতে রেষারেষি থেকে একজন আরএকজনকে খুন করবে, এটা আমার কাছে চূড়ান্ত অপচয়ের একটা উদাহরণ। সময়, শক্তি এবং ভাবনার

অপচয়।'

'মানুষ কি খুন করতে পারে না? এটা কিন্তু অদ্ভুত কথা বলছেন।'

'অবশ্যই পারে। কিন্তু আমার কাছে সেই পারাটা যুক্তিহীন। কারও জীবন নিয়ে নেবার মানে হচ্ছে আইনের চোখে নিজে ভালনারেবল হয়ে যাওয়া। এই বিনিময়মূল্য এতটাই বেশি যে এটাকে কোনোরকম স্থিতাবস্থাতেই ফেলা যায় না। আমি স্থিতাবস্থাকেই সবথেকে যুক্তিপূর্ণ অবস্থান মনে করি।'

'কিন্তু, ভাবুন একবার', অনন্যার আগ্রহ ধরে রাখার জন্য পালটা যুক্তি দিতেই হবে। অথবা এমন প্রশ্ন করতে হবে যেখানে তাঁর যুক্তি ভেঙে যায়, 'আপনি যদি অরুণের জায়গায় থাকতেন আর আপনার সারা জীবনের কাজ, হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো পেপার, অমিতাভর জন্য প্রত্যাখ্যাত হতো, আপনার কি রাগ হতো না?'

'হতো।'

'তাহলে সেই রাগ বাড়তে বাড়তে কি কেউ খুন করতে পারে না?'

'আমি করতাম না। '

'আপনি কী করতেন?

'টাকা দিয়ে অমিতাভকে কিনে নিতাম।' অনন্যার গলা ঠাণ্ডা। অরুণ নিস্পন্দ বসে আছেন। মুখে ভাবান্তর নেই।

'আপনি যেটা বুঝতে পারছেন না তনয়া, আমার বাঁচার নিয়ম হলো সবথেকে কম ঝুঁকি নিয়ে যতটা পারা যায় লাভ করবার অঙ্ক। অমিতাভকে মেরে আমি পুলিশের কাছে সন্দেহভাজন হয়ে যেতাম। হয়তো গ্রেপ্তার হতাম, এবং দোষী ও সাব্যস্ত হতাম। পথের কাঁটাকে দূর করবার জন্য এতখানি ঝুঁকি নেব কেন? তার থেকে ঢের সহজ রাস্তা বাছব। অমিতাভর সঙ্গে চুক্তিতে যাব। তার মুখ বন্ধ করে দেব। হ্যাঁ, অমিতাভ নুইসেন্স হয়ে বেঁচে থাকবে। হয়তো বারে বারে টাকা চাইবে। সেই নিয়ে দরাদরিও হবে। কিন্তু নিজের জীবন এবং কাজকে সুতোর ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া, নাকি একটা নুইসেন্সকে সহ্য করে নিজের কাজটুকু করে যাওয়া, কোনটা বেশি লাভজনক?'

হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করল। গলার স্কার্ফটা পেঁচিয়ে নিলাম। অনন্যা ঋজু হয়ে বসে আছেন। স্পষ্ট তাকিয়ে আছেন চোখের পলক না ফেলে। বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। দেখে মনে হচ্ছে মোমের মূর্তি। যার অন্তঃস্থল পর্যন্ত খুঁড়ে গেলে ও একফোঁটা রক্ত বেরোবে না।

'আপনার কাছে কি সবকিছুই লাভ-ক্ষতি দিয়ে বিচার হয়?'

'না। এখানে আপনি ভুল। আমি বিচার করছি যুক্তি দিয়ে। নাহলে যেখানে সবথেকে বেশি লাভ সেদিকে ছুটতাম। দেখতাম না তাতে ক্ষতির ঝুঁকি কতটা বেড়ে গেল। আমাকে ক্লাসে ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম পড়াতে হয়। এটুকু জানি, সবথেকে যুক্তিপূর্ণ অবস্থান কিছুতেই একজনকে মেরে ফেলা হতে পারে না। অমিতাভকে যে-ই মারুক না কেন, সে ইরর্যাশেনাল আর ইরর্যাশেনালিটি আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগে না।

'কিন্তু যদি এরকম ঘটে, মানে কিছু মনে করবেন না, আমি সম্ভাবনার কথা বলছি, যে দেখলেন অমিতাভকে খুন করেছেন আপনার স্বামীই?'

'আমাদের বিয়ের চল্লিশ বছর তো হতে চলল। আপনার কি মনে হয় সে সম্ভাবনা মাথায় কখনো আসেনি?' অনন্যা অরুণের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, অরুণ দেখলাম আলতোভাবে একটা আঙ্গুল দিয়ে অন্যমনস্কের মতো অনন্যাকে ছুঁয়ে আছেন। 'কিন্তু এই সমস্ত যা কিছু হতে পারে বা হতে পারত, এগুলো মেনে নিয়েই তো অরুণের সঙ্গে আছি। যেটা ঘটে গেছে তা অতীত, ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

এবার বেশ জোরে হেসে ফেললেন অনন্যা। 'হয়তো আপনাকে বোর করছি; আমাদের বয়েসে পৌঁছে কথা বলবার মানুষ বেশি পাওয়া যায় না। আমাদের মতো নিঃসন্তান দম্পতির তো আরোই নয়। তাই, যখন কাউকে দেখি, নিজের অজান্তে বকবক করে ফেলি। ছাত্র

পড়াতাম তো, তাই জ্ঞান দেবার অভ্যেসটা যায়নি। খারাপ অভ্যেস। আপনি বলুন। এখন থেকে আর একটা কথাও বলব না। ,

আমি হাসতে পারলাম না। ঠিক খারাপ লাগা নয়। অনন্যা চৌধুরী খারাপ লাগার মতো একটা কথাও বলেননি। কিন্তু কথাগুলো এতটাই অন্যরকম যে আমার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল স্বাভাবিক হতে। অস্বস্তি চাপা দেবার জন্য মাথা নামিয়ে হাতের কাগজপত্র ওলটাতে লাগলাম।

'পায়ের ছাপ নিয়ে জটিলতায় শেষ করেছিলাম। এখানে পরের জটিলতার শুরু। বাড়ির বারান্দার সামনে একজোড়া বুটের ছাপ। বাগান থেকে হেঁটে এসেছে। অনেকক্ষণ এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে আবার হেঁটে গেছে বাগানের দিকে। এই বুট না অরুণের, না অমিতাভর, না প্রশান্তর। তাহলে এক রহস্যময় চতুর্থ ব্যক্তির উপস্থিতির সম্ভাবনা জোরালো হয়ে ওঠে। তিনি কে?' লক্ষ করলাম, অরুণ এই প্রথম অস্বস্তিতে উসখুস করে উঠলেন। নাকি ভয়?

'তাহলে এ বাড়ির ঘটনার খটকাগুলো কী দাঁড়াল? যদি মিসেস বাসু সত্যি বলে থাকেন, তাহলে প্রশান্ত মিথ্যে বলছেন। গুলি বাগানে চলেছিল না ঘরের মধ্যে? আবার যদি প্রশান্ত গুরুং সত্যি বলে থাকেন, মানে অমিতাভ আসেননি, তাহলে বাগানে অমিতাভর রক্ত পাওয়া গেল কী করে? রাইফেলের ট্রিগারেই বা তাঁর আঙুলের ছাপ এল কিভাবে? আবার প্রশান্ত যদি মিথ্যে বলে থাকেন, মানে যদি সত্যিই অমিতাভ এসে থাকেন, তাহলে সেই বুলেটের সমস্যাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে। শুধু সেটাই না, যদি রাইফেল থেকে ছোঁড়া একটিমাত্র বুলেট মানবশরীরের স্পর্শ না পায়, তাহলে অমিতাভর মৃতদেহের বাম হাতে গেঁথে থাকা বুলেট এল কোন রাইফেল থেকে? বাগানের ধারেই বা মিলিটারি বুট পরে কে দাঁড়িয়েছিলেন? তিনিই কি অমিতাভর হত্যাকারী?

'এবার সেমেট্রির ভেতর, যেখানে অমিতাভর বডি পাওয়া গেছিল, সেখানকার খটকায় আসি। পোস্টমর্টেম বলছে, অমিতাভকে কাছ থেকে বুকে আর পেটে গুলি করা হয়েছিল, এবং অমিতাভের শরীরে ডিফেন্সিভ বা প্রতিরোধসূচক কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর সময়ে তাঁর হৃৎপিণ্ডের গতি ছিল স্বাভাবিক। তার মানে, আকস্মিক উত্তেজনার কারণ ঘটেনি। অর্থাৎ হত্যাকারী ঘনিষ্ঠ দূরত্বে দাঁড়িয়েছিলেন, অমিতাভ তাঁর হাতে বন্দুক দেখতে পাচ্ছিলেন, এবং তবুও তিনি শান্ত ছিলেন। হতে পারে যে তিনি বাধা দেবার সুযোগ পাননি। হয়তো আচমকা বন্দুক বার করে গুলি চালানো হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে মিসেস বাসুর বয়ান অনুযায়ী তার আগে অমিতাভর হাতে গুলি লেগেছিল। সেক্ষেত্রে অমিতাভ অনুত্তেজিত ছিলেন কেন? থাকতে পারেন, যদি হত্যাকারী তাঁর চেনা হয়। অথবা এমন কেউ হয়, যাঁর হাতে বন্দুক দেখে অমিতাভ অভ্যস্ত। এই রোলে একমাত্র ফিট করছেন অরুণ, যিনি তখন থানায় বসে।

'দ্বিতীয়ত, ব্যালিস্টিক বলছে অমিতাভর পেটে আর বুকে গুলি করা হয়েছিল রাইফেল দিয়ে নয়। পিস্তল দিয়ে। সেই মার্ডার ওয়েপন এখনও নিখোঁজ। কিন্তু হাতের গুলি এসেছিল অরুণের রাইফেল থেকে। রাইফেল নিয়ে ধাঁধার কথা আগেই বলেছি।

'তৃতীয়ত, অমিতাভ পড়েছিলেন উপুড় হয়ে। বুকে গুলি করলে তার ধাক্কায় মানুষ চিত হয়ে পড়ে। উপুড় হয়ে থাকার অর্থ হলো গুলি করার পর তাঁকে হত্যাকারী উপুড় করে দিয়েছিলেন। কেন?

চতুর্থত, এবং এটা আমার মতে সবথেকে ধাঁধালো জায়গা। পোস্টমর্টেমে অমিতাভর পেটে বেশ অনেকটা মদ পাওয়া গিয়েছিল। অরুণ মদ্যপান করেন না। অরুণের বাড়িতেও

কোথাও মদের চিহ্ন পায়নি পুলিশ। তাহলে অমিতাভ মদ খেলেন কী করে? তিনি কি মদ খেয়ে অরুণের বাড়িতে এসেছিলেন? নাকি অরুণের বাড়িতে বসে খাচ্ছিলেন? সেটা সম্ভব নয়, কারণ পোস্ট-মর্টেম অনুসারে অমিতাভ মারা গিয়েছেন রাত বারোটা থেকে ভোর ছ-টার মধ্যে। তার মানে, রাত সাড়ে নটার আগে অমিতাভ মদ খেতে পারেন না। এদিকে আমরা আগেই সিদ্ধান্তে এসেছি যে অমিতাভ সন্ধের সময়ে অরুণের বাড়িতে চলে এসেছেন। মিসেস বাসুও অমিতাভকে দেখেছেন রাত সাড়ে নটার সময়েই। তখন অমিতাভর হাত থেকে রক্ত পড়ছিল। জলাপাহাড় রোড থেকে নেমে সবথেকে কাছের শুঁড়িখানা অথবা মদের দোকানের দূরত্ব, ছুটে গেলেও বারো মিনিট। পুলিশ নিজে পরীক্ষা করে দেখেছিল। তাহলে অমিতাভ ন-টা বিয়াল্লিশের আগে মদ খেতে পারেন না। যদি না, তাঁর পকেটে মদের বোতল থাকে। কিন্তু হাতে গুলি লাগা অবস্থার একজন মদ খেয়ে ছুটতে ছুটতে পাহাড় থেকে নামছে, এই দৃশ্য আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার যদি দোকানের কথাই ধরি, আহত অমিতাভ ডাক্তার বা নিজের চেনা মানুষদের কাছে না গিয়ে মদের দোকানে গেলেন কেন? আর তখন প্রতিটা শুঁড়িখানাই লোকে গিজগিজ করছে। তাদের কেউ কি লক্ষ করল না তাঁর হাত থেকে রক্ত ঝরছে?

'তার মানে, অরুণের বাড়িতে অমিতাভ এলে, এবং গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ছুটে বেরিয়ে গেলে তাঁর পেটে মদ থাকার ব্যাখ্যা মেলে না। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় তিনি আদৌ অরুণের বাড়িতে আসেননি, অন্য কোথাও রাত্রিবেলা বসে মদ খাচ্ছিলেন। অর্থাৎ মিসেস বাসু মিথ্যে বলছেন। মানে আবারও ফিরে যেতে হচ্ছে কে সত্যি বলছেন আর কে মিথ্যে, সেই ধাঁধায়। প্রশান্ত, মিসেস বাসু, অরুণ কার বয়ান বিশ্বাস করব?

'পঞ্চমত, অমিতাভর ডান হাতের কবজিতে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল। লম্বা ছুরি অথবা ভোজালি দিয়ে জায়গাটা যেন কাটতে চেয়েছিল কেউ। সেই ক্ষত বাম হাতের রাইফেলের গুলির ক্ষতের আগে ঘটেছে না পরে, সেটার উত্তর মেলেনি। কিন্তু বুক ও মুখের ক্ষতের থেকে সে ক্ষত নিঃসন্দেহে পুরোনো। ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল কবজিতে। সেই ব্যান্ডেজের কাপড়ে রক্ত কতটা চুঁইয়ে ভেতরে ঢুকল, ফরেনসিকের মাধ্যমে সেটার পরীক্ষা করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল। কেন? এর সঙ্গে কি তাঁর হত্যার কোনো যোগ আছে?

'তার মানে, একটা গল্প পাচ্ছি, মূল গল্প একটাই, কিন্তু যার হাজারটা বিকল্প ছবি।

বিভিন্নজন তাদের নিজস্ব ভার্সন বলে যাচ্ছে। যা সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তারা পুরোপুরিভাবে কোনো ভার্সনের সঙ্গেই মিলছে না। আবার পুরোপুরিভাবে কোনো ভার্সনের সঙ্গে ডিসএগ্রিও করছে না। রশোমন সিনেমাটার মতো। সত্যিটা যে কী ছিল, সেটাই একসময়ে গিয়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।'

বিরতি নিয়ে আবার শুরু করলাম।

'এ ছাড়াও আমি নিজে বারবার পড়ে আরও কিছু ধাঁধার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু আজ আর সেগুলো বলছি না। যখন ফর্মালি প্রশ্ন করা শুরু করব, তার আগে আপনাকে লিখিত আকারে সব কটা প্রশ্ন দিয়ে যাব। যেগুলোর উত্তর পারেন, দিয়ে দেবেন প্লিজ। বা আপনার যদি কিছু অনুমান, থাকে। সেগুলোও।' শেষ কথাটা অরুণের দিকে তাকিয়ে বললাম।

'গত চুয়াল্লিশ বছর ধরে উত্তর দিতে দিতে আমি ক্লান্ত।' বললেন অরুণ।

অনন্যা উঠলেন, কফির কাপ বেসিনে রেখে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি এগুলো নিয়ে ভাবব। এক্ষুণি তো উত্তর দিতে পারব না। অন্তত একটা রাত দিন। তার পরেও উত্তর আসবে কি না জানি না। কিন্তু ভাবব।' তারপর অল্প হেসে বললেন, 'এখন হয়ত বলাই যায় এ কথা। আপনি আসুন, আমি চাইনি। অরুণকে বারণ করেছিলাম, আবার অতীত খুঁড়ে নিজেকে যন্ত্রণা দেবার অর্থ হয় না। কিন্তু যখন এসেছেনই, আমি চাইব সমাধান দিয়ে যান। অন্তত একটা গল্প দিন, যেটায় কোনো জীবিতপক্ষ আঘাত না পায়।

'সমাধান দেওয়া আমার কাজ নয়। কিন্তু আপনি চাইছেন একটা আখ্যান, যেখানে

আপনার স্বামী নিরপরাধ প্রমাণিত হন। সেটাও তো আমার হাতে নেই। আমি তো গল্প বানাতে পারব না।'

'নাহ, বানাবেনই বা কেন! আমি বলতে চাইছি, '৭৫ সালে যে ছেলেটা পুলিশ আর সমাজের চাপ সামলেছিল, ২০১৯-এ এসে সে হয়ত আর অতটা মানসিকভাবে দৃঢ় নেই। আপনার সমাধান তাকে যেন গুঁড়িয়ে না দেয়, সেটা চাওয়া আমার দিক থেকে অন্তত খুব অযৌক্তিক নয়।'

অনন্যা চলে যাবার পরে অরুণ নীরবে বসে ছিলেন। ওই সমাহিত চেহারার মধ্যে কীরকম ঝড় বয়ে চলেছে চুয়াল্লিশ বছর ধরে, সেটা বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। হাই পাওয়ারের চশমার কাচের আড়ালে নিমীলিত চোখ দুটো আপাতত দেখা যাচ্ছে না। ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

'আজ উঠি। কালকের জন্য কিছু কাজ গুছিয়ে নিতে হবে।

অরুণের চটকা ভাঙল। ভুরু সামান্য ওপরে তুলে বললেন, 'তাহলে আপনি অমিতাভর লেখাটা পড়বেন?'

'এই পাণ্ডুলিপি কোথা থেকে পেলেন?'

'পুলিশ দিয়েছিল।'

'পুলিশ?'

'অমিতাভর ঘর থেকে তার লেখা শেষ উপন্যাস পেয়েছিল পুলিশ। সেটা আবার রহস্যকাহিনী। পড়তে গিয়ে শুরুতে মনে হয়েছিল যে ও কোথাও আমি হয়ে উঠতে চাইছিল। পুলিশ যখন আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেয়, তখন এই পাণ্ডুলিপিটা আমি উকিলকে দিয়ে চেয়ে আনিয়েছিলাম। তাতেও কম সমস্যা হয়নি। নানা সরকারি বাধাবিপত্তি পেরিয়ে প্রায় এক বছর সময় লেগেছিল হাতে পেতে। ততদিন পুলিশ এই কেসে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তাই আর ঝামেলা করেনি। এটা চেয়েছিলাম, কারণ জানতে চাইছিলাম অমিতাভ ঠিক কীরকম লেখার দিকে এগোতে চাইছিল। কী ভাবছিল মৃত্যুর আগের দিনগুলোতে। অনেকদিন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু ওর সংকল্প, ওর মেধা, ওর গোটা অস্তিত্বটাই এত তীব্র ছিল যে আমি বিচ্ছেদের পরেও না অস্বীকার করতে পেরেছি ওকে, না ওর মৃত্যুকে।'

'ওকে জানতে চাইছিলেন, এদিকে ওকেই আপনি খুন করলেন?'

অরুণ উত্তর দিলেন না।

অমিতাভ রহস্য উপন্যাস লিখতে গেলেন কেন?'

'জানি না। প্রথমে ভেবেছিলাম পাগলের খেয়াল। অথবা হয়ত দেখিয়ে দিতে চায় যে আমার থেকে কম যায় না কোনো ফিল্ডেই। কিন্তু পরে বুঝেছি, এই লেখার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল।'

'কী উদ্দেশ্য? আর এটা পড়ে আমার কী লাভ হবে?'

'পড়লে বুঝতে পারবেন। অমিতাভর হত্যার সঙ্গে আমি কোথাও গিয়ে একটা মিল পেয়েছিলাম। যেন সে দেখতে পেয়েছিল কীভাবে সে নিহত হবে। কিন্তু লেখাটা শেষ করে যেতে পারেনি। সমাধানটুকু খুঁজে বার করবার দায়িত্ব আপনার।' অরুণ টেবিলের উপর থেকে দ্বিতীয় ফাইলটা হাতে নিলেন। 'এটা আসল পাণ্ডুলিপি। অমিতাভর হাতের লেখায়। আমি এটাকে বাংলায় টাইপ করিয়ে কয়েকটা কপি বানিয়েছি।'

আরেকটা ছোটো ফোল্ডার এগিয়ে দিলেন অরুণ, 'এখানে আছে অমিতাভর কিছু চিঠিপত্র। পার্থপ্রতিম, অরুণেশদা, সঞ্জয় অধিকারী আরও নানা জনকে লেখা চিঠি। অনেকদিন ধরে অল্প অল্প করে এদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। অমিতাভর কিছু কাটাছেঁড়া লেখাও আছে। যেগুলো শেষ করেনি। হয়ত আপনার কাজে লাগতে পারে। তবে অরিজিনালগুলোর অবস্থা খারাপ। আপনাকে টাইপ করা কপিই দিতে পারব।'

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে পাতা ওলটালাম। হলুদ, কিছুটা জীর্ণ পাতা। সম্ভবত কোনো রাসায়নিক দিয়ে সংরক্ষণ করেছিলেন অরুণ। না হলে এতদিনে পাতা ঝুরঝুর করে ভেঙে যেতে পারত। পাণ্ডুলিপির ভেতর ছোটো ছোটো অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখা। অজস্র কাটাকুটি। মাঝে মাঝে মার্জিনে এলোমেলো ফুল পাতা মানুষের মুখের আঁকিবুকি। প্রথম পাতায় বড়ো হরফে লেখা, অমিতাভ মিত্র। কিন্তু উপন্যাসের নাম নেই।

'মৃত্যুর আগে অমিতাভ মিত্র একটা রহস্য উপন্যাস লিখছিলেন, এটাই একটা খবর। এতদিন যদি অপেক্ষাই করলেন, আর দুই মাস করে যান? এই উপন্যাসের খবরটা আমিই ব্রেক করি সবার আগে? স্টোরিটার সঙ্গে ডেট মিলিয়ে?' বললাম আমি।

অরুণ কিছু বললেন না। কিন্তু মুখ দেখে বুঝলাম, অরাজি নন ৷

'একটা প্রশ্ন আছে। আমি যে সমাধানই বার করি না কেন, সেটা যে সঠিক সমাধান, আপনি জানছেন কী করে?'

'আমি তো... জানি, বাস্তবে অমিতাভ কী করে খুন হয়েছিল। তাই এটাও জানব, গল্পের কোন সমাধান বাস্তবের সবথেকে কাছাকাছি।' আবার সেই গভীর দৃষ্টি, এবং আবারও কপালের কাছে চুল এসে পড়া।

'আপনি আমাকে সোজাসুজি কেন বলছেন না মিস্টার চৌধুরী?

'বললে বিশ্বাস করবেন না। তাই বলছি না। আমি কারণ ছাড়া কাউকে কোনো অনুরোধ করি না টিনা। পাণ্ডুলিপিটা পড়লে আপনারই লাভ হবে।'

হাল ছেড়ে দিলাম। ফাইল ব্যাগে ঢুকিয়ে বাইরে বেরোতে যাব, পেছন থেকে অরুণ ডাকলেন, 'টিনা।'

পেছন ফিরলাম।

'আপনি ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট পড়েছেন?

'পড়েছি।'

'অপরাধ না শাস্তি, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলতে পারেন? নাকি দুটোই আসলে এক?'

'কেন এই প্রশ্ন করছেন?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

অরুণ শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হয়তো উত্তর দেবার দরকার ছিল না ৷

নিশীথ,

০৯/০১/১৯৭১ স্পষ্ট করে জেনে রাখ, অমিতাভ মিত্তির ভালো থাকলে ভালো, খারাপ হলে শুওরের বাচ্চা! অর্জুন চট্টোপাধ্যায় কে? কত বড়ো কবি? অরুণকে গিয়ে বলেছে যে আমি নেশা করছি, টাকা ধার করছি? আর বলেছে নাকি বন্ধুকৃত্য! ওই বন্ধুকৃত্যের মুখে আমি পেচ্ছাপ করে দি শালা! চাই না তোদের টাকা। চেয়েছি কোনোদিন, বলেছি আমাকে দাও বাবা, টাকাটা দাও? অরুণ এখন আমাকে চমকাবে দিনরাত, গালাগালি দেবে, ঠেক থেকে জোর করে তুলে আনবে। একবার বলেছে রিহ্যাবে পাঠাবে। ইয়ার্কি হচ্ছে বানচোদ? আমার নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু নেই নাকি? এবার কলকাতায় গিয়ে অর্জুনকে মারব, প্রচণ্ড মারব নিশীথ! ওর দুটো রিব ভাঙবই। তুই তো অর্জুনের বন্ধু। ওকে বলে দিবি, এপ্রিল মাসে অমিতাভ আসছে, ওকে মারবে!

শোন, টাকা দিতে হবে না। অমিতাভ মিত্তির টাকা সম্মান পুরস্কারের ওপর মুতে দেয়। ডিলান টমাস আর ম্যাথু আর্নল্ডের দুটো বই ছিল, কলেজ লাইব্রেরি থেকে ঝাড়া। বেচে দিয়েছি। দার্জিলিঙ শহরে এসব বইয়ের কদর আছে এখনও। কলকাতার মতো আনপড় না। আজ থেকে তোদের সঙ্গে সব সম্পর্ক খতম, বুঝলি? খতম।

আর শোন, কলেজ স্ট্রিট বাজারের উল্টোদিকে যে বাড়িটার দোতলায় তুই বসিস, কাজফাজের জন্য যাস, সেটা আমি চিনে নেব ঠিক। আমি আসব, তুই আমাকে নিয়ে মার্কেটের ভেতর যে ফিসফ্রাইটার দোকান আছে, ওখানে যাবি। আমার খুব খিদে পাবে সারারাত ট্রেন জার্নিতে, বুঝলি? খাওয়াবি পেট ভরে। ওখানে প্ল্যান করব, অর্জুনকে কীভাবে কোথায় মারব। আর রণজিতের কবিতা পড়লাম। আমাদের লাজুক কবিতা, তুমি ফুটপাতে শুয়ে থাকো/ কিছুকাল, তোমার লাজুক পেটে লাথি মেরে হেঁটে যাক বাজারের থলি হাতে বিষণ্ণ মানুষ— এসব লাইন আর কয়েকটা লিখলে ও অমর হয়ে যাবে শালা, অমর! ঈশ্বর ওর গেটে কুকুরের মতো বাঁধা থাকবে আর লেজ নাড়বে। তোর কবিতার মধ্যে আবার অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। কাব্যভাষা নির্গত হচ্ছে মনের অজ্ঞাত কোণ থেকে, এই অঞ্চলের উপর স্বয়ং কবিরও পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তোর যে নীচু তারে বাঁধা গভীরতার কণ্ঠস্বর, সেটা আগে তুই নিজে শুনেছিস, পরে শুনিয়েছিস অপরকে, তৈজসেরও দেখা পাইনি যেমন লিখেছিস, আর এটা করতে গিয়ে তোকে কোনো সঙেঘর শরণ নিতে হয়নি, শুধু চৈতন্যের উদ্ভাসের অপেক্ষা করতে হয়েছে, অদ্ভুত নিশীথ, অদ্ভুত! তোর বই তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। তুই পার্থর বইয়ের প্রকাশ করছিস খুব ভালো, কিন্তু নিজের বই করছিস না কেন? পার্থ ছাড়া আমাদের সময়ের এত অন্যরকম তুই ছাড়া কেউ নেই রে! মাইরি বলছি। কিন্তু অর্জুনকে মারবই। অরুণকেও মারব, কিন্তু পরে। ও শালার গায়ে সাংঘাতিক জোর। কয়েকদিন অগে খাবড়া মেরেছিল একটা এখনও বাঁ কানের নীচে কনকনাচ্ছে।

অনেকগুলো কবিতা লেখা হল গত এক মাসে। দুটো পাঠালাম, কোথাও বার করে দে। নিত্যদা মাথা খেয়ে ফেলছে, গুচ্ছকবিতার একটা কালেকশনের জন্য। নর্থ বেঙ্গল আয়, ওর বাড়িতে তোকে নিয়ে যাব, কী অসামান্য সিম্পল থেকে চাঁদের কাছাকাছি ওরকম কবিতা লিখতে পারে একটা মানুষ, ভাবতে পারবি না।

—অমিতাভ

কিছু টাকা পাঠাতে পারবি? দে না! পাইন মারা যাচ্ছে। টিউশনিটা ও ছাড়িয়ে দিয়েছে শালারা। অরুণের টাকাটা যে কীভাবে খরচা হল, বুঝতেই পারলাম না। এখন আবার চাইতে গেলেই ধরে রিহ্যাব নিয়ে যাবে।

০৩/০২/১৯৭১

অরুণেশদা,

চারটে কবিতা আপাতত পাঠালাম। এর পরেও নিয়মিত পাঠাব, নিশ্চয়। কিন্তু শরীর ভালো যাচ্ছে না। পেটের ডানদিকে একটা ক্রনিক পেন সারাক্ষণ। যাই হোক, পত্রিকার নামের বিষয়ে আগের চিঠিতে লিখিনি কিছু। ভুলে গিয়েছিলাম। নামটা রোমাঞ্চকর, 'জিরাফ'। কেন এই নাম, জানি না, তবে মনে করে নিয়েছি যে জিরাফের গলার মতোই তুমি নিঃসঙ্গ, সবার থেকে উঁচুতে এসব হাবিজাবি। থাকগে এসব। আগের সংখ্যা সবে হাতে এসেছে, এখনও পড়িনি। আমি লিখতে চাইছি, অরুনেশদা। দৈনন্দিন বাস্তবের রুক্ষতা থাকুক, ওটুকু পেরিয়ে আমার কবিতা আসুক অন্য বাস্তবে, বাস্তবোত্তর বাস্তব, অথবা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু বাইরের ঔজ্জ্বল্য, চালাকি, স্মার্টনেস ফিকে করে দিয়ে অন্তর্গত রক্তক্ষরণে শুদ্ধ হয়ে উঠবে সত্ত্বার গহন, মন কেমন করা বাতাস বইবে চরাচর জুড়ে, আর পড়ে থাকবে ভেতরের স্পন্দন, উচ্চারিত শব্দের ফাঁকে ঝিঁকিয়ে ওঠা অন্ধকার, এটুকু ছাড়া চাইবার কী আছে আমাদের। অমিতাভ গুপ্ত এরকম কবিতা লিখছে আজকাল, তুমি তো জানোই ওর কথা। আমিই এ পর্যন্ত চিনলাম না, কলকাতায় যেতে পারলে পাক্কা ধরে বেঁধে আলাপ করতাম। বলতাম, কী ভাবে লিখতে পারিস এসব শালা—তোমার উপেক্ষা দিয়ে আমাকে চিনিয়ে গেলে নীলিমায় নক্ষত্রের মন কীভাবে হারিয়ে থাকে। হার্মাদবাতাসে যেন চতুর্দিকে খুলে যায়।

সমস্ত দুয়ার। সমস্ত বন্দী আজ মুক্ত হয়ে বিশাল প্রান্তরে ছুটে আসে অবিশ্রাম ঝড় প্রেক্ষাপট তুচ্ছ করে। এসব হল ভূতে পাওয়া লেখা। আমি তোমাকে বলছি অরুণেশদা এই ১৯৭০-এ এই যে দুটো বই বেরল, একটা পার্থর আরেকটা অমিতাভর, গোটা দশকটা, এদের দুজনকে দিয়ে চিহ্নিত হবে। মিলিয়ে নিও আমার কথা।

আমি কি এদের তুলনায় খারাপ লিখি? আজকাল সন্দেহ হয়। মনে হয়, আমি আর বেশিদিন লিখব না। হয়ত আঙুল প্যারালিসিস হয়ে যাবে, অথবা একদিন সকালে উঠে দেখব সব ভুলে গিয়েছি, আর ভুলে যে গিয়েছি সেটুকু বোধও নেই। ভালো লাগে না, কুচবিহারে তোমার বাড়ি গিয়ে দুদিন থেকে আসব? তাড়িয়ে দেবে না তো? লেবু লংকা আর পেঁয়াজ দিয়ে চোলাই খাওয়াবে? সঙ্গে আদার কুচি আর বিটনুন? যদি লিখতে ভুলে যাই, যদি স্ট্রোক হয়, তবুও আমাকে খাওয়াবে তো, অরুণেশদা?

—অমিতাভ

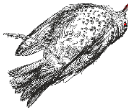

পূর্ণতার ফোঁটা ফোঁটা অন্ধকার সান্দ্র সানুদেশে ঝড়ে পড়ে
রাত্রি তিনপ্রহরে ডাকে মৃত্যুকাক

—তুষার চৌধুরী

অমিতাভর উপন্যাস

প্রিয় শুদ্ধসত্ত্ববাবু,

মৃত্যু নিশ্চিত আসিবেই, আজ অথবা কাল; সেটা জানিবার পরেও মানুষ নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করে। সেটিই বোধ করি জগতের সবথেকে বড়ো আশ্চর্য। অবগত আছি যে আমি খুন হইব, এবং শীঘ্র। কিন্তু তবুও অবিচলিত চিত্তে আপনাকে এ পত্র লিখিতেছি। আমার একদা সুহৃদ আনিসুর রহমান আমাকে খুন করিবেন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব নিজেকে বাঁচাইতে। কিন্তু আপনাকে এই পত্র প্রেরণের উদ্দেশ্য আতঙ্ক নহে। আমি চাই, মৃত্যুর পূর্বে অন্তত আপনাকে আমার জীবনের গোপন সত্যটি বলিয়া যাইতে। আমার মৃত্যু ঘটিলে অপরাধী যেন ধরা পড়ে। আনিসুর তাহার অপরাধের শাস্তি পায়। আপনি ভাবিতেই পারেন, পুলিশের নিকট কেন যাইলাম না। যাইলাম না, কারণ তাহাতে লাভ নাই। তাহারা এ কাহিনী বিশ্বাস করিবে না। এই কাহিনী এতই চমকপ্রদ যে, নিতান্ত ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য খাকি উর্দি ধারণ করিতে হয় যাহাদের, তাহারা হজম করিতে পারিবে না। একমাত্র আপনি, আপনিই পারেন আমার কাহিনীর মূল্য বিষয়ে অবগত হইতে। বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর শুদ্ধসত্ত্ব সান্যালকে এই পত্র আমি প্রেরণ করিব না। প্রেরণ করিব জটিল জীবনরহস্যের প্রাজ্ঞ অনুসন্ধানী শুদ্ধসত্ত্ব সান্যালকে, এরূপও সম্যক সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। আমার ঠিকানা খামের উপরেই পাইবেন। কিন্তু আপনাকে এই স্থানে আগমনের অনুরোধ করিব না। জানি আপনি ব্যস্ত মানুষ। আমি এই পত্র প্রেরণ করিবার দুইদিন পর, মানে আগামী উনিশে জ্যৈষ্ঠ, অর্থাৎ তেসরা জুন, দ্বিপ্রহর দুই ঘটিকায় আপনার লেক মার্কেট সন্নিহিত গৃহে আসিব। প্রত্যাশামতো এইপত্র তন্মধ্যে আপনার নিকট পঁহুছিবে। যদি আপনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন অথবা গৃহে অনুপস্থিত থাকেন, তাহাতেও অসুবিধা নাই। একটি পত্রভরতি খাম রাখিয়া আসিব, যাহার মধ্যে থাকিবে আমার স্বীকারোক্তি। আমি খুন হইবার পর সেই স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করিয়া আপনি যাহা উচিত মনে করিবেন, সেটিই করিবেন। আপনার বিচারবুদ্ধির উপর আমার পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান। শুধু এটুকু স্মরণে রাখিবেন যে, মাধব রক্ষিত আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। মাধব রক্ষিতই, অপর কেহ নহে।

ভবদীয়
মাধব রক্ষিত
তাং: ০১/০৬/১৯৭৫

চিঠিটা উলটে পালটে দেখে ধনুক হয়ে গেল শুদ্ধসত্ত্বর ভুরু। মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে চিঠি ধরিয়ে দিল প্রণবেশের হাতে। 'আজ ২ তারিখ। সকালের ডাক এখনও আসেনি। মানে কাল এসেছে চিঠিটা, রাত্রে। আজব তো।'

আজবের কী দেখলে আবার!'

‘মাধব রক্ষিত? নামটা শোনা শোনা লাগছে না?’

‘আমি যাকে ভাবছি, সে যদি হয়, তাহলে তো... সে বড়ো ব্যবসায়ী। সামনের ভোটে শুনছি টিকিট পাবে।'

‘ওহ্ সেই জন্যেই শোনা লাগছিল। তবে চিনি না, বলাই বাহুল্য।' অলস ঔদাসীন্যে হাই তুলল শুদ্ধসত্ত্ব। ‘রাজনীতির মতো একঘেয়ে আর কিছু হয় না। তা ইনি কোন্ দল হে? ডান, না বাম?’

‘ইনি সব দলের হাতেই তামাক খেয়েছেন। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, জনসংঘ ঘুরে এসে এখন সম্ভবত গাইবাছুরের ল্যাজ ধরে বৈতরণী পার হবার চেষ্টায়, কিন্তু', প্রণবেশের মুখ চিন্তিত, ‘ইনিই কি সেই মাধব রক্ষিত?’

‘সেটা জানা কঠিন নয়। বরানগরের ঠিকানা দেখছি। টেলিফোন ডায়রেক্টরি থেকে খামের ঠিকানা মিলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে। আপাতত ভাবাচ্ছে চিঠির শেষ দুটো বাক্য।' নিবিষ্ট চোখের উপর চিঠি তুলে ধরেছে শুদ্ধসত্ত্ব।

‘কেন?’

‘মাধব রক্ষিতই আমার সাহায্য চেয়েছে, অন্য কেউ নয়, এর অর্থ কী? অপর কারও সাহায্য চাইবার কথা ছিল নাকি?' শুদ্ধসত্ত্ব পাঞ্জাবির পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে একটিপ টেনে নিয়েছে এই ফাঁকে। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

‘চিঠি গোলমেলে মানছি। কিন্তু তোমার কাছে এরকম চিঠি নিত্যই আসে। সান্যালবাবু আমাকে বাঁচান আমি খুন হয়ে যাচ্ছি। সান্যালবাবু আমি আজ আমার স্ত্রীকে হত্যা করব। পারলে ঠেকান, চ্যালেঞ্জ করছি। মিস্টার সান্যাল, আমার বাড়ির লুকানো গুপ্তধন খুঁজে বার করে দিলে তার অর্ধেক আপনার। বেশিরভাগই ফালতু। নিষ্ফল আস্ফালন। আজ এই চিঠি তোমার চোখ টানছে কেন?

ঝিম আসছে শুদ্ধসত্ত্বর। নস্যির ঝাঁঝে থম বসে থাকার পর রক্তাভ চোখ মেলল সে, ‘একটা সিগারেট দাও হে! বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগবে।'

ব্যাজার মুখে চারমিনারের প্যাকেট বার করল প্রণবেশ, ‘এই নিয়ে এগারো হাজার তিনশো সাতান্নখানা ধার নিলে। হিসেব থাকছে সব।’

পাত্তা না দেবার ভঙ্গিতে সিগারেটে আগুন জ্বালিয়ে শুদ্ধসত্ত্ব বলল, ‘ব্যাপারটার মধ্যে আজব কিছু লাগছে না তোমার? ‘

চিঠি উলটে পালটে দেখে নিয়ে ঠোঁট ওলটাল প্রণবেশ, ‘বাংলায় টাইপ করা চিঠি। এরকম তো কতই হয়। নাহ, মনে হচ্ছে রজ্জুতে সর্পভ্রমই ঘটছে তোমার।’

‘আর কিছু দেখলে না? '

‘আর কী?’

‘খামের ওপর স্ট্যাম্প নেই। খেয়াল করে দেখো।'

এবার প্রণবেশ সচকিত হলো। খাম হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, ‘আশ্চর্য!’

আশ্চর্যের কিছু নেই। ডাকবিভাগের ভরসায় না থেকে গতকাল নিজের হাতে আমার পোস্টবাক্সে ফেলে দিয়ে গেছে। প্রশ্নটা হলো, শুদ্ধসত্ত্ব ঠোঁট গোল করে ধোঁয়ার রিং ছাড়ল কয়েকটা, ‘যে লোক হাতে না লিখে, চিঠি টাইপ করবার মতো সময়সাপেক্ষ কাজ করতে পারে, সে চিঠি পোস্ট করবার সময়ে তাড়াহুড়ো করে নিজের হাতে দিয়ে গেল কেন? আর দিয়েই যদি গেল, সশরীরে সাক্ষাৎ কেন করল না? কেন ৩ তারিখের ভরসায় বসে থাকলো? আবার আশা করছে যে ৩ তারিখের মধ্যে এই চিঠি আমার কাছে চলে আসবে। আশা করবার অর্থ, ডাকবিভাগ তাদের প্রবাদপ্রতিম অকর্মণ্যতার সাক্ষ্য দেবে না। তার মানে, লেখার সময়ে ভেবেছিল যে চিঠি ডাকেই ফেলবে।'

‘হুঁ, ৩ তারিখ দেখা করতে আসতে চেয়ে ১ তারিখ চিঠি পাঠাবে, এটাও কেমন না?'

‘লালমুখো জেন্টলম্যান হে! চিঠি লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখা করতে আসেন। কিন্তু লেখা শেষ হবার পর কী এমন ঘটল যে মত পরিবর্তন করতে হলো?' ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে

এলোমেলো আঙুল চালাল শুদ্ধ। 'এটা ঠিক সাধারণ চিঠি নয়। কিছু একটা আছে।'

'চিঠিটার ওপরে দেখো, কালির কয়েকটা হালকা ফোঁটা পড়েছে। আবার কাগজটাও বেশ পুরোনো। অন্য পাতায় হিজিবিজি আঁচড়। ত্রিভুজ, জিগজ্যাগ, বৃত্ত, তারপর সব কেটে দিয়েছে। কী মনে হয়?

শুদ্ধ থম মেরে আছে। সিগারেটে টান দিচ্ছে। প্রণবেশ জবাব না পেয়ে অধৈর্য হল, 'কী হলো? কথা বলছ না যে?'

'আমাকে দেখে কী মনে হয়? শার্লক হোমস? চিঠির পেছনে ত্রিভুজ দেখে অপরাধীর খুড়শ্বশুরের বয়স অনুমান করে ফেলব? ওভাবে ডিটেকশন হয় না।'

'হয় না মানে? হোমসকে অনুসরণ করে ব্রিটিশ পুলিশ তাদের ডিটেকশন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করেছিল এটা জানো না? '

'ব্রিটিশ পুলিশ গাধা, তাই করেছিল। একটা কোকেনখোরের কথাকে একমাত্র ওয়াটসনের মতো নির্বোধ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করে? একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে, তার ছড়ি ঘোরানোর ধরণ আর খুঁড়িয়ে হাঁটা দেখে হোমস বলে দিল যে, লোকটা নাকি মিলিটারিতে ছিল আর যুদ্ধে আহত হয়েছে। অথচ তার থেকেও সহজ আর একটা সমাধান ছিল— লোকটা ওভাবেই ছড়ি ঘোরায়, আর জন্ম থেকে তার পায়ে খুঁত। কিন্তু সেটা বললে তো আর কাপ্তেনি ফলাতে পারবে না। হোমসকে তো ওয়াটসনের কাছে নিজেকে হিরো প্রমাণ করতে হবে। তাই সবথেকে কঠিন সমাধানটা দিয়েছে। ওয়াটসনও বোকামির বিশ্বরেকর্ড করবার মনস্থির করেছে বলে এই সব গাঁজাখুরিকে ধ্রুব সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। আমি শুধু ভাবছি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে লেস্ট্রেডরা ওয়াটসনকে নিয়ে কী পরিমাণ রসিকতা করত নিজেদের মধ্যে। কত বড়ো গাধা হলে একটা পাগল-ছাগলের কথাকে কেউ এরকম গুরুত্ব দেয়। আচ্ছা, ওয়াটসন কি ঘোড়ার ডাক্তার ছিল? ডয়েল সাহেব কিছু লিখে গেছেন? মানুষের ডাক্তারের ব্রেন এরকম নকুলদানার আয়তনের হয় কী করে? প্রণবেশ নিজেও ডাক্তার। তাই অপমানটা চামড়ার জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু মুখ খুললে আরও অপমান জুটবে বলে কিছু না বলে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করল।

'আরে বাবা, শুদ্ধসত্ত্ব সিগারেটে একটা টান মেরে সামনে ঝুঁকেছে, 'কাগজের ওপর কালির ফোঁটা কেন, তার সবথেকে সহজ উত্তর যেটা, সেটাই হবে! কাছেপিঠে কেউ একজন কলমের কালি ঝেড়েছিল। আর পেছনে হিজিবিজি কেন, কারণ অন্যমনস্কভাবে মাধব রক্ষিত আঁকিবুকি কেটেছেন। সবথেকে সহজ সমাধানটুকু বাদ দিয়ে কঠিনের পেছনে দৌড়লে কি গোয়েন্দার মান বাড়ে? তোমাদের কি ধারণা, সব খুনিরাই আইনস্টাইনের সমান মেধাবী হয়? এমনভাবে খুন করে, যাতে ধরা অসম্ভব হয়ে ওঠে? তোমাকে বলছি শোনো, নিরানব্বই শতাংশ খুন হয় ঝোঁকের মাথায়। অগোছালো ভাবে। কারণ খুন করে আততায়ী পালাবার ধান্দায় থাকে। সে সূত্র মুছবে, হাতের ছাপ ঢাকবে, পুলিশকে ফলস্ ক্লু দেবে, এসব ওই তোমার ডয়েল সাহেবের গল্পে হয়। আর কী যেন সব থিওরি আছে না, অপরাধী ক্রাইম স্পটে ফিরে ফিরে আসে? এর থেকে বড়ো ধাপ্পা আর কিছুতে নেই, শুনে রাখো। বেশিরভাগ মানুষ যারা খুন করেছে, তারা তাদের জীবনে প্রথমবার এরকম কাণ্ড ঘটিয়েছে। আর খুন করে এত ভয় পেয়ে গেছে যে এদের প্রথম ইন্সটিংক্টই হয় যত দূরে সম্ভব পালিয়ে যাওয়া। পুলিশ তাই এরকম ঘটনায় সবার আগে রেলস্টেশনগুলোতে নজরদারি বসায়। আরে বাবা তুমি যে রেশনের দোকানের আটা খাও, খুনিও সেই রেশনের আটাই খায়। সে এত বুদ্ধিমান, আর তুমি এত বোকা, এরকম হয় নাকি?' একটানা অনেকটা কথা বলে শুদ্ধ আবার ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে চোখ বুজল।

একতলায় প্রশস্ত ঘরটায় মরে আসছে দুপুরের আলো। পচা গরমে অস্থির লাগছে। ঘুম আসছে প্রণবেশের। সে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে চিঠিটা নিয়ে কী করবে?'

'আপাতত কিছুই করব না। মাধব রক্ষিত কাল আসুন। তারপর যা হয় হবে।'

'মাধব রক্ষিতকে ফোন করা যায় না? ঠিকানা তো দেওয়াই আছে।'

'বেশি কৌতূহল দেখানো হয়ে যাবে হে। ভাববে, আমরা কেস নিতে উদগ্রীব। পর্বত মহম্মদের কাছে যাবে না। মহম্মদকেই পর্বতের কাছে আসতে হবে।' চোখ বুজেই উত্তর দিচ্ছে শুদ্ধসত্ত্ব। প্রণবেশ জানে, শুদ্ধ এখন ঘণ্টাখানেক চোখ খুলবে না, মড়ার মতো শুয়ে থাকবে। লোকে ভাববে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু শুদ্ধ এই সময়টায় ভাববে। প্রণবেশকে একবার বলেছিল, হাতে কোনো কেস না থাকলে সে অর্থহীন আকাশপাতাল চিন্তা করে। প্রতিদিন নিয়ম করে, মগজে শান দেবার জন্য প্র্যাকটিস। প্রণবেশকে সন্ধেবেলা বাড়ির নীচে চেম্বারে বসতে হবে। তার ওপর শুদ্ধসত্ত্বর মতো একা মানুষ সে নয়। লতিকা গড়িয়াহাটের বাজার থেকে রংবাহারি পর্দা কিনে আনবার নির্দেশ দিয়েছে। ভুলে গেলে দক্ষযজ্ঞ বাধবে।

কিন্তু পরদিন নির্ধারিত সময়ে মাধব রক্ষিত এলেন না। শুদ্ধসত্ত্ব টুকটাক কথার মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। প্রণবেশ বুঝতে পারছে, শুদ্ধ মন থেকে অদ্ভুত চিঠির কথা কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। অবশেষে দুপুর তিনটে নাগাদ আর থাকতে না পেরে শুদ্ধসত্ত্ব বলল, 'মাধব রক্ষিতের টেলিফোনে একটা ফোন করে দেখো তো!'

ডায়রেক্টরিতে ঠিকানা মিলিয়ে ফোন করল প্রণবেশ। 'হ্যালো, এটা কি মাধববাবুর বাড়ি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে শিল্পপতি মাধব রক্ষিত? আচ্ছা, মাধববাবুকে ফোন দেওয়া যাবে? বলুন, শুদ্ধসত্ত্ব সান্যালকে তিনি যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন, সেই ব্যাপারে কথা আছে। হ্যাঁ এটুকু বললেই হবে। কী? সে কী, কেন? আচ্ছা, ধরছি। আপনি জানান।

ফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে ফিসফিস করে প্রণবেশ বলল, 'ব্যবসায়ী মাধব রক্ষিতই। কিন্তু বাড়িতে পুলিশ এসেছে, তাই ব্যস্ত।'

'পুলিশ? কেন? মাধববাবু কি এর মধ্যেই....'

'না না! মাধববাবুর সেক্রেটারি ফোন ধরেছে। দাঁড়াও। হ্যাঁ বলুন। কে, মাধববাবু? এক মিনিট ধরুন একটু।' ফোনের রিসিভার শুদ্ধর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে প্রণবেশ। শুদ্ধ একটুক্ষণ কথা বলল। ভুরুতে চিন্তার ছাপ। বলছে, 'আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।' ফোন রেখে প্রণবেশকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গাড়িটা আছে তো?'

'তা আছে। কিন্তু যাব কোথায়? মাধববাবুর বাড়ি?'

'না। ধর্মতলা। জুপিটার নামের একটি হোটেল। খুন হয়েছে।'

'কে খুন হলো?'

'আনিসুর রহমান।'

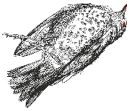

ডেকার্স লেনের এঁদো গলির মধ্যে হোটেল জুপিটার। সংকীর্ণ পথের দুই পাশে বাড়ির দল ঘেষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে, যাদের অধিকাংশ জুপিটারের মতোই ওঁচা ও অপরিচ্ছন্ন। গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না, এতটা সরু গলি। হোটেলের সিঁড়ির নীচে একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার পেতে ম্যানেজারের টেবিল বানানো হয়েছে। দিনমানেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। আপাতত সেখানে পুলিশের ভিড়। তালতলা থানার ওসি বিমল সমাদ্দার এগিয়ে এলেন। তিনি শুদ্ধসত্ত্বর চেনা। 'আমি মাধব বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনি যখন ফোন করেছিলেন তখন ওখানেই ছিলাম। কী বলব মশায়, এমন অদ্ভুত খুন বাপের জন্মে দেখিনি।

'অদ্ভুত কেন?'

'আরে মশায় বন্ধ ঘরের মধ্যে খুন! ভেতর থেকে ছিটকিনি তোলা। জানালা বন্ধ। ঘরের মধ্যে অন্য কোনো গুপ্তপথ বা গলিপথ নেই। ওই কারণেই বডি আবিষ্কার হতে সময় লেগেছিল। হোটেলের ঠিকে ঝি ঘর পরিষ্কার করতে এসে দুইদিন দরজা বন্ধ দেখে ফিরে গেছে। আজ পচা গন্ধ পাওয়ায় তার সন্দেহ হয়। জানায় ম্যানেজারকে। ডাকাডাকি করলেও যখন কেউ দরজা খোলে না, ভাঙতে হলো। দরজা ভেঙে বডি দেখতে পায় সকলে। গরমে পচতে শুরু করছে।'

'আত্মহত্যা?'

'চারতলায় চলুন। ঘর দেখুন। তারপর বলছি।' পেছনে এসে দাঁড়ালেন এক ব্যক্তি। খর্বকায়, গাট্টাগোট্টা চেহারা। তামাটে রং, কদমছাঁট চুল, হালকা কটা চোখ আর রুক্ষ পেশল মুখ, সমগ্রটার ভেতর একটা গোপন নিষ্ঠুরতার আভাস পাওয়া যায়। পরনে সাফারি স্যুট। গরমে বেশ ঘামছেন, এবং বারে বারে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন। বিমল সমাদ্দার হাত বাড়ালেন, 'আসুন মাধববাবু।'

শুদ্ধসত্ত্ব এগিয়ে গেছে। 'আমি শুদ্ধসত্ত্ব সান্যাল। আপনি আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।'

মাধব রক্ষিত কয়েক সেকেন্ড নীরবে শুদ্ধসত্ত্বকে জরিপ করার পর হাতজোড় করে নমস্কার করলেন, 'আমি দুঃখিত, কথা দিয়েও আজ আসতে পারিনি বলে। দুপুর একটার সময়ে বাড়িতে পুলিশ এসে এই দুঃসংবাদটি দিল। এতই হতভম্ব হয়ে আছি যে আপনার বাড়ি যাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সন্ধেবেলায় বাড়ি থাকবেন? তাহলে আসব। তখন কথা হতে পারে।'

বিমলবাবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছেন। শুদ্ধসত্ত্ব সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জানাল, 'তেমন কিছুই নয়। একটা ব্যক্তিগত দরকারে আজ আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু আপনারা এই কেসে মাধববাবুর বাড়ি কেন গিয়েছিলেন?'

'ভিক্টিমের ডায়রিতে প্রথম নামটাই মাধব রক্ষিতের। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল মৃত্যুর দিনেই। মানে, আমরা ধরে নিচ্ছি খুন হয়েছে পয়লা জুন রাত থেকে পরের দিন সকালের মধ্যে। কারণ পয়লা জুন সন্ধেবেলা পর্যন্ত আনিসুর রহমানকে দেখা গিয়েছে। আবার দোসরা জুন সকাল থেকে তাঁর দরজা বন্ধ ছিল। ঘরের বাইরে বেরোননি। মাধব রক্ষিত নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তিনি আনিসুরের সঙ্গে গত পরশু, মানে পয়লা জুন দেখা করেছেন। নিজেই জানিয়েছেন যে ভিক্টিম পুরোনো পরিচিত। অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়মতো এই হোটেলেও এসেছিলেন। আমরা তাঁকে নিয়ে এসেছি, লাশ আর ক্রাইম স্পট শনাক্ত করবার জন্য। কিন্তু আপনি কেন?'

'মাছের গন্ধ পেলে বেড়াল আসে, জানেন না?' একপেশে হাসি ঝুলিয়ে উত্তর দিল শুদ্ধসত্ত্ব। তারপর আঙুল চালিয়ে টেনে টেনে মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত করে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ঘরটা তো?'

ঘরের ভেতর খাট, একটা সস্তা কাঠের টেবিল আর টিনের চেয়ার। একটা সুটকেশ সরিয়ে রাখা একপাশে। মেঝের চার ফুট উঁচু থেকে শুরু হয়েছে জানালা, তিন ফুট লম্বা এবং দুই ফুট চওড়া। ভেতর থেকে বন্ধ। টেবিল রাখা আছে খাটের মাথার কাছে, আর জানালার একপাশে চেয়ার। টেবিল থেকে কিছু দূরে মাটিতে চকের দাগ দিয়ে একটা গোলাকৃতি সীমানা এঁকে দেওয়া। সেই অঞ্চলটায় চাপ রক্ত। কালচে হয়ে আছে। মাছি উড়ছে কয়েকটা। সারা ঘরে পচা মাংসের গন্ধ।

'জানালাটা খুলুন না মশাই। ঘরে টেকা যাচ্ছে না।

পুলিশের এক কনস্টেবল এগিয়ে এল। দুই কাচওয়ালা শিকবিহীন খিড়কি। জানালার ঊর্ধ্বাংশে একটা ভারী কাচের পাত। নীচের অর্ধাংশে আরেকটা কাচের পাত, যার গায়ে আংটা বসানো। আংটা ধরে নীচের কাচ ওপরে তুলে দিতে হয়। অনেকটা রেলগাড়ির জানালার মতো। কনস্টেবলটিকে কাচ তুলে জানালার ওপরের দিকের দুটো ছিটকিনি টেনে দিতে বেশ কসরত করতে হলো। অব্যবহারে জ্যাম হয়ে আছে হয়তো। জোরে টান দিতে আস্তে আস্তে উঠে গেল।

'বডি চলে গেছে মর্গে। মাধববাবু, আপনাকে শনাক্তকরণের জন্য আমাদের সঙ্গে সেখানে যেতে হবে। তার আগে বলুন, এই ঘরেই আপনি পরশু এসেছিলেন তো?'

মাধববাবু ইতিবাচক মাথা নাড়লেন। শুদ্ধসত্ত্ব বাথরুমের দরজা খুলল। নোংরা বাথরুম। একটা বালতি, মগ, এবং মেঝেতে শ্যাওলা পড়ে আছে। জানালা নেই। দুটো ঘুলঘুলি। হোটেলের মালিকও পুলিশের সঙ্গে ওপরে এসেছিলেন। ততক্ষণে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে দিয়েছেন। কত সুনাম তাঁর হোটেলের। কখনও এমনধারা উৎপাত নাকি হয়নি। এবার পুলিশের ছোঁয়া লেগেছে বলে তাঁকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। হোটেলের নাম খারাপ হয়ে যাবে।

বিমল সমাদ্দার ধমকে উঠলেন, 'ধুর মশাই! থামুন তো! যা অভিযোগ আছে থানায় এসে করবেন।' শুদ্ধসত্ত্বর দিকে ফিরে বললেন, 'আগে বলুন তো, আপনি কোন ক্যাপাসিটিতে আছেন? মাধব রক্ষিত অথবা ভিক্টিম নিজে, কেউ কি নিয়োগ করেছেন? নাহলে তো আপনাকে অ্যালাউ করতে পারব না এখানে!'

শুদ্ধসত্ত্ব উত্তর দেবার আগেই মাধব রক্ষিত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমি মিস্টার স্যানালকে অ্যাপয়েন্ট করেছি। আমার অনুরোধেই তিনি এখানে এসেছেন।'

বিমল সমাদ্দার মাথা নাড়লেন। শুদ্ধসত্ত্বকে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না শুদ্ধবাবু। আপনাকে বহুদিন ধরে চিনি। তবুও বুঝতেই পারছেন, প্রোটোকল! একটাই অনুরোধ। সহযোগিতা করবেন! কোনো ক্লু পেলে আমাদের জানাবেন।

শুদ্ধসত্ত্ব সাবধানে বুড়ো আঙুলে পায়ের ভর দিয়ে ব্যালে নাচের ভঙ্গিতে ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাথার ভেতর চুলে আঙুল ঢুকিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুলে বলল, 'ঘর ভেতর থেকে লক করা। জানালার কাচ জ্যাম হয়ে বসে আছে। বাথরুমে ছোট্ট দুটো ঘুলঘুলি। বেশ। এবার চলুন। বডি কীভাবে ছিল?'

'চিত হয়ে শুয়ে। একটাই গুলি। বুকের বামদিকে হৃৎপিণ্ড ফুটো করে ভেতরেই থেকে গেছে। মার্ডার ওয়েপন নিখোঁজ।'

'সময়?'

'পোস্টমর্টেমের আগে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে পরশু রাতে হবার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। কারণ তো আগেই বললাম।'

'আত্মহত্যা নয় কেন?' প্রশ্ন ছুড়ল প্রণবেশ।

'কারণ বন্দুকটা পাওয়া যায়নি। নিজের হৃৎপিণ্ডের ওপর টিপ করে পিস্তল ধরতে গেলে পিস্তলকে বুকে ঠেকিয়ে অস্বস্তিকর পজিশনে রাখতে হবে ডান হাত। আর বাম হাতে ধরতে গেলে বুড়ো আঙুলকে ট্রিগারের ওপর রাখতে হবে। গুলি করবার পর হাত থেকে বন্দুক ওখানেই পড়ে যাবে। বন্দুক পাওয়া যাচ্ছে না মানে আত্মহত্যা নয়। খুন!' শুদ্ধসত্ত্ব উত্তর দিল। তারপর কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে মুখব্যাদান করে তর্জনী দিয়ে দাঁতে টোকা দিল। ছয়ফুট লম্বা, রোগা, পাজামাপাঞ্জাবি পরা এবং উসকো খুসকো চুলের কেউ যদি বড়ো রাস্তার মোড়ে এ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকত পাগলই ভাবত হয়তো সাধারণ মানুষ। কিন্তু বিমলবাবু এবং প্রণবেশ, দুজনেই শুদ্ধসত্ত্বের রকমসকমের সঙ্গে পরিচিত। আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'চেয়ারটা জানালার পাশে কেন?

হকচকিয়ে গেছেন বিমলবাবু। 'মানে?'

'টেবিল তো ঘরের অন্যদিকে। চেয়ার সেখানে থাকার কথা, কারণ টেবিলের ওপর কাগজপত্র রাখা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু চেয়ার এত দূরে কেন?'

'আমি যখন এসেছিলাম, চেয়ার কিন্তু টেবিলের পাশেই ছিল। ওখানে বসেছিলাম আমি, আর আনিসুর ছিল বিছানার ওপর বসে!' মাধববাবু মুখ খুললেন।

চিন্তিত স্বরে শুদ্ধসত্ত্ব নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'একজন লোক চেয়ার কেন সরাবে? যদি টেবিলের নীচ থেকে কিছু বার করতে হয়। কিন্তু এতটা সরাবে না। তাহলে? রক্তের ছাপের সামনে উবু হয়ে বসে বিড়বিড় করল, 'মৃত্যু তার মানে ইন্সট্যান্ট! কারণ রক্ত এক জায়গাতেই জমাট বেঁধে আছে। সেটাও অল্প। বডি নড়াচড়া করেনি। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ!

এক গুলিতেই কাজ হাসিল। যাক, তার মানে গুলি বুক দিয়ে ঢুকেছে। পিঠ দিয়ে নয়।'

'কেন? পিঠ দিয়ে ঢুকে হার্ট ফুটো করতে পারে না?

'সেক্ষেত্রে বডি উপুড় হয়ে পড়বে।

'টেবিলের কাগজপত্র দেখবেন না?'

'নাহ।' দাঁড়িয়ে হাই তুলল শুদ্ধ। 'ওসব থানাতে দেখে নিলেও হবে, কারণ আপনারা তো সবই সিজ করবেন। আর ছবিও তুলে রাখবেন টেবিলের। একটা জিনিস বলুন তো, যখন দরজা ভাঙা হয়, ঘরে কি আলো পাখা চলছিল?'

'হ্যাঁ দুটোই চলছিল। কিন্তু কেন?'

'তার মানে ধরে নিতে পারি যে ভিক্টিম তখনও ঘুমোননি। তাই আলো জ্বলছিল। কিন্তু তাহলে, কী কাজ করছিলেন? খাটে শুয়ে কোনো বই পড়া বা লেখালেখি না। খাটে কিছু নেই। টেবিলের সামনে বসে কিছু করতে পারবেন না কারণ চেয়ার সরানো। বাথরুমে গিয়েছিলেন? হতেই পারে। হয়তো শুয়েছিলেন। বাথরুমে যাবার দরকার পড়ল। আলো জ্বালালেন। বাথরুমে গেলেন। ফিরে আসবার সময়ে গুলি খেলেন। নাহ্ মিলছে না। কারণ ঘরের দরজার মুখোমুখি জানালা। আর বাথরুম ঘরের বাম পাশে, খাট ঘরের ডানপাশে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাটের দিকে যেতে হলে জানলার দিকে বাম হাত থাকবে, মুখ থাকবে খাটের দিকে। সেক্ষেত্রে গুলি লাগলে যেভাবে পড়বে তাতে পা খাটের দিকে, মাথা বাথরুমের দিকে হবার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে মাথা দরজার দিকে আর পা জানালার দিকে। তার মানে, গুলি খাবার সময়ে ভিক্টিম ছিল দরজার দিকে পিঠ দিয়ে। অপরাধী কি চেয়ারে বসে ছিল? বা টেবিলের ওপর?'

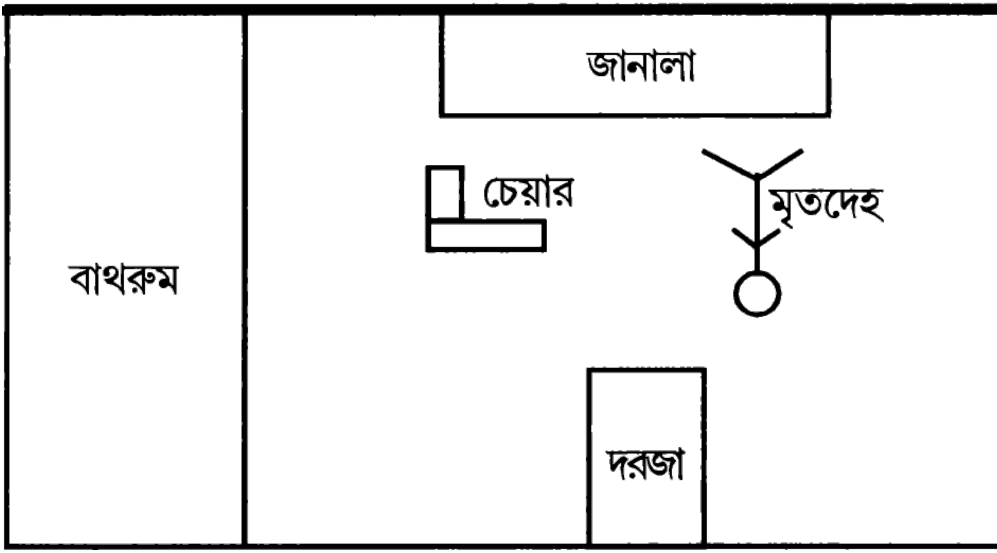

'জানালার কাচে ফুটো নেই। বাইরে থেকে গুলি করা হয়নি।' বললেন বিমলবাবু।

'না! গুলি তার মানে চলেছে ভেতরেই। সেক্ষেত্রে গুলি লাগার ঠিক আগে ভিক্টিম দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? কারও সঙ্গে কথা বলছিল কি? অথবা পায়চারি করছিল? তাহলে খুনি দাঁড়িয়েছিল জানালার দিকে পিঠ করে। কিন্তু ঘর যদি ভিক্টিমের হয় আর খুনি বাইরে থেকে আসে, সেক্ষেত্রে আততায়ী খুন করবার আগে ভিক্টিমের সঙ্গে কথা বলেছে। শুধু কথাই বলেনি, ঘরের একদম ভেতরে চলে এসেছে এবং জানালার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছে। মানে, ভিক্টিম আততায়ীকে চিনত। হয়তো কিছুটা বিশ্বাসও করত। নাহলে দুজনের পজিশন ওরকম হয় না।' অস্থির লাগছে শুদ্ধসত্ত্বর। মাথার চুল ঘাঁটছে জোরে জোরে, 'ঘরের মধ্যে গুলি চললে কার্তুজের খোল কই গেল? খুনি সেটা পকেটস্থ করেছে? কেন?'

'কিন্তু খুনি গেল কোথায়? হাওয়াতে তো উবে যেতে পারে না বন্ধ ঘর থেকে?' প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করল।

'আহা বন্ধ ঘরের সমস্যায় পরে আসব। ওটা এমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়। আগে জানতে হবে, ভিক্টিমের চেনা পরিচিতের মধ্যে কারা কারা ছিল। আর তাদের অ্যালিবাই কী? চলুন বিমলবাবু, যা দেখার সব হয়ে গেছে।

ঘর থেকে বেরোবার মুখে বিমলবাবুকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে শুদ্ধসত্ত্ব বলল, 'মাধব রক্ষিত আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এই মর্মে যে আনিসুর তাঁকে খুন করতে পারে।'

সবিস্ময়ে বিমলবাবু বললেন, 'তাহলে এই ব্যাপার! এদিকে আমরা মাধবকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ রাখিনি!

‘সে এখনও রাখবেন না। আনিসুর খুন করবেন এই আশঙ্কায় মাধব তাঁকে খুন করে দিলেন, এটা হতেই পারে। মাধবের অ্যালিবাই কী?’

‘সেদিন গ্রেট ইস্টার্নে ব্যবসায়ীদের পার্টিতে ছিল। সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে। রাত এগারোটায় কিছু পরে পার্টি ভেঙেছে। যদিও ভেরিফাই করা হয়নি, আশা করছি অনেকেই তাকে দেখে থাকবেন।

‘হুঁ। আনিসুরের মারা যাওয়ার সময়টা জানা জরুরি। নাহলে অঙ্কের হিসেব কিছুই মিলবে না। আপাতত কয়েকদিন মাধববাবুর পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে দিন।' একটিপ নস্যি আঙুলের ডগায় নিয়ে বলল শুদ্ধ।

‘আপনারা থানায় আসবেন তো?’

‘পরে। মাধববাবু জানিয়েছেন আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়ি আসবেন। আগে কথা বলে দেখি, কিছু জানতে পারি কিনা। আপনার সঙ্গে কাল দেখা হবে।’

গাড়িতে উঠে শুদ্ধ বলল, ‘অনাদি চলো। মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস না খেলে এই গরমে মাথায় আইডিয়া আসবে না।’

অনাদিতে বসে গরম মোগলাইয়ের গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে শুদ্ধসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ভোম্বল হয়ে আছ যে। কী ব্যাপার বলো তো?’

প্রণবেশ ভুরু কুঁচকে বলল, ‘খটকা লাগছে একটা।'

‘বলে ফেলো।’ মুখের ভেতর দুটো আলু ফেলে চিবোতে লাগল শুদ্ধ।

‘লতিকা কাল আমাকে গড়িয়াহাটের মোড়ে পর্দা কিনতে পাঠিয়েছিল। নতুন পর্দা লাগাবে ঘরে। ব্যাপারটা মামুলি, কিন্তু আজ হোটেলের ঘরে ঢুকে অস্বস্তি হলো। জানালার পর্দা একপাশে গুটিয়ে রাখা। একজন লোক, যে হোটেলে থাকছে, ঢাকা থেকে এসে এখানে উঠেছে, সে রাত্রিবেলা পর্দা দিয়ে জানালা ঢাকবে না কেন? অত ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, উল্টোদিকেও বিল্ডিং, সকলে তো ঘরের ভেতর দেখতে পাবে! এটুকু প্রাইভেসির বোধ নেই?

শুদ্ধর চেবানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিবিষ্টভাবে প্রণবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি ওয়াটসনের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। পর্দার ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসেনি।'

‘কিন্তু এটা বড়ো ব্যাপার কিনা জানি না।'

‘অবশ্যই বড়ো ব্যাপার। এই কেসের সব খুঁটিনাটিই বড়ো ব্যাপার। কিন্তু এখন আর ভাবব না। মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে।’ খাবারে মন দিল শুদ্ধ।

‘আচ্ছা, হতে পারে অপরাধী খুন করে জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে? জানালার শিক ছিল না৷

‘সম্ভব না। জানলার দৈর্ঘ্য তিন ফুট। নীচের কাচটা ওপরে তুললে দেড় ফুট খোলা পাওয়া যায়। আবার প্রস্থ দুই ফুটের বেশি না। দেড় ফুট বাই দুই ফুট জায়গা দিয়ে কোনো মানুষের গলে যাওয়া সম্ভব নয়, যদি না সে একটা বাচ্চা ছেলে অথবা সার্কাসের জিমন্যাস্ট হয়। তার ওপর চারতলার ঘর। জানালার নীচে কোনো কার্নিশ নেই, জলের পাইপও নেই। মসৃণ দেয়াল। কাজেই লাফিয়ে মাটিতে পড়তে হবে। কিন্তু সেখানেও সমস্যা আছে। হোটেলের গায়ে লাগোয়া চায়ের গুমটি। তার টিনের চাল এই ঘরের ঠিক নীচে। লাফিয়ে পড়তে হলে ওই চালের ওপর পড়তে হয়। আমি বেরোবার সময়ে পরীক্ষা করে এসেছি। চাল অক্ষত আছে।'

‘তাহলে খুনি পালাল কী করে? এ কি ম্যাজিক নাকি? ‘

‘আরে ওই নিয়ে এখন মাথা ঘামিও না। লকড রুম মার্ডারের সবথেকে সহজ সমাধান যেটা, সেটাই খাটে। সবসময়েই। সহজ করে ভাবলেই উত্তর মিলবে। বরং অনেক বেশি জরুরি এটা খুঁজে বার করা যে চেয়ারটা সরানো হয়েছিল কেন। আর পর্দা কেন গোটানো ছিল।'

‘তুমি তাহলে কেসটা হাতে নিচ্ছ?’

‘উলটো! কেসটা আমাকে হাতে নিয়েছে!' অন্যমনস্কভাবে পরোটা চিবোতে লাগল শুদ্ধ,

আঙুল দিয়ে এলোমেলো করে দিতে থাকল মাথার চুল।

আনিসুর রহমান। ৫২ বছর বয়েস। উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। ওজন উনপঞ্চাশ কেজি। ঢাকায় বাড়ি। ছোটোখাটো ব্যবসা আছে। কলকাতায় কেন এসেছিলেন জানা নেই। বছরে একবার করে আসতেন। হয়তো ব্যবসার কাজে। অবস্থাপন্ন বলে মনে হয় না। এটুকুই জেনেছি। এবার আপনার বলার পালা!' শুদ্ধসত্ত্ব সামনে বসা মাধব রক্ষিতকে উদ্দেশ্য করে বলল।

মাধবের আসতে রাত নটা বেজে গিয়েছিল। পুলিশের কাজে বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকতে হয়েছে বোঝা যায়। প্রণবেশ আজ চেম্বার বন্ধ রেখেছে। রহস্যের গন্ধে দুপুর থেকেই সে শুদ্ধর ছায়াসঙ্গী, এবং বেশ বুঝতে পারছে যে বাড়িতে আজকেও ফিরতে রাত হবে। লতিকা ফের ঘুমচোখে দরজা খুলে মুখ টিপে হেসে বলবে, 'শুদ্ধদার প্রতি প্রেম কি বাড়িতে সুন্দরী বউয়ের হাতের ভাপা ইলিশের থেকেও বেশি তীব্র, ডাক্তারমশায়?

মাধব রক্ষিত বললেন, 'বলুন কী জানতে চান।'

'আনিসুর রহমান আর আপনার সামাজিক অবস্থানের মধ্যে বহু যোজন তফাত। তা সত্ত্বেও আপনি আনিসুরের সঙ্গে দেখা করতে ওই সস্তার হোটেলে গেছেন। কেন? আপনি চিঠিতে লিখেছেন, আনিসুর আপনাকে হত্যা করতে চায়। কেন? আপনার জীবনের গোপন কথাটা কী, যা আমাকে জানাতে চেয়েছিলেন? চিঠিতে জোর দিয়ে কেন লিখলেন যে একমাত্র মাধব রক্ষিতই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়? চিঠি টাইপ করবার পর সেটা পোস্ট না করে নিজের হাতে আমার ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন কেন? আর যদি দিলেনই তো তাহলে তখন আমার সঙ্গে দেখা করলেন না কেন?'

'আনিসুর আমার বাল্যবন্ধু। বাংলাদেশের বগুড়াতে আমি আর ও একসঙ্গে বড়ো হয়েছি। একই স্কুলে পড়েছি। দেশভাগের পর আমি কলকাতায় চলে আসি। ও প্রতিবছর কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। চিঠিতে জোর দিয়ে লিখেছি একমাত্র মাধব রক্ষিতই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, তার কারণ আমার মনে হয়েছিল যে আমি যদি আপনার সঙ্গে দেখা হবার আগেই খুন হয়ে যাই, আপনি তবুও মৃতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই ঘটনায় তৎপর হবেন। তাই কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়েই হয়তো লিখে ফেলেছি ওই কথাটা। চিঠি টাইপ করবার পর যেহেতু সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, ভাবলাম এখন পোস্ট করলে আগামীকাল আপনার কাছে না-ও পৌঁছতে পারে। তাই এক কর্মচারী মারফত আপনার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি নিজে একটা মিটিং-এ ব্যস্ত বলে আসতে পারিনি।'

'আনিসুর আপনাকে হত্যা করতে চায় কেন?'

'আপনি অনুমান করতে পারছেন না?'

শুদ্ধ চোখ সরু করে মাধবের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর উত্তর দিল, 'ব্ল্যাকমেল ঘটিত ব্যাপার কি?

মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। 'আপনি বুদ্ধিমান। আমার কোম্পানির বোর্ড অফ্ ডায়রেক্টরস-এর সদস্য হলো অশোক ঝুনঝুনওয়ালা। ওর বাড়ির একটা হিরে চুরির কেস আপনি সমাধান করেছিলেন। ওর মুখে আপনার আশ্চর্য প্রতিভার কথা বহুবার শুনেছি। ঠিক করেছিলাম, জীবন-সংশয় হলে আপনার কাছেই আসব।'

'কিন্তু আমি যেটা বুঝছি না', প্রণবেশ ঝুঁকল, 'আনিসুর আর আপনার যা, সামাজিক অবস্থান, তাতে আনিসুরের আপনাকে ব্ল্যাকমেল করবার কথা, উলটোটা নয়। তাহলে সে আপনাকে হত্যা করতে চাইবে কেন? বরং আপনি তাকে মারতে চাইতে পারেন।'

'গল্পটা না বললে আপনারা বুঝবেন না।' মাধব রক্ষিত টেবিলের ওপর রাখা গ্লাস থেকে জল খেলেন। আমি লুকোব না কিছুই। অবশ্য লুকোবার কিছু নেই, কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে কান পাতলেই আমার অতীত জানতে পারবেন। আমি নিষ্কলঙ্ক ছিলাম না মিস্টার

স্যানাল। যৌবনে বেশ কিছু ভুল কাজ করেছি। তখন পূর্ব পাকিস্তান, ইয়ে বাংলাদেশে থাকি। ওখানেই জন্ম, বড়ো হওয়া। অপরাধী দলের সঙ্গে মিলে টুকটাক চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি ছিল। আনিসুর ছিল আমার সঙ্গী। দুজনেরই একদম নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা। আনিসুর শৈশব থেকে অনাথ এক বুড়ি পিসিমার কাছে মানুষ। আমার বাড়িতে ছিল সৎ মায়ের গঞ্জনা আর বাবার উদাসীনতা। তাই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কিশোর বয়স থেকে ক্ষীণ হয়ে যায়। স্কুলের গণ্ডি পেরোবার পরে আমরা দুজনে পাকেচক্রে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। কাস্তে দিয়ে ঘাস কাটতে কাটতেই একসময়ে গলাকাটার দক্ষতা আসে, মিস্টার সান্যাল। সেই সময়ে মানে ১৯৪৬ সালের কথা বলছি, কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে রেঙ্গুন পর্যন্ত একটি কোকেন পাচারকারী চক্র সক্রিয় ছিল। আনিসুর সেই চক্রে ঢুকে যায়। আমিও ঢুকতাম, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অমিতা। অমিতা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। ওর সঙ্গে প্রেম ছিল আমার। আমি যে খারাপ কাজে যুক্ত, সেটা জেনেও অমিতা আমাকে ছাড়েনি। কিন্তু কোকেন ব্যবসার কথা জানতে পেরে ভয়ানক কান্নাকাটি করেছিল। মাথার দিব্যি দিয়েছিল যে আমি এই কাজ করলে ও আত্মহত্যা করবে। ভদ্রবাড়ির মেয়ে তো, সংস্কার ছিল রক্তের ভেতরে। নেশার বস্তু বিক্রি করে ঘরে টাকা আসবে, এই ভাবনাটা মেনে নিতে পারেনি। আমি জানতাম, অমিতাকে বিয়ে করব। পিতৃমাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত জীবনে একমাত্র ভালোবাসার জায়গা ছিল অমিতা। তাই ইচ্ছে থাকলেও ওকে হারাবার সাহস করিনি। আনিসুরের দলে গিয়ে ভিড়তে পারিনি।'

এই পর্যন্ত বলে মাধববাবু থামলেন। তারপর ইতস্তত করে বললেন, 'এর পরের অংশটা আপনাদের সামনে বলছি, কিন্তু গোপন থাকুক এটুকুই চাই। আমি ফ্যামিলিম্যান মিস্টার সান্যাল। সমাজে কিছু প্রতিপত্তি আছে। তাই অনুরোধ করছি', শেষ কথাটা প্রণবেশের দিকে তাকিয়ে বললেন।

শুদ্ধসত্ত্ব নির্বিকার মুখে তাকিয়ে আছে মাধববাবুর দিকে। প্রণবেশ গলা খাঁকারি দিল, 'আমি তাহলে ঘুরে আসছি। আপনারা কথা চালান।'

হাতের ইশারায় প্রণবেশকে বসতে বলে শুদ্ধ আবার মাধববাবুর দিকে ফিরল, 'আপনি বলুন যা বলছিলেন।' মাধববাবু প্রণবেশের দিকে তাকাচ্ছেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন একবার। 'বেশ। অমিতার সঙ্গে আমার সবরকম সম্পর্ক ছিল। আমি বাড়ি ফিরতাম না। বাবার সঙ্গে দেখা হতো না বেশি। কিন্তু প্রায়ই রাত্রে লুকিয়ে অমিতার বাড়ি চলে যেতাম। ও চুপিচুপি আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসত। খেতে দিত। ওর কাছেই ঘুমোতাম। ভোরবেলা বেরিয়ে যেতাম। যা হয়, আমাদের ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়েছিল। তাতেও সমস্যা ছিল না। ওকেই বিয়ে করতাম। তখন থেকে ব্যবসাপাতির ধান্দায় ঘুরছি। অপরাধ জগতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ক্ষীণ। এর আগে কয়েকটা ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তবে ইনফর্মারের কাজ, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে কোনো প্যাকেট ট্রান্সফার করা, এরকম। সেগুলোও সব ছেড়ে দিয়েছি ততদিনে।

আনিসুরের সঙ্গেও সম্পর্ক কিছুটা আলগা। কিছুদিন রাজশাহীর ব্রিটিশ আর্মি রেজিমেন্টে ঘোরাঘুরি করলাম, যদি ওদের জিনিসপত্র সাপ্লাইয়ের টেন্ডার পাওয়া যায়। আর্মিতে অনেক টাকা, তাই লক্ষ্যটা সেদিকে ছিল। কিছুদিন একটা সিনেমা হলে প্রজেক্টর চালাবার কাজ করলাম। শেষমেষ কলকাতায় এসে কাঁচা সবজির সাপ্লায়ার হবার ধান্দায় ছিলাম। সুবিধে হচ্ছিল না কোনোটাতেই। কিন্তু অমিতাকে ঘরে আনতে গেলে কিছু কাজ করতেই হবে, নাহলে ওর বাবা মায়ের সামনে দাঁড়াতে পারব না।

'আর এই সময়েই ঘটল দেশভাগ। আমি তখন কলকাতায় কাঁচা সব্জির ফড়ের পেছন পেছন ঘুরছি। অমিতা বগুড়াতে। কলকাতায় আটকে গেলাম। দাঙ্গা বাধল দুই বাংলা জুড়ে। আনিসুরের খবর নেই। অমিতার খবর জানি না। আমার তখন পাগলের মতো অবস্থা। প্রচুর চেষ্টা করলাম রাজশাহী যাবার। কিন্তু তখন বর্ডার পেরানো বাস বা ট্রেনের ওপর খোলা তলোয়ার হাতে হামলা চালাচ্ছে দাঙ্গাবাজেরা। হিন্দু পরিচয় জানলে কেটেই ফেলত। ঠিক

করলাম কিছুদিন যাক, উত্তেজনা থিতিয়ে গেলে যাব।

'যেতে পারলাম না। ওপার থেকে এক চেনা পরিবার এসেছিল কয়েকদিন পর। তাদের মুখে শুনলাম যে আমাদের বাড়ি, অমিতার বাড়ি সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বাবা এবং সৎমা কেউ বেঁচে নেই। অমিতাদেরও সকলেই নিখোঁজ। নিজের বাবার কথা ভেবে বিশেষ অনুভূতি হলো না। কিন্তু অমিতার মুখ আমাকে ঘুমোতে দিত না রাতের পর রাত।

'তার পরের তিন বছর আমি কলকাতার জনস্রোতের ঢেউয়ে খড়কুটোর মতো ভেসে ছিলাম। কখনও বন্দরে কাজ, কখনও বা খবরের কাগজ ফেরি করা, আবার কিছুদিনের জন্য একটা স্কুলে নামমাত্র বেতনে মাস্টারি, এই করতে করতে শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে গিয়েছি। এর মধ্যে একটা সওদাগরি আপিসে চাকরি পেয়ে গেলাম। কাজ করতে করতে নিতান্ত কপালজোরে চোখে পড়ে গেলাম কোম্পানির ডিরেক্টর অনিল মুখোপাধ্যায়ের। তিনি আমাকে কী চোখে দেখেছিলেন জানি না। তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ-প্রস্তাব আনলেন। আমি একজন নামগোত্রহীন ছেলে, যার জীবনে কিছুই ছিল না, সে এরকম বিরাট সম্পদশালী পরিবারের সঙ্গে বিবাহসসূত্রে আবদ্ধ হবে— এরকম প্রস্তাব পেয়ে মনের অবস্থাটা অনুমান করতে পারছেন?

'এর পরের ইতিহাস উত্থানের কাহিনী। শ্বশুরমশায়ের সম্পত্তি আর কোম্পানির কাজের অংশীদারিত্ব পেয়ে চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় ঢুকলাম। ব্যবসা সফল হলো। আস্তে আস্তে সমাজের উচ্চকোটিতে চলে গেলাম আমি। গত বাইশ বছর ধরে আর পেছনে ফিরে তাকাইনি।

'কিন্তু বিগত পাপের হিসেব সম্ভবত চুকিয়ে যেতে হয় এক জীবনেই। ১৯৬০ সালে আমার সঙ্গে আবার দেখা হল আনিসুরের। সে ততদিনে পূর্ব-পাকিস্তানে ছোটোখাটো ব্যবসা করছে। চোরাবাজারি ইত্যাদি তো আছেই। বেশি উন্নতি মনে হয় করতে পারেনি, কারণ অবস্থা বিশেষ ভালো নয় দেখলাম। আমি ততদিনে পূর্বের জীবনকে প্রায় মুছে ফেলেছি। স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে সুখী দাম্পত্য। সেইসঙ্গে ব্যবসার কাজেও হিল্লি-দিল্লি ছুটতে হয়। আনিসুর আসা মানে আবার অতীত কাদা ঘাঁটা। কিন্তু আনিসুর যেটা বলল তা শুনে বুঝলাম, অতীত আমার পিছু ছাড়বে না।

'অমিতা বেঁচে আছে। শুধু সেটাই নয়, আমি যখন কলকাতায় এসেছিলাম, অমিতা আবিষ্কার করেছিল সে গর্ভবতী। দাঙ্গায় তার বাড়ির সকলে মারা গিয়েছিল। অমিতা গোপনে গর্ভপাত করাবার জন্য টাউনে এসেছিল সেদিন, তাই বেঁচে গিয়েছিল। দাঙ্গার ঝামেলার জন্য গর্ভপাত হয়নি। অমিতা তারপর ভাগ্যের সন্ধানে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে ঢাকা চলে আসে। গারমেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ নেয়। বাচ্চাটা জন্মায়। মেয়ে। সেই মেয়ের ততদিনে তেরো বছর বয়েস হয়েছে। আনিসুরের সঙ্গে অমিতার যোগাযোগ ছিল। সে এতদিন আমার সন্ধান পায়নি। কিছুকাল আগে একটা ভারতীয় খবরের কাগজের পাতা তার হাতে আসে যেখানে তরুণ শিল্পপতি হিসেবে আমার ছবি বেরিয়েছিল। আনিসুরকে সেই ছবি দেখায়। আনিসুর আমার ঠিকানা জোগাড় করে তাই কলকাতায় এসেছে।

শ্বশুরমশায় তখনও বেঁচে। তিনি আমার অতীত ইতিহাস কিছুই জানতেন না। এখন যদি জানেন যে আমার বিবাহপূর্ব একটি সন্তান আছে, আমাকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বাদ দিয়ে মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। কোম্পানির পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ার স্ত্রীর নামে। সেটা চলে গেলে আমি পথে বসব। এতদিন ধরে তিলতিল করে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে যে সাম্রাজ্য তৈরি করছি, এক লহমায় পুরোটা ধ্বসে যাবে চোখের সামনে। শুধু তাই নয়, স্ত্রী পুত্রদেরও হারাব। মনস্থির করে নিলাম, কিছুতেই এ হতে দেওয়া চলবে না। অমিতা অতীত। অতীতের একটা ভুলের মাশুল আমি সারা জীবন ধরে দিয়ে যেতে পারব না। আনিসুরকে জানালাম, যত টাকা লাগে দেব। কিন্তু অমিতার মুখ বন্ধ রাখতে হবে।

'সেই থেকে শুরু। প্রতি বছর কলকাতায় এসে আনিসুর আমার কাছ থেকে একটা মোটা টাকা নিয়ে যেত। মাঝে সন্দেহ করেছিলাম যে অমিতার ব্যাপারটা ও বানিয়ে বলছে। হয়তো

সত্যিই কোনো সন্তান নেই। তেষট্টি সালে ঢাকায় শিল্পপতিদের একটা ডেলিগেশনে গিয়ে খোঁজ নিয়েছিলাম গোপনে। আনিসুর প্রতারক এবং ব্ল্যাকমেইলার হতে পারে, কিন্তু মিথ্যে বলেনি। অমিতা আছে। রমনা বাজারের কাছে একটা বস্তিতে মা-মেয়ে মিলে থাকে। আমার সাহস হয়নি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার

'এই চলছিল। কিন্তু এই নিরন্তর ব্ল্যাকমেইলের শিকার হতে হতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আনিসুর যত টাকা দাবি করছে তার একটা মোটা অংশ তার পকেটস্থ হচ্ছে। আর আমি যত ওপরে উঠছিলাম, ততই বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল আনিসুরের মুখ বন্ধ রাখা। ও নিজেও সেটা বুঝছিল। তাই দাবির পরিমাণও বাড়ছিল। কিন্তু এর তো একটা শেষ আছে। আমি কি সারাজীবন ধরে এভাবে টাকা দিয়ে যাব? কতকাল আর নিজেকে দোহন করতে দিতে পারি? এতদিনে শ্বশুরমশায় মারা গিয়েছেন। সম্পত্তি আমার নামে। স্ত্রী-কে সব খুলে বললে হয়তো তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। চরম সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। সিদ্ধান্ত নিলাম, স্ত্রী-র কাছে মুখ খুলব। এবার যখন আনিসুর কলকাতায় এল, আমি গত পরশু তার হোটেলে গিয়ে স্পষ্ট বলে এলাম যে আর টাকা দেব না। তাতে যা হয় হোক। এটাও বললাম যে লোকলজ্জার ভয় আর এই বয়সে এসে করি না। স্ত্রীকে সব জানাব অতি দ্রুত। এবং পুলিশের কাছেও যাচ্ছি, আনিসুরের সমস্ত ব্ল্যাকমেলিং-এর ইতিহাস ও পূর্বের অপরাধ বলে দেবার জন্য।

'আনিসুর একটা কথাও বলল না। কিন্তু ওর চোখ দেখে বুঝলাম যে আমাকে ছাড়বে না। পুলিশের কাছে আমি যদি যাই, ও শেষ হয়ে যাবে। ওর অপরাধের যা তালিকা, সারাজীবন জেলে পচে মরতে হবে ওকে। ও সেটা হতে দেবে না। আমাকে আটকাবেই। ওর চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছিল। একরকম পালিয়েই বাড়ি ফিরে এলাম। তখন প্রায় বিকেল। জানতাম আনিসুর আমার হত্যার অ্যাটেম্পট নেবে। ঠিক করলাম, আপনাকে সব জানিয়ে যাব। যদি সত্যিই আমি না থাকি, তাতেও পরোয়া নেই। আনিসুর যেন শাস্তি পায়। আর আমার মেয়েটা, যার জন্য সারাজীবন কিছুই করতে পারিনি, সে যেন সম্পত্তির কিছুটা পায়। সেই মতন একটা উইলও করব বলে মনস্থির করছিলাম। অবশ্যই আপনার পরামর্শ নিয়ে কিন্তু আপনার বাড়ি আসবার আগেই পুলিশ হাজির। খবর পেলাম, আনিসুর খুন হয়েছে। খুশি হব না দুঃখ পাব, ঠিক বুঝছি না মিস্টার সান্যাল।'

মাধববাবুর বুক কোনো এক উগ্র আবেগে ওঠাপড়া করছে। সেটাকে চাপা দেবার জন্য তিনি উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রুমাল দিয়ে চোখ ঢাকলেন। শুদ্ধসত্ত্ব এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এবার মুখ খুলল, 'খুনের সময়ে আপনি গ্রেট ইস্টার্নে ছিলেন?'

চোখ থেকে রুমাল সরিয়ে মাধব রক্ষিত হালকা হাসলেন। 'অ্যালিবাই খুঁজছেন? শহরের অন্তত পঞ্চাশজন নামী ব্যবসায়ী আমাকে দেখেছেন। সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে রাত এগারোটা। বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার ধীরেন ব্যানার্জির আশিতম জন্মবার্ষিকীর পার্টি ছিল।'

'সেদিন দুপুরের পর থেকে আপনি কী কী করেছিলেন, আমার জানা দরকার।'

'আনিসুরের হোটেলে গিয়েছিলাম দুপুর দুটো নাগাদ। দুপুর তিনটের সময়ে ওর হোটেল থেকে বেরিয়ে আসি। বাড়ি ফিরতে ফিরতে পৌনে চারটে বেজে যায়। ঠিক করে রেখেছিলাম যে বাড়ি এসেই আপনাকে চিঠি লিখব। কারণ আপনার ফোন নম্বর টেলিফোন ডায়রেক্টরিতে নেই। সেইমতো চিঠি লিখতে বসলেও কী লিখব বুঝছিলাম না। আমরা তো কেজো মানুষ, কলমের মুখে কথা আটকে যায়। বারবার লিখে কেটে ফেলছিলাম। তাই লিখতে লিখতে বিকেল হয়ে যায়। শেষে টাইপ করি, কারণ টাইপিং-এ আমি বেশি স্বচ্ছন্দ, আর মাথাও তাড়াতাড়ি খেলে। সাড়ে পাঁচটায় কোম্পানির একটা মিটিং বসে, বাড়িতেই, শেষ হয় ছটার কিছু পর। সন্ধে সাড়ে ছয়টার সময়ে যাই কলামন্দিরে, ওখানে বন্যাত্রাণ উপলক্ষ্যে একটা চ্যারিটি শোয়ের আয়োজন করেছিল আমার ছোটোছেলে আর ওর বন্ধুরা। যাবার আগে আমার কর্মচারী নকুলকে চিঠি দিয়ে বলি আপনার ডাকবাক্সে যেন ফেলে আসে।

ডাকে পাঠালে হয়তো ৩ তারিখের মধ্যে পৌঁছাতো না। কলামন্দিরে পৌঁছোই সাতটা বাজতে দশ নাগাদ। সেখানে আধ ঘণ্টা মতন থেকে তারপর গ্রেট ইস্টার্নে আসি। রাত এগারোটা, না না, মনে হয় এগারোটা পনেরো পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। ভুল বললাম, এগারোটা পঁচিশ। কারণ ঘড়ি দেখেছিলাম গাড়িতে ওঠার সময়ে, আর মনে মনে ভাবছিলাম বড়ো দেরি হয়ে গেল! রাত এগারোটা চল্লিশে বাড়ি ফিরি!'

'আপনার ড্রাইভার নেই?'

'আছে! কিন্তু সেদিন ও আগে থেকে বলে রেখেছিল আটটার মধ্যে ছুটি দিয়ে দিতে, কারণ ওর মেয়ের জ্বর। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চায়। আমাকে গ্রেট ইস্টার্নে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল। রাত্রে নিজেই গাড়ি চালিয়ে ফিরেছিলাম।'

শুদ্ধসত্ত্ব কিছু একটা চিন্তা করল। তারপর বলল, 'আপনার বাড়ির ঠিকানাটা একবার লিখে দেবেন এই কাগজে? খামটা মনে হয় হারিয়েছি!'

মাধব ঠিকানা লিখলেন। তারপর বললেন, 'আপনার যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে, এবার বাড়ি ফিরতে চাই। ক্লান্ত বোধ করছি। মন চাইছে খানিক একা থাকতে।

'আপনি কি সত্যিই আমাকে এই কেসে রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য অ্যাপয়েন্ট করছেন?'

'করছি! আমি চাই আপনি হত্যাকারীকে খুঁজে বার করুন। নাহলে আমার ওপর সন্দেহ থেকেই যাবে। আপনার ফি-টা জানিয়ে দেবেন শুধু।'

'বেশ। কাল জানাব। আর অ্যাডভান্সটাও কাল আপনার বাড়ি থেকে নেব। আপনি এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিন।'

মাধব রক্ষিত বেরিয়ে যাবার পর শুদ্ধ একটা খাম বার করল টেবিলের তলা থেকে। প্রণবেশ অবাক হয়ে বলল, 'এই যে বললে খাম হারিয়েছে?

'হাতের লেখা মেলাতে হতো না? নাহ্, দুটো হাতের লেখাই এক। চিঠিটা যে মাধব রক্ষিতই পাঠিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।'

'গল্পটা কী বুঝলে?'

'হৃদয়বিদারক।' ইজিচেয়ারে টান টান হয়ে শুয়ে নস্যি কৌটো বার করল শুদ্ধ। 'তবে এই উচ্চশ্রেণীর লোকজনের নীতিবোধ আমাদের থেকে অন্যরকম হয়। তুমি বা আমি যেখানে বাচ্চাটাকে দেখবার জন্য ছুটে যেতাম, এরা সেখানে আগে নিজেদের সম্পত্তি বাঁচাবার চেষ্টায় উন্মুখ হয়ে উঠে। হয়তো অনেক কিছু হারাবার থাকে এদের!

'এই বয়সে এসে বিবেক জাগ্রত হয়েছে মনে হয়। উইলের কথাটা বলল দেখলে না?'

'আগে বানাক! অন্য মক্কেল হলে আমি বাংলাদেশ চলে যাবার কথা ভাবতাম। অমিতা আর তাঁর সন্তানকে এখানে নিয়ে এলে ভালো হতো। কারণ আনিসুরের হত্যার বীজও সম্ভবত অতীতেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই মক্কেল তা অনুমোদন করবেন বলে মনে হয় না। কিছুতেই চাইবেন না অমিতা এসে তাঁর পরিবারের সামনে দাঁড়ান। আর নিজের পয়সাতে বাংলাদেশ যাবার প্রশ্নই নেই। বাড়িতে বসে কচি পাঁঠার ঝোল খেতে খেতে মাথা খাটানোর মতো বেড়ে জিনিস আর হয় না। দাও একটা সিগারেট।'

সিগারেট দিয়ে উঠে পড়ল প্রণবেশ। তাকেও বেরোতে হবে। রাত প্রায় এগারোটা। কিন্তু দরজার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজার পাশের একটা টেবিলের ওপর ঝুড়িতে সেদিনের ডাকে আসা চিঠিপত্র রাখা থাকে। শুদ্ধর দিকে ফিরে বলল, 'তুমি বিকেলের ডাকে আসা চিঠিগুলো দেখোনি?'

'নাহ, সময় পেলাম কই! সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেই তো ফোন নিয়ে বসতে হলো। কেন?'

একটা খাম হাতে তুলে দেখাল প্রণবেশ। প্রেরকের জায়গাতে নাম নেই, শুধু আনিসুরের হোটেলের ঠিকানা লেখা।

এক লাফে এগিয়ে এসে খামটা ছিঁড়ে ফেলল শুদ্ধসত্ত্ব। তারপর ভেতরের কাগজ বার করে হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে থাকল। কাগজ পুরো সাদা। একটা কালির আঁচড় পর্যন্ত নেই।

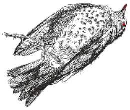

বনের কাছে
বারুদজ্বলা মাটি মাটিতে কার নাম রেখেছিল পুরনো বন্ধুরা।
চিতাবাঘের
থাবায় ছেঁড়া পাথর
পাথরে বুক পেতেছিল পুরনো বন্ধুরা।

—অমিতাভ গুপ্ত

হোটেলে ফিরে অমিতাভর লেখাটা পড়তে পড়তে চোখ ধরে এসেছিল বলে আলো জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে জানলার কাচে বৃষ্টির চটাপট শব্দে চমকে উঠে বসলাম। পাহাড়ি বৃষ্টির আওয়াজ এবং গন্ধ অন্যরকম হয়। অন্যরকম, এবং শহুরে কানের পক্ষে তীব্র। মোবাইল বলল, রাত চারটে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বাতি নিভিয়ে বিছানায় এসে খেয়াল করলাম, জানলার বাইরে থেকে ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে পিছলে যাচ্ছে বিছানায়। আবার উঠতে হলো, এবং পর্দা টানতে গিয়ে থমকালাম।

রাস্তার উলটোদিকে ল্যাম্পপোস্টের নীচে রেনকোট পরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছায়ামূর্তি। আমার জানালার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। আলোর উৎসের দিকে পিঠ, তাই মুখ দেখা যাচ্ছে না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। দুজনেই একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছি। চৌধুরী ভিলা যাবার সময়েও একটা ছায়ামূর্তিকে দেখেছি। একইভাবে আমাকে লক্ষ করে যাচ্ছিল। দুজনেই কি এক লোক? বুঝতে পারছিলাম, পা আমাকে ইঞ্জিনের মতো টানছে। দরজা খুলে বাইরে, সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে লাউঞ্জ, এবং রাস্তা পেরিয়ে ল্যাম্পপোস্টের নীচে। চাইছে, মূর্তিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। হাত মুঠো করলাম নিজের অজান্তে। তারপর পর্দাটা টেনে দিলাম। ঘুমোতে হবে। যদি আজকের রাত না ঘুমোই, কাল থেকে কাজ শুরু করতে পারব না।

যখন আবার চোখ মেললাম, সাড়ে ছটা বেজে গেছে। পর্দার বাইরে আবছা একটা আলো ফুটেছে, আর ঝির ঝির করে বৃষ্টি। ভারী কুয়াশার কম্বল বিছিয়ে আছে রাস্তা, বাড়ি, পাহাড়ের গায়ে। ল্যাম্পপোস্টের আলো তখনো জ্বলছে। নীচে কেউ নেই।

কালকের ঘটনা, এবং ছায়ামূর্তিকে নিয়ে নিয়ে ভাবতে ভাবতে এতই আনমনা ছিলাম যে লাউঞ্জে ব্রেকফাস্ট করবার সময়ে সামনে যে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে, এবং 'এক্সকিউজ মি' বলেছে দু-বার, তা খেয়াল করিনি। টেবিলের উপর আঙুলের ঠকঠক শব্দে চটকা ভাঙল।

লম্বাটে এবং রোগা এক তরুণ। বয়েস মেরেকেটে তিরিশ। খোঁচাখোঁচা দাড়িতে ছেয়ে আছে চোয়াল ৷ ভাঙা নাক। একমাথা এলোমেলো চুল। চোখদুটো উজ্জ্বল। বাম গালের পাশে একটা কাটা দাগ। গায়ে ওভারকোট, গলায় মাফলার। হাতে ধরা লম্বা ছাতা থেকে জল পড়ছে টপটপ করে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে, দেখে মনে হলো কিছুটা বিরক্তও, কারণ আমি সাড়া দিতে দেরি করেছি।

'আমার নাম সিদ্ধার্থ। আমার কাকা, মানে অরুণ চৌধুরী কাল রাত্রে আমাকে ফোন করে আপনার কথা জানিয়েছিলেন। বললেন, আমি যেন পারলে একবার দেখা করি, কারণ

আপনার স্টোরির জন্য যদি দরকার পড়ে, তাহলে লোকাল হিসেবে হয়তো সাহায্য করতে পারব। অবশ্যই আপনার যদি দরকার মনে হয়।' ছেলেটা গম্ভীর, এমনকি সৌজন্যের হাসিটুকুও নেই। বাইরে তাকালাম। কুয়াশার চাদর পাতলা হয়েছে।

বর্ষাতে দার্জিলিং-এ এমনিতেই কম টুরিস্ট হয়। লাউঞ্জে আমি বাদে আর একজন বিদেশী বয়স্ক মহিলা বসে আছেন। আর আছে এক বাঙালি দম্পতি। তাদের বাচ্চাটা খেলে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। মহিলা পৃথুলা। মাথায় সিঁদুর, হাতে

শাঁখা-পলা, এবং পরনে চোখে লাগার মতো টাইট জিন্স। এই পরিবারটা অনাবশ্যক নিজেদের মধ্যে বাঙালি টানে ইংরেজিতে কথা বলছে। এমনকি বাচ্চাটাকেও তার মা বলছে, ‘বুবুন, সিট হিয়ার। ডোন্ট বি নটি।' আর বাচ্চাটা বাংলাতে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের চেহারা ভালোমানুষের মতো। শীর্ণকায়, মাথার সামনের দিকে একটা ছোট্ট টাক। লোমশ থাই, চেপে বসা হাফপ্যান্ট। বাচ্চাটা খেলতে খেলতে এদিকে চলে এসেছিল, ধাক্কা খেল সিদ্ধার্থর হাঁটুতে। সিদ্ধার্থ ফিরেও তাকাল না, শুধু আলতো সরে গেল। রোবট নাকি? না জন্মগত খিটখিটে?

‘আচ্ছা, আমি জানতাম না আপনার কথা', হাত বাড়িয়ে দিলাম। অরুণ চৌধুরীর দুই দাদা আছে জানতাম, যাঁদের একজন বিদেশে, অপরজন চা বাগানের ব্যবসা সামলান। তাঁদের ছেলেপুলের ব্যাপারে খবর নিইনি।

'আমি এখানে থাকি না। ছুটিতে এসেছি। আমার বাবার বাড়ি ম্যালের কাছে, তবে ছুটির বেশিরভাগ সময় কাকার বাড়িতেই থাকি।'

‘আপনি কি কলকাতায় থাকেন? ‘

না। ডাবলিন। কিন্তু আমার কথা থাক এখন।' সিদ্ধার্থ তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো আমার দিকে। পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটছি বলে অরুণ চৌধুরীর পরিবার চটে আছে। ছেলেটা তখনও দাঁড়িয়ে। এবার সচেতন হয়ে উঠলাম, ‘বসুন।' উলটোদিকের চেয়ারের দিকে ইশারা করলাম। সিদ্ধার্থ ইতস্তত করছিল, তারপর বসল, আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম স্টোরির খাতিরেই, কারণ আপনাদের সবাইকেই ইন্টারভিউ দিতে হবে।

তামাকের পাউচ বার করল সিদ্ধার্থ, সিগারেটের কাগজের ভেতর তামাক পুরে পাকাতে লাগল নীরবে। তারপর কী মনে হতে সৌজন্যের ঠোঁট টিপে বলল, ‘আশা করি আপনার ব্রেকফাস্টে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি না?'

'না না একদমই না। একটা কফি নিন?'

‘চা। থ্যাঙ্ক ইউ।'

‘ডাবলিন আমার প্রিয় শহর। যদিও যাইনি কখনও। জেমস জয়েস, শেমাস হিনি...'

সিদ্ধার্থ মাথা নাড়ল, ‘ট্রিনিটি কলেজের যে বিল্ডিং-এ আমার অফিস, তার নাম জেমস জয়েস লাইব্রেরি। ওটা বহু বছর আগে, একটা পাব ছিল, জয়েস সেখানে মদ খেতে আসতেন। জয়েস ওদের জাতীয় অহংকার বলতে পারেন।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিদ্ধার্থকে ভালো করে দেখলাম আবার। অরুণ চৌধুরীর বংশের সবাই বেশ সুপুরুষ, মানতেই হবে।

‘আমি আপনার ভার্সনটাও শুনতে আগ্রহী, সিদ্ধার্থ। মানে আপনি কীভাবে কাকাকে দেখেছেন, ঘটনাটাকেও। যদিও, মনে হয় আপনি তখনো জন্মাননি।'

‘আমি ছোটোবেলা থেকে কাকা আর কাকিমার খুব কাছের। বেশিরভাগ দিন ওদের বাড়িতেই কাটাতাম। এখনও ছুটিতে এসে ওখানেই থাকছি অনেকটা সময়। কাকিমার প্রভাবে অঙ্কের প্রতি উৎসাহ হয়েছিল। আর তাই পিএইচডিতে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেছে নেওয়া। কাকা আমাকে বই পড়াত। শুধুই রহস্য গল্প না। দেশবিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস আর সিনেমা সংক্রান্ত বই। দেখেছেন হয়তো, বিশাল কালেকশন।

‘আপনি কি একমাত্র সন্তান? কিছু মনে করবেন না, এগুলো স্টোরিতে লাগবে।'

আরও দুই দাদা আছে, যারা আমার থেকে বয়সে অনেকটা বড়ো। কেউই এখানে নেই,

একজন কলকাতা আরেকজন হায়দ্রাবাদ। তবে হয়তো আমিই কাকার বেশি কাছের, ছোটোবেলা থেকেই। যদিও জানি না, আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কীভাবে আপনার গল্পে কাজে লাগবে।

ঠোঁট কামড়ালাম। একটা খড়খড়ে ভাব, ফাটছে। সকালবেলা লিপগ্লস লাগাতে ভুলে গিয়েছি, এত অন্যমনস্ক ছিলাম। সিদ্ধার্থ যদি আমাকে নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকে, সরাসরি কথা বলে নেওয়াই ভালো.. 'কিছু মনে করবেন না। একটা প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার ওপর কোনো কারণে আপনি বা আপনারা বিরক্ত? অথবা, এমনটা কি হয়েছে যে আমার আসাতে খুশি নন? '

'আপনি নিজের কাজ করতে এসেছেন। আমার আর কী বলার থাকতে পারে।'

'আপনার কাকার অনুমতি নিয়েই এসেছি।'

'তাহলে তো মিটেই গেল।'

'কিন্তু তবুও, সিদ্ধার্থ, যদি কোনো কিছু আপনার মনে হয়, আমাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমি পেশাদার সাংবাদিক', অল্প হাসলাম, 'কিছুই মনে করব না, এমনকি যদি মনে হয় এখানে ওয়েলকাম নই, তাতেও কিছু সমস্যা নেই। শুধু আগে থেকে জেনে রাখলে ভালো হয় ।'

পাকানো সিগারেট হাতে চায়ে চুমুক দিল সিদ্ধার্থ। মুখ থেকে থমথমে ভাব কাটছে না। 'আমি, কাকিমা, আমরা কেউ চাইনি, আপনি আসুন। কারণ যা ঘটে গিয়েছে, যার জন্য চুয়াল্লিশ বছর ধরে একটা মানুষ সাফার করেছে, তার যন্ত্রণা আমরা আর বাড়াতে চাইনি। অতীত খুঁড়তে কেউ ভালোবাসে না মিস ভটচাজ! কাকা আমাদের কথা মেনে নিয়েছিল, বারণও করেছিল আসতে। কিন্তু তারপর নিজেই মত পালটালো, জানি না কেন! আপনার ওপর রাগ বা অসূয়া নেই আমার। যদি সেরকম কিছু ব্যবহারে প্রকাশ পেয়ে থাকে, দুঃখিত। আমি বিরক্ত এই গোটা ব্যাপারটা নিয়েই।'

চুপ করে থাকলাম। কী-ই বা বলার থাকতে পারে এক্ষেত্রে।

'আপনি যে রহস্যের সন্ধানে এসেছেন, সেটা সারাজীবন কাকাকে তাড়া করে বেরিয়েছে। রাত্রে ঘুমোয় না ভালো করে। বহু রাত আচমকা ঘুম ভেঙে দেখেছি কাকার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকে দেখেছি কাকা জেগে বসে আছে। বাগানের দিকে তাকিয়ে। এত চুপচাপ, মনে হতো ধ্যান করছে। পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে এসেছি। কোনো কোনো রাতে দেখেছি, পুরোনো খবরের কাগজের কাটিং জমানো ফাইলগুলো বার করে পড়ছে।' মাথা নাড়ল নিজের মনে, 'অনর্থক, এই বারবার অতীতে ফিরে যাওয়া। কী লাভ এতে!'

সিদ্ধার্থর দেখাটা মূল্যবান। লেখার কাজে লাগবে।

'আমি বেশ কিছুদিন এই টাউনের বাইরে। মাস্টার্স করতে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সে চলে যাই। এক বছর চাকরিও করেছিলাম। তারপর ওখান থেকেই পিএইচডি-র ডাক পেয়ে ডাবলিন। প্রায় সাত বছর হয়ে গেল দার্জিলিং ছাড়া। এখন ছুটিছাটায় আসি। কিন্তু প্রত্যেকবার যখন দার্জিলিং-এ পা দিই, ভয় লাগে। মনে হয় এমন কিছু ঘটে গেছে এর মধ্যেই, জানি না, হয়তো আবার কিছু নতুন করে আবিষ্কার হয়েছে, সেটা এতই শকিং যে আমাদের বাড়িটা আবার একটা না বলা শোক, ভয় আর আশঙ্কার ভেতর ডুবে গিয়েছে। আমার জন্মের কত আগেকার ঘটনা, সেটা যদি আমাকেই এভাবে তাড়া করে, তাহলে কাকাকে কী করছে। আপনার এখানে আসা একটা ভাবেই অর্থবহ হতে পারে, যদি কোনো সমাধান দিতে পারেন।'

'আমি তো সমাধান করতে আসিনি। একটা স্টোরি করতে এসেছি।'

সিদ্ধার্থ হাতের পাকানো সিগারেট ঘোরাতে লাগল অন্যমনস্কভাবে। 'বাড়িতে মাঝে মাঝে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা উঠতো, ছোটোবেলায় তো আরও বেশি। কাকা কোনো মন্তব্য করত না। শুধু একবার কী একটা কথার সূত্রে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম, 'এখনও কি তুমি এই ঘটনাটা নিয়ে ভাবো?' কাকা অনেকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে উত্তর

দিয়েছিল, 'ওল্ড সিনস্ হ্যাভ লং শ্যাডোজ। পাপ পুরোনো হলে তার ছায়া দীর্ঘ হয়।' মেঘ আর কুয়াশার যুগলবন্দী সকালটার ওপর আবছা অন্ধকার ঝামরে দিয়েছে। ম্যাল রোডে টুপটাপ জোনাকির মতো ফুটে উঠছে পথচারীর দল। চুয়াল্লিশ বছরও কি যথেষ্ট দীর্ঘ ছায়া নয়, মিস ভটচাজ?'

'কিন্তু যদি একদিন আবিষ্কার করেন যে, আপনার কাকাই হত্যাকারী? সেই সত্যি কি আপনি দেখতে চান?'

সিদ্ধার্থ স্থির চোখে আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো অরুণের মতোই। হারিয়ে যাওয়া, ভাসা ভাসা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'আপনি হয়তো বুঝছেন না, আমাদের পরিবারে কী ঘটে গেছে এতগুলো বছরে, অথবা আমরা এগুলো নিয়ে কী ভাবি। আপনার কি মনে হয় এই সম্ভাবনা আমার মাথাতে নেই? আমাদের কারোর মাথাতে নেই? কিন্তু তাতেও, হয়তো কাকার প্রতি একটা বায়াস আমার থেকেই যাবে। শেষ দিন পর্যন্ত। আমার তো বড়ো হওয়া কাকার হাত ধরে। কাকাই সেই মানুষ যে আমাকে প্রথম বলেছিল, মনের জানালাগুলো সব খুলে রাখবি। খুলে ফেলতে পারলে দেখবি তোর জন্য সারা পৃথিবী অপেক্ষা করছে। হেমিংওয়ে অপেক্ষা করছে। টুরিং টেস্ট আছে। গডেলের উপপাদ্য আছে। পিজি উডহাউস আছে। নেভিল কার্ডাস আছে। অত ছোটো বয়সে আমাকে তো কেউ এগুলো বলেনি! বাবা মা-ও নয়। আমি গডেলের নাম জেনে গেছি তার কাজ বুঝবার দশ বছর আগেই। কাকা কাফকা পড়তে দিয়েছিল, দ্য ট্রায়াল৷ তখন আমি পনেরো। এই লোকটা যদি খুনি হয়ও, আমি কতটা নির্দয় হতে পারব? ঠিক জানি না, মাঝে মাঝে নিজেরই সন্দেহ হয়, আমিও তখন অপরাধীর পক্ষ নিয়ে ফেলব না তো?'

অজান্তেই আমার আঙুল আবার ডান হাতের পোড়া দাগটার ওপর চলে গিয়েছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আর অমিতাভ মিত্র? তাঁর সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নেই?'

'কী করে থাকবে? আমি কি লোকটাকে দেখেছি?'

'কিন্তু আমার স্টোরিতে অমিতাভকে খোঁজাটাও যে একটা জরুরি অধ্যায়।' আবার মনে পড়ল কেবল সাহেবের কথা। দার্জিলিং নিয়ে পাতার পর পাতা কবিতা চন্দনের ফোঁটার মতো সেই কবে আমার কপালে সাজিয়ে দিয়েছিলেন এক অজ্ঞাত কবি। আপাতত পোড়া ব্রিটিশ বাংলো, গথিক ছাদের মিনার, লোহার রেলিং, আর্দ্র পাইনের চামড়া, পাহাড়ের গায়ে শ্যাওলা ধরা সিঁড়ির স্মৃতিতে যে ভেজা দার্জিলিং আটকে আছে, সেটুকুও কি জন কেবল নয়? অথবা, অমিতাভ মিত্র?

সম্ভবত কবিতা বা অমিতাভ কারও প্রতিই সিদ্ধার্থর উৎসাহ নেই। ভুল ভেবেছিলাম। ও ঠিক আমার প্রতি অসূয়া পোষণ করছে না। স্বভাবটাই গম্ভীর, আত্মনিমগ্ন টাইপ। কঠিন কঠিন অঙ্ক করে করে বোধহয় স্বাভাবিক উচ্ছ্বলতা মরে গেছে। ঘড়ি দেখলাম। এবার বেরোতে হবে। কিন্তু আগে তো চৌধুরী ভিলা যাবো না। আগে যাবো পাশের কটেজে। মিসেস বাসু বেঁচে আছেন কি? ' 'ভীষণ খিটখিটে মহিলা ছিলেন।' সিদ্ধার্থ মাথা নাড়ল, 'বেঁচে নেই। আমার ছোটোবেলাতেই মারা গিয়েছেন। তবে তাঁর ছেলে এখনও আছেন ৷' ইতস্তত করে বলল, 'আপনি চাইলে আমি থাকতে পারি। আমাকে চেনেন।

উত্তর দিতে সময় লাগল। মনে মনে ভেবে নিচ্ছিলাম সিদ্ধার্থ সঙ্গে থাকার সুবিধে-অসুবিধেগুলো। মদনদা আছেন ঠিকই। স্থানীয় মানুষ তিনিও। কিন্তু তিনি এতকিছু জানবেন বলে মনে হয় না। অন্যদিকে সিদ্ধার্থ ছোটোবেলা থেকে এই রহস্যের সঙ্গে বড়ো হয়েছে। তার ওপর সে এই শহরেরই ছেলে। দেখার একটা অন্য চোখ থাকলে আমার গল্পে কিছু বৈচিত্র্য আসতে পারে। তবে সমস্যাটা হল, একটি মেয়েকে অযথা পেট্রনাইজ করবার প্রবণতা আছে অধিকাংশ পুরুষের। বিশেষ করে এই সদাবিরক্ত খিটখিটে টাইপটার। সারাক্ষণ আমার কাজের খুঁত ধরতে পারে, অথবা গম্ভীর মুখে হয়তো এমন তাকালো, মনে হলো আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোকা। সে অসহ্য হবে। কিন্তু একটা সুযোগ দিয়ে দেখাই যায়।

'ভালোই হবে আপনি থাকলে। আজ বাদেও, সামনের কয়েকদিন অনেকগুলো

জায়গাতে যেতে হবে। আপনি হয়তো চিনবেন সেগুলো। যদি থাকেন, আমারই উপকার হয়।'

মদনদা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। গাড়িতে সিদ্ধার্থকে বললাম, 'আমার তালিকায় মিসেস বাসু ছাড়াও কয়েকজন আছেন যাঁদের কাছে যেতে হবে। একজন হলেন প্রশান্ত গুরুং।'

'নাম শুনেছি অনেক। কিন্তু লাভ নেই। বহু আগে দার্জিলিং ছেড়ে পরিবার নিয়ে চলে গেছেন। এখন সম্ভবত দেশের বাইরে।'

'পুলিশের রিপোর্টে দুজনের নাম পাচ্ছি। একজন, তখনকার চকবাজার থানার ওসি, ড্যানিয়েল লামা। আর অন্যজন, সাব ইন্সপেক্টর ধনরাজ গম্বু।'

'ধনরাজ গম্বুকে ছোটোবেলায় দেখেছি। শেষের দিকে ডিএসপি হয়েছিলেন। জনপ্রিয় ছিলেন এই টাউনে। ইনিও মারা গেছেন। কিন্তু আর একটা যে নাম বললেন, এটা চেনা লাগছে না। কাকাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এত পুরোনো ঘটনা, প্রত্যক্ষদর্শীরা বেশিরভাগই আর নেই। কী স্টোরি দাঁড় করাব?

'সিদ্ধার্থ, যেটা সমস্যা লাগছে, খটকা বলতে পারেন, সেটা পুলিশ রেকর্ড নিয়ে। আমি দিল্লি থেকে সোজাসুজি নয়, কলকাতা হয়ে আসছি। আসার আগে কলকাতায় রাজ্য পুলিশের আর্কাইভ থেকে কিছু নথি জোগাড় করেছিলাম। বাকিটা সদর পুলিশের লাইব্রেরি থেকে মিলবে, বলা হয়েছিল। তো, যেটুকু পেয়েছিলাম, তাতে যা দেখছি, ড্যানিয়েল লামা ঘটনাটার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন। এই মাপের কেস তাঁরই হ্যান্ডেল করবার কথা। পুলিশ রিপোর্টও তাঁর লেখার কথা। সেটাই প্রথম কয়েকদিন হয়েছিল। কিন্তু ২৩ জুনের পর থেকে দেখছি, সব রিপোর্ট লিখছেন ধনরাজ গম্বু। তাহলে কি কেস হ্যান্ডওভার হলো? হলে, কেন? ড্যানিয়েল লামাকে সরিয়ে দেওয়া হলো কেন? রিপোর্টে সেসব কিছুর উল্লেখ নেই। এমনকি ড্যানিয়েল লামা সম্বন্ধে আর একটা শব্দও কোথাও লেখা হয়নি।

সিদ্ধার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, 'এই নামটাই প্রথম শুনছি। সঞ্জয় অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করেননি এই বিষয়ে? মানে সেই সাংবাদিক, যিনি এই নিয়ে এত লিখে গেছেন? খবরটা তো তিনিই ব্রেক করেছিলেন।'

ম্লান হাসলাম। 'সঞ্জয় অধিকারীও দুই বছর আগে মারা গিয়েছেন।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গাড়ি সাবধানে উঠে এল জলাপাহাড়ের ধাপে দূরে মিসেস বাসুর বাড়ি।

মিসেস বাসুর ছেলে বীরেশ্বর বাসুর বয়েস প্রায় পঁয়ষট্টি। খিটখিটে মেজাজ। গাল তুবড়ে গেছে। মাথায় চুল নেই বললেই চলে। রোগা হাড়সার শরীরের ওপর এই সকালবেলা কল্কাদার পাঞ্জাবি চড়িয়েছেন, যেন বিয়েবাড়ি যাবেন।

'এতদিন আগেকার কথা, মনে থাকে নাকি?' খিঁচিয়ে বললেন বীরেশ্বর। আমরা বসে আছি বাড়ির লাউঞ্জে। শোকেসের কাচে ধুলোর আস্তরণ। সোফায় বসবার পর ক্যাঁচ করে আর্তনাদ করে উঠল। একটা জানলার কাচ ভাঙা। তার ওপর তাপ্পি মারা হয়েছে কাগজের।

'আপনি তখন কি বাড়িতেই ছিলেন?'

'নাহ। আমি কলকাতায় গোয়েঙ্কা কলেজে কমার্স নিয়ে পড়ছিলাম। দেখুন, মাকে আপনারা বেঁচে থাকতে অনেক জ্বালিয়েছেন। পুলিশ, প্রেস, উটকো লোক হুটহাট করে বাড়ি ঢুকে পড়ত। মা শেষদিকে এতই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল যে অচেনা কারোর সঙ্গে দেখাই করত না। আমারও সময় নেই ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার। নিজের ব্যবসা নিয়ে থাকি। অরুণ চৌধুরীরা তো এলিট! শিক্ষিত, উন্নাসিক। আমাদের সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেন না। মিথ্যে বলব না, অভদ্রতা করেননি কোনোদিন। কিন্তু শিক্ষার অহংকার বোঝেন? শিক্ষার অহংকারে মটমট করছে! এসব এলিট সমাজের কেচ্ছা নিয়ে আমি কোথা থেকে জানব?'

সিদ্ধার্থকে আড়চোখে দেখলাম, প্রাণপণে মনোযোগ দিয়ে টিভির গায়ে লাইন করে হাঁটা পিঁপড়ের সারি দেখছে। বীরেশ্বরবাবুও এত খিটখিটে মেজাজে আছেন যে সিদ্ধার্থর কথা তাঁর মনেও নেই। শুরুতে একবার 'ভালো তো?' বলা ছাড়া ওর দিকে ফিরেও তাকাননি। আবার চেষ্টা করলাম, 'মা কিছু বলতেন না? মানে, এই ধরুন ঘরোয়া আড্ডায়, বা খাবার টেবিলে? যা দেখেছিলেন সেই নিয়ে কিছু?

'কী আর নতুন করে বলবে! পুলিশকেই তো যা জানার জানিয়ে দিয়েছিল। আর অত পুরোনো ঘটনা, মনেও নেই।'

'না, মানে শেষবয়সে এসে তো অনেকে অতীতের স্মৃতিচারণ করতেন। বা আপনার বাবাকে জানিয়ে যেতে পারতেন কিছু। সেরকম কিছু জানেন?' অজান্তে গলার স্বরে একটা ব্যগ্রতা চলে এসেছিল আমার।

'এটা কি জেরা হচ্ছে?' খেঁকিয়ে উঠলেন বীরেশ্বর।

ভুল রাস্তায় চলেছি। গলা নরম করে বললাম, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না প্লিজ। জানি, অতীতের স্মৃতি নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করলে আপনার ভালো লাগবে না। আমি একদমই জেরা করছি না। শুধু অনুরোধ করছি, যদি কিছু মনে পড়ে আপনার।'

এবার নরম হলেন বীরেশ্বর। মাথা নাড়িয়ে হুঁ বলে চিন্তা করলেন একটু। তারপর বললেন, 'নাহ্, কিছুই মনে নেই। মা-ও পরে আর এগুলো নিয়ে বিশেষ কথা বলেনি। আমার আগ্রহ ছিল না। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার ভাই, সে বহুদিন আগেই অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। তাকে কিছু বলে থাকলে, জানি না। কিন্তু আমাদের মধ্যে এসব নিয়ে কথা হতো না।' বলে আনমনা হয়ে গেলেন।

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। ব্যাগের ভেতর খাতা পেন পুরে সিদ্ধার্থকে চোখের ইশারা করলাম। 'ধন্যবাদ মিস্টার বাসু। আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।'

দরজার বাইরে পা ফেলেছি, মিস্টার বাসু নিজের মনেই বললেন, 'অরুণ কিছু খুঁজছিল।'

আমি পিছু ফিরলাম, 'কিছু বলছেন?'

'মা বলেছিল, অমিতাভ মিত্র বেরিয়ে যাবার পর, বাগানের মাটিতে ঝুঁকে পড়ে অরুণ চৌধুরী কিছু একটা খুঁজছিল। অল্প সময়ের জন্য। তারপর বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। এটুকুই। আর কিছু মনে পড়ছে না।'

'কী খুঁজছিল? মা কিছু বলেছিলেন?'

'উঁহু, মা শুধু দেখেছিল অরুণ মাথা নীচু করে খুঁজছে। কী, সেটা বুঝতে পারেনি।

, কাল সন্ধের অন্ধকারে খেয়াল করিনি। আজ দেখলাম, অরুণ চৌধুরীর বাড়ির যেদিকে গেস্টহাউস, তার উল্টোদিকে একটা বারান্দা আছে। চারপাশে রেলিং দিয়ে ঘেরা, উপরে টালি। অরুণ চৌধুরী সেখানে বসে দাবা খেলছেন। নিজের সঙ্গে নিজে। গভীরভাবে তাকিয়ে আছেন বোর্ডের দিকে। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি, বাবা আমাকে দাবা খেলা শিখিয়েছিল। কিন্তু বারবার হেরে যেতাম। বাবা মূলত বিভিন্ন ধরনের চাল শেখাত। বারবার হেরে গেলে যাতে মনখারাপ করে খেলাটা ছেড়ে না দিই, তার জন্যে বাবা নিজেও অনেকসময়ে ইচ্ছে করে হেরে যেত। অরুণ কি প্রতিদিন নিজেকেই হারাবার সংকল্প নিয়ে ঘুম থেকে ওঠেন?

'কাকা!'

আমি আর সিদ্ধার্থ বড়ো ছাতাটার নীচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অরুণ মুখ তুলে আমাদের দেখে হাসলেন।

সিদ্ধার্থ হাতের ছাতা গোটাতে গোটাতে বলল, 'কাকিমার ওষুধটা এনেছি। আজ কেমন আছে?'

'সকাল থেকে অনেকটা ভালো। যা গিয়ে দেখা করে আয়। ঘরে শুয়ে আছে।'

অরুণের দিকে ফিরলাম, 'কাল আপনাকে বলেছিলাম, আজ সকালবেলা আসবো। তার কারণ গোটা জায়গাটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, কিছু ছবি তুলব। আমার ফটোগ্রাফার আগামীকাল শিলিগুড়ি থেকে আসবেন। আসার আগে তাঁর

কাছে সম্ভাব্য সমস্ত ফটোর স্যাম্পেল এবং তাদের লোকেশান পাঠাতে হবে। সেই ফটোগুলোর মধ্যে আপনার বাড়ির ছবিও আছে। সম্ভাব্য ক্রাইম স্পটের ছবি তো, ওটা থাকতেই হবে গল্পের সঙ্গে।'

'আপত্তি নেই। আসুন।' অরুণ হাত বাড়ালেন।

বাড়িটার পেছনে অনেকখানি বাগান। ঢালু হতে হতে নীচে নেমে গেছে। সেই নীচু জায়গাটায় একটা সরু পায়ে চলা পথ, আর বাকিটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি। সেটা পেরিয়ে পাহাড়ের আর একটা শিরা, যার ওপর আবার বেশ কিছু বাড়ি। চৌধুরী ভিলার গেস্টহাউসটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ি বলা যায়। ভেতরে কিচেন, ছোটো বাথরুম, একটা বেডরুম। কিচেন দিয়ে লাগোয়া স্টোররুমে যাওয়া যায়। স্টোররুমের আর একটা দরজা পেছনের বাগানের দিকে মুখ করে স্টোররুমের ভেতর দেখলাম, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে রাশি রাশি পুরোনো ম্যাগাজিন, ছেঁড়া বইখাতা। ইতিউতি ঘুরতে গিয়ে কয়েকটা খাতায় চোখ পড়ল। জটিল গাণিতিক ফর্মুলাতে ভর্তি। অনন্যা চৌধুরী এই বয়সে এসেও সক্রিয়!

মূল বাড়ির অন্যপ্রান্তে বাইরে দিয়ে বাহারি ঘোরানো সিঁড়ি দোতলার ব্যালকনিতে উঠে গেছে। দোতলায় উঠিনি কাল, তবে চোখের হিসেব দিয়ে মনে হলো, প্রায় দেড় হাজার স্কোয়ার ফিটের বাড়ি। ওপরে খান তিনেক ঘর থাকার কথা। নীচের তলাটা শুধুই কিচেন, ডাইনিং রুম এবং লাউঞ্জ।

'আমরা বেশ কয়েক পুরুষ আগে মুর্শিদাবাদ থাকতাম। আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় অনাদিচরণ চৌধুরী ছিলেন কুচবিহারের রাজবাড়ির ব্যক্তিগত চিকিৎসক। সেই সময়ে তিনি পরিবার নিয়ে রাজপ্রাসাদে থাকতেন। একবার ছোটো রাজকুমারের লিভারের জটিল অসুখ সারিয়ে দেওয়ার পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মহারাজা তাঁকে কিছু ধনসম্পদ উপহার দিয়েছিলেন। অনাদিচরণ ছিলেন দূরদর্শী পুরুষ। আর উত্তরবঙ্গ তাঁর ততদিনে ভালো লেগে গিয়েছিল। তিনি মুর্শিদাবাদ ফিরলেন না।

নিজের সম্পদ বিনিয়োগ করলেন দার্জিলিং-এ। দার্জিলিং তখন ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। ঐশ্বর্য ও রাজকীয়তার স্নায়ুকেন্দ্র। অনাদিচরণ দুটি চাবাগানের শেয়ার কিনলেন। অংশীদারিত্বে ব্যবসা শুরু হলো। তারপর দার্জিলিংএ কিছু জমি কিনে সেখানে থিতু হলেন। আমাদের যে মূল বাড়ি, সেটা অনাদিচরণেরই বানানো। সেটা ছিল ফুলবাড়িতে। ১৯০৫ সালে বানানো হয়েছিল। সে ছিল প্রায় প্রাসাদের মতো বাড়ি। বাবা একমাত্র সন্তান ছিলেন। অত বড়ো বাড়ি দেখভাল করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি সেই বাড়ি বিক্রি করে দিলেন এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীকে, এবং তার পরিবর্তে এক এক করে তিনখানা ছোটো কটেজ আমাদের তিন ভাইয়ের জন্য বানালেন। বড়দা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। আর ফেরেননি। আমিও আমার চা-বাগানের শেয়ার অন্য দাদা, মানে সিদ্ধার্থর বাবার কাছে বিক্রি করে দিলাম। বর্তমানে বড়ো ভাইয়ের কটেজটা বিক্রি হয়ে গেছে। দাদার ছেলেমেয়েরাও ফিরতে চায় না দেশে। আছি আমি আর মেজদা। এই বাড়ি বাবা বানিয়েছিলেন ১৯৫৫ সালে। আমি তখন আট।'

অরুণ কথা থামিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। খেয়াল করিনি। নিজের মনে ঘুরছিলাম। তারপর একসময়ে দেখি অরুণ নেই। পেছন ফিরলাম। অরুণ দূরের পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছেন।

'হয়ে গেছে। ধন্যবাদ।'

অরুণ ঘাড় ঘোরালেন। 'বাগানে গিয়ে বসি তাহলে?'

বাগানের ধারের বারান্দায় বসে বললাম, 'আপনার কথামতো অমিতাভর উপন্যাস ধরেছি। কিন্তু আপাতত ওটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। পুরোটা পড়তেও সময় লাগবে। আমি অন্য ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। কিছু কনট্যাক্ট যদি দেন, যাঁরা এই কেসের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।

কনট্যাক্টের ব্যাপারটার সরাসরি উত্তর দিলেন না অরুণ। পালটা প্রশ্ন করলেন, 'কী মনে

হল লেখাটা পড়ে?'

'লেখা খুবই সোজাসুজি। সম্ভবত পয়লা অথবা দোসরা জুন থেকে লেখা শুরু হয়েছিল। মানে অমিতাভর মৃত্যুর দিন দশেক আগে থেকে। হত্যারহস্য নিয়েই মূলত চর্চা করেছে। লকড রুম মার্ডার, বা বন্ধ ঘরের মধ্যে খুন এই নিয়ে এত বেশি লেখা হয়েছে যে এখানে হয়তো নতুন কিছু পাব না। তবে হ্যাঁ, মিল একটা আছেই। মাধব আর আনিসুর একভাবে দেখতে গেলে আপনি আর অমিতাভর রূপক। একজন খুন হলো, অপরজনের ঘাড়ে সন্দেহের ছায়া পড়ল। পড়তে ইন্টারেস্টিং লাগছে, এটুকুই। হনকাকু গোত্রের লেখা।'

'এটা কি ব্যাকরণগতভাবে ঠিক বললেন? হনকাকু ঘরানা এসেছে ১৯৮১ সালে সোজি শিমাদার টোকিও জোডিয়াক মার্ডার্স বইটা প্রকাশের পর থেকে। সেখানে এই উপন্যাস তো ১৯৭৫ সালের।'

'তাহলে অমিতাভকে এদের পূর্বসূরী বলতে হয়, কারণ গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে ধাঁধা, লকড রুম রহস্য, একলা বাড়ির ভেতর খুন, এরকম নানাবিধ দুরূহ সমস্যা এনে প্রায় অঙ্কের নিয়ম সাজিয়ে সাজিয়ে সমাধান, যেখানে সাহিত্য কম বরং সমাধানের মজা বেশি, সেই ব্যাপারগুলোই তো এই উপন্যাসে ভর্তি।'

'হুঁ, চরিত্রে খুবই অর্থোডক্স। সে যাই হোক, ব্যক্তিগতভাবে আমি এই গোত্র নিয়ে আগ্রহ পাই না, কারণ মানুষের মন, তার সমাজ, তার পারিপার্শ্বিক, এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ভাষা ও শৈলী। এগুলোকে বাদ দিলে বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধা বানানো যায় অনেক, কিন্তু ধাঁধা আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। জাপানে একসময়ে ওসব ঢেউ প্রচুর এসেছিল, বটে, শিন-হনকাকু নাম দিয়েছিল আবার, নিউ অর্থোডক্স, তবে সাহিত্য না থাকলে শুকনো মগজের খেলা কতদিন আর ভালো লাগে মানুষের। ওরা তো বলত সাহিত্যের চাপে ডিটেকটিভ গল্প তার রোমাঞ্চ ও বুদ্ধির খেলা হারিয়েছে, তাই ওরা আবার ফিরে যেতে চায় অর্থোডক্স ঘরানার গল্পে। কিন্তু পেছনদিকে হেঁটে লাভ কী! এক নদীতে দুবার স্নান করা যায় না। হনকাকুতে যেন একজন জাদুকর জাদুবিদ্যা দেখিয়ে খুন করছে আর গোয়েন্দাকে সমাধান করতে হচ্ছে সেই ম্যাজিকের পেছনের কারসাজির। ওরা যতই বলুক যে হনকাকু ছিল ডিটেকটিভ সাহিত্যের হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণযুগের প্রতি প্রেমপত্র, মোদ্দা কথাটা হলো সেই স্বর্ণযুগের আগাথা ক্রিস্টি বলুন বা জন ডিকসন কার, এমনকি জাপানের গোয়েন্দা গল্পের যিনি প্রথম পুরুষ, এডোগাওয়া র‍্যাম্পো, এদের সবারই লেখায় একটা ভালো সাহিত্য খুঁজে পাওয়া যেত। আর আপনি শিন-হনকাকু গোত্রের নামকরা বইগুলো দেখুন, অ্যালিস অ্যাকারাগুয়ার মোয়াই আইল্যান্ড পাজলবলুন বা ইউকিতো আয়াতসুজির ডেকাগন হাউস মার্ডারস, মানে যে বইগুলো ওই ঘরানার গ্রাউন্ডবেকিং হিসেবে গণ্য করা হয়। হ্যাঁ রহস্য আর সমাধান হিসেবে অসামান্য মানছি। কিন্তু সাহিত্য?'

'আপনার লেখাতেও মনস্তত্ত্ব, সমাজ, মানুষের চালচিত্র এগুলো কোথাও কোথাও রহস্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ওই যে বিখ্যাত বই আপনার, চার্বাকের সময়, সেটায় তো আপনি অপারেশন সানশাইনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা হত্যাকাহিনীকে সামনে রেখে কলকাতার ভবঘুরেদের জীবনকে তন্ন-তন্ন করে ঘেঁটেছেন বলা যায়।'

'আর কীভাবে লিখব? আমাদের লিখতে শিখিয়েছেন দেবেশদা, অমিয়ভূষণ, মতি নন্দী। এঁদের লেখাপত্র শিকারি বেড়ালের মতো অনুসরণ করে গিয়েছে আমাদের প্রজন্ম। আমি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখলেও নিজস্ব অর্জনটুকু ফেলে দেব কী করে! ওই, অমিতাভ যেরকম লিখেছে, ওতে তো আর সাহিত্য নেই। ওভাবে লিখে আজকাল আপনি পাত্তাও পাবেন না। হনকাকু মৃত, তার সময় অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছে।'

'আমারও যে উপন্যাসটা সাহিত্যগুণে পড়তে ভালো লাগছে, এমনটা না। তবে রহস্য সমাধানের আগ্রহটুকু আছে। অমিতাভ বেঁচে থাকলেও মনে হয় না ঔপন্যাসিক হিসেবে

সুবিধা করতে পারতেন। কবিতাই ওঁর জায়গা ছিল। এই লেখা লিখতে এসে স্বধর্ম খুইয়েছেন।'

'সমাধানটা খুঁজে বার করবার আগ্রহ পাচ্ছেন না?

'এখনো অনেক বাকি। তবে, মাধব খুন করেছেন এটাই আপাতত মনে হচ্ছে। সেই যে, ব্যোমকেশ বক্সীর একটা গল্প ছিল না? একজন লোক ভয় পেয়েছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে হত্যা করবে। তাই সে ব্যোমকেশকে চিঠি লিখেছিল। বাস্তবে দেখা গেল, তার প্রতিদ্বন্দ্বীই খুন হয়েছে। এবং খুন করেছে এই লোকটিই। ব্যোমকেশকে চিঠিটা লিখেছিল সন্দেহ থেকে বাঁচবার জন্য। এই সূত্র মেনে এগোলে এখানে মাধব খুন করতেই পারেন।' অরুণের চোখে চোখ রাখলাম, 'ঠিক যেমন গতকাল স্বীকার করলেন যে আপনিই খুন করেছিলেন অমিতাভকে।'

'আর অ্যালিবাই?'

'আরও কিছুটা না পড়লে বুঝতে পারব না। কিন্তু আমার যে অন্য প্রশ্ন আছে!' 'বলুন, কী জানতে চান।

'অমিতাভ কেমন ছিলেন? তাঁর চরিত্র কী ছিল? মানুষ হিসেবে কীরকম? আপনি তাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন বহু বছর। স্টোরিতে এই মানবিক স্পর্শটা লাগবে। আর অমিতাভর কোনো ছবি। ক্যানডিড হলে ভালো হয়।'

অরুণ ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢাললেন দুজনের জন্য। হাতে কফির মগ ধরিয়ে বললেন, 'বহুদিন আগের কথা। আমারও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে স্মৃতি। অমিতাভ পাগলাটে ছিল ছোটোবেলা থেকেই। কিন্তু কলমে জোর ছিল। কবিতা লিখত অসাধারণ। স্কুলে পড়বার সময়ে একটা কবিতা লিখেছিল, 'কার্শিয়াঙের মেঘ আমি কখনো দেখিনি।'কী অসামান্য চিত্রকল্প! আমি কিছুটা মণীন্দ্র গুপ্তর কবিতার সঙ্গে মিল পেতাম ওর লেখার ধরনের। 'বনে আজ কনচের্টো'— পড়েননি, না? অমিতাভ ওই ধরনের লিখত।'

'কী মনে হয়, বেঁচে থাকলে বড়ো কবি হতেন?

'ঠিক জানি না, বড়ো বলতে আপনি কী বোঝেন। পুরস্কার অথবা অমরত্ব, এসবকে অমিতাভ গ্রাহ্যও করত না। সেই সময়কার একটা পঙক্তি ও পোস্টার বানিয়ে নিজের কাছে রেখেছিল, 'পুরস্কার গ্রহণ করা যায় একমাত্র শয়তান অথবা ঈশ্বরের হাত থেকেই। ভোটে জেতা মানুষের নোংরা হাত থেকে কোন্ শিল্পী পুরস্কার গ্রহণ করবে?' বাজারকে সে পাত্তা দিত না। কিন্তু আবার আমার উপন্যাস বেরোবার খবরে ওভাবে রিঅ্যাক্ট করল। হয়তো ভেতরে ভেতরে রেকগনিশনের প্রত্যাশা ছিলই। তবে বাংলা কবিতার বাজারে তখন ও একা নয়, বলতে পারেন জোয়ার এসেছিল। বাইসন বলে একটা কাগজ বার করত মৃদুল দাশগুপ্ত। অসাধারণ সব কবিতা। আমার বন্ধু ছিল শামসের, শামসের আনোয়ার। কলকাতায় পড়তে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। 'খোলা ব্লেড দেখলে তৃষ্ণায় আমার গলা জ্বলে/ পাখার হুক দেখলে মনে পড়ে যায় সোনালি ফাঁসের কথা।' ক্রুদ্ধ,

শোকার্ত, হাহাকারময়, অথচ হাংরিদের থেকে কত আলাদা! আধুনিক, হয়তো পশ্চিমি ঢঙেই আধুনিক। কিন্তু সে কি আমরাও নই? তখন সব কবিতা পড়তে গেলেই অস্বস্তি হতো, মনে হতো কাঁটার মতো প্রশ্নচিহ্ন উঁচিয়ে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে৷ কৃত্তিবাস, শতভিষার মতো পত্রিকারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জেলা ও গ্রামগঞ্জ থেকে স্রোতের মতো উঠে আসছিল লিটল ম্যাগাজিনের বাহিনী। আদ্রা থেকে বেরোনো কেতকী, বর্ধমান থেকে বেরোনো বাল্মীকী, আসানসোল থেকে কবিকণ্ঠ, নবদ্বীপ থেকে অজ্ঞাতবাস— আর কত বলব! অমিতাভকে আমি যখন ভাবতে যাই আজকাল, এই কবিদের, এই পত্রিকাগুলোর থেকে আলাদা করে ভাবতে পারি না। এদের কেউ কেউ এখন প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে, আবার অনেককেই আমাদের আগামী প্রজন্ম মনে রাখবে না। কাউকে আগে ভুলবে, কাউকে কিছুদিন পর। কিন্তু অমিতাভ তো এরাই! এই সব টুকরো টুকরো সাতের দশকের কবিতাগুলো নিয়েই তো ও, ওর দার্জিলিং, আমাদের বন্ধুত্ব।'

'কবিতার প্রতি আপনার এই তীব্র প্রেম, এদিকে লিখলেন গোয়েন্দা গল্প। কেন?' অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন অরুণ। 'আমি যে কবিতা লিখতে পারি না টিনা। কোনোদিনও পারিনি। শুধু হিংসে করে গিয়েছি অমিতাভদের।

হাসি পেল। বললাম, 'চেষ্টা করুন, এখনও হতে পারে।'

অরুণের স্বর নিবিড় হয়ে এল, 'কবিতা না থাকলে অমিতাভর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটাই থাকত না। ওর ওই প্যাশন, পাগলামি— দিনরাত আমরা দার্জিলিংএর জঙ্গল, পাহাড়, চা-বাগান উপত্যকায় একসঙ্গে হেঁটেছি মাইলের পর মাইল। স্টেপ অ্যাসাইড, লোয়ার টুংসুং ধরে হাঁটতে শুরু করে চক্কর খেয়েছি গোটা শহর। অমিতাভর মাথায় হঠাৎ করে কোনো কবিতার লাইন এসেছে, এদিকে সঙ্গে কাগজ-কলম নেই। ও কাঠি দিয়ে মাটির ওপর লিখে ফেলেছে সেই লাইন। তখন নকশাল আন্দোলন আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে। হুটহাট করে রাতবিরেতে এখানে ওখানে চলে যাওয়া উচিত নয়। এমনকি, অমিতাভর বড়ি যেখানে মিলেছিল, সেই সেমেট্রির মাটিতে তার আগেও এরকম গুলি খাওয়া লাশ পড়ে থেকেছে। কিন্তু আমরা ছিলাম অকুতোভয়— আমরা দুজন কোথায় না গিয়েছি। এসবই দুজনের রাস্তা আলাদা হবার আগের ঘটনা। কিছুদিন পরে আমি কলকাতায় চলে যাই দুই বছরের জন্য। মাস্টার্স করতে। তখন ছেদ পড়বে, স্বাভাবিক। ফিরে আসবার পর কাজকর্ম, পরিবার এসবেও জড়িয়ে গেছি। থিতু হয়েছি আস্তে আস্তে। কিন্তু অমিতাভ পালটায়নি।'

'আচ্ছা, অমিতাভর প্রথম দিককার আর শেষের দিককার কবিতায় একটা বাঁকবদল লক্ষ করেছিলেন কি? মানে, আমি যেটুকু এখান ওখান থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম আর কী — শুরুর দিকে মেঘ, কুয়াশা, মিরিক, একলা জিপগাড়ি, ভাঙা শহর, নির্জন দেবতার মূর্তি— পরের দিকে বারবার লাশ, রক্ত, হুটার, পাগলি ঘণ্টি। পাহাড় বলে কোনো কিছুরই অস্তিত্বই নেই আর।'

অরুণ মাথা নাড়লেন, 'গতকালকেই বলেছিলাম, সময়টার একটা প্রভাব থাকেই। যারা সেই অর্থে কমিটেড নয় তাদের লেখাতেও নকশালবাড়ির ছায়া পড়েছে। তার ওপর অমিতাভ তো উত্তরবঙ্গেরই। সত্তরের ইম্পর্ট্যান্ট কবি ছিলেন অজয় নাগ। মূলত আত্মমগ্ন স্বরের অধিকারী, নীচু গলায় প্রেম আর যন্ত্রণার কথা বলতেন। সেই তিনিও লিখেছেন— 'লাল আগুন সমস্ত দিগন্ত পুড়িয়ে ডাকছে/সাজানো জীবন ছেড়ে কাঁটাপথে তুমি কি আমার সঙ্গী হবে?' গৌতম বসু, আর এক বড়ো মাপের কবি, তিনিও অন্তর্লোক থেকে উঠে আসা কবিতা লিখতে লিখতেই রাজনৈতিক বাক্য উচ্চারণ করে দিয়েছেন। আবার উল্টোটাও আছে। শম্ভু রক্ষিতের মতো কবি এখনও কমই এসেছেন আমাদের দেশে। যদি শম্ভুর কবিতা পড়তে যান, দেখবেন, পরাবাস্তব অজস্র দৃশ্যের একত্র সমীকরণে এমন একটা শব্দবিশ্ব তৈরি করেন শম্ভু, যেখানে উচ্চারণ ভেঙে যায়। মনে হয় সবই অসংলগ্ন। অবচেতনে বোধের অভিজ্ঞতার আভাস পাওয়া যায় শুধু। এই কবিতার ভেতর আপনি মাথা খুঁড়লেও রাজনীতি পাবেন না। শম্ভুর কোনো কবিতাতেই পাবেন না, এবং আপনি ভাববেন শম্ভু রক্ষিত একজন অরাজনৈতিক কবি। তারপর আমি আপনাকে জানাব, শম্ভু ছিল সম্ভবত একমাত্র বাঙালি কবি যে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে লিখে জেল খেটেছিল।' এটুকু বলে নিমগ্ন দৃষ্টিতে বাগানের দিকে তাকালেন অরুণ। নরম হাসলেন আপনমনে, অস্ফুটে বললেন, 'শম্ভু! বারুদের গোলা!'তারপর মুখ ফেরালেন আমার দিকে, 'এস্টাব্লিশমেন্টের কাগজে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কথা বলছি না। কিন্তু তার বাইরে যে বিরাট কবিদের দল, তাঁরা অনেকেই ওই সময়টাকে অস্বীকার করতে পারেননি।'

'আপনি ছাড়া অমিতাভর অন্য কোনো বন্ধু...'

'ছিল অনেকে। তবে দার্জিলিং-এ আমি বাদে বিশেষ কেউ ছিল না।... বেশিরভাগই কলকাতায়, অন্যান্য জেলারও, কুচবিহারের অনেকে। মূলত লেখালেখির সূত্রেই বন্ধুত্ব। অনেকের বাড়ি গিয়ে থেকেও এসেছে। তবে আদতে ও ছিল সোসিওপ্যাথ। নিঃসঙ্গ থাকতে

পছন্দ করত। শুধু আমাকে ভালোবাসতো খুব। স্কুলে, পরে কলেজে পড়বার সময়েও ও ছিল প্রতিভাবান, কিছুটা একলা। আপনমনে ঘুরে বেড়াত এখানে ওখানে। মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত। আবার ফিরে আসতো কয়েকদিন বাদে। কোথায় গিয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলে হাসতো। বলত, 'আমার কি ঘুরতে যাবার জায়গার অভাব আছে রে শালা? অতুল্যমামা হাত ধরে সাধাসাধি করছে, ওর সঙ্গে একবার দিল্লিটা ঘুরে আসতে। ইন্দিরাদি নাকি আমি গেলেই স্পেশাল সুক্তোটা বানাবে।' এসব হাবিজাবি বলত। তারপর জানা যেত কলকাতায় গিয়ে পার্ক সার্কাসের বস্তিতে কোনো এক কবি বন্ধুর সঙ্গে পনেরো দিন কাটিয়ে এসেছে। কখনো জানতে পারতাম, চন্দননগরে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে টানা তিনরাত শুয়ে বসে কাটিয়েছে। এরকম আর কী! পড়াশোনা সেরে কলকাতা থেকে ফিরে দেখলাম ওর এই পাগলামি বেড়ে গিয়েছে। একবার তো বেশ কিছুদিন পরে ফিরল, একাত্তরের মাঝামাঝি, যতদূর মনে পড়ে। ভয় পেয়ে পুলিশে ডায়রিও করেছিলাম। ফিরল যখন, জামা প্যান্ট নোংরা, অবিন্যস্ত। তার ওপর মদের শুকনো দাগ। মুখ থেকে অনাহারের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। ঘন দাড়ি রাখত। সারাদিন ধরে, যখন লিখছে না, আপনমনে নখ খেতে খেতে ভেবে যাচ্ছে, এরকম স্বভাব ছিল। আঙুলের চামড়া মাংস অবধি খেয়ে ফেলছে বলে মনে হতো মাঝে মাঝে, এত নখ খেত। আমাদের মধ্যে যখন আড্ডা হতো, মাঝে মাঝেই কথা বলতে বলতে চুপ করে যেত দুম করে। আর ওকে খুঁজে পাওয়া যেত না, পুরো হারিয়ে যাওয়া চোখ। আমরা বলতাম, এবার নির্বাণ লাভের সময় হয়েছে। তখন ও কলেজ পাস করে গেছে। একটা চাকরি পেয়েছিল, কিছুদিন পর সেটাও ছেড়ে দিয়েছে। এখানে ওখানে ছুটকো টিউশনি, কোনো প্রেসে প্রুফ দেখার কাজ এসব করে নিজের খরচ চালায়। একটা ছোট্ট ঘরে পিজি নিয়ে থাকে। সেখান থেকে তো নীচে গ্রামের দিকে চলে গেল। ওখানে নাকি ওর লেখা হবে। দার্জিলিং-এ এত টুরিস্ট বেড়ে চলেছে যে মনোযোগ দিতে পারছে না, অবসাদ চলে আসছে। আমিই সন্ধান করে একটা ছোটো ঘরের ব্যবস্থা করে দিলাম, গ্রামটার ধারে। মাসে মাসে কিছু টাকার ব্যবস্থা আমাদের কোম্পানির একটা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ট্রাস্ট আছে, সেখান থেকে এটা ওটা বলে, কমিটিকে বুঝিয়ে সামান্য কিছু অনুদান ওর জন্যে। কিন্তু মাঝে মাঝেই বিরক্ত লাগত। আর কতদিন একটা ছেলে এভাবে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরবে? কী খায় তার ঠিক নেই। কোথায় থাকে তার ঠিক নেই। তার ওপর লিভারের একটা সমস্যায় ভুগছিল। লেখা বেরোচ্ছে টুকটাক, তা ঠিক। আবার গল্পও লিখতে শুরু করল। সেটাও খারাপ লিখছিল না। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এত বিভ্রান্ত, তার ওপর এত নেশা করত যে আমার মনে হতো ও একটা বেলাইন হয়ে যাওয়া রেলগাড়ি, যা খাদে ঝাঁপ দেবে যে কোনো সময়ে।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে এই ঝগড়া, বা আপনার নামে অভিযোগ, এটার কারণ কী? '

'আমিও জানি না। ওর মাথায় ভূত চেপেছিল তখন।' অরুণ আরেকটু কফি ঢাললেন। সামান্য চলকে পড়ল টেবিলে। টিস্যু দিয়ে সাবধানে মুছে যত্নের সঙ্গে চারভাজ করে সেটাকে রেখে দিলেন একপাশে।

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ির একটা কবি সম্মেলনে এসেছিলেন একবার। কথায় কথায় বলেছিলেন, অমিতাভ মিত্র ইম্পরট্যান্ট কবি। সেটা ৭৩ সাল। অমিতাভর সঙ্গে তখন আলাপ হয়েছিল, আড্ডাও হয়েছিল অনেকটা সময়। শক্তিদা বড়ো হৃদয়ের মানুষ, আমাদের দুজনকেই ভালোবাসতেন। যখন অমিতাভকে বোঝাতে গিয়েছিলাম, এটুকুই বলেছিলাম যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার এসব পেটি ব্যাপারে থাকা সাজে না। তাতে উলটে অমিতাভ বলল যে ওর জেহাদ নাকি বাজারি কাগজগুলো সাহিত্যের যেরকম পণ্যায়ন ঘটাচ্ছে তার বিরুদ্ধে। শম্ভু রক্ষিতের কথা বললাম আপনাকে একটু আগে। তখন মেদিনীপুরের বিরিঞ্চি রোড থেকে শম্ভুর লিটল ম্যাগাজিন মহাপৃথিবী বেরচ্ছে। সেখানে অমিতাভর একগুচ্ছ কবিতা বেরিয়েছিল। সেই সংখ্যাটা আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল আমি সারাজীবন বড়ো পত্রিকাতে লিখলেও অথবা থান ইটের মতো উপন্যাস বার করলেও ওই একগোছার ধারে দাঁড়াবার ক্ষমতা হবে

না। কিছু মনে করিনি, কারণ জানি ও পাগল, কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল, ওর মাথা ঘুরে যাচ্ছে। পুরোটাই যে ব্যক্তিগত ক্ষোভ তা বলছি না। নীতিগত অবস্থান অনেকের মতো ওরও ছিল। কিন্তু ব্যালেন্সের অভাব দেখেছি, মনে হয়েছে একটা অবস্থান নিতে নিতে ও সেটাকেই পার্সোনালি নিয়ে ফেলেছে। ফলত যারা বাণিজ্যিক কাগজে লিখেছে সবাই ওর ব্যক্তিগত শত্রু, কথাবার্তা শুনে এরকম মনে হয়েছিল। যদিও ব্যাপারগুলো তো কখনোই এত সরল ছিল না। বাণিজ্যিক পত্রিকায় লিখলে সে বিক্রীত আর লিটল ম্যাগে লিখলেই আপোষহীন, এরকম সরল বিভাজন শুনতে রোমান্টিক লাগলেও সাহিত্য বলুন না এস্টাবলিশমেন্ট, কোনোটাই ওভাবে সরলরেখায় চলে না। সে যাই হোক। তবে একটা কথা ঠিক, তখন অমিতাভকে ধুয়ো দেবার লোকেরও অভাব ছিল না। সঞ্জয় অধিকারীর সেই সময়কার লেখাগুলো আপনি পড়েছিলেন?'

'কয়েকটা পড়েছি। সঞ্জয় সুকৌশলে আপনাদের দুজনকে লড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।'

'সেটায় দোষ দেব না, কারণ ওঁকেও তো লেখা বিক্রি করাতে হবে। সেনসেশন না থাকলে সাংবাদিক বাঁচে না।'

'হ্যাঁ, সেনসেশন তৈরিতে সঞ্জয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ওঁর অন্য ইস্যুতেও কিছু রিপোর্ট পড়েছি। বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়ে এখানকার নকশালপন্থী তরুণেরা সীমান্তে পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র-ট্রেনিং দিয়েছিল, সেই রকম একটা ক্যাম্পে গিয়ে সঞ্জয় খবর করেছিলেন। ভারতীয় প্রশাসন নাকি জানতো, কিন্তু বিশেষ ঘাঁটায়নি সেই তরুণদের। উলটে পুলিশ আর সীমান্তরক্ষীরা অনেক জায়গায় সহায়তাও করেছে। তারপর তসলিমা নাসরিন যখন বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, দিনের পর দিন তাঁকে নিয়ে লিখে গেছেন। হুমায়ুন আজাদের রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে সেনসেশনাল লেখা লিখেছেন। এগুলোর কিছু কিছু আমি পড়েছি। চমকপ্রদ স্টাইলে লিখতেন ভদ্রলোক।

'তবে সঞ্জয় যদি অমিতাভকে এই সময়ের অন্যতম সেরা প্রতিশ্রুতিবান কবি ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত না করতেন, তাহলে ওর হয়তো মাথাটা ঘুরত না। ওই খবরটাই কাল হলো। এমনিতেই ওর ভারসাম্যের অভাব ছিল। সেটাকেই খুঁচিয়ে দেওয়া হলো এই খবরগুলো করে।'

'সঞ্জয় অধিকারী কিন্তু অমিতাভ মিত্র-র হত্যারহস্য নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখে গিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, যতদিন মানুষের কৌতূহল ছিল আর কী! যতদূর জানতাম সঞ্জয় নিজেও তখন উঠতি সাংবাদিক। একটা স্কপ দরকার ছিল। অমিতাভ মরে গিয়ে সঞ্জয়ের কেরিয়ার তৈরি করে দিয়ে গেল।'

'আপনারও কি দেয়নি?'

অরুণ আমার দিকে তাকালেন।

'অমিতাভ খুন হবার বছরেই, ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আপনার তৃতীয় বই বেরোয়। এবং সুপারহিট হয়। এক বছরে বারোটা এডিশন করতে হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে সিনেমা হয় বইটা থেকে। সেটাও বাণিজ্যসফল ছিল। যে লেখকের আগের দুটো বই বাংলা সাহিত্যে ঢেউ কেন, বুদবুদও তোলেনি, তার তৃতীয় বই এরকম সাফল্য পাবার পেছনে কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?' মাপা গলায় প্রশ্ন করলাম।

অরুণের ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। তারপর একটা হালকা হাসির আভাস দেখা দিল। হয়তো সামান্য তিক্ততাও মিশে ছিল তার মধ্যে। 'একটা পারফেক্ট মার্ডার করে পুলিশকে বোকা বানানো অপরাধীর লেখা রহস্য-কাহিনী পড়বার আগ্রহ মানুষের মধ্যে থাকবে, সেটা স্বাভাবিক না?

হাসির মধ্যে কোথাও একটা হালকা বিদ্রুপ ছিল। সম্ভবত নিজের প্রতিই। 'এর পরেও বলবেন, অমিতাভকে হত্যা করবার কোনো মোটিভ আমার ছিল না? সেনসেশন তৈরি করে ফ্লপ লেখকের বিখ্যাত হবার লোভ কি ঈর্ষার তুলনায় কম শক্তিশালী, টিনা? '

আমি মাথা নীচু করে হাতের কাগজ ওলটাতে থাকলাম। সময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অমিতাভ কি ড্রাগের নেশা করতেন? তাঁর হাতে কয়েকটা সূঁচ ফোটাবার দাগ ছিল।'

'পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল আমাকে। আমি ঠিক জানতাম না। কিন্তু শেষের দিকে ওর উন্মাদনা, অপ্রকৃতস্থ ভাব, নিজের মনে বিড়বিড় করা— এগুলো দেখে আমারও মনে হতো যে ও অন্য কিছুর নেশা করে। জিজ্ঞাসা করে উত্তর পাইনি। তবে মদ তো খেতই অত্যন্ত বেশি পরিমাণে। মদ না খেলে কবিতা লেখা যায় না, এরকম ভুল ধারণা বুকে নিয়ে কত ছেলে যে তলিয়ে গেছে।

'আমি একজনকে পাচ্ছি না। ড্যানিয়েল লামা। এই কেসের তদন্তকারী অফিসার ছিলেন। আপনি কোনো সন্ধান দিতে পারেন?

অরুণ দূরের দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখলাম, তাঁর গালের একটা পেশি কাঁপছে হালকা।

প্রায় আধ মিনিট পর মুখ ফেরালেন, 'ড্যানিয়েল বেঁচে আছে কিনা জানি না। কিন্তু বেঁচে থাকলেও বহুদিন হয়ে গেল সে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে।'

'এঁর ঠিকানা জোগাড় করে নিতে পারব। অফিস থেকে এখানকার পুলিশের একজন কনট্যাক্ট পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে ঠিকানা পেয়ে যাব। আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা হলো, ড্যানিয়েলকে কি আপনি চিনতেন তার আগে বা পরে? কারণ সিদ্ধার্থ আমাকে বলল যে ড্যানিয়েলের নাম শোনেনি। কিন্তু অন্য অফিসার, ধনরাজ গম্বুর নাম জানে। তাই অবাক লাগল। হতে পারে সিদ্ধার্থর জন্ম অনেক পরে। কিন্তু বাড়িতে তো আলোচনা হয়েছে এই নিয়ে অনেকবার। সেখানে পুলিশ অফিসারের নাম আসেনি?'

'ড্যানিয়েল স্থানীয় মানুষ। তাকে আমি কেন, অনেকেই চিনত।'

'কিন্তু ডানিয়েলকে কেস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে অরুণ উত্তর দিলেন, 'এটা তো আমার জানার কথা নয়! পুলিশের ভেতরের ব্যাপার।

'বেশ। তবে ড্যানিয়েলকে লাগবেই। তিনি কথা না বলতে চাইলে তাঁর পেছনে পড়ে থাকতে হবে। যেহেতু ধনরাজ মারা গেছেন, ড্যানিয়েলই এই কেসে আমার একমাত্র সহায়।'

'ড্যানিয়েল দক্ষ পুলিশ অফিসার ছিল। তার দাপটে টাউনে অপরাধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা কম ছিল। কিন্তু ও পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দিল। কেন, তা জানি না। তারপর থেকে শুনেছিলাম লোকজন এড়িয়ে চলে। তবে আমিও বিশেষ খোঁজ রাখিনি। ব্যস্ত হয়ে পড়েছি নিজের জীবন নিয়ে। আর আমার ওপর থেকে সব অভিযোগ পুলিশ ততদিনে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে ড্যানিয়েলের খবর রাখার দরকার ছিল না আর।' দাবার বোর্ডের ওপর থেকে একটা কালো ঘোড়া তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তার গায়ে আঙুল বোলালেন অরুণ।

'আপনি কেন খোলাখুলি পুরোটা বলছেন না মিস্টার চৌধুরী? কেন খুন করলেন, কীভাবেই বা করলেন? আর কীভাবে এতগুলো অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর মেলালেন? আপনি যদি না চান যে সত্যিটা বাইরে বেরোক, তাহলে আমার কাছে স্বীকারোক্তি দিলেন কেন?'

অরুণ ঘোড়াকে নিজের জায়গাতে রাখলেন। 'আমি চাই, আপনি নিজে খুঁজে বার করুন। আমার মুখে শুনলে বিশ্বাস করবেন না, আগেও বলেছি। আপনাকে একটা গল্প লিখতে হবে। সেই গল্পটা তখনই লিখতে পারবেন, যখন নিজে গল্পটাকে খুঁড়ে বার করে আনবেন।'

অদ্ভুত জেদি লোক। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, মরীচিকার পেছনে ছুটছি। কয়েকদিন পর আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।

উঠে পড়লাম। 'ভেবেছিলাম আজকেই আপনার সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে রাখব। কিন্তু এখন ছুটতে হবে অন্য জায়গাতে। সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। কাল সন্ধেবেলা কি ফাঁকা আছেন?'

সিদ্ধার্থ বলে দিয়েছিল যে, তাকে নিয়ে যেন বেরোই। দারোয়ান গেল সিদ্ধার্থকে খবর দিতে। আমি অরুণের বাগান দেখছিলাম।

‘এটা কি সর্পগন্ধা? পাতাগুলো অন্যরকম লাগছে না?’

'সর্পগন্ধাই। কিন্তু দুষ্প্রাপ্য একটা প্রজাতির। কম দেখতে পাওয়া যায়।'

‘এত অদ্ভুত আর নানা ধরনের গাছ, পুরো পূর্ব হিমালয়ের একটা মিনিয়েচার তুলে এনেছেন মনে হয়।’

‘বাগানের নেশা আমাকে ধরিয়েছিল বাবলা। বর্ধমানের ছেলে। এখানে কাজের সন্ধানে ঘুরছিল। আমিই ওকে ধরে মালির কাজ দিই। জাদু ছিল ওর হাতে। আমাকে ধরে ধরে মাটি চিনিয়েছে, সার চিনিয়েছে, গাছের স্বভাব, তাকে কীভাবে আঙুলের স্পর্শে বড়ো করতে হয়, সব শিখিয়েছে।' অরুণের গলার স্বর অদ্ভুত নরম হয়ে এল। গাছগুলোকে কথা দিয়ে আদর করছেন।

আমার বাবার বাগানের শখ ছিল।' মুখ দিয়ে হঠাৎ করে কথাটা কেন বেরিয়ে গেল, জানি না। অরুণ চোখ সরিয়ে আবার দূরের দিকে তাকালেন।

এরপর আর কী নিয়ে কথা চালাব, বুঝলাম না। অরুণ নিজেও আজ অন্যরকম। মাঝে মাঝে অনেকটা কথা বলছেন, আবার দীর্ঘ সময় নির্বাক। মনে হয় গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। অথবা হয়তো মানুষটা মূলগতভাবে এইরকমই। নির্জন, গম্ভীর, শান্ত।

সিদ্ধার্থ আসছে। চলে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছি, কথাটা মনে পড়ল। ‘আচ্ছা, এটা মনে হয় তুচ্ছ ব্যাপার। তবু জিজ্ঞাসা করছি। মিসেস বাসুর ছেলে বীরেশ্বরবাবু জানালেন যে তাঁর মা বলেছিলেন সেই রাত্রে আপনি বাগানের মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজছিলেন। কিন্তু এই কথাটা আমি আমি প্রথম শুনছি। পুলিশের রিপোর্টেও ছিল না কিছু।

অরুণ ভুরু কুঁচকে তাকালেন। বুঝলাম না! খুঁজছি? কী খুঁজব?’

‘সেটাই আমারও প্রশ্ন। কী খুঁজছিলেন?’

অরুণের মুখে হালকা হাসির আভাস দেখা গেল। ‘সেই রাত্রে অমিতাভ যে আসেইনি, আমার এই সরকারি বক্তব্য নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি? '

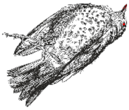

১০/০৩/১৯৭০

প্রিয় ঘেণ্টুদা,

আমার দ্বারা লেখাফেখা হবে না আর। ও বুঝে গেছি। আমি মরে যাচ্ছি ঘেন্টুদা, তলপেটের পেনটা কমছে না কিছুতেই। অরুণ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিল। সে বালের ডাক্তার। বলে মদ ছাড়তে হবে। যেন এ দুনিয়ায় সমস্ত প্রবলেমের মূলে ওই একটাই জিনিস, মদ। মনে আছে, ঊনসত্তরে এই সময়ে আমি কলকাতায়, অরুণের মেসবাড়িতে সারারাত ধরে আড্ডা চলছে, আর বইয়ের ভেতরে উইপোকাদের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে বর্ধমানের সুব্রত। পার্ক সার্কার্স থেকে মাংস নিয়ে এল সামশের, কষিয়ে ঝাল গরগরে রান্না করল অরুণ, বাংলা জোগাড় করে রেখেছিল আগেই, এদিকে নিজে কিন্তু খায় না একফোঁটা। ভাস্কর সেই রাত্রেই বলল, 'সামশের, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব একটা বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্বের মতো।' সামশের আবার বলল, এখনও মনে আছে, 'আমার পছন্দ, সাদা ফটফটে বিছানায় শুয়ে মুঠো মুঠো স্লিপিং পিল খেয়ে, ধীরে ধীরে মৃত্যু উপভোগ করতে করতে নিঃশব্দে চলে যাব।' কিন্তু আমার সেদিন ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল এরাও যেন কত কত আগেকার কবি লেখক, যাদের সময় চলে গেছে। ওদের কবিতাও ভালো লাগল না, মনে হলো এ আমার সময়ের আগে। বিষণ্ণ লাগছিল, মনে হচ্ছিল পালিয়ে যাই। ভোর হতেই বেরিয়ে পড়লাম, অন্যেরা তখনো বিছানায় মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতে এলোমেলো, এদিকে রাস্তাঘাটও ভালো চিনি না। শেষে বাসে উঠে কলেজস্ট্রীট চলে এলাম তারপর কফিহাউসের সিঁড়িতে বসে দেওয়াল মাথা রেখে ঘুমাচ্ছি তো ঘুমাচ্ছিই, কাঁধে কড়া ঝাঁকানি খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা চোখ মেললাম। দেখি দেবারতি। অবাক হয়ে বলছে, 'এখানে এভাবে ঘুমিয়ে আছ? তুমি তো কলকাতা কিছুই চেনো না। এখানে আসলে কী করে?' আমি কিছুই বলিনি, কিন্তু ওকে দেখে হাসলাম, খুব আনন্দ হলো। দেবারতি আমাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে কবিরাজি আর ইনফিউশন খাওয়াল, হাতে বাস ভাড়ার টাকা দিয়ে বলল, 'শেয়ালদা গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করবে, শ্যামবাজারের বাস কোথায় মিলবে।' আমি বললাম, 'কী লিখছ? আমাকে পড়াবে?' উত্তর না দিয়ে সুন্দর করে হাসল। আমি ওর ভেতর একটা শান্ত ধ্যান দেখতে পেলাম। আমার মনে পড়ল অরণির কথা। কতদিন দেখিনি ওকে! একটা দলা পাকানো কষ্ট গলার ভেতর আলুসেদ্ধর মতো আটকে থাকল। তুমি অরণি পড়েছ?

প্রবন্ধ লিখতে ভালো লাগে না ঘেন্টুদা।

প্রথমে পাথর ছুঁড়ে মারি আয়নায়, তারপর তোমায় কবিতা টুকরো টুকরো কাঁচ ছড়িয়ে দি ঘরের ভিতর ও বাইরে পাঠাই? কাগজ, কবিতা আর হিসেবের খাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে জ্বালাই আগুন। ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না আমার। ঠিক ওটাই আমার হচ্ছিল, অরণি কীভাবে যেন বহু দূরে থেকেও সেই ভালো না লাগা, কবিতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে দেবার ইচ্ছাটুকু পড়ে ফেলেছে। আর এখন আবার সেই মন খারাপ। কিন্তু ভালো তো হতেই হবে। অনেক লেখা বাকি। মদটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? অরুণকে বললে ও তো আনন্দে লাফাবে! আমাকে ওর মতো আমিও ভালবাসি না, বুঝলে? যতদিন ও কলকাতায় ছিল, আমার পাঁজরের হাড় খুলে দিয়েছিল ঘেণ্টুদা! ভেবেছিলাম, আর লিখতে পারব না কিচ্ছু। কিন্তু অরুণ ফিরে এল, তার পরেও কেন লিখতে পারছি না? অরুণেশদার কাগজে গুচ্ছ

কবিতা পাঠিয়েছি। কিন্তু এই যে তুমি বললে, সত্তর দশকের কবিতা কোন রাস্তায় হাঁটবে তাই নিয়ে অনুমানধর্মী একটা গদ্য, গত সাতদিন চেষ্টা করেও পারিনি। হয়তো আমার প্রবন্ধ লিখতে ভালো লাগছে না, সেটাও হতে পারে। হতেই পারে। ভালো কথা, অরুণ বলছে ও ক্রাইম লিখবে। হাঃ! শুনে মজা লেগেছে কিন্তু!

ভাবছি দার্জিলিং থেকে পালাব কিছুদিনের জন্যে। আবার ফিরে আসব যখন, গোখরোর খোলসের মতো পেছনে ফেলে আসব মনখারাপ, ক্রনিক পেন, লিখতে না পারার সমস্ত গ্লানি। তখন স্যাঁৎলা ধরা রোকড় দাঁত হাসিতে ঝিলকে উঠবে হা হা হা, আর কাজললতার মতো মেঘ দেখলে আমি খুঁট থেকে বিড়ি বার করে ধরাব।

না সত্যি ভাবছি, কৃষ্ণনগরে আচার্যবাটি থেকে কয়েকদিন ঘুরে বুঝলে! দেখব কীভাবে ও কাজললতার মেঘ দেখলে বিড়ি ধরায়। পৃথিবীর ফুসফুসকে অপারেশান থিয়েটারে আনার পর ওর পাশাপাশি বসে বলব, একটি দামামা দাও হে একটি দামামা। হা হা হা হা হা হা...

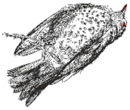

রাত ঘন হয়, আর অতি প্রাকৃতিক
ব্রহ্মপদ্ম ফুটে উঠলে ডেকে ওঠে ডোমের কুকুর
এই প্রসারতা অন্তহীন।

-দেবদাস আচার্য

'এরপর?'

'স্থানীয় পুলিশের এক কনট্যাক্ট পেয়েছি। আনন্দ পাঠক। এখানকার ওসি ছিলেন। আমাদের ম্যাগাজিনের এক সাব-এডিটর এঁর দূর সম্পর্কের কীরকম আত্মীয় হয়। লেবং রোডের কাছাকাছি একটা ক্যাফে, নাম নাইটিংগেল। ওখানে দেখা করবার কথা। তবে এখনও ঘন্টাখানেক দেরি আছে।'

'নাইটিংগেল আমি চিনি। ছোটোবেলায় ওখানে প্লাম কেক খেতে যেতাম। এই শহরের সবথেকে ভালো কেক ওই ক্যাফের মালিক যিনি, মিস্টার ম্যান্ডেলি, তাঁর স্ত্রী বানান। ক্রিসমাসের আগে পুডিং, কেক আর টার্কি রোস্টের গন্ধ দিয়ে জায়গাটা চেনা যায়।' সিদ্ধার্থ বলল, 'আপত্তি না থাকলে হেঁটে যেতে পারি। একটা শর্টকাট চিনি। বেশি পরিশ্রম হবে না।' বৃষ্টি ধরে এসেছে। হাতে এই একঘণ্টা কিছু কাজ নেই। মদনদাকে বলে দিলাম লেবং রোডের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে।

ঝাপসা আলোয় ভরে আছে চারপাশ। পাইনের ডাল থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে নীচের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে খেলনার মতো বাড়ির দল ধারে ধারে গড়িয়ে গেছে। আমরা পাহাড়ের ধার ঘেঁষে একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, যার একপাশে খাদ, রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাঝেই মাঝেই শ্যাওলা ঢাকা সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। পাশের জঙ্গল থেকে পাহাড়ি ঝোরার অবিরাম জল পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। নিঃশব্দ পায়ে ঘোলা কুয়াশা সেঁধিয়ে যাচ্ছে গাছের চামড়ায়। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে এক-একটা বেঞ্চ, কোথাও নিঃসঙ্গ লেপচা রমণী বসে আছে। এক একটা বাঁক ঘুরলে কুয়াশা ভেদ করে দেখতে পাচ্ছি রঙিন ছাতাদের আবছা অবয়ব। লোমশ স্পিৎজ নিয়ে ছাতা মাথায় হাঁটতে বেরিয়েছে মিনিস্কার্ট পরা এক তরুণী। কোথাও বা টুরিস্টের দল, এই ঘন বর্ষাতে যারা জনহীন শহরটিকে চাখতে আসে।

চোখে পড়ল একটা কুচকুচে কালো ঘোড়া নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে। তার কেশর, পেশল পা এবং ধনুকের মতো পিঠে থিতিয়ে আছে বিন্দু বিন্দু জল। ঘোড়াটার মাথা নীচু। এরকম অদ্ভুত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ভয় লাগল। কেন, নিজেও বলতে পারবনা, চোখ সরিয়ে দ্রুতপায়ে জায়গাটা পেরিয়ে গেলাম। সিদ্ধার্থ হয়তো দেখেইনি।

'এই বর্ষাকালে আপনি দার্জিলিং আসেন প্রতি বছর? এসময় তো কিছুই করার থাকে না, অবসাদ ধরে যায় এমন বৃষ্টিতে।'

'আমার শহর।' ছোট্ট উত্তর দিল সিদ্ধার্থ।

এত গোমড়ামুখো লোকের সঙ্গে চলা মুশকিল। মুখ বন্ধ রাখতে হয় সারাক্ষণ। হেঁটেই বা কেন যেতে বলল সেক্ষেত্রে, কে জানে! কিন্তু তখন সিদ্ধার্থ মুখ খুলল।

'এই শহর বর্ষাকালে নির্জন হয়ে যায়। টুরিস্ট আসে না। হোটেলগুলোর অনেকের ঝাঁপ পড়ে যায়। কর্মচারীরা দেশগাঁয়ে ফিরে যায়। চা-বাগানের পাতা তোলা বন্ধ থাকে।

জিপগাড়িগুলো, যেগুলো সমতলের দিকে যাচ্ছে, তাদের বেশিরভাগই গায়ে প্লাস্টিক জড়িয়ে অকেজো পড়ে থাকে। আর এই সময়টায় আমি প্রত্যেক বছর এই শহরে আসি। বিগত সাতবছর ধরে এই বর্ষার দার্জিলিংটাই আমার স্মৃতিতে খোদাই হয়ে আছে। আবার ডাবলিন যখন ফিরে যাই, সেখানে ও একই রকম স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। প্রতি সন্ধেবেলা নিয়ম করে বৃষ্টি হবেই।

একটা আবছা অন্ধকার ঘিরে আছে চারপাশে। মনে হয়, এক ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দুটো শহর আসলে একটাই। আসল দার্জিলিং থেকে নকল দার্জিলিং-এর দিকে যাচ্ছি। অথবা নকল ডাবলিন ছেড়ে ফিরে আসছি আসলের দিকে।'

বাপরে! এ তো কবিও! সাহিত্যের ধারাটা কাকা ভালই চারিয়ে দিতে পেরেছে দেখছি।

'দার্জিলিংকে মিস করেন, না?'

উদ্দেশ্যহীন কাঁধ ঝাঁকাল সিদ্ধার্থ। তারপর পাউচ থেকে তামাক বার করে হাঁটতে হাঁটতেই সিগারেটের কাগজে ভরে রোল করতে লাগল।

'এই আনন্দ পাঠক কি এখনও চাকরি করেন?' জিজ্ঞাসা করল সিগারেট ধরিয়ে। 'কিছু বছর আগে রিটায়ার করেছেন। ফোনে কথা বলেছি। খোলামেলা লোক বলেই মনে হলো।'

'ধনরাজ গম্বু আর ড্যানিয়েল লামা, দুজনকেই চেনেন?'

'হ্যাঁ। তবে অমিতাভ মিত্রর খুনের ঘটনার সময় পুলিশের চাকরিতে ঢোকেননি। কিন্তু পুলিশের সেই সময়কার অন্যান্য কর্মচারী যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের সন্ধান দিতে কাজে লাগবেন।'

কথা বলতে বলতে বিভিন্ন শর্টকাট দিয়ে, এই গলিতে কিছুটা নেমে, আবার পাশের গলির কয়েক ধাপ সিঁড়ি উপরে উঠে কখন লেবং রোডে চলে এসেছি, বুঝতেই পারলাম না। নাইটিংগেল ক্যাফের ভেতর ঢুকলে মনে হয় পুরোনো ইংল্যান্ডের কফির দোকানে ঢুকেছি। আলো আঁধারি চারপাশ, হিম হিম, ঝিমিয়ে থাকা। একটা বেড়াল ঘুমিয়ে আছে কাউন্টারের উপর। মৃদুস্বরে কান্ট্রি সংগীতের স্বর ভেসে আসছে। ঘর জুড়ে কফির সুবাস।

আনন্দ পাঠক এলেন কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে। সাতষট্টি বছর বয়েস, কিন্তু এখনও ঋজু শরীর। ক্যাফেতে শুধু আমরাই বসে ছিলাম। ঢুকে আমাদের দেখে হাত নাড়িয়ে হাসলেন। হাসলে চোখের চামড়া কুঁচকে যায় আর হাসিটা মনে হয় গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সিদ্ধার্থর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম।

'অরুণবাবু, গ্রেট রাইটার! আমাদের এই শহরের গর্ব। আমি ইংরেজি অনুবাদে কয়েকটা বই পড়েছি। অসাধারণ জ্ঞান ভদ্রলোকের। আর পুলিশ প্রসিডিওরাল নিখুঁত জানেন।'

'মিস্টার পাঠক, আপনি আমাকে কিছু যোগাযোগ দিতে পারেন? আমি পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটা শুনতে চাই।' ফোনের রেকর্ডারের সুইচ টিপলাম।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আনন্দ পাঠক বললেন, 'আমার জানা মতে অল্প লোকই বেঁচে আছে। ধনরাজ গম্বু থাকলে আপনার কোনো সমস্যাই হতো না। সব গল্প পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে ছিল তাঁর, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।'

'আপনি ফোনেও বলেছিলেন এটা। কিন্তু ড্যানিয়েল লামাকে নিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, এড়িয়ে গেলেন। আমি জানি ধনরাজ গম্বু হয়তো এই কেসের মূল কথক, কারণ শেষ অবধি তিনিই ছিলেন। কিন্তু ড্যানিয়েল তো তখন ইনচার্জ। প্রথম কয়েকদিন তদন্তকারী অফিসার। তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে ড্যানিয়েল মুছে গিয়েছেন এই ইতিহাস থেকে। কেন?'

ড্যানিয়েলের কথায় মুখটা হালকা বিকৃত হয়ে গেল পাঠকের। সামান্য সময়ের জন্যই। তারপরেই নিজেকে স্বাভাবিক করে মাথা নাড়লেন, 'সেই সময়ে আমি পুলিশে ঢুকিনি। বয়সও অল্প ছিল। তাই বলতে পারব না। আর ড্যানিয়েলকে কাছ থেকে চিনতাম না। ধনরাজ স্যারকে বহুকাল দেখেছি, এবং আমার প্রায় অভিভাবকের মতো ছিলেন। তাই হয়তো আমি ওদিকে ঝুঁকে।'

'ড্যানিয়েল কি বেঁচে নেই?'

'আছেন।'

'আছেন?' হালকা উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল আমার। প্লিজ যোগাযোগ করিয়ে দেবেন?'

'ড্যানিয়েল বাড়ির বাইরে বেরোন না। লোকজনের সঙ্গে মেশেন না। তাঁকে বাইরে কমই দেখা যায়। আগে যদিও মাঝেমাঝে বেরোতেন। পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা সিকিওরিটি সংস্থা খুলেছিলেন। শহরের নানা পানশালা এবং হোটেলে নিরাপত্তারক্ষী সরবরাহ করত তাঁর সংস্থা। কিন্তু তখনও সংস্থার দেখাশোনা করতেন মূলত তাঁর স্ত্রী এবং ভাই। ড্যানিয়েল বাড়ির ভেতরেই থাকেন। কখনো কখনো, কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে অথবা জনসভা হলে তাঁকে দেখা যেত। স্ত্রী মারা যাবার পর সেই কোম্পানি বিক্রি হয়ে গেছে। আর ড্যানিয়েলও বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে মানুষজনকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন। বছর পাঁচেক তাঁকে দেখিনি। আজকাল নাকি বাড়ি গেলেও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না ।'

'ওঁর ফোন নাম্বার অথবা ঠিকানা, কিছু একটা দেবেন? একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।' কাগজ ও পেন এগিয়ে দিলাম।

'ড্যানিয়েলের বাড়ির নির্দেশ আমি দিয়ে দেব। সেন্ট পলস স্কুলের কাছে বাড়ি। কিন্তু তাঁর ফোন নম্বর আমার কাছে নেই।

'ড্যানিয়েল পুলিশ ছাড়লেন কেন?'

'জানি না। আমরা যখন ছোটো ছিলাম, ড্যানিয়েল লামা এই জেলার ত্রাস ছিলেন। তখন নকশালবাড়ির সময়। ড্যানিয়েলের দাপটে শহর ঠান্ডা ছিল। অবশ্য কানাঘুষোও কম ছিল না এই নিয়ে। ড্যানিয়েল নাকি খোঁচড়দের টিম বানিয়েছিলেন। রাত্রিবেলা এক একটা পাড়া ঘিরে ধরা হতো পুলিশ-বাহিনী দিয়ে। স্থানীয় অল্পবয়স্ক ছেলেদের বাড়ির বাইরে বার করে এনে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হতো। বোরখা পড়া খোঁচড় এসে এক একজনের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিত দিত, এই ছেলেটি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, অথবা যুক্ত নয় । সব মিটে যাবার পর নাকি চিহ্নিত হয়ে যাওয়া তরুণদের একটা ভ্যানে চাপিয়ে চলে যাওয়া হতো। তাদের আর খোঁজ মিলত না। আবার এটাও শোনা যেত, শহরের বাইরে ছোটো ছোটো আস্তানায় ড্যানিয়েল টর্চার সেল খুলেছিলেন। সন্দেহভাজনদের ধরে নিয়ে এসে তাদের জলে চুবিয়ে ইলেকট্রিক শক দেওয়া, হাতের উপর চেয়ার রেখে বসে জিজ্ঞাসাবাদ, উলটো করে ঝুলিয়ে মার, এরকম অনেক গল্প শোনা যেত । কতটা সত্যি জানি না। আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি, ড্যানিয়েল পাইপ মুখে সারা শহর টহল মারতেন নিজের জিপে। নিজে গাড়ি চালাতে পারতেন না। ড্রাইভারের পাশে বসে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন। ওটাই মনে হয় নেশা ছিল। সারা শহর ঘুরে বেড়ানো। আর নেশা ছিল পাইপ। চব্বিশ ঘণ্টাই জ্বলন্ত অথবা নিভে যাওয়া পাইপ ঠোঁট থেকে ঝুলত তাঁর। আমার নিজের চোখে দেখা, ভুটিয়া বস্তির জমজমাট সাট্টার ঠেক চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে দূর থেকে ড্যানিয়েলের জিপ দেখতে পেয়ে। ওরকম দাপুটে পুলিশ অফিসার যখন দুম করে চাকরি ছাড়লেন, সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ড্যানিয়েল, যেটুকু শুনেছি, যেমন নির্মম ছিলেন, তেমনই অহংকারী। কাউকে বলেননি চাকরি ছাড়বার আসল কারণ।

আনন্দ পাঠকের মুখ থেকে বিতৃষ্ণার ভাব যাচ্ছিল না। 'সত্যের খাতিরে বলা উচিত যে ড্যানিয়েলের হৃদয় পরিবর্তনও হতে পারে। সেটাই হয়তো তাঁর চাকরি ছাড়বার কারণ ছিল। মানুষ তো, কোথাও গিয়ে এত নিষ্ঠুরতা, এত এত বাচ্চা ছেলেদের এনকাউন্টার, এগুলো হয়তো মানতে পারছিলেন না। ওপর থেকে নির্দেশ আসছে, তাই ডিউটি করতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে হয়তো খারাপ লাগাটা ছিলই। এটা বলছি এই কারণে যে পুলিশের চাকরিতে ঢুকে দেখেছি, বহু মানুষ অপরাধবোধে ভুগেছেন। ওই দিনগুলোতে যা করতে বাধ্য হয়েছেন, সেগুলো রাতের পর রাত তাঁদের ঘুমোতে দেয়নি। অনেকে পরে চাকরি ছেড়েও দিয়েছেন। আমি তো নিজে পুলিশ। তা সত্ত্বেও এগুলো খোলা মনে আপনাদের কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই। তখন যা হয়েছিল, প্রচুর বাড়াবাড়ি। একজন সুস্থ

মানুষকে জীবিকার প্রয়োজনে এসব করতে বাধ্য হতে হলে তার মানসিক অবস্থা কী হতে পারে, কেউ ভেবে দেখে না। যাই হোক, তখন দার্জিলিং-এ এত হোটেল আর রেস্তোরা, এমনিতেই, পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিরাপত্তা সংস্থা খুললে দশগুণ বেশি রোজগার হয়। ড্যানিয়েল হয়তো সেরকমই কিছু ভাবছিলেন।'

'আর ধনরাজ?'

আনন্দ পাঠক এবার হাসলেন, এবং আবারও চোখ কুঁচকে সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। নরম হয়ে এল গলার স্বর। 'ধনরাজ স্যারের মতো মানুষ ডিপার্টমেন্টে এসেছিলেন বলে এখনও গর্ব করে অন্যদের বলতে পারি যে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সততার কথা বলছি না। অধিকাংশ পুলিশই সৎ হয়। কিন্তু স্যার ছিলেন ডিপার্টমেন্টের কাছে ভগবান। আমাদের মতো জুনিয়ারদের যে কোনো সমস্যায় বুক পেতে দিতেন। ওপরওয়ালার কাছ থেকে আড়াল করতেন আমাদের। হ্যাঁ, কাজে ভুল করলে অথবা ফাঁকি দিলে এত বকাবকি করতেন যে তখন মনে হতো এই লোকটার থেকে বাজে কেউ হয় না। কিন্তু সেই রিপোর্ট কখনও ওপরতলা পর্যন্ত যায়নি, যদি না আপনি বড়োসড়ো ঘুষ খান, অথবা নির্দোষ মানুষকে ফাঁসিয়ে দেন, অথবা আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করেন, সেসব ক্ষেত্রে স্যার নির্দয় ছিলেন। কারণ ডিপার্টমেন্টের বদনাম হবে, এমন কিছু তাঁর কাছে ছিল সবথেকে যন্ত্রণার। আর সবসময় বলতেন, 'একজন অপরাধী ছাড়া পেয়ে গেলেও ততটা ক্ষতি নেই, যতটা ক্ষতি একজন নির্দোষ শাস্তি পেলে।' ওই লক্ষণরেখা অতিক্রম না করলে স্যার সবসময় আপনার পাশে থাকতেন। অবসর নেবার পরেও মাঝে মাঝে আসতেন। সকলের সঙ্গে দেখা করে গল্পগাছা করে যেতেন। শেষ জীবনে কিছুটা একা হয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রী মারা গেছেন। একমাত্র মেয়ে বিবাহসূত্রে কলকাতায় থাকে। আসে ন-মাসে ছ-মাসে একবার। যখন থানাতে বা পুলিশ ক্লাবে ঢুকতেন, আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতাম সবাই। অতখানি সম্মান জীবনকালে আর কোনো অফিসারকে আমি পেতে দেখিনি।

বাম হাতে ঘড়িটা দেখালেন পাঠক। মুখে প্রচ্ছন্ন গর্ব। 'অবসরের দিন আমার হাতে স্যার পরিয়ে দিয়েছিলেন। কী চোখে যে আমাকে তিনি দেখেছিলেন জানি না। কিন্তু নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছিলেন। স্যার চলে গিয়েছেন প্রায় বছর দশেক হতে চলল। কিন্তু শেষ সময়েও তাঁকে ভুলে যাইনি। শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখতাম, দেখা করতে যেতাম নিয়মিত। এটুকুই সান্ত্বনা যে স্যার জেনে গিয়েছিলেন আমি তাঁর পাশে ছিলাম।'

'ধনরাজ কখনও অমিতাভ মিত্রর হত্যারহস্য নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলেননি? মানে, এটা তো সেই সময়কার সবথেকে বড়ো রহস্য ছিল। ডিপার্টমেন্টের কাছেও একটা ব্যর্থতা, যে আপনারা সমাধান করতে পারেননি।'

নিজের জন্য অর্ডার দেওয়া সুগন্ধি চায়ে চুমুক দিলেন আনন্দ। 'কথা হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু স্যার মুখ খুলতে চাইতেন না। মনে হতো, এই ব্যর্থতা তিনি মন থেকে মানতে পারেননি, বিশেষত যেখানে তিনিই ছিলেন তদন্তকারী অফিসার।'

'ড্যানিয়েল লামা তদন্ত থেকে সরে গেলেন কেন?' এবার প্রশ্ন করল সিদ্ধার্থ।

'বলতে পারব না। তবে যে কোনো তদন্তেই এসব আকছার ঘটে থাকে। তদন্তকারী দল বদলে যায়, অফিসার সরে যান। আর ড্যানিয়েল মূল মাথা হলেও, তদন্তের দলে কিন্তু ধনরাজ স্যারও সহকারী হিসেবে ছিলেন। যদি ভুল না হই, খুনের রাত্রে থানায় ফোন পেয়ে ধনরাজ স্যারই অরুণবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন বলে শুনেছি।'

হঠাৎ কী মনে হলো, বললাম, 'মিস্টার পাঠক, অমিতাভ মিত্র-র লেখা একটা অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে এসেছে। সেটা নাকি পুলিশের কাছে ছিল। সেখান থেকে অরুণবাবু নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এটার ব্যাপারে কিছু জানেন?'

সিদ্ধার্থ দেখলাম অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে কিছু বলিনি এই ব্যাপারে।

'জানি। ধনরাজ স্যারের কাছে এটার টাইপ করা একটা ভার্সন দেখেছি আমি। স্যার বাঙালিদের মতো বাংলা জানতেন। ছোটোবেলায় কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়েছেন। কলেজও সেখানেই। প্রচুর বাঙালি বন্ধু ছিল। নিজেকে হাফ-বাঙালি বলতেন। স্যার উপন্যাসটা পড়েছিলেন। আমি পড়িনি যদিও, কারণ বাংলা পড়তে পারি না। তবে স্যারের মুখ থেকে শুনেছিলাম, এটাও একটা রহস্য উপন্যাস ছিল। এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্লু।'

'আপনি জিজ্ঞাসা করেননি, মৃত্যুর আগে লেখা একটা খসড়া কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল?'

'করেছিলাম। স্যার সোজাসুজি উত্তর দেননি। শুধু বলেছিলেন, অরুণ চৌধুরী যে খুন করতে পারেন না, সেটা তিনি প্রথমদিন থেকেই বুঝতে পারছিলেন। এই উপন্যাসটা পড়ে তাঁর সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।'

আমি কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। একদিকে অরুণ বলছেন তিনিই খুন করেছেন, অপরদিকে দেখা যাচ্ছে তদন্তকারী অফিসার বুঝে গিয়েছেন যে অরুণ নিরপরাধ। অর্থাৎ তাঁর অপরাধের খুটিনাটি বোঝবার জন্য অরুণ যে লেখাটা দিয়েছেন, সেটাই আবার তাঁর নিরপরাধ হবার সাক্ষ্য দিচ্ছে। জটিল গোলকধাঁধা ।

'কেন ধনরাজের মনে হয়েছিল যে অরুণ নিরপরাধ?'

, কাউন্টারের উপর ঘুমিয়ে থাকা বেড়ালটা জেগে উঠে আড়মোড়া ভাঙল, এবং বিশাল হাই তুলল একটা। তারপর লাফ দিয়ে নেমে আনন্দ পাঠকের পায়ের কাছে এসে পিঠটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে গা ঘষতে লাগল। আনন্দ বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে নরম আঙুল বোলালেন তার রোমশ গলায় । আরামে বেড়ালটার চোখ বুজে আসছিল, ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছিল গলা থেকে।

'দেখুন পুলিশের তদন্তে যুক্তি এবং সূত্রের বাইরেও আর একটা জিনিস প্রয়োজনীয়, সেটা হলো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। একজন পুলিশ অনেক কিছুই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারে, যেগুলোর ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারবে না। আমি নিজে বহু কেসের তদন্তে গিয়ে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য পেয়েছি অভ্রান্ত ভাবে। ধনরাজ স্যারের সেটাই মনে হয়েছিল সম্ভবত। এগুলোকে প্রশ্ন করা যায় না। গেলেও উত্তর মিলবে না সহজে।'

'মিস্টার পাঠক', সামনে ঝুঁকলাম, 'আমার অবস্থাটা বুঝুন। চুয়াল্লিশ বছর আগের এক তামাদি হয়ে যাওয়া কেস নিয়ে লিখতে এসেছি, যার অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী আজ মৃত। যেটুকু গল্প পেয়েছি তা দিয়ে ষোলো হাজার তো দূরের কথা, ষোলোশো শব্দও নামানো যায় না। জানি, এটা আমার সমস্যা। আপনার কিছুই আসবে যাবে না। আমি শুধু অনুরোধই করতে পারি, আপনি কি এমন কিছু ধনরাজ গম্বুর কাছ থেকে জেনেছিলেন যেটা অদ্ভুত? সামান্য হয়তো। হতেই পারে যে পাত্তা দেবার মতো কিছুই না। কিন্তু আমার কাছে তো কোনো অবলম্বনই নেই! আপনি যদি কিছু মনে করতে পারেন, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, আমাকে জানাবেন?'

আনন্দ পাঠক ভুরু কোঁচকালেন। বেড়ালটা ততক্ষণে তাঁর কোল থেকে নেমে গিয়ে দরজার সামনে বসেছে। সেখান থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। চোখের মণি সবুজ। ম্যাও করে ডেকে উঠল একবার।

'একটা ছোট্ট জিনিস, যেটা স্যার বলেছিলেন। ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর খটকা ছিল, কিন্তু উত্তর পাননি।'

বলুন যত ছোটোই হোক হয়তো গল্পে কাজে লাগতে পারে।' ফোন এগিয়ে দিলাম আনন্দ-র দিকে।

'যে রাত্রে অরুণ চৌধুরীর প্রতিবেশী, মিসেস বাসু মনে হয় নাম, তিনি পুলিশ স্টেশনে ফোন করেছিলেন, তখন অফিসার ইন-চার্জ ড্যানিয়েল থানায় ছিলেন না। সেদিন কোনো কিছু উপলক্ষে ছুটি নিয়েছিলেন। ডিউটি অফিসার ছিলেন ধনরাজ স্যার। তিনি দুজন পুলিশ নিয়ে মিস্টার চৌধুরীর বাড়িতে যান। বাড়িতে কিছু পাননি, কিন্তু বাগানের ঘাসে রক্ত দেখে

তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। তিনি মিস্টার চৌধুরীকে ধরে আনেন। কিন্তু রাত আড়াইটের সময়ে ড্যানিয়েল থানায় এসে উপস্থিত হন। গাড়ি ছিল না। হেঁটেই এসেছিলেন। স্যারের সময়টা মনে ছিল কারণ তখন ডিউটি বদল হচ্ছিল। ড্যানিয়েল প্রচণ্ড উত্তেজিত ছিলেন। অল্প মাতালও, মুখ থেকে হুইস্কির গন্ধ আসছিল। অরুণ চৌধুরীকে দেখে ড্যানিয়েল নাকি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপর ধনরাজ স্যারকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, এই কেস তিনি হাতে নিচ্ছেন। ধনরাজ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কী কেস? কিছু ক্রাইম ঘটেছে কি না সেটাই তো জানা যাচ্ছে না! ড্যানিয়েল উত্তরে বলেন যে কেসই ঘটে থাকুক না কেন, সেটা তাঁর অধীনে থাকবে আজ থেকে। ধনরাজ স্যার ড্যানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি এত রাত্রে থানায় এসেছেন কেন। ড্যানিয়েল নাকি উত্তরে বলেছিলেন, তিনি ফোন পেয়েছেন থানা থেকে।

কফিতে চুমুক দিয়ে আনন্দ বললেন, 'ধনরাজ স্যার পরে আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন, সেই রাত্রে থানার কোনো পুলিশ ড্যানিয়েলের বাড়িতে ফোন করবার কথা স্বীকার করেনি। আর ওরকম দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসারকে মাঝরাত্রে ফোন করে বিরক্ত করবে, ধড়ে এমন মাথা সেই সময়ে কারোর ছিল না। প্রশ্নটা হলো, ড্যানিয়েল এরকম দাবি কেন করলেন? যদি পুলিশরা মিথ্যে বলে থাকে, যদি সত্যিই থানা থেকে ড্যানিয়েলের বাড়িতে ফোন গিয়ে থাকে, যেরকম তিনি দাবি করেছিলেন, তাহলে ড্যানিয়েলকে ফোন করেছিল কে? আর সেই ফোনেই বা কী এমন বলা হয়েছিল যে অত রাত্রে ড্যানিয়েল থানায় এসেছিলেন? এলেও গাড়ি না নিয়ে হেঁটে এসেছিলেন কেন? সবথেকে বড়ো ব্যাপার, কী কারণে তিনি এত উত্তেজিত ছিলেন?'

বুকের মধ্যে হালকা ধুকপুক করতে শুরু করল। এই প্রথম একটা স্টোরি পাচ্ছি, যা কোনো কাগজে কখনো বেরোয়নি।

'উত্তরগুলো জানা যায়নি?'

'নাহ। আর একটা ব্যাপার, যেটা আরও অদ্ভুত' আনন্দ আবার ভুরু কুঁচকালেন, 'ড্যানিয়েল সবসময়ে ফিটফাট থাকতেন। মাথায় চুল থেকে পায়ের নখ অবধি একটা ভাঁজও পড়ত না। মুখের পাইপটাও ঝুলে থাকত পাক্কা ব্রিটিশ কায়দায়। কিন্তু সেই রাত্রে ড্যানিয়েল যখন এসেছিলেন, পরনে পুলিশের পোশাক ছিল না। সেটা স্বাভাবিক, কারণ ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। হয়তো পোশাক পরবার সময় পাননি। তাঁর মাথায় ছিল টুপি, গায়ে ওভারকোট, হাতে ছাতা এবং মুখে পাইপ। কিন্তু, যেটা স্যারের খটকা লেগেছিল, ড্যানিয়েলের পায়ে ছিল সাধারণ চটি।'

'সেটা তো হতেই পারে। বাড়ি থেকে আসছেন যেহেতু।' বলল সিদ্ধার্থ।

'আপনি সম্ভবত মন দিয়ে ঘটনাটাকে অনুসরণ করেননি মিস্টার চৌধুরী। তখন বর্ষাকাল। সেদিন তুমুল বৃষ্টি পড়ছিল। দার্জিলিং-এ বর্ষাকালে যেখানে রাস্তাঘাটের এরকম অবস্থা এবং ভয়াবহ জোঁকের উপদ্রব, সেখানে আমরা কি কেউ চটি পরবার কথা ভাবতে পারি? তাহলে ড্যানিয়েলের মতো একজন সাহেবি কেতার পুলিশ অফিসার এরকম আবহাওয়াতে চটি পরে বেরোবেন কেন? বিশেষত যেখানে তিনি আবহাওয়ার উপযোগী টুপি, কোট এবং ছাতা সঙ্গে রেখেছেন?

'আপনার কী মনে হয়?' প্রশ্ন করলাম।

'ভেবে দেখিনি।' মাথা নাড়লেন আনন্দ, 'আমার কাছে এটা তুচ্ছ লেগেছিল। ভুলেও গেছিলাম এতদিন। আপনার কথায় মনে পড়ল। তবে এখন বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সত্যিই ভাবার মতো।'

আমাদের কফি শেষ। আনন্দ পাঠক উঠে পড়লেন। বললাম, 'আপনাদের পুলিশ লাইব্রেরিতে পুরোনো কেসগুলোর রিপোর্ট আমি দেখতে চাই। অফিস থেকে আমাকে বলা হয়েছিল আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে। আর কাল আমার ফোটোগ্রাফার আসবেন। আপত্তি না থাকলে আপনার বাড়িতে তিনি যাবেন একটা ছবি নিতে '

'হ্যাঁ, অসুবিধে নেই। লাইব্রেরিয়ান আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। আপনাকে শুধু অফিসের পরিচয়পত্রের ফোটোকপি দিয়ে একটা চিঠি বানাতে হবে, যেখানে আসার উদ্দেশ্য ইত্যাদি লেখা থাকবে। চিঠিটা আমাকে আজ বিকেলের মধ্যে দিতে পারলে কাল অ্যাকসেস কার্ড পেয়ে যাবেন। দুজনের যোগাযোগ লিখে দিচ্ছি। ১৯৭৫ সালে এরা সকলেই ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ছিল, এবং এখনও জীবিত। সেন্ট পলস স্কুলে অরুণ চৌধুরীর সমসাময়িক একজন, যাঁকে আমি চিনি। আর একজনের নম্বরও দিচ্ছি। ইনি এখানকার কোর্টের উকিল, যাঁর সঙ্গে সেই সময়ে অরুণের হৃদ্যতা ছিল। এই কয়েকজনকেই পেয়েছি। অরুণ এবং অমিতাভর বাল্যবন্ধুদের মধ্যে বাকিরা হয় মারা গেছেন আর না হলে কর্মসূত্রে অন্যত্র চলে গেছেন বহু আগেই। এই চারজনকে দিয়ে আপনার কাজ হবে কিনা জানি না, তবু একবার বাজিয়ে দেখতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ। আর ড্যানিয়েল লামার বাড়ির ঠিকানা?'

আনন্দ বাড়ির নির্দেশ দিয়ে দিলেন। আমার হাতে চারজনের ফোন নাম্বার লেখা কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে দীর্ঘকায় শরীরটা এগিয়ে গেল ক্যাফের দরজার দিকে। বেড়ালটা একবার ডাক দিয়ে পায়ে মাথা ঘষতে গেল। আনন্দ নীচু হয়ে ঝুঁকে বেড়ালটার গলায় আদর করলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

সিদ্ধার্থ ভুরু কোঁচকাল, 'অমিতাভ মিত্রর উপন্যাসের কথা তো বললেননি?'

'আপনার কাকা দিয়েছেন। এই উপন্যাসের রহস্যের সমাধান করতে পারলে নাকি সব কিছুর উত্তর মিলবে।'

'আমি কি দেখতে পারি একবার?'

'চাইলে ফটোকপি করিয়ে নিন আজ রাত্রে। কিন্তু এই মুহূর্তে উপন্যাস গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার ধারণা এটা আপনার কাকার একটা খেয়াল মাত্র। আমার বুদ্ধি পরীক্ষা করতে চাইছেন।'

সিদ্ধার্থ মাথা নাড়ল, 'কাকাকে আমি চিনি। কারণ না থাকলে কোনো কাজ করবে না।'

প্রসঙ্গ বদলালাম। 'সিদ্ধার্থ, সামনে বেশ কিছু কাজ আছে। এখন ড্যানিয়েল লামার বাড়ি যাব। সেখান থেকে বেরিয়ে এই যে চারজনের নাম লিখে দিয়েছেন মিস্টার পাঠক, তার মধ্যে একজন, কুলবীর থাপাকে আজই সাক্ষাৎ করব। আমার রেকর্ড বলছে, ধনরাজ গম্বুর সঙ্গে যে দুজন কনস্টেবল অরুণের বাড়ি গিয়েছিলেন সেই রাত্রে, কুলবীর তাঁদের মধ্যে একজন। তারপর চিঠি বানিয়ে আনন্দ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে মদনদার হাত দিয়ে। তারপর হোটেলে ফিরে সাজাতে হবে সব ঘটনা। কাজেই, বেরোতে হবে এখনই।'

'ড্যানিয়েলের বাড়ি পর্যন্ত আছি। তারপর আপনাকে একাই যেতে হবে। আমাকে একবার নিজের বাড়ি যেতে হবে, তারপর কাকার বাড়িতে লাঞ্চ।'

'কোনো সমস্যা নেই। যখন খুশি আসবেন, আপনার ফাঁকা সময়ে। না এলেও অসুবিধে নেই।'

'হোটেলে আসতে পারি, আপনি অন্য কোথাও থাকলে সেখানে। হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন।

ডিনারে নিমন্ত্রণ করা উচিত হবে কি? ভদ্রতার জন্য একবার বলাই যায়, কারণ আজ অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে ঘুরেছে, নিজের কাজকম্ম বাদ দিয়ে। না বলে দিলে বাঁচা যাবে, ওই গোমড়ামুখ দেখতে হবে না।

'এখানে তিব্বতি খাবার ভালো মেলে, এরকম কিছুর সন্ধান দিতে পারেন? '

'আছে একটা। পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত রেস্তোরাঁ। লগটেবিল নাম।'

'আপনি চাইলে ডিনার করা যেতে পারে ওখানে। মাই ট্রিট।'

হাসল না একটুও! অদ্ভুত ছেলে তো! নিজের ফোনটা একবার ভুরু কুঁচকে চেক করে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ যেতে পারি। আপনি তো চিনবেন না। তুলে নেব।' ধন্যবাদের বালাইটুকুও নেই। কিন্তু একে হাতে রাখা দরকার। অলিগলিতে ঘুরতে সুবিধে হবে।

‘ঠিক আছে। তাহলে মদনদাকে ছেড়ে দেব। বেচারা পরপর দুইদিন বহুক্ষণ ধরে ডিউটি করছে। বিশ্রাম পাচ্ছে না। ডিনারের পর আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিলে ভালো হয়।’

আনন্দ পাঠকের পথনির্দেশ অব্যর্থ। সেন্ট পলস্ স্কুলের রাস্তায় একটা ফাটকওয়ালা বিশাল চত্বরের মধ্যে ড্যানিয়েল লামার বাড়ি। উঁচু দেওয়াল। সাদা দোতলা বাড়ির ধাঁচ অনেকটাই আধুনিক। দোতলার কাচের বড়ো বড়ো জানালার পর্দা ভেদ করে যেটুকু দেখা যায়, অন্ধকার। চত্বরটার চারিপাশে বড়ো বড়ো গাছ দিয়ে ঘেরা। জায়গাটা হিম হিম নির্জন। এই রাস্তাটাই আস্তে আস্তে উঠে গেছে পাহাড়ের গায়ে। অদ্ভুত ব্যাপার যেটা, এই বাড়ি থেকে অরুণের বাড়ির দূরত্ব একদমই বেশি নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অরুণ বা অন্য কেউ ড্যানিয়েলের খোঁজ রাখেন না। আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেটের গায়ে আঘাত করলাম। ফাটকের ঢাকনা খুলে উঁকি মারল পাহাড়ি মুখ-

‘কেয়া চাহিয়ে?’

সত্যিটাই বললাম। সাংবাদিক, দার্জিলিং-এর একটা পুরোনো অপরাধ নিয়ে স্টোরি করতে এসেছি। উলটোদিকের মুখ থেকে সন্দেহের ভাব না মোছায় নিজের কার্ডের পেছনে ইংরেজিতে লিখলাম, 'অমিতাভ মিত্র হত্যা রহস্য'। তারপর লোকটিকে অনুরোধ করলাম মালিককে গিয়ে কার্ডটা দিতে।

‘ঠেহরিয়ে ইধার।’

ঢাকনা আবার বন্ধ হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের মনেই বলল, ‘রাক্ষসপুরী। কিডনি খুলে বেচে দেবে।'

তরলতার ইচ্ছে হলো। ‘জ্যাকপটের সন্ধান পেয়েছি। এখন কিডনি কেন, হৃদয় দিতে বললে সেটাও ওপেন হার্ট সার্জারি করিয়ে বার করে দেব।' সিদ্ধার্থ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, অগ্রাহ্য করলাম। নির্বিকার ভাবে ব্যাগ থেকে পাফটা বার করে মুখে একবার বুলিয়ে নিলাম, ছোট্ট আয়নায় দেখে নিলাম ঠিকটাক লাগছে কিনা।

ঢাকনা খুলে গেল। এবার অন্য মুখ। আমাদের সর্বাঙ্গ জরিপ করল, তারপর বলল, ‘সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন। দেখা হবে না।

শেষ চেষ্টা করলাম, ‘কখন এলে সাহেব ফাঁকা থাকবেন?’

'বলতে পারছি না।'

‘প্লিজ, সাহেবকে বলবেন যে আমি অনেক দূর থেকে আসছি। একবার যদি দশ মিনিট তিনি আমাকে দেন- ,

‘সাহেব ব্যস্ত আছেন। দেখা হবে না। কর্কশ গলায় যান্ত্রিক উচ্চারণ করল লোকটা। হাল ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধার্থর দিকে তাকালাম। ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেল।

'কিছু করবার নেই। ফিরে চলুন। বলল সিদ্ধার্থ।

ফিরে আসতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু জানি যে সত্যিই কিছু করবার নেই। গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে একবার পেছন ফিরে তাকালাম। হঠাৎ মনে হলো, জানালার ধারে পর্দার ওপারের অন্ধকারে একটা মূর্তি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

গোটা দুপুর এবং বিকেল একরকম নিষ্ফল কাটল। পুলিশের সেই সময়কার কনস্টেবল কুলবীর থাপা মুখই খুললেন না। কিছুই নাকি মনে নেই। লেপাপোঁছা মাটির তালের মতো মুখের অভিব্যক্তি তাঁর। ড্যানিয়েলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন মনে নেই কী হয়েছিল। শেষমেষ থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম অরুণ চৌধুরীর নাম শুনেছেন কিনা। কুলবীর যন্ত্রের মতো বলে গেলেন যে এই নামে তিনি কাউকে চেনেন না; তবে বাঙালিদের মধ্যে এরকম নামের অনেকে আছে। আর দার্জিলিং-এ অনেক বাঙালি। সেই হিসেবে হয়তো অতীতে কখনও কারোর আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, কিন্তু এখন তাঁর মনে নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে হোটেলে এসে লাঞ্চ করে মদনদাকে পাঠালাম লাইব্রেরির চিঠি দিয়ে আনন্দ পাঠকের বাড়ি। তারপর গল্প সাজাতে গিয়ে দেখলাম, হাতে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছুই

আসেনি। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল এই শহরে ঢুকেছি, কিন্তু ড্যানিয়েল লামার মধ্যরাত্রে থানায় আসা বাদ দিয়ে এ পর্যন্ত তেমন কিছুই জানতে পারিনি যা আগে অজানা ছিল। এমনকি অমিতাভ মিত্র মারা যাবার আগে স্থানীয় গ্রামের যে ঝুপড়িতে থাকতেন, সেটারও নাকি চিহ্নমাত্র নেই। ধ্বসে গুঁড়িয়ে গেছে। কোথাও কিছুই নেই— আমি কি তাহলে শূন্য থেকে স্টোরি আমদানি করব? মেজাজ খারাপ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। সিদ্ধার্থর ফোনে ঘুম ভাঙল। ডিনারে বসেও বিরক্তিটা দূর হচ্ছিল না।

'কুলবীর থাপাকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা শূন্য আইকিউ-এর রোবট। হোপলেস।'হতাশায় থুকপার চামচ মুখে তুলতে গিয়েও নামিয়ে রাখলাম আমি।

হারমিটেজ রোডের উপর একটি ঝুলন্ত তিব্বতি রেস্তোরা লগটেবিল। আমাদের ব্যালকনির রেলিং-এর নীচ দিয়ে নেমে গেছে অরণ্যভর্তি পাহাড়ের ঢাল। হয়তো দিনের বেলা রোদ উঠলে এখান থেকেই চা-বাগানের মেয়েদের পাতা তুলতে দেখা যায়। রেস্তোরার ভেতরে ঝোলানো তিব্বতি চিত্রমালা, পুরোনো দার্জিলিংএর ছবি। মিটমিটে কয়েকটা ঝুলন্ত ল্যাম্প আলোর থেকে বেশি অন্ধকার সৃষ্টি করছে। পাইনকাঠের দেয়ালের গায়ে ঘাম জমেছে। অদ্ভুত সব মথ আর পোকারা পাহাড় থেকে এসে ভিড় জমাচ্ছে আমাদের আশেপাশে। টিপটিপে বৃষ্টি। স্যাঁতসেঁতে এরকম পরিবেশে আলো অন্ধকার ঘেরা রেস্তোরাটাকে আরও বেশি করে রহস্যময় লাগছিল।

'ঠিক আছে। আরও তিনজনের সঙ্গে কথা বলা যাবে তো। আপনি গল্পটা গুছিয়েছেন? কাঠামো, শুরু কীভাবে করবেন, এসব?'

'গল্প কোথায়? আপনার কাকা মুখ খুলছেন না। ড্যানিয়েল দেখা করছে না। এভাবে চলতে থাকলে আমাকে তো ফিরে যেতে হবে সিদ্ধার্থ।'

সিদ্ধার্থ থুকপায় মনোনিবেশ করল। আমি কার্ডিগানটাকে টেনে নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট চাপিয়েও পাহাড়ি ঠাণ্ডা থেকে রেহাই নেই। তার ওপর খোলা জায়গায় বসার ফলে একটা হিমেল হাওয়া মাঝে মাঝেই ঝাঁপিয়ে পড়ে হাড়ের ভেতর আঁচড়ে দিচ্ছে।

'আমার মনে হয়, আসল রহস্য লুকিয়ে আছে ড্যানিয়েলের মধ্যে।'

'আসল রহস্য আপনার বিখ্যাত রহস্যলেখক কাকা। তিনি সব জানেন কিন্তু বলবেন না। ডেকে নিয়ে এসে, একটা ফালতু লেখা হাতে ধরিয়ে দিয়ে মজা দেখছেন।'

'উঁহু! কাকার ভার্সন গল্পের একটা দিক। কিন্তু আনন্দ পাঠক যে খটকাগুলোর কথা বললেন? তার ওপর, মনে হচ্ছিল আনন্দ পাঠক ড্যানিয়েলকে অপছন্দ করেন। কিন্তু ড্যানিয়েল ইস্তফা দেবার পর আনন্দ পুলিশে এসেছেন। তাহলে এই অপছন্দ কি ধনরাজ গম্বুর কাছ থেকে পাওয়া? অপছন্দের কারণ কী ড্যানিয়েল নির্মম অফিসার ছিলেন বলে? বহু তরুণকে হত্যা করেছিলেন, তাই? না কি অন্য কোনো কারণ? '

'জানি না। এই গল্পের ভেতর যত ঢুকছি, একটার পর একটা জট একে অন্যের সঙ্গে পাকিয়ে পাকিয়ে আয়তনে বেড়েই যাচ্ছে। প্রশান্ত গুরুং না মিসেস বাসু কার কথা সত্যি? অমিতাভ অরুণের বাড়ি এসেছিলেন, নাকি আসেননি? রাইফেল থেকে একটাই গুলি ছোঁড়া হয়েছে, কিন্তু বুলেট পাওয়া যাচ্ছে দুটো, যারা ওই রাইফেলের সঙ্গে ম্যাচ করছে। কীভাবে? অমিতাভর মুখে আর বুকে গুলি করা পিস্তল কোথায় গেল? অমিতাভর পায়ের ছাপ বাগানে পড়ল না কেন? বাগানে যে বুটের ছাপ, সেটা কার? সেটাই কি অমিতাভর? অমিতাভর লাশ উপুড় করে শোয়ানো কেন? কেন তাঁর কবজিতে ক্ষতচিহ্ন ছিল, সেটাও আবার মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ আগে? অমিতাভর পেটে মদ এল কীভাবে? এত এত প্রশ্ন, যার উত্তর বলতে আমার হাতে একটা শেষ না হওয়া উপন্যাসের খসড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি কি তাহলে সিরিজের শেষ স্টোরি হিসেবে এই উপন্যাসটা ছাপিয়ে দেব? পাঠকের সামনে নতুন চমক। নতুন যুগের সাংবাদিকতা? মাই ফুট!'একটা সিগারেট জ্বালিয়ে জোরে ধোঁয়া ছাড়লাম অন্ধকার পাহাড়ের দিকে। সিদ্ধার্থ খাওয়া থামিয়ে নিশ্চুপে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। একটু

পর বলল,
'একটা ড্রিংক নেবেন? এখানে ভালো কালেকশন আছে।
'যা খুশি। তবে আমার জন্য এক পেগ, তার বেশি নয়।'
পানীয় না আসা পর্যন্ত কেউ আর কিছু বলিনি। সিদ্ধার্থ অন্যমনস্কভাবে অন্ধকার পাহাড় দেখে গেল, আর আমার মুখে সিগারেট তেতো লেগে গেল গোটা সময়টা।
অ্যাবসল্যুট ভদকার সঙ্গে লাইম ও সোডা মিশিয়ে এগিয়ে দিল সিদ্ধার্থ। এখানে এসে লাভ তাহলে হলো না, শুধু পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে টক করে দেওয়া বাদে!'
গা জ্বলে গেল ওর কথায়। উত্তর না দিয়ে পানীয়তে চুমুক দিলাম।
'আপনি কাজ ছাড়া অন্য কথা বলেন না কেন?' আচমকা প্রশ্ন করল সিদ্ধার্থ। ঝাঁঝিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, আপনি জন্ম থেকে হাসেন না কেন? নিজেকে সামলে উত্তর দিলাম, 'কী কথা? '
'সাধারণ কথা। বাড়ি কোথায়, দিল্লিতে কতদিন আছেন, এইসব। কারণ এখন যত কাজের কথা ভাববেন, বিরক্তি বাড়বে।'
'বাড়ি কলকাতায়। আপনি ডাবলিনে কোন অঞ্চলটায় থাকেন? আমার কলেজ জীবনের বন্ধু স্যান্ডিফোর্ডে থাকে।' সিদ্ধার্থ ঠিকই বলেছে। অন্য কথায় মন না ঘোরলে আরও বিশ্রী লাগবে চারপাশ।
'ওটা শহরতলি। আমি বেলফিল্ডের বাসিন্দা, ডাবলিনের ভেতরেই। বান্ধবীর সঙ্গে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকি। দুজনে মিলে ভাড়াটা ভাগাভাগি হয়ে যায় বলে গায়ে লাগে না। না হলে ডাবলিন দামি শহর।
'বান্ধবীও কি পড়াশোনা করে?
করত। ম্যাঞ্চেস্টারের মেয়ে। মাস্টার্স করেছে ট্রিনিটি থেকেই। এখন ডাবলিনের আইবিএম ল্যাবে রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করে। আপনি দিল্লিতে কতদিন?'
'দশ বছর হয়ে গেল। মাস্টার্স করেছি জেএনইউ থেকে, তারপর চাকরি। আবার নীরবতা। সৌজন্যের পালা শেষ
'যেটা মনে হচ্ছে,' আমাকেই মুখ খুলতে হলো, 'হোটেলে গিয়ে আবার প্রথম থেকে পড়তে হবে, যা যা পয়েন্ট করেছি। এদিকে আপনার কাকা বারবার বলছেন সত্তর দশকের কবিতা না পড়লে এই গল্প আমি লিখতে পারব না। সেই রিসার্চ এখনও কিছুটা বাকি।' ইতস্তত করে বললাম, 'একটা কথা জানাচ্ছি। বাইরে এখনই বলবার দরকার নেই। আপনার কাকা আমার কাছে কাল স্বীকার করেছেন যে তিনিই হত্যাকারী।'
সিদ্ধার্থ চমকে তাকাল আমার দিকে। ঝোড়ো হাওয়াতে ল্যাম্প কাঁপছিল। সেই কাঁপা আলোতে দেখলাম, ওর ভাঙা নাকের ছায়াটা নড়ছে। এক জায়গায় স্থির থাকছে না। সারা মুখের অজস্র ফাটল, হালকা দাড়ির ভেতরে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার গহ্বর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে ওর সারা মুখে। দমকা হাওয়া এল একটা, আর ছায়াগুলো ভেঙে গিয়ে আলোকিত হয়ে উঠল সিদ্ধার্থর মুখ দেখলাম, ও তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে। আমিও ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, চোখের পাতা না ফেলে। তারপর সিদ্ধার্থর দৃষ্টি নরম হয়ে এল। সে মৃদুস্বরে বলল, 'আর আপনি সেই স্বীকারোক্তিকে বিশ্বাস করছেন না।'
'করছি।'
সিদ্ধার্থ চুপ করে থাকল।
'যদি আমাকে স্টোরি করতে গিয়ে এই স্বীকারোক্তির মর্যাদা রাখতে হয়, আপনার খারাপ লাগবেই। আগে থেকেই বলে দিলাম তাই, যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল সিদ্ধার্থ, 'আপনার কি ধারণা আমি কোনো ভুল বিশ্বাস নিয়ে বসে আছি? কাকাকে আমি চিনি। ওই শান্ত মনটার ভেতরে কীরকম উথালপাথাল চলে, আর সেটাকে কীভাবে চেপে রাখে সেটা দেখেছি। শুনেওছি কিছু গল্প। বাবলা নামে একজন ছিল। কাকার বাড়ির মালি। তার গল্প শুনেছি। ওর একটা কুকুর চোখের সামনে মরে গিয়েছিল

বলে কাঁদতে কাঁদতে বাবলা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ওকে কাকা নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবাসতো। চলে যাবার পর দু-দিন খায়নি। বসে থেকেছে বোগেনভিলিয়ার তলায় । টানা দুই দিন। ঘরে শুতেও যায়নি। একদম শান্ত, পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে বসেছিল, ধ্যানী বুদ্ধর অবয়ব। এই ধ্যানমগ্ন লোকটার ভেতরটা আমরা বুঝতেই পারব না, এত চাপা। কাকাকে নিয়ে আমার কিছু অবিশ্বাস করবার নেই। খারাপ লাগবারও নেই। এটুকু জানি, সহ্য করতে করতে কতখানি রক্তক্ষরণ হয়েছে মানুষটার ভেতর।'

'বাবলার কথা আমিও আজ সকালবেলা আপনার কাকার মুখে শুনলাম। ওই সুন্দর বাগান, সবটা নাকি ওর হাতে।'

'বাইরের নির্বিকার শান্ত সমাহিত মুখটা দেখে ভুলবেন না। যে কষ্ট পাক না কেন, যত ক্ষতবিক্ষতই হোক, কিছুতেই সেই রক্তপাতকে বাইরে দেখাবে না। এত চাপা এবং অন্তর্মুখী মানুষদের আমার মাঝে মাঝে ভয় লাগে। এরা নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করে একদিন চুপচাপ মরে যায়। কেউ টেরও পায় না।

আস্তে আস্তে বললাম, 'এবার উঠি। হোটেলে গিয়ে কাজ আছে।'

শুনশান অন্ধকার রাস্তা দিয়ে সিদ্ধার্থর ছাতার নীচে দুজন হাঁটছি। ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া রাস্তার পাশের পাইন বন থেকে অবিশ্রান্ত জল পড়ছে টুপটাপ। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, এখানে ওখানে টায়ার জ্বালিয়ে চারপাশ ঘিরে ভবঘুরের দল বসে আছে। বৃষ্টির ছাটে আগুন নিভুনিভু হয়ে উঠলে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছে। কয়েকটা পথকুকুর উত্তাপের লোভে জড়ো হয়েছে আগুনের পাশে। ভিখিরিদের হাততালি দেওয়া গানের সুরে লেজ নাড়ছে ওরা। খাদের নীচ থেকে একটা অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক্ উঠে এসে সেই লেজ নাড়বার সঙ্গে তাল ঠুকছে।

সিদ্ধার্থ হঠাৎ আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল। উঃ, কাতরে উঠলাম। চামড়ায় নখ গেঁথে গেছে। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতে ফিসফিস করে বলল, 'পেছনের গাড়িটা। ফলো করছে আমাদের। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি।'

একটা জিপ। ভেতরে কে বসে আছে, অন্ধকার রাস্তায় কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। জিপটাও দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে জিপ আবার চলতে শুরু করল। আমরা যে বুঝছি, তাতে কোনো মাথাব্যথা নেই গাড়ির চালকের। যেন বোঝানোর জন্যই এমন অনুসরণ।

সিদ্ধার্থকে নীচু গলায় বললাম, 'পা চালান। ঘাবড়াবেন না। অত রাত হয়নি যে দুম করে কিছু করতে পারবে। তবে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটব না। ধার ঘেঁষে চলুন।'

হোটেল পর্যন্ত গাড়িটা অনুসরণ করল আমাদের। আমরা এতটাই সতর্ক আর সন্ত্রস্ত ছিলাম যে নিজেদের মধ্যেও কথা বলতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলাম, গাড়ি কতদূরে আছে। হোটেলের সামনে এলাম। গাড়িটা দাঁড়াল, তারপর গতি বাড়িয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেল অন্ধকারের দিকে।

সিদ্ধার্থ একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলল। আমি কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাচ্ছিলাম। সিদ্ধার্থও রোল করবার জন্য পাউচ বার করল, এবং হঠাৎ হাসল, প্রথমবার। দেখলাম, মৃদু হাসির নিঃশব্দ তরঙ্গ ওর অবয়বকে জলছবির স্নিগ্ধতা দিচ্ছে। তারপর ভুরু তুলল, 'এখনও বলবেন, আপনি গল্প খুঁজে পাচ্ছেন না?

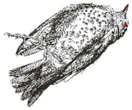

তুমি এসময় এসো না, আরো রাত্রি হোক, শহর
ঢুকে যাক জরায়ুর ভিতর, আলো নিভে যাক
রাত্তিরে শুয়ে থাকতে থাকতে আমি উঠে বসব যখন
তুমি
শান্তভাবে তোমার গত জীবনের ধর্ষণের কথা বলো আমাকে।

—নিশীথ ভড়

অমিতাভর উপন্যাস

পচা গরমের অবসানে হালকা বৃষ্টি নামলেও গুমোট কাটছেই না। চেম্বার বন্ধ করে শুদ্ধসত্ত্বর বাসায় আসতে আসতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে প্রণবেশের। নতুন কেনা অ্যাম্বাসেডর প্রথম বৃষ্টি দেখেই গাঁইগুঁই করেছে। স্টার্ট নিতে চাইছিল না। মেকানিক ডাকতে হয়েছে শেষে।

শুদ্ধসত্ত্বর বাসায় এসে দেখে বিমল সমাদ্দার বসে আছেন। শুদ্ধ নিজের ইজিচেয়ারে টানটান হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে বাক্য নেই। শুনে যাচ্ছে বিমলবাবুর কথা।

প্রণবেশকে দেখে বিমলবাবু একগাল হাসলেন, 'আসুন আসুন, আপনার জন্যেই বসে আছি। নতুন গাড়ি কিনেছেন শুনলাম। চলছে কেমন?'

'আর চলা! আজকেই বেগড়বাঁই করছিল। আপনি বলুন, কী সংবাদ।'

'এই শুদ্ধবাবুকে মাধব আর আনিসুরের বিষয়ে বলছিলাম আর কী। ওদের পূর্ব ইতিহাস।'

মাধব রক্ষিতকে তো কথা শুনে বেশ গেরামভারী লাগল মশায়।

'সুবিধের লোক লাগল কি? ওর পলিটিক্যাল কানেকশন প্রচুর। অতীত জীবনও সুবিধের নয়। বহুদিন ধরে কানাঘুষো শুনছি যে ও নাকি কোকেনের ব্যবসায় জড়িয়ে আছে।'

'আর আনিসুর?'

'আনিসুর রহমান কুখ্যাত সমাজবিরোধী ছিল এককালে। সেটা দেশভাগের আগের ঘটনা। আমি তখন সবে সবে পুলিশে ঢুকেছি। বনগাঁতে পোস্টিং ছিল। তখন থেকেই ওর নাম শুনতে পেতাম, বুঝলেন কিনা? দুই বাংলা জুড়ে দৌরাত্ম্য চালাত। কখনও মুসলিম লিগের গুণ্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, আবার কখনও বা কংগ্রেসের নীচুতলার সঙ্গে বোঝাপড়া করে চোরাচালানের ব্যবসা চালিয়েছে! নটোরিয়াস এলিমেন্ট মশাই! মাধবও ছিল ওর সঙ্গে। ইদানীং ভবিষ্যুক্ত হয়েছে। তবে পুরানো পাপ কি আর চাপা থাকে?

'আপনার কি মনে হয়, মাধবই খুন করেছেন?

'আর কে করবে? বেআইনি ব্যবসা চালাতে গিয়ে কীভাবে একে অন্যের হাতে খুন হয়, আপনি দেখেননি?'

'কিন্তু অ্যালিবাই?'

'গ্রেট ইস্টার্ন থেকে বেরিয়ে আনিসুরের হোটেলে গিয়ে খুন করে আবার ফিরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে? বিশেষত যদি সঙ্গে নিজের গাড়ি থাকে?'

'উঁহু, কিছু একটা মিলছে না বিমলবাবু। ধরে নিচ্ছি মাধব রক্ষিত খুন করবেন বলে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাহলে আনিসুরের কাছ থেকে সাদা কাগজ ভর্তি খাম এল

কেন?'

'আনিসুরই যে পাঠিয়েছে তার প্রমাণ?

'আপনি খামের ওপর ঠিকানার সঙ্গে আনিসুরের হাতের লেখা মিলিয়ে দেখুন। আমার ধারণা, একই লোকের হাতের লেখা হবে।

'তা বটে! এবার বলি, যে কারণে আপনার কাছে আসা। কথায় কথায় সেটাই এতক্ষণ বলা হয়নি। আনিসুরের শক্ত ব্যারাম ছিল। লিভার ক্যান্সারে ভুগছিল। পোস্ট-মর্টেম থেকে জানা গেছে। আয়ু বড়োজোর মাস ছয়েক ছিল আর।'

শুদ্ধসত্ত্ব সোজা হয়ে বসল। নস্যির কৌটো বার করেছিল, থেমে গেল সেটা হাতেই। অবাক হয়ে বলল, 'আনিসুর জানতেন?'

'জানত। ওর ঘরে আমরা মেডিক্যাল রিপোর্ট আর ওষুধের ফাইল পেয়েছি। ডায়রিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেখা ছিল, পিজি হাসপাতালে।'

দাঁতে তর্জনী দিয়ে টোকা মারতে লাগল শুদ্ধ। ভুরু কুঁচকে বলল, 'এটা কী করে সম্ভব? আনিসুর যদি জানেনই যে, তাঁর অসুখের নিরাময় নেই, তাহলে তিনি মাধববাবুকে মারতে যাবেন কেন? কেনই বা মাধববাবু আনিসুরের সত্য প্রকাশ করে দিলে আনিসুরের কিছু আসবে যাবে? অন্যদিকে, মাধববাবুই বা মারতে যাবেন কেন, যদি তিনি জানেনই যে আনিসুরের শেষ লগ্ন ঘনিয়ে আসছে? তাহলে কি আনিসুরের অসুখের খবর মাধববাবু জানতেন না?'

'বলা মুশকিল। মাধব শক্ত লোক। ভাঙলেও মচকাবে না।'

'আচ্ছা বন্ধ ঘরের মধ্যে খুন কীভাবে হলো তা নিয়ে আপনারা মুখে এরকম কুলুপ এঁটেছেন কেন?' অধৈর্য হয়ে এবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল প্রণবেশ। শুদ্ধসত্ত্ব দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বিমলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার বন্ধুটি কাল থেকেই এই প্রশ্ন করে করে কানের পোকা খেয়ে নিচ্ছে মশায়।

আছে কোনো উত্তর, আপনার কাছে?'

বিমল ভুরু কুঁচকে ভাবলেন, তারপর বললেন, 'অনেক রকম উত্তরই থাকতে পারে। সবথেকে সহজ সমাধানটাই আগে বলি। সেটা হলো মিথ্যে কথা। জুপিটারের মালিক বলেছেন যে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, আর তাঁরা বাধ্য হয়ে দরজা ভাঙেন। মালিক যে সত্যি বলছেন তার কী প্রমাণ আছে? হয়তো হত্যাকারী টাকাপয়সা দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল? যদি সত্যিই বলেন, তার পরেও দরজার ছিটকিনিকে নানাভাবে ব্যবহার করা যায়, বুঝলেন কিনা? অনেক দরজার পাল্লায় মধ্যেই অল্প ফাঁক থাকে দেখবেন। কেউ যদি ছিটকিনির সঙ্গে একটা সরু কিন্তু শক্ত সুতো বেঁধে রাখে আগে থেকে, তারপর দরজা বন্ধ করলেও সেই সুতো বাইরে থেকে টেনে ছিটকিনিকে নিজের জায়গাতে বসিয়ে দেওয়া, কঠিন হলেও সম্ভব। তারপর সুতোর যে প্রান্ত বাইরে বেরিয়ে আছে সেটুকু কেটে দিলেই হলো। অনেকেই খেয়াল করবে না ছিটকিনির গায়ে সুতো বাঁধা কেন। খিলের ব্যবস্থা থাকলেও একই পদ্ধতি। তবে সেক্ষেত্রে সুতোটার অবস্থান আলাদা হতে হবে। তৃতীয় সমাধান হলো, জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। হ্যাঁ মশায়, মানছি', শুদ্ধর প্রতিবাদকে বিমল দারোগা হাত তুলে রোধ করলেন, 'ওটুকু জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সহজ নয়। কিন্তু অসম্ভব নয়। রিং-এর মধ্যে দিয়ে কীভাবে শরীরটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে নিয়ে যায় সার্কাসের ছুঁড়িগুলো, দেখেননি? এবার আপনি বলবেন, নীচে গেল কী করে? নীচে নামতে হলে তো লাফিয়ে পড়তে হয় চায়ের গুমটির ছাদে। কিন্তু যদি নীচে না নামে যদি আততায়ীর কোনো সহকারী ছাদ থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দেয়, যেটা বেয়ে ছাদে উঠে যেতে পারে? সেখান থেকে টপকে পাশের বাড়ির ছাদে যাওয়া তো জলভাত মশায়! চতুর্থত, একই উপায়ে আততায়ী নীচেও নামতে পারে, মানে দড়ি বেয়ে আলতো করে চায়ের গুমটির ঢালে নামল, সেখান থেকে লাফিয়ে নীচে। পঞ্চমত, আততায়ী খুন করে বাথরুমে লুকিয়ে থাকতে পারে। যারা দরজা ভেঙে বডি আবিষ্কার করেছিল, তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া কী হবে? চিৎকার

চেঁচামেচি করে লোক জানানো। ঘরের ভেতর ভিড় হবে। সেই ভিড়ের সুযোগ নিয়ে টুক করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আততায়ী লোকজনের মধ্যে মিশে যেতে পারে। তবে এটা কষ্টকল্পিত সমাধান। ষষ্ঠত, টেবিলের অবস্থানটা খেয়াল করুন। হয়তো বন্দুক ওখানে রাখা ছিল, আর তার ট্রিগারের সুতো জানালার কাচের ফাঁক দিয়ে বার করে ছাদ অবধি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বন্দুক হয়তো বাঁধা ছিল এমনভাবে যে নড়াচড়া করবার ক্ষমতা ছিল না। অথবা টেবিলের পায়ে প্লাস্টিক কি সেলোফেন পেপার দিয়ে শক্ত করে আটকানো ছিল। আনিসুর জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়াল, আততায়ী ছাদ থেকে সুতোয় টান দিল। গুলি ছুটল। এবার আপনারা বলবেন ছাদ থেকে আততায়ী জানল কী করে আনিসুর কখন কীভাবে দাঁড়াবে? মনে রাখবেন, চারতলার মাথাতেই ছাদ। সেখান থেকে কিনারায় ঝুঁকে চেষ্টা করলে এটা দেখা অসম্ভব নয়, কারণ নীচের কাচের জানালায় কেউ এসে দাঁড়াবার ছবি প্রতিফলিত হবে। তো, গুলি ছুটল, আনিসুর মরল, পিস্তল সেখানেই থাকল। বডি আবিষ্কার হবার পর ভিড়ের সুযোগ নিয়ে পিস্তল সরিয়ে ফেলা হল। এটা ঘটে থাকলে আততায়ীকে প্রথম লোক হতে হবে যে ঘরে ঢুকেছিল। নাহলে অন্যেরা এসে পড়লে কারোর না কারোর চোখ পিস্তলের দিকে যেতে পারত। আমরা হোটেলের কর্মচারীদের সেই জন্য জিজ্ঞাসাবাদও করছি। সপ্তমত..'

'থাক থাক আর বলবেন না।' হাত তুলল প্রণবেশ। 'এটুকুতেই মাথা ঝিমঝিম করছে মশায়। এ তো অনন্ত সম্ভাবনার সমুদ্র।'

'ওই জন্যই তোমাকে বলেছিলাম, বন্ধ ঘর নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না।' ব্যাজার মুখে বলল শুদ্ধসত্ত্ব। 'হাজার হাজার ব্যাখ্যা তোমার মাথা ঘুরিয়ে দেবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেবে, বুঝলে? বন্ধ ঘরের ভেতর খুন হয়েছে তো কী? খুন হলো, সেটাই বড়ো ব্যাপার। বন্ধ না হয়ে খোলা জায়গাতে খুন হলেও একই রকম বড়ো ব্যাপার থাকত।'

বিমলবাবু হৃষ্টচিত্তে চুমুক দিচ্ছেন। প্রণবেশকে তাক লাগিয়ে আমোদ পেয়েছেন স্পষ্ট।

'বিমলবাবু, সেদিন আনিসুরের গতিবিধি সম্পর্কে কী জেনেছেন শুনি?'

'দুপুর দুটো নাগাদ মাধব এসেছিল আনিসুরের কাছে। তিনটে নাগাদ বেরিয়ে যায়। তাকে ওই সময়ে হোটেলের একাধিক লোক দেখেছে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে উঠতে। মিনিট পনেরো পর আনিসুরও বেরোয়। ফিরে আসে সন্ধেবেলা। সন্ধে থেকে নিজের ঘরেই ছিল। মাঝে একবার আটটা নাগাদ রাস্তার ধারের ঝুপড়িতে রাতের খাবার খেতে বেরিয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা দেখেছে। আবার ফিরে আসে কিছুক্ষণ পর। সাড়ে আটটার পর আর বেরোয়নি। অন্তত বাইরে তাকে আর দেখা যায়নি। হোটেলের একটি ছেলেকে জল দিয়ে যাবার জন্য হাঁক পেড়েছিল। ছেলেটি ঘরে জল রেখে আসে। তার বয়ান অনুসারে সে বেরিয়ে যাবার পর আনিসুর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।'

'তখন কি ঘরে আলো জ্বলছিল?'

'আলো থাকলে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে কিনা সেটা ধরা পড়বে সেই কারণে জিজ্ঞাসা করছেন তো?' মুচকি হাসলেন বিমল দারোগা। 'আমার মাথাতেও এই সম্ভাবনার কথা এসেছিল। জিজ্ঞাসা করেছি। জ্বলছিল।'

'সেই রাত্রে কোনো ঘটনা ঘটেছিল, হয়তো আজব? সৃষ্টিছাড়া ধরনের?'

'রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ একবার কারেন্ট চলে গিয়েছিল। সে মাঝে মাঝেই যায়। কিন্তু আশেপাশের বাড়িতে কারেন্ট ছিল। এই ধরনের হোটেলে যা হয়, মালিক তখন নিজের বাড়ি চলে গেছে। কর্মচারীগুলোও, তিনজন ছিল, ভেগে পড়েছে এখানে ওখানে। কিছুক্ষণ পরেও কারেন্ট না আসাতে হোটেলের লজাররা হইহট্টগোল শুরু করে। হোটেলের একটা ছেলে পাশের গলিতে তাসের আড্ডায় বসেছিল। তাকে খুঁজে পেতে ধরে আনা হয়। সে মিটারবক্সে গিয়ে দেখে, মেইন সুইচ কে অফ্ করে দিয়ে গেছে। বারোটার মধ্যে আবার কারেন্ট চলে আসে।'

'লোডশেডিঙের মধ্যে কি আনিসুর বেরিয়েছিলেন?'

'কেউ খেয়াল করেনি।'

'হুঁ। আর আনিসুরের মৃত্যুর সময়?'

'পোস্টমর্টেম অনুসারে, রাত নয়টা থেকে পরের দিন ভোর চারটের মধ্যে যে কোনো সময়ে।'

'তাহলে কি এই মেইন সুইচ অফ করে দেবার সঙ্গে আনিসুরের মৃত্যুর কোনো যোগ থাকতে পারে? অপরাধী হয়তো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আনিসুরের ঘরে ঢোকবার জন্য মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছিল? তারপর গিয়ে আনিসুরের ঘরে টোকা মারল। আনিসুর দরজা খুললেন। গুলি চলল। অপরাধী বেরিয়ে গেল কোনোভাবে। আবার অন্ধকারের মধ্যেই।'

'হতে পারে। তবে গুলির আওয়াজ কেউ শোনেনি। শুধু পাশের ঘরের লজার এক উড়িয়া ভদ্রলোক, সন্ন্যাসীচরণ মহাপাত্র, একটা জোরে হাঁচির আওয়াজ শুনেছিলেন। তখন লোডশেডিং ছিল।'

'হ্যাঁ। সম্ভবত সাইলেন্সার লাগানো ছিল বন্দুকে। তার মানে হত্যার সময় আমরা রাত সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে রাখতে পারি। সম্ভবত বললাম, কারণ হতেও পারে যে সেই সময়ে সত্যিই কেউ হেঁচেছিল। আচ্ছা, ওই সময়টায় মাধববাবুর অ্যালিবাই কী?'

'ওদের পার্টি ভেঙেছিল এগারোটা পনেরোতে। তারপরেও এখানেওখানে জটলা করে গল্পগুজব করেছিলেন কেউ কেউ। মাধবও তাঁদের মধ্যে ছিল। এগারোটা পঁচিশে লোকজন দেখেছিল যে মাধব গাড়িতে উঠছে, ড্রাইভারের আসনে। তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীকে পেয়েছি যারা এই সাক্ষ্য দিয়েছে। মাধব তার বরানগরের বাসাতে ফিরেছে রাত এগারোটা চল্লিশ। নিজেই ড্রাইভ করে ফিরেছে। বাড়ির দারোয়ান জানিয়েছে যে সে ঘুমোচ্ছিল, গাড়ির হর্ন প্রথমে শুনতে পায়নি। মাধব তাকে বারবার হর্ন বাজিয়ে তুলেছে। দারোয়ান তারপর ঘড়ি দেখেছে। সত্যিই তখন এগারোটা চল্লিশ।'

'পনেরো মিনিট গাড়ি চালিয়ে ধর্মতলা থেকে বরানগর এসেছেন। সেটা রাত্রের ফাঁকা কলকাতায় অবশ্যই সম্ভব। নাহ বিমলবাবু, যদি সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে আনিসুর সাহেব খুন হন, তাহলে মাধববাবু খুন করতে পারেন না। কারণ এই পনেরো মিনিটে হোটেলে গিয়ে মেইন সুইচ অফ করে খুন করে তারপর আবার গাড়ি চালিয়ে অতদূরের বাড়ি ফেরা বড়ো সহজ কম্মো নয়। আর যদি সত্যিই মাধব খুনি হন, তাহলে আনিসুর খুন হয়েছেন হয় সোয়া এগারোটার আগে, আর নয়তো এগারোটা পঞ্চান্নর পর। কারণ বরানগর থেকে আবার যদি একই গতিতে মাধব গাড়ি চালিয়ে আসেন, তাহলেও পনেরো মিনিট লাগবার কথা।'

'মুশকিল হলো, পার্টির মধ্যে সকলে বলছেন মাধব গোটা সময় পার্টিতে ছিল। সকলের চোখের সামনে ঘুরে বেরিয়েছে। আর অন্যদিকে দারোয়ান বলছে যে মাধব বাড়ি ঢুকে যাবার পর আর বেরোয়নি। গেটের চাবি তার কাছে ছিল। বেরোতে গেলে তাকে উঠে গেট খুলে দিতে হবে।'

'যদি না মাধব পাঁচিল টপকে বেরিয়ে যান। সেক্ষেত্রে তাঁকে হেঁটে আসতে হবে আনিসুরের হোটেল পর্যন্ত, অথবা ট্যাক্সি বা আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোনো গাড়ি নিতে হবে।

'হেঁটে আসাটা বাড়াবাড়ি নয়?' প্রশ্ন করল প্রণবেশ।

'হ্যাঁ, অনেক সময় লাগবে। তার ওপর কেউ দেখে ফেলতে পারে।

কলকাতায় রাতবিরেতে ট্যাক্সি পাওয়াটাও ভাগ্যের ব্যাপার। তাহলে যে সম্ভাবনাটা পড়ে থাকল সেটা হল মাধব আগের থেকে ঠিক করে রাখা কোনো গাড়ি ব্যবহার করেছিল।' বললেন বিমলবাবু।

'তার থেকে অনেক সহজ সমাধান হলো অন্য কেউ খুন করেছে। সেটা আপনারা খতিয়ে দেখছেন না কেন শুনি?'

'মোটিভ? অন্য কে আনিসুরকে কলকাতায় চিনবে? কলকাতায় আনিসুরের আর কোনো চেনা লোকের খোঁজ আমরা পাচ্ছি না। লোকটা এমনই ফেরেব্বাজ, বুঝলেন কিনা, যে ভদ্রসমাজের কারোর সঙ্গে চেনাজানাটুকু পর্যন্ত রাখেনি। সেক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষে তাকে খুঁজে বার করা চাট্টিখানি কথা নয়।'

শুদ্ধসত্ত্ব হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দুই হাত দিয়ে মাথায় চুল ঘাঁটতে থাকল সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে।

উঠে পড়েছেন বিমলবাবু। 'আমরা আমাদের দিক থেকে যা জানাবার সব জানিয়ে গেলাম। আপনি যদি কিছু ক্লু পান, আমাদের জানাবেন একটু।'

বেরোবার সময়ে প্রণবেশের অ্যাম্বাসাডরের গায়ে হাত বুলিয়ে সপ্রশংস গলায় বিমলবাবু বললেন, 'বেড়ে জিনিস মশায়! অনেকদিনের ইচ্ছে কিনি একটা, সেকেন্ড-হ্যান্ড। কিন্তু গিন্নির বাধা। এই মাগ্যি গণ্ডার বাজারে আবার ড্রাইভার রাখার খরচ জোগানো তো চাট্টিখানি কথা নয়! আপনারা আছেন ভালো। প্রাইভেট প্র্যাকটিসে দুই হাতে কামাচ্ছেন। আমাদের তো, বুঝতেই পারছেন, হেঁ হেঁ...।

ঘরে ঢোকবার সময়ে প্রণবেশের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে শুদ্ধ বলল, 'কী, গাড়ির প্রশংসা শুনে তো বাবুর হাসি আর ধরছে না মুখে!'

'উঁহু তা নয়। আমি ভাবছি, বিমলবাবুর কথা। দিব্য মানুষ কিন্তু। অন্য পুলিশ হলে একফোঁটাও সহযোগিতা করত না। বরং প্রাইভেট ডিটেকটিভ ক্ষীর খেয়ে যাবে ভয়ে বাগড়া দিত.... বেশি করে।'

'হ্যাঁ, ভালোমানুষ।' শুদ্ধসত্ত্ব আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নস্যির কৌটো হাতের তালুতে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'একটা খটকা লাগছে। মেলাতে পারছি না কিছুতেই।'

বরানগরে মাধব রক্ষিতের পেল্লায় বাড়ির সামনে প্রণবেশের গাড়ি এসে থেমেছে সন্ধেবেলা। প্রায় সাত ফুট উঁচু পাঁচিল। দারোয়ান এসে গেট খুলে দিল। বাড়ির ভেতরে বড়ো বাগান পেরিয়ে গাড়িবারান্দা।

মাধব রক্ষিত নীচের ঘরে বসে পায়ে মালিশ করাচ্ছিলেন এক ভৃত্যস্থানীয়কে দিয়ে। পা-টা ফুলে আছে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। শুদ্ধসত্ত্ব আর প্রণবেশকে দেখে ক্লিষ্ট হাসলেন। উঠতে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না।

'কী হয়েছে আপনার পায়ে?' বড়ো একটা চেয়ারে বসে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল শুদ্ধ।

'অতীতের কর্মফল। প্রায় তিরিশ বছর অগে পুলিশের তাড়া খেয়ে দৌড়াতে গিয়ে পা মচকেছিলাম। ডান পায়ের গোড়ালির হাড়টাই ভেঙে গেল। ঠিক করে জোড়া লাগেনি আর। এমনিতে অসুবিধে হয় না, তবে বেশি চাপ দিতে পারি না। অসহ্য যন্ত্রণা হয়। হাঁটাচলায় ক্ষতি নেই। কেউ দেখে বুঝবেও না। কিন্তু মাঝে-মাঝে অমাবস্যায় হাড়ের ভাঙা জায়গাটা ফুলে ওঠে। অনেক ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়েছি, লাভ হয়নি কিছু। এখন একটা কোবরেজি তেল পেয়েছি। সেটা মালিশ করালে কিছুটা আরাম পাই। আস্তে আস্তে ঘণ্টাখানেক পর ব্যথার উপশম হয়।

ভৃত্যটি উঠে দাঁড়াল। সেলাম করে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। মাধব সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'নকুল কুড়ি বছর ধরে আমার অনুচর। ওকে ছাড়া এই বাড়ি অচল। গিন্নির গেঁটে বাত। নীচে নামতে পারেন না। গোটা সংসারটাকে নকুল হাতের তালুতে ধরে রেখেছে।'

'আমরা এলাম কয়েকটা প্রশ্ন করতে।'

'হ্যাঁ, ফোনে তো সেরকমই বললেন। আপনার অ্যাডভান্সের টাকাটারও বন্দোবস্ত রেখেছি। বলুন, কী জানতে চান।'

'আনিসুর সাহেব দুরারোগ্য ব্যারামে ভুগছিলেন। লিভার ক্যান্সার। আয়ু হয়তো মেরেকেটে কয়েক মাস ছিল আর। আপনি জানতেন?'

মাধবের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। স্তম্ভিতের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলেন, 'না। জানতাম না।' তারপর মৃদু স্বরে বিড়বিড় করলেন, 'জন্ম থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। চলে যাবার লগ্নেও বোধ করি ছাড়তে চাইছিল না আমাকে। নিয়ে যেতে চাইছিল।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন। আনিসুরের কি কলকাতায় আপনি বাদে আর কোনো চেনা মানুষ ছিলেন, যার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন?

ক্যান্সারের খবর শোনার পর মাধববাবু আনমনা হয়ে ভাবছেন কিছুটা। শুদ্ধসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসা করাতে চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ? ওহ্, না না, আমার জানামতে কেউ চেনা লোক ছিল না।'

'তৃতীয় প্রশ্ন। আনিসুর সাহেবের টাকা পয়সার অবস্থা কীরকম ছিল?'

'ভালো ছিল বলে তো মনে হয় না। হোটেলটার চেহারা দেখলেন না? কথায় বলে না, উৎপাতের টাকা চিৎপাত যায়? নাহলে কম টাকা তো সে নেয়নি আমার কাছ থেকে। তার পরেও এরকম ভিখিরির হাল কেন হবে বলুন?

'অমিতাদেবীর খোঁজ কি আপনি আর করেছেন?'

'এই কয়েকদিন? নাহ। সব ঝামেলা মিটুক আগে। বাড়ির যিনি কর্ত্রী, তাঁকে জানাবার মতো সাহসটুকু জোগাড় করি।' বিষণ্ণ হাসলেন মাধব রক্ষিত। তারপর ভাবছি একবার বাংলাদেশে যাব।'

'আনিসুরের কোনো নিকটাত্মীয় কেউ বাংলাদেশে আছেন? আপনি জানেন?'

'না, ও অনাথ ছিল, বিয়ে থা-ও করেনি বলেই জানি। এর বাইরে কার সঙ্গে ওঠাবসা ছিল, বলতে পারবো না। শেষ বহু বছর ওর সঙ্গে সম্পর্ক বলতে শুধু টাকা দেওয়া-নেওয়া। আর কোনো খাতিরদারি কোনো তরফ থেকে ছিল না। বন্ধুত্ব বহুদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এইবার বরং এসে বেশ কিছুক্ষণ ওর হোটেলে বসেছিলাম। কারণ ওকে বলার দরকার ছিল যে আমি আর ওর দাবীর কাছে মাথা নোয়াচ্ছি না। ঢাকার পুলিশ হয়তো দিতে পারবে আত্মীয়পরিজনের খোঁজ।'

'মিস্টার রক্ষিত, আনিসুর সাহেবও আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। দুঃখের বিষয় সেটা একটা সাদা কাগজ।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন মাধব রক্ষিত। 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না এর মাথামুণ্ডু।

'বুঝতে আমিও পারছি না। তবু মনে হলো, আপনাকে জানিয়ে রাখি।' মাধববাবু কষ্ট করে উঠলেন। সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গিয়ে ঘরের এককোণের দেরাজের ড্রয়ার টেনে একটা খাম বার করে ফিরে এসে শুদ্ধসত্ত্বের হাতে দিলেন। 'আপনার অ্যাডভান্স গুনে নিন।

শুদ্ধ টাকা গুনে খামটা পকেটে পুরে বলল, 'ঠিক আছে। শেষ অনুরোধ। একবার আপনার বাগানটা ঘুরে দেখতে চাই।'

মাধব অবাক হলেও মুখে কিছু বললেন না। উত্তর দিলেন, 'বেশ। নকুলকে বলে দিচ্ছি, আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবে। কিছু মনে করবেন না, আমি পা-টাকে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রামে রাখতে চাই।'

দরজার বাইরে বেরিয়ে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখছে শুদ্ধসত্ত্ব। সন্ধে সাতটা বাজতে চলেছে। চারপাশ অন্ধকার। কোথাও একটা রেডিও বেজে উঠল। আকাশবাণীর বিশেষ বিশেষ খবর। শুদ্ধ বাইরে থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'গড়িবারান্দার বাতিটা জ্বালানো যায়? কিছু দেখা যাচ্ছে না এখানে।

'বাল্বটা কয়েকদিন আগে কেটে গেছে। পালটানো হয়নি। নকুলকে বলছি, টর্চ নিয়ে আসবে।' বাড়ির ভেতর আরামকেদারায় বসে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলেন মাধব।

টর্চের আলোতে বাগান এবং বাড়ির চারিপাশ খুঁটিয়ে দেখে, এবং দারোয়ানকে সেই রাত্রি বিষয়ে টুকটাক প্রশ্ন করবার পর বেরিয়ে এসে প্রণবেশের গাড়িতে উঠতে উঠতে শুদ্ধসত্ত্ব বলল, 'আজ আমি তোমাকে র‍্যালিসের কুলপি খাওয়াব। সেই সঙ্গে নিউ মার্কেটে আজিজের

পানের দোকানের স্পেশাল মিঠেকড়া। খাসা বানায় ওটা। বহুদিন খাওয়া হয়নি।' পকেটের খামের ওপর চাপড় মেরে বলল, 'গরম লাগছে হে! টাকার গরম।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কী মনে হয়? মাধব রক্ষিতই খুনি?' নাকে একটিপ নস্যি নিয়ে জলভরা লাল চোখে সামনের বিটি রোডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল শুদ্ধসত্ত্ব। তারপর বলল, 'খুনি হতেই পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আনিসুর খুন হয়েছেন রাত এগারোটা পঁচিশের আগে! অর্থাৎ, যখন পার্টি চলছে।'

'কেন?'

'দেখো, আনিসুরের খুন হবার সময়কালে, মানে পোস্টমর্টেমে যেটুকু এসেছে, সেটা কী? রাত নয়টা থেকে ভোর চারটে। এই সাত ঘণ্টাকে আমরা তিনটে আলাদা স্লটে ভাগ করে ফেলতে পারি। রাত নটা থেকে এগারোটা পঁচিশ। এগারোটা পঁচিশ থেকে এগারোটা পঞ্চান্ন। এগারোটা পঞ্চান্ন থেকে ভোর চারটে। এবার এগারোটা পঁচিশে মাধব গাড়িতে উঠেছেন, আর এগারোটা চল্লিশে বাড়ি এসেছেন। এই পনেরো মিনিট সময়ের মধ্যে খুন করে বাড়ি ফেরা সম্ভব না আগেও বলেছি। আবার এগারোটা চল্লিশ থেকে একই গতিতে গাড়ি চালিয়ে এগারোটা পঞ্চান্নর আগে ধর্মতলা আসা সম্ভব নয়। কিন্তু দারোয়ান দিব্যি করে বলেছে যে মাধব বাড়ি থেকে বেরোননি। তাহলে এগারোটা পঁচিশ থেকে এগারোটা পঞ্চান্ন এই স্লট বাতিল। এগারোটা পঞ্চান্ন থেকে ভোর চারটে, সেটাও অসম্ভব। কারণ হেঁটে বা গাড়িতে, যেভাবেই হোক মাধবের বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই দারোয়ানের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে দিয়ে গেটের চাবি খোলাতে হবে। আমি ধরে নিচ্ছি দারোয়ান মিথ্যে বলছে না। যে কারণে বাড়ির চারপাশ আরও দেখলাম। গেট দিয়ে ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোবার দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই।'

একটা দোতলা বাসকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে প্রণবেশ বলল, 'কিন্তু আমরা তো এই সম্ভাবনার কথাও ভেবেছিলাম যে মাধব পাঁচিল টপকাতে পারেন।'

'পায়ের অবস্থা দেখেছ? কীভাবে ফুলে উঠেছিল, আর নীলচে শিরা বেরিয়েছিল গোড়ালির চামড়ায়? সাত ফুট উঁচু পাঁচিলের ওপর থেকে ওই পা নিয়ে লাফানো যায় না। পায়ের ওপর চাপ দেওয়া যায় না, মাধব নিজেই বলেছেন। অন্য কিছু কতটা সত্যি বলেছেন জানি না, কিন্তু পায়ের ব্যাপারটা সত্যি। হাড়ের বিভিন্ন ধরনের চিড় বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করেছিলাম এককালে। তোমাকে আর নতুন কী বলব, তুমি তো ডাক্তার! ওই লক্ষণ আমার চেনা। মাধববাবুকে তাঁর পা মৃত্যু পর্যন্ত ভোগাবে।'

'তাহলে?'

'তাহলে পড়ে থাকল প্রথম স্লট। রাত ন-টা থেকে এগারোটা পঁচিশ।'

'যে সময়টায় অন্তত পঞ্চাশজন শিল্পপতি বুকে হাত দিয়ে বলবেন যে মাধববাবুকে তাঁরা সর্বক্ষণ গ্রেট ইস্টার্নের মধ্যে দেখেছেন।'

শুদ্ধ কিছুক্ষণ পর বলল, 'নাহলে আর একটা সমাধান আছে, যেটা আরও সহজ। মাধববাবু খুন করেননি।'

'সেটাই সম্ভব। কারণ একটা লোকের পুরো সময়টায় অ্যালিবাই আছে, এমন অ্যালিবাই যেটাকে ভাঙা যাচ্ছে না। অন্য কোনো রাস্তা ভাবো হে!

'আমাকে এই মুহূর্তে সবথেকে কী ভাবাচ্ছে জানো? দুটো চিঠির রহস্য। দুটো চিঠি কেন? একটা আসল, একটা সাদা, এরকম কেন? দুটোই আসল নয় কেন? অথবা একটা নয় কেন?'

'প্রথম চিঠির ব্যাপারে তো মাধববাবুই যা জানবার জানিয়ে দিয়েছেন। পড়ে আছে শুধু দ্বিতীয় চিঠির রহস্য। সেটা যে কারণেই পাঠানো হোক না কেন, মাধববাবু যে নির্দোষ, তা কি চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় না? যদি না একমাত্র দারোয়ান মিথ্যে বলে।'

'হুঁ, নির্দোষ তো বটেই। কিন্তু এত বড়োলোক, নিজের গাড়িবারান্দার বাতি সারাবেন না?' চিন্তিত প্রশ্ন করল শুদ্ধসত্ত্ব।

'কী সব অদ্ভুত ভাবনা! তুমি একটা বালব কিনে দিয়ে এসো বরং।'

'র‍্যালিস যাবার অগে একবার আনিসুরের হোটেল চলো তো। কয়েকটা জিনিস দেখে আসি।'

হোটেল পৌঁছাতে গিয়েই প্রায় আটটা বেজে গেল। ডালহৌসি, কার্জন পার্ক, চাঁদনিচক ঘিরে ততক্ষণে মোটরগাড়ি, ট্রাম আর বাসের মেলা বসে গিয়েছে। বাদুড়ঝোলা হয়ে বাসায় ফিরছে মানুষ। শুদ্ধ কথাবার্তা বন্ধ করে টানটান বসে আছে অ্যাম্বাসাডরের আসনে। দেখে মনে হচ্ছে ধ্যান করছে। প্রণবেশ জানে, এটাই এখন শুদ্ধর ভাবনা প্র্যাকটিসের সময়। বাড়িতে হয়নি। তাই মোটরের ভেতরে করে নিচ্ছে।

কিন্তু জুপিটারের মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেও সন্তোষজনক কিছু পাওয়া গেল না। আনিসুর প্রতি বছর এসে এখানেই থাকতেন। মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল। এটুকুই। না, সেই রাত্রে তাঁরা কেউ সন্দেহজনক কিছু দেখেননি।

'কিন্তু মেইন সুইচ অফ করল কে?'

'এই চত্বরে অনেক বদ ছোকরা থাকে স্যার। সারাদিন নেশা করে। মারামারি করে নিজেদের মধ্যে। ওদেরই কেউ করেছে। তক্কে তক্কে আছি। ঠ্যাঙানি না খেলে থামবে না।

'একবার মিটারবক্সটা দেখব।'

সিঁড়ির নীচে দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট অন্ধকার কুঠুরি। তার মধ্যে মিটারবক্স বসানো।

'তার মানে বাইরে থেকে এসে যে কেউ সুইচ অফ করে দিয়ে যেতে পারে?'

'তা পারে, যদি না কেউ এখানে আমার জায়গায় বসে থাকে। তবে অত রাত্রে আর কে থাকবে স্যার। বউ ছেলে নিয়ে সংসার করি। ভদ্দরলোকের পাড়াতে থকি। ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে তো ক্যারেক্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেবে লোকে। প্রতিদিন এগারোটার মধ্যে বাড়ি চলে যাই। তিনটে ছোকরা কর্মচারী অছে। তারাও খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ে, অথবা এদিক ওদিক ফূর্তি করতে বেরোয়। আমি ফ্যামিলিম্যান, কিন্তু এই ছেলেপুলেদের তো আর আটকনো যায় না স্যার। সারাদিন খাটাই, মৌজ করবার দরকার সবারই পড়ে।'

র‍্যালিসে কুলপির গায়ে চামচ বসিয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রশ্ন ছুড়ল, 'ডেকার্স লেনের হোটেল থেকে গ্রেট ইস্টার্নের দূরত্ব কত হতে পারে?'

'কাছেই। কিন্তু তুমি যা ভাবছ, তা বড়ো সহজ সমাধান নয়। ওই গলিতে গাড়ি ঢুকবে না। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে বেশ অনেকটা হেঁটে আসতে হবে। এবার, অত রাত্রে মাধব রক্ষিতের দামি মোটরগাড়ি যদি ওই গলিতে দাঁড়ায়, স্থানীয় লোকের চোখে পড়বে না?'

'নাও পড়তে পারে। ধর্মতলা অঞ্চলে বহু দামি গাড়ি যাতায়াত করে। কিন্তু সেটা ভাবছি না। আমি ভাবছিলাম, প্রথম টাইম-স্লটের কথা। নটা থেকে এগারোটা পঁচিশ। যদি পার্টি চলাকালীন গাড়ি চালিয়ে এসে, গাড়ি রেখে আনিসুরকে খুন করে মাধববাবু আবার পার্টিতে ফেরত চলে যান?'

'কিন্তু সবাই যে বলছেন মাধববাবুকে সারাক্ষণ চোখের সামনে দেখেছেন?

'পার্টির মধ্যমণি কিন্তু মাধব রক্ষিত ছিলেন না। যাঁর আশি বছরের জন্মদিন পালিত হচ্ছিল, সেই স্যার ধীরেন না বীরেন কী যেন নাম, তিনি ছিলেন। দশ কি পনেরো মিনিটের জন্য কি মাধববাবু বাইরে যেতে পারেন না?'

'কঠিন, ব্যাপারটা প্রায় ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেবার মতো। একবার ভাবো, যদি সব প্ল্যানমাফিক না ঘটত? যদি খুন করতে সময় লাগত, আর মাধববাবুর ফিরতে দেরি হতো? তাহলে তো লোকের চোখে পড়তই। এতটা ঝুঁকি কি মাধব রক্ষিত নেবার সাহস দেখাবেন?'

'দেখাতেই পারেন, যদি রোখ চেপে যায়।'

'যে লোক খুন করবার আগে তোমাকে চিঠি লিখে নিজের ওপর সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা করে, সে মূলগতভাবে সাবধানী। কখনও চাইবে না ঝুঁকি নিতে। বিশেষত তার যদি কয়েক কোটি চাকার ব্যবাসায়িক সাম্রাজ্য হারাবার ভয় থাকে।

'ঠিক।' মুখের ভেতর কুলপির টুকরো ফেলে জিভ দিয়ে ঘোরাচ্ছে শুদ্ধসত্ত্ব। আবেশে

বুজে এসেছে চোখ। তাহলে অপর কোনো খুনির সন্ধানেই নামতে হচ্ছে। তাই তো?’

‘সেটাই তো কঠিন কাজ! আমরা এমন কাউকে জানি না যে কলকাতায় আনিসুরের চেনাজানার মধ্যে ছিল। এই বিশাল শহরে কোথায় সেই আততায়ী লুকিয়ে আছে, সেটা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব!'

‘সেক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। কাল সারাদিন থানায় বসে থাকবো ভাবছি। আনিসুরের ঘর থেকে যা যা পাওয়া গিয়েছে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তুমি কী করবে?’

'কাল আমি থাকব না। চেম্বার আছে। তারপর লতিকাকে নিয়ে ওর পিসির বাড়ি যেতে হবে। নিমন্ত্রণ আছে। বিয়ে থা তো করলে না, সংসারীদের জ্বালা আর তুমি কী বুঝবে!'

‘তোমার কালেকশনের শার্লক হোমসটা একবার দিয়ো তো। আজ রাত্রে ঘুমাতে যাবার আগে পড়ব।'

‘সেকী? একটা কোকেনখোরের গাঁজাখুরিকে এতটা পাত্তা দেবে?’

‘আহা গাঁজা হোক আর যাই হোক, সাহিত্য হে! অমন উৎকৃষ্ট মানের খাসা লিখনভঙ্গী আর কার আছে? দেখি একটা সিগারেট দাও তো!’

‘ভেতরে সিগারেট খেতে দেবে না ইডিয়ট! বাইরে গিয়ে ধরাও। আর এগারো হাজার তিনশো আশি পেরিয়ে গেল কিন্তু।'

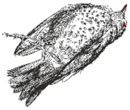

সে আবার ফিরে আসে ছেলেদের বাড়ির রোয়াকে
পুরানো বৃষ্টির শব্দে। ছেঁড়া-খোড়া কোটের পকেটে
মুমূর্ষু কিছু ভয়, সন্ধানী টর্চের মৃদু আলো
নিঃশব্দে ঘুরে যায় সবুজ জানলা, ভিজে ভিজে
দরোজায়, চৌকাঠে, বিবর্ণ নামের ফলকে
শীর্ণ আঙুল রাখে, সাবধানে নাকের ওপরে
পেতলের চশমাটি এঁটে নেয়, এদিক ওদিক
ঘুরে আসে চুপিচুপি পরিচিত বাড়িটিকে দেখে।

—বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ে বৃষ্টি নিষ্ঠুরতা এবং নির্জনতার উদযাপন ঘটায়, বলেছিলেন কোনো এক কবি। দার্জিলিং-এর বর্ষাকালকে যদি এক কথায় ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে তার নাম অবিশ্রাম। বিরতিহীন বৃষ্টি। কখনও আস্তে এবং কখনও মুষলধারে । যখন বৃষ্টির বেগ কম, পাহাড়ের নীচ থেকে মেঘের দল উঠে এসে কুয়াশায় ঢেকে নিচ্ছে চরাচর, আমার ঘরের জানালার কাচ ভেপে উঠেছে। রাস্তাঘাটের স্যাঁতসেঁতে ভেজা অন্ধকার ভেদ করে মাঝে মাঝে ছিটকে আসছে একঝলক ছাতার রং অথবা বাহারি পোশাকের আঘ্রাণ। কম সংখ্যায় টুরিস্ট। ম্যাল, চৌরাস্তা, সব ফাঁকা ফাঁকা। সন্ধে হলে একদম নিঝঝুম হয়ে যায়। ঘরের দেয়াল ঘেমে ওঠে। আড্ডা জমায় অদ্ভুত দেখতে পাহাড়ি পোকার দল। খাদের ধারের পাইন, ইউক্যালিপ্টাস্, বার্চের ডাল থেকে সারাদিন টুপটাপ করে জল পড়বার আওয়াজ।

ক্ষণিকের জন্য কুয়াশা কেটে গেলে আবছা জলরঙের মতো দেখা যায় নীচের দরিদ্র বস্তি। এই অবিরাম অবসাদের মতো বৃষ্টি মনকেও কীরকম বিকল করে দেয় । কাজ করতে ভালোলাগে না। সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মনে হয় জানালার বাইরে ওই ছাইরঙা আকাশ আর ফ্যাকাশে জন্ডিস রুগির মতো সূর্যের আলোকে চেটে দেখি। এমনিতেই অনিদ্রাতে ভুগি। দিনের বেলা ঘুম পায়, চোখের পাতা বুজে আসে। এমন প্রকৃতি আমাকে আরোই বেশি করে কাজে ফাঁকি দেওয়াবার ষড়যন্ত্র করেছে।

১৯০৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইংলিশম্যান কাগজে একটা লেখায় বলা হয়েছিল, 'দার্জিলিঙ হ্যাজ অলমোস্ট বিকাম দ্য প্লে-গ্রাউন্ড অ্যান্ড নার্সারি অফ্ ক্যালকাটা'। স্বাভাবিক, সাম্রাজ্যবাদের চোখে দার্জিলিং-এর নিজের মূল্য কতটুকু, যদি না তা রাজধানীকে সার্ভ করে! কলকাতার নার্সারি হওয়াই এই শহরের ভবিতব্য ছিল হয়তো, যার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল অসংখ্য নেটিভ কুলি, চা-বাগানের শ্রমিক, লেপচা-নেপালি-ভুটানি গোষ্ঠীদের আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা। এই বৃষ্টি, অবিরাম স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া আর অবিচ্ছিন্ন কুয়াশা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, এটাই সম্ভবত আসল দার্জিলিং যার পেটের ভেতর লুকিয়ে থাকা রহস্যগুলোর সুলুকসন্ধান কোনোদিনই উপনিবেশের প্রভুরা নাগাল পাবে না। কাঞ্চনজঙ্ঘা, টাইগার হিলের সূর্যোদয়, অজস্র ফুলের সমারোহ, চিড়িয়াখানা, এসব পেরিয়ে গেলে যেটা পড়ে থাকে চিতাবাঘের মতো ঘাপটি মেরে থাকা সেই শহরের ইতিহাস এবং অস্তিত্বকে সম্ভবত অমিতাভ মিত্রর মতোই ভুলে গিয়েছে সবাই। অথবা, ভুলে গেছে কি? মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায় । অমিতাভ কি বিশ্বাস করতেন?

অরুণের কাছ থেকে অমিতাভর একটা ছবি ধার করে এনেছিলাম। বার করে দেখলাম আবার। হলদে, প্রায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ফটো। বাদামি ছোপ ধরতে শুরু করেছে একধারে। রোগা। লম্বা নয়। এক অবিন্যস্ত দাড়িগোঁফওয়ালা তরুণ। মাথার চুল বড়ো বড়ো এবং উসকোখুসকো। একটা পাহাড়ি নদীকে পেছনে রেখে একখণ্ড পাথরের উপর বসে বাম দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি আবছা, এবং পুরোনো ছবিতে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হলো,

বসে থাকার এবং তাকাবার ভঙ্গিটা উদাস। বিষণ্ণ। যেন তরুণ এ পৃথিবীর কেউ নয়।

কেবল সাহেবের কবিতার বইটা অরুণকে দিয়ে এসেছি। বইয়ের ভেতরে কবির একটা ছবি ছিল। মোটা গোঁফওয়ালা মধ্যবয়স্ক ইউরোপিয়ান, সে সময়কার টিপিকাল সাহেবদের যেমন দেখতে হতো। এই দুটো ছবি, অমিতাভর আর কেবলের, পাশাপাশি বসিয়ে একটা কোলাজ বানানো যায় না? স্টোরির খাতিরেই। একশো বছরের ব্যবধানে দুই হারানো কবি, যাঁদের এক বিন্দুতে এনে দিয়েছে এক অমীমাংসিত রহস্য। দুজনের কেউই হয়তো অমরত্ব চাননি। চেয়েছিলেন, একটা ছোট্ট টাউনকে ভালোবেসে তার এলিজি রচনা করে যেতে।

টুং করে দু-বার হোয়াটসঅ্যাপের আওয়াজ হলো। মাঝে মাঝে ভাবতে ভালো লাগে একান্তে। তখন মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ এই সবকিছুর থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছে করে। আজ সেরকম মেজাজে আছি। অবশেষে হোয়াটসঅ্যাপ যখন খুললাম, তার মধ্যে দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে।

অচেনা নম্বর থেকে পাঠানো। একটা বাড়ির পুরোনো ছবি, সেটাকে স্ক্যান করে দেওয়া হয়েছে। ছবির নীচে ঠিকানা লেখা। দার্জিলিং-এর কোথাও, কিন্তু রাস্তার নাম দেখে বুঝলাম যে চিনি না। দ্বিতীয় মেসেজটাও একই নম্বর থেকে পাঠানো, কিন্তু সেটা আরও অদ্ভুত। চারলাইনের একটা কবিতা

Yesterday upon the stair
I met a man who wasn't there
He wasn't there again today
I wish, I wish he'd go away

ইংরেজির ছাত্রী হবার সুবাদে কবিতাটা আমি জানি। আমেরিকান কবি উইলিয়াম হিউজেন্স মেয়ান্স অ্যান্টিগোনিস নামের এই ছড়াটা লিখেছিলেন গত শতাব্দীর শুরুতে। এক ভুতুড়ে আত্মার উপস্থিতি বিষয়ক এই কবিতার প্রচুর প্যারডিও হয়েছে। কিন্তু আমাকে এটা পাঠাবার মানে কী? আর বাড়িটাই বা কী? ট্রুকলার অ্যাপ খুলে নম্বরটা সেখানে দিলাম। ট্রুকলার জানাল, এই নামের কেউ তাদের ডেটাবেসে নেই।

আজকেও সিদ্ধার্থ নীচে অপেক্ষা করছে। আমাকে নামতে দেখে এগিয়ে এল, ‘আজ রাত্রে কাকিমা আপনাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। ঘুমোচ্ছেন ভেবে ফোন করেনি এতক্ষণ। জানতে চেয়েছে আপনার কোনো খাবারে অ্যালার্জি আছে কিনা।'

‘কাঁচা আনারস বাদে আর কোনো কিছুতে নেই। ভালোই হলো, এই সুযোগে আজ সন্ধেবেলাই দুজনের ইন্টারভিউটা রেকর্ড করে নেব। আচ্ছা সিদ্ধার্থ, এই ঠিকানাটা আপনি জানেন?' ছবিটা দেখালাম।

ভেবে নিয়ে সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'হুঁ, ঋষি রোড। রাস্তাটা জানি। শহরের বাইরে বেরিয়ে গেছে। জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে লেপচাজগতের আগে। একজ্যাক্ট ঠিকানা ওখানে গেলে জেনে যাব। কিন্তু কার বাড়ি এটা?’

কবিতাটা দেখালাম। ভুরু কুঁচকে গেল সিদ্ধার্থর। বিড়বিড় করে বলল, 'আশ্চর্য! কেউ প্র্যাংক করছে না তো?’

‘মনে হচ্ছে একবার দেখে আসা দরকার। ’

‘যাওয়াই যায়। যেতে আসতে বেশি হলে ঘণ্টা দুই পড়বে। নির্ভর করছে আপনার

কাজের ওপর।

'আজ পুলিশ লাইব্রেরির কার্ড হাতে পেলে সেখানে যাব। তার আগে আনন্দ পাঠক অন্য যে পুলিশের কনটাক্ট দিয়েছেন, লালবাহাদুর রাই, তাঁর বাড়ি যাবার আছে। কাল ফোন করেছিলাম। সাড়ে এগারোটায় সময় দিয়েছেন। এরপর কার্ট রোডের সেই কবরখানার ছবি তুলতে যাব যেখানে অমিতাভর লাশ পাওয়া গিয়েছিল। দুপুরবেলা সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে শিলিগুড়ি থেকে আমার ফোটোগ্রাফার আসবেন। আমাদেরই এখানকার ব্যুরো অফিসের একজন ফ্রিলান্সার। তাঁকে নিয়ে আবার সমস্ত জায়গায় একবার করে ঢুঁ মারতে হবে, ছবির জন্য। তিনি সন্ধেবেলার মধ্যে আবার নেমে যাবেন নীচে। আর তারপর, যদি সত্যিই আপনার কাকিমা নিমন্ত্রণ করেন, তাহলে সেখানে। এর মধ্যে যদি সময় পাই, আর একবার ড্যানিয়েল লামার বাড়িতে নক করব, যদি সদয় হন।'

'মানে ঠাসা শিডিউল। সেক্ষেত্রে এই বাড়িতে যাবেন কী করে।'

'সময় অল্প, সিদ্ধার্থ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানকার কাজ মিটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছি। লেখা শুরু করতেই অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সিদ্ধার্থ মোবাইল বার করে সময় দেখল। 'অবশ্য এখন ন-টা বাজে। আপনি চাইলে আমরা এই বাড়িটা ঘুরে এসে সাড়ে এগারোটায় লালবাহাদুর রাইয়ের বাড়ি চলে যেতে পারি। তবে বাড়িতে থাকা যাবে না বেশিক্ষণ।'

আমি দোনোমোনো করছিলাম। ভাবছিলাম, যদি এই সময়ের মধ্যে আর একবার ড্যানিয়েলের বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু তাতেও কতটা কাজ হবে জানি না। হয়তো অকারণেই এই বাড়িটা দেখতে ইচ্ছে করছিল। এখানে এসে থেকে ঘোরা হচ্ছে না একটুও। কতক্ষণ আর বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগে। 'আপনি যাবেন? মানে, কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি না তো সেই কাল থেকেই?'

উত্তর না দিয়ে গলার মাফলার গোটাল সিদ্ধার্থ। অন্তত ভদ্রতা করেও যে বলবে, না না কোনো সমস্যা নেই, সেসবের বালাই নেই। হাসির কোটা সম্ভবত কাল রাত্রে পূরণ হয়ে গেছে। দিনে একবার করে হাসে। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিছু ফিরে বলল, 'গাড়িতে অপেক্ষা করছি।'

সিদ্ধার্থ যতটা দূর ভেবেছিল, তার অর্ধেকও নয়। মদনদা জায়গাটা চেনেন বললেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে দিলেন। একে ওকে জিজ্ঞাসা করে, তারপর জিপিএস মিলিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম বাড়িটার সামনে।

একদিকে খাদ নেমে গেছে, অন্যপাশে পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে একটা সরু রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে কিছুটা উঠে বাম দিকে বাঁক নিলে আচমকা চোখের সামনে শূন্য থেকে এসে উদয় হয় বাড়িটা। চারপাশে উঁচু গাছের জঙ্গল বলে রাস্তা থেকে দেখা যায় না। একটা বড়ো পাঁচিলঘেরা এলাকা। ভেতরে আগাছার জঙ্গল। সেগুলোকে পেরিয়ে যে পোড়ো বাড়িটা চোখে পড়ে, খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝা যাবে না যে সেটাই ছবির বাড়ি। ছত্রাকে ঢেকে গিয়েছে বাড়ির নকশা। জানালার কাচ একটাও অবশিষ্ট নেই আর। দরজার কাঠ পচে খসে পড়ছে। এমনকি ঢোকার গেটটাও ভেঙে খুলে একদিকে ঝুলছে। আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

বাড়ির পেছন আর ডান পাশ থেকে জমি ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে খাদের দিকে। বাড়িটা খাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। খাদের কোলে ঘন জঙ্গল। এখন বৃষ্টি কম পড়ছে। তাই দেখতে পেলাম। সেই অরণ্যের গা বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে ভারী কুয়াশা। কিছুক্ষণ পরেই অস্বচ্ছ এক হিমাভ আলখাল্লা জায়গাটার দখল নিয়ে নেবে।

সিদ্ধার্থ দেখলাম খাদের ধারে গিয়ে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে হয়তো। অথবা প্রেমিকাকে মিস করছে। কিন্তু আমার তো এসব ভাবালুতার সময় নেই। হাতের এত কাজ ছেড়ে এতদূর এলাম একটা পোড়ো বাড়ি দেখতে, ভাবতেই এখন রাগ হচ্ছে নিজের ওপর।

'আপকো ঘর চাহিয়ে কেয়া?'

পেছন ফিরে দেখি, এক থুরথুরে নেপালি বৃদ্ধ। পিঠ নুয়ে গেছে। হাতে লাঠি একটা ছাতা মাথায় দিয়ে আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন ৷ 1

'না। ঘর চাই না। এমনি দেখতে এসেছি।'

'চাইলেও পেতেন না। এই বাড়ি এখন আর ভাড়া দেওয়া হয় না। একা আর কত দিক সামলাব। পঁচাশি বছর বয়স হবে এই শীতে। আমি চোখ বুজলে বাড়িও তার সব রূপ হারাবে।'

যেন সত্যিই এখনও কত রূপবান! সিদ্ধার্থ দেখলাম এগিয়ে এসেছে গলার স্বর শুনে। তাকে নমস্কার করলেন বৃদ্ধ। নাম রামবীর দাহাল। এই বাড়ির কেয়ারটেকার হয়ে আছেন আজ প্রায় পঁয়ষট্টি বছর। লেপচাজগতে নিজের ঝুপড়িতে বউ ছেলে নাতি সব আছে। তাও প্রতিদিন এখানে আসা চাই।

'কেন আসব না? আমি না এলে তো লুটেপুটে খাবে সবাই। ভেতরের টেবিল চেয়ার আসলি ওককাঠের, জানেন? বেলজিয়াম কাচের আয়না। লোকের নজর নেই ভেবেছেন?'

'কার বাড়ি এটা?' জিজ্ঞাসা করল সিদ্ধার্থ।

'মদনমোহন ধিংড়া। দিল্লির বাসিন্দা। সুপ্রিম কোর্টের উকিল ছিলেন। বাড়িটা নিয়েছিলেন ছুটিছাটায় আসবেন বলে। আমাকে বহাল করেছিলেন। প্রতিদিন সকালবেলা ছয়টার মধ্যে চলে আসি। দশটার মধ্যে ফিরে যাই। যখন সাহেবরা থাকতেন, তখন সারাদিন। না থাকলে, ওই তিন-চার ঘণ্টার জন্য। তবে আজকাল তো কাজ থাকেও না তেমন। ধিংড়া সাহেব চোখ বোজার আগেই একটা ট্রাস্ট বানিয়ে গিয়েছিলেন, যার থেকে বিভিন্ন এনজিও, সমাজসেবামূলক প্রকল্প ইত্যাদিতে অনুদান দেওয়া হতো। আমার মাইনে আসত সেই ট্রাস্ট থেকেই। দিব্যি চলছিল। কিন্তু সাহেব চোখ বুজবার পর কিছুদিন যেতে না যেতেই সম্পত্তির দখল নিয়ে ধিংড়ার তিন ছেলের মধ্যে লাগল লাঠালাঠি। সাহেব যেহেতু উইলে এই বাড়ি কোন ছেলের ভাগে পড়বে লিখে যাননি, তিনজনেই বলে এই বাড়ি তার। মাঝখান থেকে হল কী, বাড়ি ডিসপুটেড হয়ে গেল। কেউ তার রক্ষণাবেক্ষণ করে না। মেরামতির টাকা দেয় না। ইলেট্রিকের লাইন কেটে দিল। জল বন্ধ করে দিল। কিন্তু আইনের কী একটা মারপ্যাঁচে ট্রাস্টের টাকা আমার কাছে আসা আজও বন্ধ হয়নি। প্রতি মাসে নিয়ম করে ব্যাঙ্কে টাকা জমা পড়ে। ধিংড়া সাহেব ঝানু উকিল ছিলেন, এমন কলকব্জা করে গিয়েছিলেন যে ডিসপুটেড ল্যান্ডের কেয়ারটেকার এখনও মাইনে পায়। তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরেও।' কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন রামবীর।

'ভেতরটা দেখা যায়?'

'চলুন। টুরিস্ট পার্টিরা আগে এসে থাকত এখানে। সাহেব ভাড়া দিতেন। আমি সকালবেলা এসে তাদের ফাই-ফরমাশ খেটে দুপুরে নিজের ডেরায় ফিরে যেতাম। ডিসপুট হবার পর থেকেই সব বন্ধ। তবে হ্যাঁ, দেখার মতো বাড়ি বানিয়েছিলেন বটে! জানালার কাচ প্রতিদিন পরিষ্কার করবার কঠোর নির্দেশ ছিল। যাতে কুয়াশা লেগে ঝাপসা না হয়ে যায়। সাহেবের শখ ছিল দামি কাচ দিয়ে বাড়ি সাজানো ৷ একবার আমাকে বলেছিলেন, 'রামবীর, তোমার মাইনে জানালার কাচ পরিষ্কার করবার জন্যই আসে। ওটা মন দিয়ে করে যাও।' আসুন, এইদিক দিয়ে। সাবধানে অসবেন, ঝোপে বড্ড কাঁটা ৷'

বাড়ির ভেতর বড়ো হলঘরটা, ড্রইং রুমই বলা চলে, ধ্বংসস্তূপ। ধুলোয় আচ্ছন্ন পরিবেশ। পেল্লায় সোফা উলটে আছে। মেঝের ওপর লুটোচ্ছে ভাঙা বাল্বের কাচ। দুটো ফ্যান ব্লেডবিহীন অবস্থায় একপাশে রেখে দেওয়া। শুধু কয়েকটা চেয়ার এখনও আস্ত আছে। সেগুলো একটা গোল টেবিলকে ঘিরে সাজানো। হলের যেদিকে দরজা তার ঠিক উলটোপ্রান্তে মুখোমুখি বড়ো জানালা। জানালার নীচ দিয়ে খাদ নেমে গেছে। কাচ ভেঙে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে ৷ মাঝখান থেকে উঠে গেছে সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম।

'সাহেবের এক মেয়ে ছিল। অল্প বয়সে মারা যায়। বাবার নয়নের মণি ছিল সে। তার ঘরটা এই বাড়ির সেরা ঘর ছিল। সে চলে যাবার পর সাহেব ওই ফাঁকা ঘর সহ্য করতে পারতেন না। বলে দিতেন, টুরিস্ট পার্টি ভাড়া নিলে যেন ওই ঘরটায় রাখি। তাতে যদি মেয়ের সব স্মৃতি মুছে যায়, তাতেই সাহেব স্বস্তি পাবেন। এই যে, সেই ঘর।

ঠিক সিঁড়ির মুখেই তালাবন্ধ দরজা। কোমর থেকে চাবির গোছা খুলে একরাশ চাবির মধ্যে থেকে বেছে বেছে বার করলেন রামবীর। ক্যাঁচ করে দরজা খুলে গেল। বড়ো ঘরের মধ্যে কিংসাইজ সেগুন কাঠের খাট। দুই দেয়াল ভর্তি টানা ওয়ার্ডরোব। দেখলে বোঝা যায়, সময়কালে জাঁকজমক ছিল এই ঘরের। দুটো বড়ো জানালা। অ্যাটাচড বাথরুম। বর্তমানে ধুলোয় ছেয়ে আছে সমস্তকিছুই। বাথরুমের দরজা জ্যাম হয়ে আছে। আয়নার কাচে কয়েক দশকের ঝুল পড়ে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দুটো উঁচু ফ্যান। পুরো জায়গাটার মধ্যেই একটা দমচাপা ভাব। সম্ভবত অনেকদিন বাদে দরজা খোলা হলো।

'সাহেবের মেয়ের ছিল বার্নিশের গন্ধে অ্যালার্জি। এই ঘরে কাঠ বলতে তখন কিছু ছিল না। সব স্টিলের। অনেক পরে সাহেব একবার ভেবেছিলেন বাড়ি বিক্রি করে দেবেন। তখন পাহাড়ে অশান্তি শুরু হয়েছে। অনেক ফ্যামিলি নীচে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন পর যখন শান্ত হলো সবকিছু, মত বদলে ফেললেন। ঠিক করলেন রিটায়ারমেন্টের পর এখানেই মেয়ের স্মৃতি নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাবেন। এই খাট, ওয়ার্ডরোব, সব কিছু স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানালেন। ভাগ্যের ফের। এক বছরের মধ্যেই চলে গেলেন। কে আর ভোগ করবে এসব! ভূতের বাড়ি হয়ে গেল আস্তে আস্তে।'

সিদ্ধার্থ ফিসফিস করে বলল, 'আর কতক্ষণ দাঁড়াবেন এখানে? আমার ডাস্ট অ্যালার্জি আছে। আপনার সময় লাগলে আমি নীচে গিয়ে অপেক্ষা করছি।'

'যাচ্ছি।'

বেরোতে যাব, হঠাৎ খাটের পাশের দেয়ালটায় চোখ চলে গেল এবং স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমার মুখের অবস্থা দেখে 'কী হয়েছে' বলে সিদ্ধার্থ আমার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে নির্বাক হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

খাটের যে দিকটা মাথার দিক, তার দেয়ালে, খাটের সামান্য ওপরেই লাল আর কালো রং পেনসিল দিয়ে দুটো মূর্তি আঁকা। একটা মূর্তি দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে। আর একটা টুপি পরা মূর্তি তাকে গুলি করছে। তার হাতে বন্দুক। দুই হাত দাঁড়ানো মূর্তির মাথার ওপর ইংরেজিতে লেখা, 'অমিতাভ'।

কিছুক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। সম্বিত ফিরতে রামবীরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাজু, এখানে এই ছবিটা কে এঁকেছে?'

রামবীর চোখ কুঁচকে ক্ষীণ দৃষ্টিকে যতটা পারা যায় তীব্র করবার চেষ্টা করলেন। দেখে-টেখে উদাসভাবে বললেন, 'তা কত টুরিস্টই তো আসে। কেউ এঁকে থাকতে পারে।'

'একবার ভালো করে মনে করে দেখবেন? ১৯৭৫ সালের জুন মাসে এখানে কেউ এসেছিলেন কিনা?'

'ও বাবা। সে তো বহু আগের ব্যাপার। না না, অত মনে নেই,' রামবীর ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন।

'প্লিজ, মনে করবার চেষ্টা করুন। বড়ো দরকার।' ব্যাকুল গলায় বললাম। রামবীর অনেকক্ষণ নিজের মনে বিড়বিড় করলেন। তারপর বললেন, 'সেই যেবার সেবক রোডে বড়ো ধ্বস নামল? কে যেন একটা এসেছিল! একজন মাত্র লোক। গাড়ি চালিয়ে আসত। আমাকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দিত না। তালাবন্ধ করে রাখত বাড়ি। নিজেও বাইরে বেরোতে না বেশি। জোরে ইংরেজি গান বাজাত সারাক্ষণ। আমি বাড়ির কাজ সেরে সকাল সকাল নিজের বাসায় ফিরে যেতাম। তখনও ঘরের মধ্যে থাকত। বেরোতো না। আবার পরের দিন সকালবেলা এসে দেখতাম ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই জোরে গান বাজিয়ে

দিত। অস্থির লাগত গোটা জায়গাটা!'

'কে? নাম মনে আছে?'

'নাহ্, অত কী আর মনে থাকে? সেসব খাতাপত্রও আর নেই। তার আগেপরেও কত লোক এসেছে গেছে! একে মনে ছিল গান বাজাবার জন্য।'

'কেমন দেখতে, মনে আছে?'

রামবীর ঘাড় নাড়লেন। মুখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। আর কোনো লাভ হবে না এঁকে দিয়ে।

ঘর এবং দেওয়ালের কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে বাইরে বেরোলাম। বাইরে এসে রামবীরের হাতে কিছু টাকা দিলাম। বুড়ো ফোকলা মুখে হেসে বললেন, 'আবার আসবেন। কেউ তো আর আসে না! আমাকে একা একাই ঘরদোরের দেখভাল করতে হয়, জানালা পরিষ্কার রাখতে হয়।' এই বলে কাঁধের গামছা হাতে নিয়ে ভাঙা জানালার অদৃশ্য কাচের গায়ে বোলাতে থাকলেন। একে মাথা কাজ করছিল না, তার ওপর এরকম অদ্ভুত আচরণ দেখে আমরা দুজনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। 'আপনি কী মুছছেন? জানালার তো কাচ নেই।

রামবীর মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'আপনাদের কি মনে হয়, আমি সেটা জানি না? নাকি জানি না, এই বাড়ি ধ্বংসস্তূপ? কিন্তু ডিউটি হলো ডিউটি। আমার মাইনে আসে কাচ মোছবার জন্য, সাহেব বলেই গেছিলেন। কয়েক বছর আগে দার্জিলিং শহরে ব্যাঙ্কে গেছিলাম, যেখানে ট্রাস্ট থেকে এখনও টাকা আসে। ব্যাঙ্কের বড়োবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাহেব, বাড়ি বলতে তো আর কিছু নেই। জানালার কাচও নেই তাহলে এই টাকা নিয়ে করব কী?' বড়োবাবু উত্তর দিলেন, রামবীর, তুমি না চাইলেও টাকা আসবেই। তাহলে, টাকাই যদি আসে, আমাকে তো ডিউটি করেই যেতে হবে, তাই না? বাড়ি না থাকলেও বাড়ির খেয়াল রাখতে হবে। কাচ ভেঙে গেলেও প্রতিদিন কাচ পরিষ্কার রাখতে হবে। এই বলে হাতের গামছা দিয়ে জোরে জোরে শূন্যস্থানে ঘষতে লাগলেন।

গাড়িতে উঠেও মাথা কাজ করছিল না কিছুক্ষণ। সিদ্ধার্থ আপনমনে বলল, 'লোকটা পাগল?' তারপর একটা পাকানো সিগারেট পকেট থেকে বার করে ধরালো। আমি বললাম, 'সিদ্ধার্থ, আমাকে হয়তো আরও কয়েকদিন এই শহরে থেকে যেতে হবে, আমার মন বলছে। এই রহস্য যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি জটিল।'

'মাথায় কিছুই আসছে না। কী বলব, জানি না।'

'এখন ভাবব না। তাহলে মাথা ঘেঁটে যাবে। আগে লালবাহাদুরের বাড়ি যাই।' লালবাহাদুর রাইয়ের বাড়ি হরিদাস হাট্টা নামের একটা জায়গাতে, যেটা শহরের নীচের দিকে অবস্থিত। ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা মধ্যবিত্ত বাড়িঘর, সরু গলিপথ, হ্যাপি ভ্যালি চা-বাগানের উপত্যকা পাশ দিয়ে নেমে গেছে ঢালু হয়ে। লালবাহাদুরের বাসস্থান একটি একতলা ছোট্ট কাঠের বাড়ি। বাড়ির সামনে মুরগি চরছে কয়েকটা। টালির ছাদের ওপর গা এলিয়ে পড়ে আছে স্থানীয় সবজির মাচা।

লালবাহাদুরের বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি হবে। ঘরের ভেতর কাঠের চেয়ারে আমাদের মুখোমুখি বসে ছোট্টখাট্ট রোগা চেহারার মানুষটি স্মৃতিচারণ করছিলেন। ভাঙা বাংলায় ৷

'আমি বাংলা জানি। পড়তে লিখতে পারি না, তবে বলতে পারি ভালোই। এই শহরে জন্ম থেকে বেড়ে উঠলে বাংলা আপনি নিজে থেকেই শিখে যাবেন। তো, যা বলছিলাম, বছরখানেক হলো কনস্টেবলের পদে ঢুকেছিলাম তখন। সেই রাত স্পষ্ট মনে আছে। ফোন পেয়ে ধনরাজ স্যার বেরিয়ে গেলেন ৷ আমি থানায় ছিলাম। বারোটা নাগাদ ফিরে এলেন, সঙ্গে অরুণবাবু।'

'ড্যানিয়েল লামাকে চিনতেন?'

'চিনব না? বাঘের মতো ভয় পেতাম সকলে। রাজার মতো হাঁটাচলা করতেন। ড্যানিয়েল স্যারের দাপটে টাউনে কোনো অশান্তি ছিল না।'

'ড্যানিয়েল লামার হাত থেকে কেস কেন ধনরাজের হাতে গেল?'

'দেখুন, আমরা চুনোপুঁটি। ওপরের ব্যাপার অত ভালো জানতাম না। তবে এটা সবাই জানত যে ড্যানিয়েল স্যার আর ধনরাজ স্যার, দুজনের কেউ কাউকে পছন্দ করতেন না। একটা রেষারেষি বহুদিন ধরে ছিল। তো, ডিপার্টমেন্টের ভেতরের রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপার অনেক রকম হয়। তারপর তো ড্যানিয়েল স্যার চাকরি ছেড়েই দিলেন।'

সিদ্ধার্থর দিকে তাকালাম। আনন্দ পাঠক কেন ড্যানিয়েলকে পছন্দ করেন না, বোঝা গেল এবার।

'কেন ছাড়লেন, কোনো কারণ জানেন?

'বলতে পারব না। আমরা সকলেই অবাক হয়েছিলাম। তখন স্যারের আর কতই বা বয়স, চল্লিশ হবে বড়োজোর! যা নামডাক ছিল স্যারের, আর যেরকম কর্মদক্ষতা, একদিন না একদিন ডিএসপি হয়ে যেতেন। পরে আমার মনে হয়েছিল, ভেতরের রাজনীতিতে ধনরাজ স্যারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি।

'আচ্ছা, অমিতাভ মিত্রর বডি আপনারা কেন পেলেন না? কেন পুলিশের কুকুর আনতে হয়েছিল?'

'তুমুল বৃষ্টি পড়ছিল। দুইদিন ধরে সার্চ অপারেশন চালানো কঠিন ওরকম আবহাওয়াতে। আর তার থেকেও বড়ো কথা যেটা, তখনো তো আমরা জানতামই না যে অমিতাভ মিত্র খুন হয়েছেন। নিখোঁজ ধরে নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছিলাম। আমাদের কাছে সূত্র ছিল সামান্যই। বাগানের ঘাসে রক্ত, অরুণবাবুর হাতে আঁচড়ের দাগ, আর গুলির আওয়াজ। অপরদিকে প্রশান্ত গুরুং যা বলেছিল, সেটা অরুণবাবুর কথাকেই সমর্থন করে। আমরা কী করে জানব বলুন, যে এটা মার্ডার কেস? নিয়মমাফিক পুলিশের কুকুর নিয়ে এসে রক্তের দাগের কাছে যাওয়া হয়েছিল। তারপর তো মৃতদেহ আবিষ্কার হলো। এই তো কাছেই সেই জায়গাটা। পুরোনো কবরখানা। আমি নিজে ছিলাম, যখন বডি পাওয়া যায়।'

'অরুণ চৌধুরীকে কি সেদিনই গ্রেপ্তার করেছিলেন?'

'রাত্রের মধ্যেই, যখন বডি আইডেন্টিফাই করা হলো। অরুণবাবুর উকিল এলেন, মিডিয়া এল। আমরা তো স্থানীয় মানুষ। এর আগে জানতামই না অমিতাভ মিত্র এত বিখ্যাত কেউ। তারপর দেখলাম, এই কেস প্রায় জাতীয় খবর হয়ে গিয়েছে।

'অরুণবাবুকে ছাড়া হল কীসের ভিত্তিতে?

'কিছুই তো প্রমাণ নেই। যখন খুন হয়েছে, অরুণবাবু থানায় বসে। আপনারা বলবেন, সহকারী ছিল কেউ। কিন্তু তাহলে সে কোথায় গেল? তাকে ধরা গেলেও তবু কেস সাজানো যেতে পারত। সেটাও হয়নি। আমরা জনে জনে তল্লাশি চালিয়েছি, যদি সন্দেহভাজন কাউকে মেলে। কিস্যু পাইনি। অন্যদিকে, অরুণবাবুর উকিল ধনরাজ স্যারকে হুমকি দিচ্ছিলেন যে মিডিয়ার কাছে মিস্ট্রায়াল নিয়ে মুখ খুলবেন। প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন চাপ দিচ্ছিল। আমাদের কাছে যা সূত্র ছিল তা দিয়ে চার্জশিট বানানো সম্ভব নয়। এর থেকে বেশিদিন আটকে রাখলে মুখ পুড়ত আমাদের।'

'ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত কার ছিল?'

'ধনরাজ স্যারের। ঠিকই করেছিলেন। স্যার সবসময় সেই সিদ্ধান্তটাই নিতেন যাতে ডিপার্টমেন্টের ভাবমূর্তি অক্ষত থাকে। মনে আছে, অরুণবাবুকে যেদিন জামিনে ছাড়া হল, সেদিন স্যারের ঘরে বসে ছিলেন অরুণবাবুর উকিল। গুজরাতি ভদ্রলোক, নামটা ভুলে গেছি এখন। স্যার তাঁকে ইংরেজিতে কিছু বলছিলেন। অত ভালো ইংরেজি তো জানি না। যেটুকু বুঝেছিলাম, স্যার বলছিলেন, ভদ্রলোক যদি রাজি থাকেন, তাহলে সবদিক রক্ষা হয়। সম্ভবত অরুণবাবুর জামিন নিতে রাজি হবার কথা বলছিলেন। যদিও সবই আমার অনুমান মাত্র। ভুলও হতে পারি, কারণ অরুণবাবু জামিন নয়, বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন, যতদূর মনে পড়ে। সেদিন বিকেলবেলা মুক্তি পেলেন। তারপরেও কেস চলছিল, কিন্তু আমরা কোনো দিশা পাইনি কোনোদিকেই। ' ,

'সেই সময়টায় ড্যানিয়েল কোথায়?'

চিন্তা করে লালবাহাদুর উত্তর দিলেন, ‘এতদিন পরে সেটা আর ঠিকঠাক মনে পড়ছে না। যতদূর সম্ভব, ড্যানিয়েল স্যার মনে হয় ছুটিতে ছিলেন।'

ঋষি রোডের বাড়ির ছবি দেখালাম লালবাহাদুরকে। ‘এই বাড়িটা ঋষি রোডে। লেপচাজগৎ আর দার্জিলিং-এর মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত। কেসের সঙ্গে কি এই বাড়ি কোনোভাবে জড়িয়ে? কিছু জানেন?’

‘না তো! এমন বাড়ি এই প্রথম দেখছি।'

আরও টুকটাক কিছু প্রশ্ন করে আমরা উঠে পড়লাম। লালবাহাদুর ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিলেন ওল্ড সেমেট্রির ঠিক কোন জায়গায় অমিতাভর লাশ পড়েছিল। বেরিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ, কী মনে হলো, পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আচ্ছা যে রাত্রে অরুণবাবুকে থানায় নিয়ে আসা হয়, সেই রাতে তো ড্যানিয়েলের ডিউটি ছিল না। তবুও তিনি থানাতে এসেছিলেন। আপনার কি মনে আছে সেটা?'

‘হ্যাঁ, কেন থাকবে না? স্যার এসেছিলেন, রাত তখন আড়াইটে। চোখ লাল। অল্প খোঁড়াচ্ছিলেন।’

আমি থমকে গেলাম। খোঁড়াবার কথা তো আনন্দ পাঠক বললেন না!

‘কেন এসেছিলেন?'

'জানি না। খবর পেয়েছিলেন হয়তো।'

‘কিন্তু থানা থেকে তো কেউ ফোন করেনি!'

‘তা করেনি। কিন্তু ড্যানিয়েল স্যার তো নিজের চোখেও দেখে থাকতে পারেন। যদিও এটা একান্তই আমার নিজস্ব অনুমান। আশেপাশেই তো ছিলেন।

‘আশেপাশে মানে? '

লালবাহাদুর আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ‘আপনি জানেন না? সেই রাত্রে তো ড্যানিয়েল স্যার জলাপাহাড় রোডেই ছিলেন। অনেকেই তাঁকে দেখেছে।'

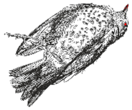

পাইনের দল প্রহরীর মতো শ্যাওলামাখা কবরগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। নীচের রাস্তা থেকে তিরতির করে ভেসে আসছে গাড়ির হর্ন, অথবা উচ্ছল হাসির আওয়াজ। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে ভালোমতন। সিদ্ধার্থর ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে কবরখানার ভেতর জোরে শ্বাস নিতে গিয়ে মনে হলো, এক ঝলক অতীত ঢুকে যাচ্ছে আমার ভেতর। কুয়াশার ভেতর দিয়ে চোখ চালালে যতদূর দেখা যায়, চারপাশে শুধু সাদা মার্বেলের এক একটা স্ল্যাব। তাদের মাথায় লুটিয়ে পড়েছে আগাছা। এপিটাফের পাথর ক্ষয়ে গেছে। ঘাসের ওপর পড়ে আছে সাপের ছেড়ে যাওয়া খোলস।

কেবল সাহেবের বইটা অরুণের কাছে। কিন্তু কবিতাগুলো অনেক কটাই মুখস্থ। একটা মনে পড়ে গেল। ‘ইন এ সেক্রেড গ্রিন গ্রেভ, অন দি গ্রাসি হিলসাইড/স্লিপস আ ফর্ম দ্যাট ওয়াজ জেন্টল অ্যান্ড ফেয়ার,/ এ ডিভোটেড সুইট ওয়াইফ, ইন দ্য হেডেইজ অফ লাইফ/ দি অ্যাডোরড অফ মাই সোল’স হিডেন দেয়ার'। কেবলের স্ত্রী কি এখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন? হয়ে থাকলে, অমিতাভ মিত্রর সঙ্গে কী আশ্চর্য সমাপতন! কেবলের পরিবার সম্বন্ধে কিছুই নথিপত্র নেই। তবুও মনে হলো, সবকটা সমাধি খুঁজে খুঁজে দেখি। হয়তো রুগ্ন, যক্ষ্মা কি ফুসফুসের রোগে ভুগতে ভুগতে শেষ হয়ে যাওয়া এক ফ্যাকাশে ইংরেজ তরুণীর শ্যাওলাধরা কবরের ওপর বসেই কেবল এই কবিতা লিখেছিলেন!

আমরা নির্ধারিত জায়গাটিতে এলাম। পুরো অঞ্চলটা সংস্কার করবার পরে ঝকঝকে হয়ে আছে। ১৯৭৫ সালে বোধ করি এমনটা ছিল না। অমিতাভর লাশ পড়েছিল একটা কবরের পেছনে, যার বড়ো এপিটাফের পাথর লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছিল মৃতদেহটিকে। কবরটি স্কটল্যান্ডের এক যুবকের, সুদূর ডান্ডি থেকে এই দেশে যিনি এসেছিলেন। হয়তো ভাগ্যান্বেষণে। এবং ১৮৪৮ সালে মাত্র ২৭ বছর বয়েসে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নাম অ্যালিস্টেয়ার ফিনলে। সম্ভবত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর লেফটেনান্ট ছিলেন, যদিও শ্যাওলা ঢাকা এপিটাফের এই জায়গাটা অস্পষ্ট। জায়গাটার কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। ফোটোগ্রাফারকে নিয়ে আবার আসতে হবে এখানে।

সিদ্ধার্থ বেশ অন্যমনস্ক। লালবাহাদুরের বাড়ি থেকে আসবার রাস্তায় একটাও কথা বলেনি। বললাম, 'আপনি যা ভাবছেন, আমিও সেটাই ভাবছি।' সিদ্ধার্থ ঘাড় ফেরাল, ‘কী ভাবছি, জানছেন কী করে?’

‘এটাই ভাবছেন যে ড্যানিয়েল যদি সেই রাত্রে জলাপাহাড় রোডে থাকেন, সেটা আনন্দ পাঠক আমাদের বলেনি কেন।'

‘ভুল। আনন্দ পাঠক কেন বলেননি তার সহজ ব্যাখ্যা আছে। ভেবেছিলেন যে আমরা জানি। আপনার মনে আছে, ওঁর একজ্যাক্ট কথাগুলো? আমার হুবহু মনে আছে। বলেছিলেন, ‘প্রশ্নটা হলো, ড্যানিয়েল এরকম দাবি কেন করলেন? যদি পুলিশেরা সত্যিই বলে থাকে, আর যদি সত্যিই ড্যানিয়েল বাড়িতে থাকেন, যেরকম তিনি দাবি করেছিলেন, তাহলে ড্যানিয়েলকে ফোন করেছিল কে? আর সেই ফোনেই বা কী এমন ছিল যে অত রাত্রে ড্যানিয়েল থানায় এসেছিলেন? মনে, যদি সত্যিই ড্যানিয়েলের দাবি ঠিক হয় যে তিনি বাড়িতে ছিলেন, তাহলে তাঁকে ফোন কে করেছিল'— এটাই আনন্দ পাঠকের প্রশ্ন ছিল। কিন্তু ড্যানিয়েল যে বাড়িতেই ছিলেন সেরকম দাবি আনন্দ পাঠক করেননি। তাঁর অবাক লাগার জায়গাটা যেখানে ছিল, এবং যেটা তাঁর ধারণা আমরা জানতাম— ড্যানিয়েলকে তো জলাপাহাড়ে দেখা গিয়েছিল। তাহলে ড্যানিয়েল এরকম দাবি করলেন কেন? আর যদি তিনি

সত্যি বলে থাকেন, তাহলে থানার ঘটনা বাড়িতে বসে কীভাবে জানলেন?'

সিদ্ধার্থর কথায় যুক্তি আছে। ড্যানিয়েলের বাড়ি জলাপাহাড় রোডের কাছেই। সেদিন ওই জায়গাতে তাঁর থাকা এতই সাধারণ একটা ঘটনা যে সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।

'কিন্তু তাহলে আপনি এত অন্যমনস্ক কেন? কী এত ভাবছেন?'

সিদ্ধার্থ নীরব। তাকিয়ে ছিল দূরে। একটা কাঠবেড়ালি শ্যাওলা মেখে উড়ে গেল এক কবর থেকে অন্য অন্ধকারের দিকে। কুয়াশা নিবিড় হলো। চোখে পড়ল, ফিনলের কবরের একপাশে অনাদৃত ফুলের তবক, পড়ে আছে মাটিতে। আশ্চর্য, এত বছর পরেও কেউ মনে রেখেছে? নাকি স্কটল্যান্ড থেকে এসেছিল কেউ, পূর্বপুরুষের সমাধি খুঁজে বার করতে? আমিও সম্ভবত একইভাবে খুঁড়তে চাইছি। অমিতাভ মিত্রর হারানো সমাধি। শুধু, তেমন লাঙল নেই। কলম বাদে।

'এবার যেতে হবে।' বললাম।

'ভাবছি, একটা অদ্ভুত জিনিস। হয়তো বোকা বোকা।' আচমকা বলল সিদ্ধার্থ।

'বলতে পারেন। হয়তো আমার বোকা বোকা লাগবে না। '

'একজন মানুষ যদি ভালো ইংরেজি না বোঝে, যদি শুধুমাত্র কয়েকটা শব্দের মানে বোঝে, তাহলে তার সামনে অন্য কেউ ইংরেজিতে কথা বললে সে কীভাবে মানে উদ্ধার করবে?

'এ আবার কেমনধারা প্রশ্ন?' ভুরু কোঁচকালাম আমি।

'হেঁয়ালি নয়। ভাবছি। আপনার কী মনে হয়, কেমনভাবে সে অর্থ বুঝবে?'

'কেমনভাবে আবার? সে তার জানা শব্দগুলোর মানে বার করবে, তারপর সেগুলোকে একটার পর একটা জুড়ে দিয়ে নিজের মনের ভেতরে কোনো একটা অর্থপূর্ণ বাক্য গঠনের চেষ্টা করবে।'

'ঠিক।' সিদ্ধার্থ মাথা নাড়ল। স্থির দৃষ্টি মেলল আমার চোখে। 'যেদিন কাকাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, লালবাহাদুর রাই ধনরাজ গম্বর ঘরে গিয়ে ইংরেজিতে কথোপকথন শুনেছিলেন। সেই কথাটা ছিল, তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ভদ্রলোক যদি রাজি থাকেন... ইত্যাদি ইত্যাদি।' এবার বলুন লালবাহাদুর রাই ভালো ইংরেজি জানেন না। তিনি যদি পুরোটাই ভুল অর্থ করে থাকেন?'

'মানে? এখনও বুঝলাম না।'

'লালবাহাদুর তাঁর চেনা শব্দগুলো পরপর জুড়ে যদি একটা অন্য ব্যাখ্যায় যান? ভাবুন একবার। ভদ্রলোকের ইংরেজি কী? '

'জেন্টলম্যান।'

'আর রাজি হওয়া?'

'এগ্রি।' বলেই আমি স্তম্ভিত হয়ে নিজের মুখে হাত চাপা দিলাম। এই জিনিসটা মাথায় আসেনি কেন এতক্ষণ?

জেন্টলম্যান'স এগ্রিমেন্ট।

দুই পার্টির মধ্যে মৌখিক চুক্তি, যেটা পালন করতে দুই পক্ষই দায়বদ্ধ থাকবে। কোনো লেখাপড়ার ব্যাপার নেই এর মধ্যে। কিন্তু এমন এক দৃঢ় শর্ত আছে, যার ফলে উভয় পক্ষই সারা জীবন ধরে সেই অবস্থানকে মর্যাদা দেবে।

'ধনরাজ আর কাকার মধ্যে কী সেই চুক্তি ছিল, মিস ভটচাজ? পুলিশ কেন এরকম একটা বোঝাপড়ায় গেল? কাকাকে কি তার জন্যই ছেড়ে দিয়েছিল? ধনরাজ কেন বললেন যে এই চুক্তির ফলে সবদিক রক্ষা হবে? পুলিশের কি কিছু হারাবার ভয় ছিল?'

নাছোড় টুপটুপে কুয়াশার বুক চিড়ে একটা হা-ক্লান্ত ধূসর সূর্যালোক চুঁইয়ে পড়ছিল ফিনলের এপিটাফের মাথায়। কিন্তু সেদিকে আমাদের কারোরই তাকাবার অবসর ছিল না।

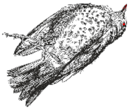

এই শেষ। সম্পাদকমণ্ডলীতে আর নাম ফাম রাখা যাবে না। এভাবে লেখালেখি হয়? লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে দূর থেকে সম্পর্ক রাখাই ভালো। নাহলে সংগঠক হয়ে যেতে হবে, লেখক না।

পরশু সপ্তমী। তবু আমার ছুটি নেই। পাহাড়ে আগমনী হয় না, শুধু বিসর্জন।

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে

'অশ্বমেধের ঘোড়া' দুটি সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৯৬৮ সালের যথাক্রমে এপ্রিল ও ডিসেম্বর মাসে। তারপর দীর্ঘ ছাব্বিশ বাইশ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। সম্পাদকমন্ডলীর আন্তরিকতায় ঘাটতি ছিল না, ঘাটতি ছিল না উদ্যম ও পরিশ্রমের— ইচ্ছারও। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে মাঝের গোটা এক বছর প্রকাশ করতে পারা গেল না, তার কারণ সম্ভবত লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্রের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। যতক্ষণ তা অনিয়মিত, অনিশ্চিত এবং আর্থিকভাবে দুর্বল, ততক্ষণই লিটল, যখন নুন আনবার পরেও দেখা যাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ পান্তা আছে, বছরে চারটে অথবা দুটো মোটা সংখ্যা, বিদগ্ধ লেখকের দাম এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা যাবে, তখন চরিত্রেও বড় পত্রিকা হাউস এবং বাজারজাত হবার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। । না, কবিতা পূর্বাশা অথবা শতভিষা হয়ে ওঠার কোনো ইচ্ছা আমাদের ছিল না, পর্যাপ্ত গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও। তবুও, পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ প্রকাশে সত্যিই অনেকদিন দেরি হয়ে গেল। ধূর্জটি চন্দ কবিতা পাঠায়নি। রাখা উচিত ছিল ওকে। দ্বিতীয় যে কথাটা বলার, এই সংখ্যার পরিকল্পনা আমাদের ছিল একবছর আগে থেকেই, অর্থাৎ ১৯৬৯ সাল। কিন্তু সেই পরিকল্পনার অনেকটা বাতিল করে নতুনভাবে সবকিছু শুরু করতে বাধ্য হয়েছি, দেরির কারণও মূলত সেটাই, কারণ ১৯৭০ সালের শুরু থেকে আমরা লক্ষ্য করছি বাংলা কবিতার একটা উল্লেখযোগ্য বাঁকবদল ঘটেছে। এই বছরেই বেরিয়েছে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের দেবী এবং অমিতাভ গুপ্তর আলো, এবং আমরা মনে করি এই দুটি কবিতার বই আগামী গোটা দশককে চিহ্নিত করবে। ভবিষ্যতেও, আজ থেকে হয়তো তিরিশ বছর পরে, যখন সত্তরের কবিতা নিয়ে আলোচনা হবে তখন তার প্রস্থানবিন্দু হবে এই দুটি বই, যদি বাংলা কবিতা সত্যভাষী হয়। এর পাশাপাশি আমরা রাখব দেবদাস আচার্যের কালক্রম ও প্রতিধ্বনি, যা প্রত্যক্ষে রাজনৈতিক না হয়েও কাব্যভাষায় নিম্নবিত্তের স্বরকে ঢুকিয়ে এক প্রকার অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে। ১৯৬৯ সালে পরিকল্পনায় ছিল যে পত্রিকার প্রবন্ধগুলোর বিষয় হবে 'কেন বাংলা কবিতা সময়ের স্বরকে আত্মস্থ করতে পারল না'। স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিকল্পনা আমরা ত্যাগ করেছি কারণ তারপর এই বইগুলো বেরিয়ে গেছে। শুধু এরাই নয়, আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করছি বাংলা কবিতায় নারীস্বরের এক শক্তিশালী বয়ান উঠে আসছে যেটা ১৯৫০-এর নবনীতা দেবসেন, কবিতা সিংহ এমন-কি ষাটের দশকের দেবারতি মিত্রদের থেকেও চরিত্রে কিছুটা আলাদা। সেই স্বরের মধ্যে শুধুই স্বাধীন প্রেম বা স্বাবলম্বনের প্রশ্ন নেই, বরং আছে হিংসা, আঘাত দেবার বাসনা, আছে বিবাহ-বর্হিভূত সম্পর্ক অথবা সমপ্রেমের মতো অস্বস্তিকর বিষয়গুলোও। কৃষ্ণা বসু, রমা ঘোষ, দেরাঞ্জলী মুখোপাধ্যায়, এঁদের কারও কবিতাই একে অপরের মতো নয়। কিন্তু প্রণয় আর বিষাদচিহ্ন, ক্রোধ আর লালসা, ক্ষয়িষ্ণুতা আর তীব্র সংরাগের চিত্রল আভাসে পরিপূর্ণ হয়ে, উঠেছে এই কবিদের প্যালেট। এঁদের ভাষা পুরুষবিশ্বে অচেনা, এমনকি সমপ্রেমের মতো অদ্ভুত ব্যাপার ব্যক্তিগতভাবে আমরা যে সবাই মানতে পারব এমনটাও নয়। কিন্তু এঁদের স্বরকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, এবং এঁদের কবিতাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য হিসেবে

আমাদের মনে হয়েছে। ১৯৬৯ সালের পরিকল্পনায় এই ভাবনা ছিল না।

শংকর চক্রবর্তী। অপূর্ব লেখে। আর অনন্য রায়। অনন্যকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার।

ছিল না মানে কী! এরা '৬৯ সালে লেখেনি? আসলে ইচ্ছের অভাব, চেষ্টীকৃত উদাসীনতা।

কিন্তু কিছু লেখা ১৯৬৯ সালেই আমরা জোগাড় করেছিলাম, সেগুলো প্রকাশ না করলে লেখকের প্রতি সুবিচার হতো না। এই লেখাগুলো কয়েকটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, লেখকরা নিজেরাও তা মানেন। সুব্রত রুদ্রর এই বছরের পাঠ অভিজ্ঞতাকে সাম্প্রতিক বলা যাবে না। সুব্রতর মতো সংবেদনশীল মানুষ তা জানেন বলে নিজেই চেয়েছিলেন লেখাটি প্রত্যাহার করে নিতে। আমরা চাইনি, কারণ সুব্রতর মতো এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কবির শ্রম, মেধা ও পাঠাভ্যাসকে ডকুমেন্ট করে রাখা দায়িত্ব হিসেবে মনে করেছিলাম। আবার বীরভূমের তরুণ কবি একরাম আলি কয়েকটি গদ্য কবিতা পাঠিয়েছিল। পরবর্তীকালে তার মনে হয়েছে সেই গদ্য ১৯৭০-এর বইদের বিচারে আকাইক, তাই তার দাবী ছিল কবিতাগুলি যেন আমরা বাতিল করি। আমাদের মনে হয়েছে যে একরামের ভাষা লৌকিকতার কাছ থেকে পাওয়া এক আশ্চর্য আলোয় জারিত। ভূমণ্ডলে সঞ্চরমান সমস্ত প্রাণের সঙ্গে নিগূঢ় যোগ ঘটিয়ে দেয় এক নিভৃত আত্মিকতার মাধ্যমে, যা এই মুহূর্তে বাংলা কবিতার তীব্র নাগরিকতার চাপে বিরল একরামের সমস্ত কবিতা একটা শব্দও না বদলিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই সংখ্যায়, এবং ভাষা নিয়ে তার এই কনটেম্পোরারি থাকার দাবী আমরা স্বীকার করিনি। স্বাভাবিকভাবেই।

প্রকল্পনা এরকম করে কেন লেখে? উত্তর বসু এটা কি ছদ্মনাম? আবার একইসঙ্গে অরুণ বসুর 'ক্ষুধার্তের কৈফিয়ত' লেখাটি সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে এক অনন্য থিওরিবয়ন, যে কোনো কালেই এমন লেখার প্রাসঙ্গিকতা পুরোমাত্রায় থাকবে। অরুণ বসুর কাছে আমাদের অভিযোগ ছিল, আমার দশক-এর মতো অত উচ্চমানের পত্রিকাটি তিনি বন্ধ করে দিলেন কেন। অজ্ঞাতবাস বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অভিযোগ আমরা প্রত্যাহার করে নিয়েছি, এবং লিটল ম্যাগাজিনের জগতে অজ্ঞাতবাস যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে চলেছে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করছি না, অরুণ বসুর হাঙরি সংলগ্নতায় আমাদের সংহতি নেই, বরং এ জাতীয় দলবদ্ধ আন্দোলনকে কিছুটা সংশয়ের চোখেই দেখে এসেছি। ঠিক যেমন আগের বছরেই কবিসেনা ও স্বতোৎসার পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া প্রকল্প সর্বাঙ্গীন কবিতা আন্দোলনকেও আমরা সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই দেখছি। কিন্তু নিজের অবস্থানের সমর্থনে অরুণ যে তত্ত্বায়ন করেছেন দীর্ঘ এগারো পাতা জুড়ে, তাকে আগামীদিনেও রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের মনে হয়েছে অরুণকে পাঠকের কাছে নিয়ে আসা দরকার।

অরুণ অনেক বই কিনে দিল পুজোতে। ফকনারের দুটো উপন্যাস, আফ্রিকান রাইটিং টুডে, অ্যান্টি পোয়েট্রি সংকলন - ফকনারের ভাষা লক্ষ্য করছি আর . . .

প্রকল্পনা আন্দোলনের লোকজনের নামগুলো বেশ অদ্ভুত কিন্তু। ভট্টাচার্য চন্দন- এরকম করে কেন লেখে? উত্তর বসু- এটা কি ছদ্মনাম?

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত, তাই উত্তরের কবিরা কিছুটা বেশি জায়গা পাবেন, স্বাভাবিক। ষাটের দশকের কবি সমীর চট্টোপাধ্যায় রণজিৎ দেবদের কবিতা আমরা নিয়েছি। সমান আগ্রহে নিয়েছি সমসমায়িক অনুভব সরকার, সন্তোষ সিংহদের কবিতাও। অরুণেশ ঘোষকে আমরা দশকের মধ্যে বাঁধতে চাই না, এবং মনে করি বর্তমান দশকেও অরুণেশ এক প্রধানতম স্বর হিসেবেই থেকে যাবেন। আমরা অমর চক্রবর্তী, কমল সাহা, সঞ্জয় দেবনাথের

কবিতাকেও গুরুত্ব দিচ্ছি। কিন্তু শুধুই স্থানিক বেড়াজালে বন্দী থাকা তো উদ্দেশ্য ছিল না। বরং বীরভূমের একরাম, শান্তিপুরের অরুণ বসু, পুরুলিয়ার মুকুল চট্টোপাধ্যায়, অশোক দত্ত, রাণাঘাটের অনুপ মুখোপাধ্যায়, চব্বিশ পরগণার বাপী সমাদ্দারকে আমরা চেয়েছি পাঠকের বৃত্তে পৌঁছে দিতে। বরং এই অভিযোগ উঠতে পারে যে কলকাতার কবিদের বিষয়ে অশ্বমেধের ঘোড়া হয়তো কিঞ্চিৎ উদাসীন। সেটা অমূলক নয়, কিন্তু এই সময়কালের কবিতাচিহ্নকে যদি কোনো একটামাত্র দিকনির্দেশিকা দিয়ে নির্দেশ করতেই হয়, সেটা হল মফস্বল ও গ্রামের উত্থান। তাই ওটুকু পক্ষপাতিত্ব সচেতন সিদ্ধান্তই ছিল।

এই সংখ্যা বার করতে খরচ পড়ল চারশো পঁচাত্তর টাকা। হিসেব করে দেখতে গেলে, বহু নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের চার মাসের খরচ এ টাকায় উঠে আসে। ভবিষ্যতে আবার যখন পত্রিকা বার করতে হবে, একইরকম ভাবে আর্থিক টানাটানির চাপ থাকবে। কিন্তু তার পরেও 'অশ্বমেধের ঘোড়া' বেরবে, ঠিক যেমন বেরবে আরও কয়েক হাজার লিটল ম্যাগাজিন, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অনিশ্চিত পদক্ষেপে। এটাই কনভেনশন। অথবা, তৃতীয় বিশ্বের একটি অবহেলিত ভাষার অবাণিজ্যিক নিরীক্ষামূলক সাহিত্যচর্চার ভবিতব্য। হতাশাও আসবে, মনে হবে যে এবার থেমে যাওয়াই ভালো, এবং তারপরেও পত্রিকা অনিয়মিতভাবে বেরবে।

এতটা নাটকীয় হবার দরকার আছে? তারপর দেখা গেল, আর বেরলই না, এত বুক বাজিয়ে বলার পর। কিন্তু — কী আসে যায়! কবিতা আমরা লিখবই। লিখেই যাব। যতদিন এ পৃথিবীতে একটাও লিটল ম্যাগ বেঁচে থাকবে, আমাদের লেখা কেউ আটকাতে পারবে না।

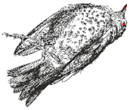

এবং যেহেতু ভিরমি খাওয়া পথের
ওপর সমস্ত ধূলো ময়লা পরিষ্কার করার জন্য আমার গা শিউরে শিউরে উঠছে, খারাপভাবে জড়ো করা নানান বিস্ফোরক দিয়ে তৈরী হয়েছে আমার দেহাভিমান এবং সমস্ত বারণ অমান্য করে আমি আমার আত্মার কাছে যেতে চাইছি।'

—শম্ভু রক্ষিত

'ঋষি রোডের বাড়ি? এরকম কিছু শুনিনি।' অরুণ চৌধুরী উত্তর দিলেন।

রাত সোয়া আটটা। আমরা অরুণের ডাইনিং রুমে বসেছিলাম। আমি, অরুণ, সিদ্ধার্থ আর অনন্যা। পাস্তা, গ্রিলড পট্যাটো এবং বেকড স্যামন। সঙ্গে হোয়াইট ওয়াইন। অরুণের জন্য কফি। আমি খেতে খেতে সংক্ষেপে জানাচ্ছিলাম গত দুইদিনের বিবরণ। সত্যি বলতে কী, এত নতুন নতুন রহস্য সামনে এসে ভিড় করেছে যে বুঝতেই পারছিলাম না কীভাবে গল্পটা শুরু করব। মনে মনে ঠিক করে এসেছিলাম যে অরুণের সাহায্য চাইব দরকার হলে। রহস্যকাহিনীর প্রাজ্ঞ লেখক হিসেবে যদি এগোবার রাস্তাটা দেখিয়ে দেন। এর মধ্যে ফোটোগ্রাফার এসে সবকটা জায়গার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি তুলে আবার ফিরে গিয়েছেন ঘণ্টা দেড়েক আগে। তারপর এই বাড়িতে এসে আলাদা আলাদা ভাবে অরুণ আর অনন্যার সাক্ষাৎকার ফোনে তুলে নিয়েছি। ফলে কাজ অনেকটাই কম। হালকাও লাগছে কিছুটা। শুধু ড্যানিয়েল লামার বাড়িতে গিয়ে আবার নিরাশ হতে হয়েছে। গেট থেকে খালি হাতে ফিরেছি। মেলেনি পুলিশ লাইব্রেরির কার্ডও। তবে আনন্দ পাঠকের ছবি যখন তুলতে যাওয়া হয় তাঁর বাড়িতে, গিয়েছিলাম সঙ্গে। পাঠক অনেক গল্প করলেন, স্মৃতিচারণা করলেন এই শহরের। অ্যালবাম খুলে পুরোনো বহু ফটো দেখালেন, অনুমতি দিলেন তাদের ছবি তুলে রাখার। যখন স্টোরি করব, এই শহরটাকে ১৯৭৫ সাল অনুযায়ী নির্মাণ করে নিতে হবে। সেই কাজে আনন্দ পাঠকের বয়ান, এবং তাঁর সংগ্রহের ছবিগুলো অমূল্য সম্পদ।

অনন্যা ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়িটার ভেতরটা কেমন দেখতে? গথিক স্ট্রাকচার নিয়ে আমার বরাবরের কৌতূহল।' উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই অরুণ অস্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি মনে করেন, ওই বাড়িতে অমিতাভ ছিল?'

'অমিতাভ, অথবা তাঁর হত্যাকারী, অথবা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, যে কেউ হতে পারে।'

'অন্য কেউ ছিল কিনা তা নিয়ে আমার ইন্টারেস্ট নেই। অমিতাভ ছিল কিনা, কারণ পুলিশ আমাকে বলেছিল অমিতাভর নিজের ডেরায়, ওই গ্রামের ঘরে, ও নাকি অনেকদিন আসেনি। তাহলে এই দিনগুলো ও কোথায় ছিল? উপন্যাসটা কোথায় বসে লিখেছিল? কোনোদিন জানতে পারিনি।'

'বাড়িটার কথা পুলিশকে জানাচ্ছেন না কেন?' অনন্যা জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই কেস তামাদি হয়ে গিয়েছে। এখন কে আর সাধে নতুন করে পুরোনো ফাইল খুলবে?'

'কিন্তু আপনি কি চান না সত্যিটা বেরিয়ে আসুক?'

'সত্যি নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই।' উত্তর দিলাম। 'আমি স্টোরি করতে এসেছি। রহস্যের সমাধান করতে নয়। আজ যদি এই বাড়িটা আমার সামনে হাজির হয় এসে, সেটা আমার গল্পের উপাদান। গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু তার জন্য আমাকে পেছনের কাহিনীটা জানতে হবে।'

'আর যে সন্দেহ গত চল্লিশ বছর ধরে অরুণের ঘাড়ে চেপে বসে আছে, সেটার নিরসন হবে না?' অনন্যা আমার চোখে চোখ রাখলেন।

দৃষ্টি ফেরালাম না। 'প্রত্যেককে নিজের ক্রুশকাঠ নিজেকেই বইতে হয়।' আমি বিশ্বাস করি, এই রহস্যের সমাধান একমাত্র করতে পারেন মিস্টার চৌধুরী। তিনি না চাইলে করবেন না। কিন্তু আপনি কি সত্যিই এতটাই কৌতূহলী? কিছু মনে করবেন না। পরশুদিন কথা বলে কিন্তু মনে হয়েছিল মাথা ঘামাতে চান না। এমনকি আমি যে এখানে আসি, আপনি বা সিদ্ধার্থ কেউ চাননি।

অনন্যা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'খুনের রহস্যকে ধাঁধা হিসেবে অথবা আকর্ষক উপাদান হিসেবে দেখার ইচ্ছে আমার নেই।' অরুণের হাতে হাত রাখলেন অনন্যা, 'কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার স্বামী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অন্যের সন্দেহ থেকে মুক্তি পান। আমরা আগের বছর জয়পুর সাহিত্য উৎসব গিয়েছিলাম। সেখানে এতদিন পরেও যখন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল অরুণের, সেই একই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। ছাপা হয়েছে জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে। হেডলাইন ছিল খুনের সন্দেহভাজন থেকে মুক্ত হয়ে বেস্টসেলার লেখকে পরিণত হওয়া অরুণ চৌধুরী নিজের সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে কথা বলছেন। গার্ডিয়ান থেকে অরুণের উপর ফিচার করবার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল। কেন করেছিল? অরুণের লেখার জন্য নয়। চল্লিশ বছর আগেকার ঘটে যাওয়া একটা হত্যারহস্যের জন্য। কেন এতদিন পরে এসেও বারবার এই সন্দেহের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে?'

কিছুক্ষণ সকলে নির্বাক। অরুণ খাওয়া থামিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন। সিদ্ধার্থ নীরবতা ভাঙল, 'কাকিমা, তুমি চাইলে আমরা কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।'

'এত পুরোনো কেস নিয়ে কেউ কি উৎসাহী হবে আর?' জিজ্ঞাসা করলাম। 'পরশু আমাকে বসিয়ে যে যে প্রশ্নগুলো আপনি তুললেন, সবকটা নিয়ে ভেবেছি। কিন্তু কিছু মাথায় আসেনি। হয়তো ইন্টারেস্ট পাইনি বলেই। শুধু একটা কথা মনে হয়েছে। আপনি প্রশ্ন করেছিলেন, চোখের সামনে রাইফেল দেখেও অমিতাভর হৃৎস্পন্দন কেন বেড়ে যায়নি। কারণটা সম্ভবত মদের জন্য। অত্যধিক মাত্রায় নেশা করে অমিতাভ অসুস্থ বা অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন।' বললেন অনন্যা।

অরুণ আমার দিকে তাকালেন। 'আমিও ভেবেছি। নতুন করে। আর সেটা ভাবতে গিয়ে আবিষ্কার করছি, এই ঘটনার অনেকগুলো দিক আমি নিজেও জানি না। যেমন পুলিশ মহলে ড্যানিয়েল আর ধনরাজের পারস্পরিক রেষারেষি। অথবা, সেই রাত্রে মিসেস বাসু পুলিশের কাছে ঠিক কী বলেছিলেন। এগুলো আবার নতুন করে আমার সামনে ফিরে আসছে।'

'কিন্তু সেই রাত্রে ড্যানিয়েল কেন থানায় এসেছিলেন বলে মনে হয়? ইন্টারভিউতে এই প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে। এড়িয়ে গেলেন। তাই আবার করছি।'

'এড়িয়ে গেলাম, কারণ এর উত্তর একদমই জানা নেই। তবে ঘটনাটা মনে আছে। ড্যানিয়েলকে দেখে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একজন পুলিশ বলে উঠেছিল, 'স্যার, এত রাতে?' ড্যানিয়েল আমাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে ছিল কয়েক সেকেন্ড। তারপর ধনরাজ গম্বুকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। উত্তেজিত গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। নিজেদের ভাষা আর ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলছিল দুজন। বলছিল মূলত ড্যানিয়েলই। কথার বক্তব্য, এই কেস এখন থেকে তার। অন্য কেউ যেন সেখানে মাথা না ঘামায়। ধনরাজ থমথমে মুখে বেরিয়ে এসে থানার বাইরে চলে গেল। ড্যানিয়েল এসে বসল আমার টেবিলের উলটোদিকে। তার আগে পর্যন্ত রুটিন চেক-আপ, জিজ্ঞাসাবাদ এসব চলছিল। ড্যানিয়েল আসার পর ছবিটা পালটে গেল। ড্যানিয়েল নির্দেশ দিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অমিতাভ এবং প্রশান্ত গুরুং দুজনকেই থানায় এনে হাজির করতে। সেই ভোরেই দুজনের আস্তানায় হানা দিল পুলিশ। এর পরের ঘটনা তো আপনি জানেন।'

'সেই রাতে ড্যানিয়েল কি খোঁড়াচ্ছিলেন? কেন?'

অরুণ মাথা নাড়লেন, ‘সেসব মনে নেই আর। এই কেনর উত্তরও আমার কাছে নেই।

‘সঞ্জয় অধিকারীর সেই সময়কার রিপোর্ট সংগ্রহ করে যতটুকু জেনেছি, আপনাকে পরের ভোরবেলা ছেড়ে দেবার পর সারাদিন বাড়িতেই ছিলেন। সেদিন কি উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছিল?’

'না। বাড়িতে শুয়ে ছিলাম, আর ভাবার চেষ্টা করছিলাম আগের দিনের ঘটনাগুলো। দাদা খবর পেয়ে সকালবেলা উকিল নিয়ে এসেছিল। তখন তো একাই থাকতাম। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে যে ছেলেটি, সে ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি গিয়েছিল আগের সপ্তাহে। বাবলাও ততদিনে চলে গিয়েছে। দাদা জোরাজুরি করল, সে এখানে থাকবে। কিন্তু আমি একা থাকতে চাইছিলাম। কারোর সঙ্গ ভালো লাগছিল না। উকিল মিস্টার ভুলাভাই প্যাটেল বলছিলেন আগাম জামিনের আবেদন করতে। কারণ তিনি খবর পেয়েছিলেন যে অমিতাভকে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি খারাপ কিছু ঘটে থাকে, পুলিশ গ্রেপ্তার করবে সবার আগে। এসব নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল। দাদারা বেলার দিকে চলে গেল। আমার এক বন্ধু এসেছিল তারপর। কিন্তু বাড়ির বাইরে বেরোইনি। আপনাকে ওয়াইন দি?’

‘অল্প করে। ধন্যবাদ। আপনি কি একেবারেই মদ খান না?’

‘কলেজবেলায় দু-একবার খেয়েছি। আর অনন্যার সঙ্গে বিদেশের কনফারেন্সে যেতাম যখন, রিসেপশনে ওর পাল্লায় পড়ে চেখে দেখেছি।' অনন্যার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন অরুণ। ‘অনন্যা ওয়াইনের ব্যপারে অসম্ভব নাকউঁচু। বিশেষ দেশের বিশেষ অঞ্চলের ওয়াইন না হলে ওর অসুবিধে হয়। কিন্তু আমি একেবারেই অরসিক। সকাল থেকে রাত অবধি কয়েক লিটার কফি আমার প্রিয় বন্ধু বলতে পারেন।

‘আমরা হাসাহাসি করতাম নিজেদের মধ্যে। অরুণের রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙে যায় মাঝেমাঝেই। আর লোকে যেমন জল খেয়ে আবার ঘুমোতে যায়, ও নাকি তেমনভাবেই কফি খেয়ে নেয় কয়েক ঢোক।'

‘আপনিও কি উত্তরবঙ্গের মানুষ?' জিজ্ঞাসা করলাম অনন্যাকে।

‘না। আমরা প্রবাসী বাঙালি। আমার জন্ম এবং বড়ো হওয়া এলাহাবাদে। পড়াশোনা করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি। কয়েক বছর ব্রেবোর্নে পড়িয়েছি। একটা এক্সকারশনে দার্জিলিং এসে অরুণের সঙ্গে আলাপ। ১৯৭৭ সাল সেটা। বরাবর চাইতাম শহরের কোলাহল থেকে দূরে কোথাও বাড়ি করে থাকতে। অরুণের থেকেও আমাকে বেশি টেনেছিল তখন দার্জিলিং। এখন তো শহরটা বদলে গেছে অনেক। ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। নীচের দিকে বেড়েই চলেছে। পুজোর সময়ে এখানে ভিড় দেখলে মনে হবে আপনাদের গড়িয়াহাটে বসে আছেন। কিন্তু তখন এরকম ছিল না। যখন এসেছিলাম, অরুণ চৌধুরীর নাম সেই সময়ে ছোট্ট শহরটার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। স্মল টাউন সিন্ড্রোম যা হয় আর কী! আজকের দার্জিলিং হলে মনে হয় না মানুষ এসব নিয়ে এত মাথা ঘামাতো।'

‘আর তবুও সেই রহস্য নিয়ে আপনি আকৃষ্ট হলেন না?’

‘না। আমি সোজা পথে চলি। আগের দিনেও বলেছি। সবথেকে সহজ যে সমাধান, সেটাই বাস্তব সমাধান মনে হয়।'

‘এক্ষেত্রে সেটা কী?'

‘ভাবিনি। কিন্তু একটা জিনিসে বিশ্বাস করি। আমাদের অঙ্কে ওকামস্ রেজর নামে একটা তত্ত্ব চলে। মধ্যযুগের দার্শনিক উইলিয়াম অফ ওকামের নাম থেকে এই তত্ত্বের উদ্ভব। যদি কোনো ঘটনা ঘটে, যার একাধিক সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে, তাহলে যে কারণটা ভাবতে গেলে সবথেকে কম মাথা খাটাতে হয়, সেই সহজতম ব্যাখ্যাই নেওয়া উচিত। এটাই হলো ওকামস রেজরের মূলমন্ত্র। এই সমস্ত তথাকথিত রহস্যের আসল সমাধান সবথেকে সহজটাই।'

‘আপনি হয়তো নেম অফ দ্য রোজ উপন্যাসটা পড়েছেন। মধ্যযুগের একটি খ্রিশ্চান মঠে একের পর এক সন্ন্যাসীর খুন হয়ে যাওয়া নিয়ে লেখা গোয়েন্দাকাহিনী? সেই উপন্যাসের যে

গোয়েন্দা চরিত্র, উইলিয়াম অফ বাস্কারভিল, সেই চরিত্রটির পেছনে মূল অনুপ্রেরণা ছিল উইলিয়াম অফ ওকামের জীবন।' বললেন অরুণ।

আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনন্যা বললেন, 'সিদ্ধার্থকে নিয়ে ওপরে যাব। আমার নতুন পেপারটা ওকে একবার পড়াতে চাই।'

অনন্যা আর সিদ্ধার্থ ওপরে উঠে যাবার পর আর একটা ওয়াইন নিলাম। হালকা নেশা হয়েছে, আর ভালো লাগছে বেশ। অরুণ কফির কাপ নিয়ে সামনে এসে বসলেন।

অমিতাভর উপন্যাস শেষ হল?'

'না। বেশি সময় দিতে পারছি না। তবে এখনও মনে করি, খুন মাধবই করেছেন।'

'কেন বলছেন এই কথা?'

'কিছুটা যুক্তি, আর কিছুটা অনুমান। মাধবের পায়ে ব্যথাটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লু। দেখুন, গ্রেট ইস্টার্নের পার্টিতে মাধব মধ্যমণি ছিলেন না। সকলের চোখ মূলত ছিল স্যার ধীরেনের দিকে। মাধব সেই সুযোগে হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে আনিসুরের হোটেলে যান। আনিসুরকে খুন করেন। তারপর বেরিয়ে এসে আবার গ্রেট ইস্টার্নে ঢোকেন। এই ছোটাছুটিতে মাধবের পায়ের ব্যথা বেড়ে গিয়েছিল। এটা হতে পারে। অথবা হতে পারে যে পার্টি শেষ হবার পর আনিসুরের হোটেলে গিয়ে মেইন সুইচ অফ করে অন্ধকারের সুযোগে আনিসুরের ঘরে ঢুকেছিলেন। খুন করে বেরিয়ে এসে আবার গাড়িতে ওঠেন। পুরো কাজটাই তিন-চার মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। গাড়ি সম্ভবত দূরে পার্ক করেছিলেন যাতে লোকের নজরে না পড়ে। দৌড়তে দৌড়তে এসে গাড়িতে ওঠেন। সেই কারণেও ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠতে পারে।'

'কিন্তু তাহলে আগের দিন যখন মাধবকে নিয়ে পুলিশ আনিসুরের হোটেলে যায়, অথবা মাধব যখন শুদ্ধসত্ত্বের বাড়ি আসেন, তখন পায়ের ব্যথাটা প্রসঙ্গে আসেনি কেন?'

'মাধব চেপে গিয়েছিলেন। ব্যথা নিয়েই হাঁটাচলা করছিলেন। নাহলে পুলিশের সন্দেহ বাড়ত।'

'কিন্তু আনিসুর যদি পার্টি চলাকালীন খুন হয়ে থাকেন, তাহলে খুনের পরে মেইন সুইচ অফ করা হলো কেন?'

'সেটা হয়তো সত্যিই স্থানীয় ছেলেপুলের বদমাইশি। খুনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমার ধারণা আনিসুরকে খুন করা হয়েছিল পার্টির পরে। মেইন সুইচ অফ করে অন্ধকারে গা ঢাকা দেবার সুযোগ নেওয়া হয়েছিল।'

আর বন্ধ ঘরের রহস্য?'

'বিমল দারোগা অনেকগুলো ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, সেদিন দুপুরবেলা মাধব আনিসুরের ঘরে এসেছিলেন। তিনি আনিসুরের অজান্তে ছিটকানির সঙ্গে সুতো বেঁধে দরজার ফাঁক দিয়ে বার করে রাখতেই পারতেন। বাকি কাজটা মাখনের মধ্যে দিয়ে ছুরি চালাবার মতো করে হয়ে গিয়েছিল।'

'পর্দা এবং চেয়ারের রহস্য?'

'আপনি এভাবে পরপর প্রশ্ন করে যেতে থাকলে তো মুশকিল। এখনও সবটা পড়িনি। হতে পারে যে মাধবই চেয়ারটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে তাঁর গুলি করতে সুবিধে হয়। আর পর্দার ব্যাপারটা নিয়ে এখনও ভাবিনি। আরও কিছুটা পড়তে হবে।'

'দ্বিতীয় চিঠি নিয়েও ভাবেননি, বুঝতেই পারছি।'

'মিস্টার চৌধুরী, অমিতাভ মিত্রর উপন্যাসের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আগেই বলেছি, হনকাকুর সমাধান করতে যে মাথা খেলাতে হয়, সেটাও আকর্ষণীয়। কিন্তু আমার গল্পটা তো আমাকেই লিখতে হবে। আজ সকালেও সম্পাদক ফোন করে কাজের প্রগ্রেস জানতে চেয়েছেন। তাই আমি একটা ডেডলাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আপনার কি মনে হয় না, অমিতাভর উপন্যাস এই মুহূর্তে আমার কাছে এতটাও গুরুত্বপূর্ণ না হতেই পারে?

অরুণ কাপের গায়ে হাত বোলাতে থাকলেন। গতকালের দাবার বোর্ড একপাশে রাখা। খেলা এখনও শেষ হয়নি। আপাতত দুই পক্ষেই সমান সমান ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

'আপনার উকিল, মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে পুলিশের কী জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, মিস্টার চৌধুরী?' মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

এই প্রথম অরুণ চমকালেন। দেখতে পেলাম, দুর্ভেদ্য বুহ্যে চুলের মতো সরু একটা ফাটল দেখা দিচ্ছে। অরুণ প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাভাবিক হতে চাইছিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। কোনোমতে কফির কাপ রেখে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। চোখ নীচু করে কয়েক মুহূর্ত কিছু ভেবে নিয়ে তাকালেন আমার দিকে। 'আপনাকে কে বলল এরকম কথা?'

'তার মানে অনুমানটা সত্যি? কিছু একটা চুক্তি হয়েছিল?'

অরুণ উত্তর না দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'আপনার প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারছি, চুক্তিটা গোপনীয়তা বজায় রাখার সেই জন্য আপনি নিজের মুখে কিছু বলছেন না। নিজের অপরাধ স্বীকার করবার পরেও তার বিশদ বিবরণে যেতে পারছেন না। এবং সেই কারণেই আমাকে অমিতাভ মিত্রর উপন্যাসটা দিয়েছেন যেখান থেকে কিছু সূত্র পেতে পারি। তাই তো?'

অরুণ এখনও নীরব। যখন সিদ্ধান্ত নেন যে কথা বলবেন না, পৃথিবীর কেউ মনে হয় এঁকে মুখ খোলাতে পারবে না।

'আমার সেটা মানতেও কোনো অসুবিধে নেই। যদি সত্যিই গোপনীয়তা চুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে আপনি মুখ খুলবেন না সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এখানে একটা বড়ো কিন্তু আছে যার উত্তর নেই— একটা হত্যারহস্যের মধ্যে কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জড়িয়ে যার জন্য পুলিশ আপনার সঙ্গে এই চুক্তিতে যেতে বাধ্য হলো?'

অরুণ হাসলেন। শান্ত গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়ল চোখে। 'আপনি কিছুটা বুঝেছেন টিনা। কিন্তু অনেকটাই এখনও না বোঝা। সেটুকুর জন্যেই অমিতাভর উপন্যাসটা আপনাকে শেষ করতে হবে। এবং খুঁজে বার করতে হবে সমাধান। উপন্যাসের শেষে গেলে দেখতে পাবেন, অদ্ভুত মিল বাস্তবের ঘটনার সঙ্গে। অমিতাভ যেন দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিল।'

'পড়ব। কিন্তু আমি যে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, সেটা কি আপনি শুনবেন একবার?

বুকশেল্ফ থেকে সারসার বই নীরবে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। মনে হলো, সেগুলো জীবন্ত। কেঠো কোষের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছে চুয়াল্লিশ বছর আগেকার স্মৃতি— সেই সব দৃশ্য, যেগুলো অজস্রবার অনুমান, বির্নিমাণ আর কাটছেঁড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে চিবানো ডাঁটার মতো নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। টেবিলে একটা বই ওলটানো। চমস্কির ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট।

'অমিতাভ হত্যার দায় আপনারই। অমিতাভর উপন্যাস পড়তে গিয়ে যেমন মাধবের ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছে, ঠিক তেমনই হচ্ছে আপনার ওপর। সন্দেহ বলা ভুল, কারণ আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেই স্বীকারোক্তিকে আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি বলতে পারেন। আর বলতে বাধা নেই, এই বিশ্বাসে কিছুটা সহায়ক হয়েছে অমিতাভর উপন্যাস। সেই খুন আপনি নিজের হাতে করতে পারেননি। কোনো সহকারী ছিল। অমিতাভকে আপনার বাড়ি থেকে ধাওয়া করে সে গিয়ে পাকড়াও করে। তাকে মদ খাওয়ায়, মাতাল করে দেয়, এবং ভুলিয়ে ভালিয়ে কবরখানায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। পুরো ব্যাপারটা ঘটে যখন, আপনি তখন থানায় বসে। স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে অভিযুক্ত করা যায়নি। আপনার সহকারী সম্ভবত এমন কেউ, যাকে পুলিশ বা স্থানীয় কেউ চেনে না। হয়তো ভাড়াটে খুনি। কাজেই তাকে ধরাও অসম্ভব ছিল। একটা পারফেক্ট মার্ডার, নিখুঁত খুন। এটা একমাত্র সম্ভব হয় কোনো রহস্যকাহিনীর লেখকের দ্বারাই।'

'কিন্তু তাতে কি এই কেসের সঙ্গে এতদিন জড়িয়ে থাকা এতগুলো খটকার সমাধান হয়ে যায়? '

'যায়। অঙ্কের উত্তর জানা থাকলে মাঝের স্টেপগুলোর অসংগতিকে সেই উত্তরের

আদলে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব। যেমন ধরুন, একটা রাইফেল, যার থেকে একটাই গুলি ছুটেছে। কিন্তু বুলেট মিলছে দুটো। কীভাবে সম্ভব? যদি বলি, রাইফেল আসলে দুটো? একই ধরনের একই মডেলের? ২০১৯ সালের ব্যালিস্টিক বিশ্লেষণ অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে একই কোম্পানির একই মডেলের যমজ রাইফেলের মধ্যে তফাত করা সম্ভব ছিল না। একটা রাইফেল ছিল আপনার বাড়িতে। আর একটা রাইফেল আততায়ীর হাতে।'

'প্রশান্ত গুরুং আর মিসেস বাসুর পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্য?'

'আপনি গুরুং-কে টাকা খাইয়েছিলেন। সেটা কি একেবারেই অসম্ভব?' কিছুটা সময় পর আবার বললাম।

অরুণ মাথা নাড়লেন, 'এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।'

'রাইফেলের ট্রিগারে অমিতাভর আঙুলের ছাপ মুছতে আপনি ভুলে গিয়েছিলেন। সম্ভবত ঘাসের ওপর রক্তও খেয়াল করেননি। করলে মুছে দেবার ব্যবস্থা করতেন। আর আপনার হাতে আঁচড়ের দাগটা কি এখনও বলে দিতে হবে? সেটা তো পুলিশই জেনে গিয়েছে। অমিতাভর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে আপনার হাত ছড়ে গিয়েছিল।'

ওয়াইনে চুমুক দিলাম। তারপর হাসলাম হালকা, 'অনন্যা ওকামস রেজর নিয়ে বলছিলেন। আমিও সবথেকে সহজ সমাধানের দিকেই এগোচ্ছি।'

'সুডোকু ভালোবাসে যে মানুষ, তার চিন্তাগুলো সরলরেখায় চলে, আগে ও দেখেছি।' ক্ষীণ হাসির রেখা অরুণের ঠোঁটের গোড়ায় ফুটে উঠল।

'নাহ, সব ব্যাখ্যা মেলেনি এখনও। তবে সেটা নিয়ে ভাবার থেকেও আর একটা জিনিস বেশি ভাবাচ্ছে। অমিতাভ মিত্রর প্রোফাইলিং করা - সমস্যার লাগছে একটু।'

'সেটা স্বাভাবিক। কারণ ওই সময়টাকে না চিনলে আপনি অমিতাভকে বুঝতে পারবেন না।'

'সেই চেনাটাই, মানে ভাবছি, কীভাবে চিনব। আপনার দেওয়া অমিতাভর চিঠিপত্র, লেখালেখি কাটাকুটি কাগজগুলো কিছু দেখলাম। সেগুলো ইন্টারেস্টিং কিন্তু অমিতাভকে ঐ সময়ের মানচিত্রে প্রোথিত করে যদি লিখতে হয়, তাহলে ওটুকুই যথেষ্ট নয়।'

'না, যথেষ্ট নয়। কারণ একা অমিতাভকে চিনলে হবে না। আগেও বলেছি, এই সুযোগে আরও কিছুটা বাংলা কবিতা পড়ে নিন। সত্তরের কবিতায় কীভাবে দিকবদল এসেছিল, কীভাবে বীতশোক ভট্টাচার্য বা তুষার চৌধুরীর মতো কবিরা অন্য ভারতীয়ত্বের সন্ধান করছিলেন, যেভাবে প্রবন্ধের মেজাজে মেধাবী কাব্যভাষার নির্মাণ করছিলেন, উল্টোদিকে বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, রমা ঘোষ— আমাদের সময়ের ইম্পর্ট্যান্ট কবি এরা সবাই। শ্রুতি, হাঙরি, , শাস্ত্রবিরোধী, এই সমস্ত ধারার যে কালমিনেশন ঘটেছিল সত্তরের শুরু বা ষাটের শেষের দিকটায়, অমিতাভ সেটার প্রতিনিধি হয়েও কিছুটা নির্জনে দাঁড়িয়েছিল। ওর যাত্রাপথটা পুরোপুরি বাইরের দিকে ছিল না, অনেকটাই নিজের শুদ্ধ আত্মার খোঁজ— কিন্তু সেটুকু থেকেও সরে এসেছিল এক সময়ে। সময়টা আগুন ঝরানো, ওর লেখাও সেই আঁচে নিজেকে ঝলসে নিল।'

'সমস্যাটা কী জানেন, আমার পাঠক বাংলা কবিতা নিয়ে আগ্রহী হবে না।'

'কিন্তু ষোলোহাজার শব্দের মধ্যে যদি অমিতাভর চরিত্রকে পাঁচশো শব্দও দেন, সেটার মধ্যে তো অন্তত তিনশো শব্দই কবিতায় চলে যাবে টিনা! আমি যখন ক্রাইম লিখি, অপরাধীর প্রোফাইলিং করতে গেলে তার সমাজ, সময়, অর্থনীতি এগুলোকে ভুলে যদি লিখতে যাই তাহলে তো চরিত্রটাই গ্রাউন্ডেড হবে না। তার মনস্তত্ত্ব— কোন প্রবৃত্তি তাকে দিয়ে খুনটা করাচ্ছে, সেটা বুঝতে গেলে তার ইতিহাস, অর্থনীতি আর পারিপার্শ্বিক ভুলে থাকা অসম্ভব। কারণ অপরাধপ্রবৃত্তি আকাশ থেকে পড়ে না। এবার, যখন লিখব, হয়তো ওই বিশাল ইনফর্মেশন থেকে দুটো কি তিনটে লাইনই নেব। সেটুকুই ব্যাকগ্রাউন্ড। কিন্তু বোঝাটা কমপ্লিট থাকতে হবে, নাহলে চরিত্রের প্রতি সৎ থাকা যায় না।'

‘এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি বারবার করতে বলছেন, এক্ষেত্রে সেটা কী?’

‘ওই সময়ের রাজনীতি, আর তা থেকে উঠে আসা কবিতা। তখন জেনারেল ট্রেন্ডই ছিল সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহের আহ্বান। অরাজনৈতিক লেখক কবিরাও পুরোটা প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল ওই কারণেই একবার রেগেমেগে লিখেছিল যে ১৯৭২ এর পর থেকে অমিতাভ গুপ্ত, ১৯৭৬ এর পর থেকে নিশীথ ভড়, সকলেই পা হড়কেছেন বাম রাজনীতির মোহে পড়ে নিম্নবিত্তের ডায়ালেক্ট আনতে গিয়ে, এমনকি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মহা শক্তিশালী কবিও। কিন্তু আমি একমত হতে পারি না। আমার বারেবারেই কী মনে হয় জানেন তো, প্রত্যেকটা দশকের কবিতা মানে সেই দশকের তরুণদের লেখা কবিতা। চোয়ালচাপা রাগী যুবকদের কবিতা। যে যুবক নির্জনে, সেও তো ক্রুদ্ধ! আর কিছু না হলেও অন্তত ভাষা নিয়ে ক্রুদ্ধ। ওই হিসেবেই ষাটের দশক যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরীর, সত্তর হলো মৃদুল দাশগুপ্ত, অমিতাভ মিত্রর। পা হড়কানোর হিসেবটা মুলতুবি রাখার পক্ষপাতী আমি, কারণ ভাষা নিয়ে এদের ক্রোধ আসলেই সৎ। এরাই হয়তো আশির দশকে গিয়ে মূল্যহীন হয়ে যাবে, কারণ আর তরুণ থাকবে না। নতুন দল আসবে। সে যাই হোক। যেটা বলতে চাইছি, অমিতাভকে লিখতে গেলে ওকে ওই সময়টার থেকে আলাদা করতে পারবেন না। ওর কবিতা থেকেও না। করা উচিতও নয়।’

‘রাজনীতিকে লেখায় খুব বেশি আনতে পারব না, পলিসিতে আটকাবে। কবিতার কথা আগেই বলেছি, পাঠক উৎসাহী হবে না। কিন্তু আরেকটা সমস্যা আছে, যেটা আমার নিজের। আমি এর আগে বাংলা কবিতা খুব বেশি পড়েছি এমনটা নয়। আপনার সঙ্গে কথা হবার পর ইন্টারনেট ঘেঁটে কিছু পেয়েছি। আজ ডিনারের আগে আপনার কালেকশন যা দেখলাম, ঈর্ষণীয়। আমার জ্ঞান তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তবে দিল্লি যাবার আগে কলেজস্ট্রিট ঢুঁ মেরে কিছু বই তুলে নেব। কিন্তু তাতেও আমার জানা খুবই ওপর ওপর থাকবে। ব্যাপারটা আয়রনিক, কারণ প্রথমদিন বলেছিলাম যে ভুলে যাওয়া কবি লেখকদের প্রতি আকর্ষণ আছে। আপনি ভাবছেন সেটা কথার কথা। তা নয়। কিন্তু আমার বেড়ে ওঠার পরিমণ্ডলে বাংলা কবিতা, লিটল ম্যাগ এগুলো নিয়ে চর্চা হয়নি বলেই ঠিক ধরতে পারছি না।'

‘কিন্তু অমিতাভকে এক্সপ্লোর করতে হলে সেই সময়কার রাজনীতি, ভিন্নধারার সাহিত্য যা বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকার লেখালেখি বা পুজোসংখ্যার থেকে চরিত্রে আলাদা, সংবাদপত্র-শাসিত সাহিত্যের প্রতি অমিতাভদের কেন ক্ষোভ ছিল, সেখান থেকেই আমার প্রতি অভিযোগ এসেছিল কিনা, না কি ব্যক্তিগত রাগ, এগুলোর সম্ভাবনাও যদি দেখাতে হয়, তাহলে আপনার পাঠককে সেই সময়কার প্রেক্ষাপট কিছুটা হলেও বলতেই হবে। নাহলে কানেক্ট করতে পারবেন না।

আবার বুকশেল্ফের দিকে চোখ গেল। সারি সারি বাংলা কবিতার বই। অজস্র, জীবন্ত। পেটের কাছে কোন রহস্য ছুরির মতো উঁচিয়ে রেখেছে, জানি না।

‘শুধু রাজনীতি না, প্রতিশোধও একটা থিম, যেটা আপনাকে এক্সপ্লোর করতে হবে।'

'প্রতিশোধ?’

‘বন্ধুবান্ধব রাজনীতি করতে গিয়ে খুন হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিশোধ কবিতায় ঘোষণা হবে না? ‘আমার বোনের বুকে বেঁধে নখ, তিনশ বছর আগে হেঁশেল ঘরের মধ্যে, লুকিয়ে দেখেছি সব, দাঁতে দাঁত, সেবার বাঁচিনি, আজ জানি, ভয় পাও বলে তুমি পুষেছ বন্দুক, ঐ দেখো ক্রমশ এগিয়ে আসছে ঘোলাজল, হেতালের গরাণের বন।' গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার ডাক। এই প্রতিশোধের থিম ঘুরে ঘুরে এসেছে তখন।'

‘এ তো অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা, হেসে ফেললাম এবার। ‘বোনকে ধর্ষণ করছে ভিলেন, হাত পা বাঁধা অবস্থায় ভাই দাঁতে দাঁত চেপে সে জিনিস দেখেছে, হয়তো খুনও হয়ে গেছে। তারপর পুনর্জন্ম হয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছে।'

বুঝলাম, অরুণ বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। ‘এত লঘু ভাবনা আজ পেছন ফিরে দেখলে মনে

আসতে পারে, কিন্তু ওই সময়টা আপনারা দেখেননি, তাই হয়তো বুঝবেন না। মৃদুল আমাদের সময়কার মহত্তম কবি, শুধুমাত্র কাব্যভাষা বা শৈলীর জন্য নয়। ওই সময়ের ক্রোধ বেদনা আর উথালপাথাল, শোককে ওর মতো আর কেউ ধরেনি, এমনকি ওর থেকে প্রতিভায় উচ্চতর মানের কবিরাও। 'আছি বাতাসের মতো, ও আমার মিষ্টি মা-মণি/আছি তোমার দু চোখে আজও কঠিন শীতল/ মানো না যে মরে গেছি, বোকা মেয়ে, এখনও মানোনি/তাই জেগে বসে থাকো, ভাবো এলো পলাশের দল', এই চারলাইনের সমতুল্য কটা কবিতা লেখা হয়েছিল তখন? জানি, ওরা তখন কী ভাবত। ভাবত, প্রতিশোধ নেবার কথা। লিখত শোক, মৃত সন্তানের উদ্দেশ্যে পিতার তর্পণ লিখত। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, ওই সময় নিয়ে আমার কোনও উপন্যাস নেই অথচ নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জমজমাট মার্ডার মিস্ট্রি লিখতে পারতাম না কি? কিন্তু হাত ওঠেনি। ওই রাগ, ওই বেদনা, ওই হাহাকারকে কমার্সিয়ালাইজ করতে পারতাম না।'

'তিনদিনের কথাবার্তায় যেটুকু দেখলাম, আপনি এই মুভমেন্টটা নিয়ে সহানভূতিশীল।'

'হয়তো, কারণ আমাদেরই বন্ধুবান্ধবরা জড়িয়েছিল। কিন্তু আদর্শগত কোনো সংযোগ অনুভব করিনি। আমি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মানুষ। রাজনীতি ততক্ষণ ইন্টারেস্টিং যতক্ষণ আমার লেখার উপাদান। তার বাইরে, ডান অথবা বাম কারোর সঙ্গেই আত্মিক বন্ধন নেই। কিন্তু ওই সময়কার অনুভূতি, আমার বন্ধুরা, তাদের প্রতি তো মায়া থাকবেই। মায়া রহিয়াই যায়।' হালকা হাসলেন অরুণ।

'এই কবিতাগুলো পড়ব। কিছুটা শুরুও করেছি। তবে আমার স্টোরিতে সেগুলো পেছনে থাকবে, বুঝতেই পারছেন। সামনে থাকবে হত্যারহস্য। কবিতার প্রসঙ্গ নানা রেফারেন্সে আসবে। ইংরেজি পাঠক এর থেকে বেশি হজম করতে পারবে না।'

'যেটা মনে হচ্ছে,' আবার মুখ খুললাম, 'আমাদের বাইরে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি পুরো ঘটনাটা জানে। সে চায় আমি এটার সমাধান খুঁজে বার করি। আপনাকে বলিনি। গতকাল রাত্রে আমাদের একটা জিপ অনুসরণ করছিল। তার আগের রাত্রে হোটেলের উলটোদিকের ল্যাম্পপোস্টের নীচে এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে। বলিনি, কারণ ব্যাপারটা বোকাবোকা শোনায়। হয়তো আমিই ঝোপেঝাড়ে বাঘ দেখছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই রহস্যময় ব্যক্তি আমাকে মেসেজ করেছে।'

অরুণের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। 'আমি জানতামই না এসব। বলেননি কেন? টিনা, আপনি চাইলে আমার গেস্টহাউসে এসে থাকতে পারেন। এবার চিন্তা হচ্ছে আপনার নিরাপত্তা নিয়ে।

'চিন্তা করবার কারণ কিছু ঘটেনি এখনও। কাজের সূত্রে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াই। এর আগেও নানা ধরনের উটকো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ঘাবড়াচ্ছি না। শুধু ভাবছি। কে হতে পারে এই রহস্যময় ছায়ামূর্তি? সে কি একা, না একাধিক?

'আপনার ড্রাইভার সঙ্গে থাকে না? সে কি বিশ্বাসী?'

'বিশ্বাসী বলেই তো মনে হয়। কালকের পর আর ঝুঁকি নিইনি। আজ ওকে সঙ্গে রেখেছি।' অরুণ সামান্য সময় ভাবলেন। তারপর বললেন, 'একবার ঋষি রোডের বাড়িটা দেখতে যেতে চাই। কবে যাবেন বলুন।

'কাল সকালবেলাই হতে পারে। আপনাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাব। ধরুন সাড়ে আটটা নাগাদ?'

'বেশ। প্রস্তুত থাকব।

সিদ্ধার্থ নেমে এসেছে। উঠে পড়লাম। বিদায় নিয়ে দরজা খুলে বাগানে এসে চমকে উঠলাম দুজন। বাইরে ঝড় হচ্ছে বুঝতেই পারিনি। সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। একটা বড়ো গাছের ডাল ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বাগানের একধারে। অরুণ পেছনে পেছনে আসছিলেন। ডাল দেখে তাঁর মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, 'একটা ডাল ভেঙে পড়া মানে গাছের সৌন্দর্য পুরো নষ্ট হয়ে গেল।'

‘এত ঝড় হচ্ছে, কিছুই বুঝিনি।

‘মোটা কাচের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো লাগিয়েছিলেন বাবা। আর বাকি দেয়ালের দুই ধারে ফোম লাগানো। পর্দা টেনে দিলে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন।'

কোনোমতে বৃষ্টি বাঁচিয়ে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম। সিদ্ধার্থ নিজের বাড়ি যাবে। মদনদাকে বলে দিলাম, আমাকে হোটেলে ছেড়ে ওকে যেন ড্রপ করে দিয়ে আসে।

তুমুল বৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত। আমাদের গাড়িটা সাবধানে পিচ্ছিল পথ দিয়ে নেমে এল নীচে। হোটেলে যখন পৌঁছালাম, চারপাশে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সবে রাত নটা, কিন্তু শুনশান জনহীন শহরটা মৃত্যুপুরী হয়ে উঠেছে কয়েক ঘণ্টায়। হোটেলের লাউঞ্জও প্রায় ফাঁকা। শুধু সেই বুড়ি মেমসাহেব বসে টিভিতে কার্টুন দেখছেন। আর সেই দম্পতির বাচ্চাটা একা একা খেলে বেড়াচ্ছে লাউঞ্জে। বাবা মা-কে দেখলাম না কোথাও।

‘একটু বসে যাবেন?’ একসঙ্গে ভাবলে জটগুলো ছাড়াতে সুবিধে হয়।

লাউঞ্জে বসে কফির অর্ডার দিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিলাম মনে মনে। জটগুলো আস্তে আস্তে মাথার ভেতর ফিরে আসছে। ‘সিদ্ধার্থ, ঋষি রোডের বাড়ির ছবিগুলো একবার দেখবেন? আপনার কী মনে হচ্ছে জানতে চাই। '

ফোন খুলে ছবিগুলো দেখালাম ওকে। সিদ্ধার্থ মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেয়ালের আঁকাটা দেখতে লাগল। প্রথম প্রশ্ন যেটা করল, ‘রংপেনসিল পেল কোথায়?

‘মালিকের মেয়ের ঘর ছিল তো। হয়তো তার ব্যবহার করা রংপেনসিল এখানে ওখানে পড়ে ছিল তখনও।'

‘হুঁ।’ সিদ্ধার্থ আবার ছবিটা দেখতে লাগল। ‘একটা জিনিস দেখুন, অমিতাভ লেখাটা আর টুপির ছবি একই রং-এর, আর বাকি ফিগারগুলো অন্য রঙের। কেন?’

‘জানি না। আর টুপিটাই বা মাথার ওপর দিয়ে এভাবে আঁকা হয়েছে কেন? টুপির ভেতর দিয়ে মাথা দেখা যাচ্ছে।'

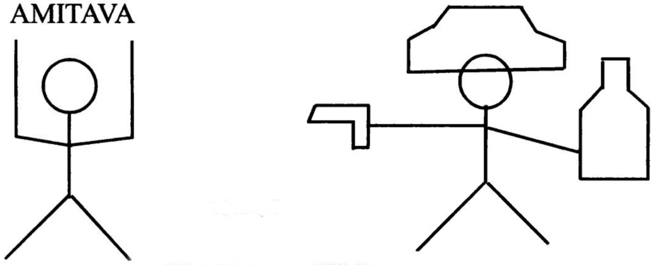

(‘অমিতাভ’ লেখা আর অপর মানুষের টুপির রঙ ছবির বাকি অংশের থেকে আলাদা)

‘যে এঁকেছে, কাঁচা হাতের কাজ। আর একটা জিনিস খেয়াল করুন, মেঝে থেকে ছবির উচ্চতা তিন ফুটের বেশি নয়। মানুষ যখন দেয়ালে কিছু লেখে, নিজের চোখের উচ্চতায় লেখে। তাহলে এটা কি কোনো বাচ্চার কাজ?’

‘নাহ। ওই বাড়িতে বাচ্চা ছিল না। আর অমিতাভর ঘটনায় কোনো বাচ্চার প্রসঙ্গই ছিল না।'

‘তাহলে, একটাই বিকল্প পড়ে থাকে।’

‘সেটা হলো, কেউ খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে এঁকেছে। সাধারণ খাটের উচ্চতা দুই থেকে তিনফুটের বেশি হয় না।'

‘কেন? অন্তত বসে আঁকল না কেন?' ‘অসুস্থ ছিল?’

'অমিতাভকে তাহলে বাদ দিতে হয়। অন্তত কোনো রিপোর্টেই অমিতাভর অসুস্থতা বিষয়ে কিছু পড়িনি।'

'অমিতাভর হত্যাকারীকেও বাদ দিতে হয়। এত অসুস্থ যে বিছানা থেকে উঠতে পারছে না, এদিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দার্জিলিং গিয়ে অমিতাভকে এতবার গুলি করবে, তার মৃতদেহ উপুড় করে দেবে, এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে যাবে, এটা প্রায় অসম্ভব।'

‘যদি না এই ছবি অমিতাভর হত্যার বেশ কিছুদিন আগে আঁকা হয়ে থাকে। অথবা কিছুদিন পর।’

‘তার মানে, এই হত্যা পূর্বপরিকল্পিত হতে পারে। অথবা অমিতাভ যদি এঁকে থাকেন, তাহলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে খুন হবেন। '

‘সেই জন্যেই কি অমিতাভ উপন্যাসটা লিখতে শুরু করেছিলেন? কোনো সাংকেতিক বার্তা দেবার উদ্দেশ্যে? যাতে না থাকলেও এই লেখা পড়ে অপরাধীকে ধরা যায়?

‘পুরোটা না পড়লে বোঝা সম্ভব নয়। আচ্ছা, যে মূর্তিটা গুলি করছে, তার এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে কী?’

'বুঝতে পারছি না। দেখে মনে হচ্ছে বোতল।'

‘মদের বোতল? সেক্ষেত্রে আপনার কাকাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। তিনি মদ খান না।’

‘যদি কোনো প্রত্যক্ষদর্শী এই ছবি এঁকে থাকে, তাহলে বলতে হবে, টুপি পরা কোনো লোক মদ খেতে খেতে অমিতাভকে গুলি করেছে।

‘সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল। কেউ রেনকোট পরে থাকতে পারে। তার মাথায় রেনকোটের হুড থাকতে পারে। ছাতাও থাকতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে টুপি কেন পরে থাকবে? তাও আবার এরকম হ্যাট?’

‘তাহলে কি এটা হতে পারে যে এই বাড়ির ভেতরে কেউ এভাবে অমিতাভকে ভয় দেখিয়েছিল?’

‘কিন্তু তাহলে অমিতাভ থানায় গেলেন না কেন? পুলিশকে কেন জানালেন না?'

‘আরও একটা বড়ো প্রশ্ন, যেটা আমরা ভুলে যাচ্ছি। অমিতাভর নিজের আস্তানা ছিল। তিনি দুম করে এই বাড়িতে আসতে যাবেন কেন?’

‘আপনার কাকাই হয়তো ঠিক। সূত্র লুকিয়ে আছে অমিতাভর উপন্যাসে', ভাবতে ভাবতে বললাম।

সিদ্ধার্থ উঠে পড়ল। ‘আমি বাড়ি গেলাম। দরকার পড়লে জানাবেন। কাল সকালবেলা হবে না, কিছু কাজ আছে। বিকেলবেলা ফাঁকা থাকব।'

‘কাল সকালে আপনার কাকাকে নিয়ে ঋষি রোডে যাচ্ছি।'

সিদ্ধার্থ উঠতে গিয়ে থেমে গেল। ‘কাকা যদি অমিতাভর হত্যাকারী হয়, তাহলে এই বাড়ির ব্যাপারে জানবে। জানবেই।'

‘কিন্তু বললেন যে জানেন না।

‘তাহলে হয় কাকা হত্যা করেনি, আপনাকে তখন মিথ্যে বলেছিল। আর নয়তো...' ‘এখন মিথ্যে বলছেন।’বাইরের কুয়াশার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় উত্তর দিলাম।

'যদি কাকা হত্যাকারী হয়, তার মানে বুঝতে পারছেন? আপনি অপরাধীকে নিয়ে যাচ্ছেন সম্ভাব্য ক্রাইম স্পটের কাছে।'

‘জানি। আর এখনও বিশ্বাস করি, অরুণ চৌধুরীই হত্যাকারী।'

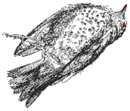

হলুদ আমের মত রাত নেই, চাঁদ নিয়ে এই পৃথিবীতে
কাচের চাঁদের গায়ে লেগে আছে পৃথিবীর কাদা।
মৃত্তিকাবর্ণের মাটি হয়ে গেছে দ্বিচারী আলাদা,
হলুদ আমের মত রাত নেই, খড়ের বসুধা।
মৃত্যুধান খুঁটে খায় আদিম কুক্কুট হিমসুধা।

—দেবাঞ্জলী মুখোপাধ্যায়

অমিতাভর উপন্যাস

তালতলা থানায় প্রণবেশ আর শুদ্ধসত্ত্ব ঢুকে দেখল, সাজো সাজো রব। সাব ইন্সপেক্টর বিনোদ মুহুরি ফোর্স সাজাচ্ছেন, কোথায় নাকি অভিযানে যাবেন। বিমল সমাদ্দার বকাবকি করছেন কোনো কনস্টেবলকে। বকতে বকতেই তাঁর চোখ পড়ল দুজনের উপর। একগাল হেসে বললেন, 'আরে আসুন আসুন। এই খোঁয়াড়ে পায়ের ধুলো পড়ল আপনাদের, কী সৌভাগ্য আমার।'

'ব্যস্ত বুঝি?'

'আরে পলিটিক্যাল প্রিজনারেরা নাকি বিহার থেকে পালিয়ে এসে জানবাজারের কাছে আস্তানা গেড়েছে। কী ঝামেলা ভাবুন তো! হোম সেক্রেটারি ফোন করে গালাগালি দিচ্ছেন। কমিশনার হুমকি দিচ্ছেন।

ঘেন্না ধরে গেল মশায় এই চাকরিতে। গিন্নি তো বারবার বলে ছেড়ে দাও। সদাগরি আপিসের কেরানি হলেও এর থেকে বেশি সম্মানের জীবন ছিল। তা যাক। বলুন, চা চলবে তো?'

চায়ের অর্ডার দিয়ে বিমলবাবু তাঁর ঘরে দুজনকে নিয়ে গিয়ে মুখোমুখি বসলেন। 'বলুন। এরকম অসময়ে, কী মনে করে?'

'ব্যালিস্টিক রিপোর্ট আজ আসার কথা ছিল। তদবির করতে এলাম। এ ছাড়া আরও টুকটাক প্রশ্ন আছে।'

'ব্যালিস্টিক এসে গেছে। খুন করা হয়েছে রাইফেল দিয়ে।'

'রাইফেল?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল শুদ্ধসত্ত্ব।

'হ্যাঁ। অবাক হচ্ছেন কেন?'

'সব ঘেঁটে গেল মশায়। ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন অন্যজনকে রাইফেল দিয়ে গুলি করবে কেন? পিস্তল ব্যবহার করবে তো! সেটাই স্বাভাবিক না?'

'আর রাইফেলের মতো বড়ো জিনিস নিয়ে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠল, কারোর নজরে পড়ল না?' প্রশ্ন ছুঁড়ল প্রণবেশ।

'বোধ করি সেই কারণেই লোডশেডিং-এর ব্যবহার। যাতে অন্ধকারে কারোর চোখে না পড়ে,' উত্তর দিলেন বিমল সমাদ্দার।

'আচ্ছা বুলেটের ফাঁকা খোলটা মেলেনি, না?'

'নাহ, আমরাও খুঁজেছি। ও আর মিলবে না। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বোধ করি।

'আপনারা কাকে সন্দেহ করছেন?'

'আশপাশের সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কিন্তু মাধব রক্ষিত ছাড়া তো কারোর ওপরেই চার্জ আনা যাচ্ছে না।'

‘তাহলে মুশকিল হবে আপনার। কারণ আপনাকে মাধববাবুর অ্যালিবাই ভাঙতে হবে। সেটা না পারলে চার্জশিট বানাতে পারবেন না।’

‘আচ্ছা মাধব তো আপনার মক্কেল। তাহলে আপনি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা না করে এভাবে কথা বলছেন কেন মশায়?’

‘যদি দেখি যে আমার মক্কেল অপরাধী, তাকে কী করে বাঁচাব? আমি তো গোয়েন্দা। উকিল নই।’

'তার মানে আপনিও দেখতে পাচ্ছেন মাধবই অপরাধী?’

‘না। এখনও পাচ্ছি না। আমার মাথা এখনও ফাঁকা স্লেট। সকলকেই সন্দেহ করছি, আবার কাউকেই করছি না।'

‘যেমন? আর কাকে সন্দেহ করছেন?

‘মাধব আর আনিসুর বাদে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি। সে সাড়ে এগারোটার সময়ে মেইন সুইচ অফ করে ওপরে উঠে আনিসুরকে খুন করেছে।’

‘কিন্তু তাহলে তো ঘরের মধ্যে তার পায়ের ছাপ পাবার কথা’

‘হোটেলের ছেলেটি, যে সেদিন সন্ধেবেলায় আনিসুরকে জল দিতে গিয়েছিল, সে খুন করেনি সেটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?

‘মোটিভ কী? আমরা ছেলেটির ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখেছি। মামুলি। কিছু পাওয়া যায়নি।'

‘হুঁ।’ শুদ্ধসত্ত্ব চিন্তিত মুখে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। 'আচ্ছা বিমলবাবু, আপনি কি মিলিটারিতে ছিলেন?' আচমকা জিজ্ঞাসা করল।

হকচকিয়ে গেছেন বিমলবাবু। আমতা আমতা করছেন, ‘কেন এমন প্রশ্ন করছেন?’

‘আপনার শোকেসের মধ্যে একটা ফলক দেখতে পাচ্ছি। সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন, তারপর কিছু একটা লেখা।’

‘ওহ, তাই বলুন!’ এবার হাসলেন বিমল সমাদ্দার। হ্যাঁ, সে স্বাধীনতার আগের ঘটনা। বছর তিনেক ছিলাম। তারপর মন উঠে গেল। পোস্ত পান্তা খাওয়া বাঙালির ছেলের কি ওই হাড়ভাঙা খাটনি সহ্য হয়? ইস্তফা দিয়ে কলকাতা ফিরে পুলিশের পরীক্ষায় বসলাম। আর্মির ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার জন্য চাকরিটা পেতে অসুবিধা হয়নি।

‘আচ্ছা।’ শুদ্ধসত্ত্ব উদাসীনভাবে চায়ের কাপ সরিয়ে নস্যির কৌটো বার করল। ‘মিলিটারিতে পোস্টিং ছিল কোথায়?’

বিমলবাবু হাসি মুখে তাকিয়ে ছিলেন। চট করে উত্তর দিচ্ছেন না। ধীরে ধীরে তাঁর মুখ থেকে হাসি মুছে গিয়ে কঠিন একটা অবয়ব ফুটে উঠছে। প্রণবেশ দেখল, দপদপ করছে তাঁর মাথার একপাশের শিরা। চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমার ইতিহাস জানাটাও কি আপনার তদন্তের মধ্যে পড়ে?

‘নাহ। কৌতূহল জেগেছে বলতে পারেন। কলকাতা পুলিশের মধ্যে আপনার নামডাক আছে, আগেও শুনেছিলাম। দক্ষ অফিসার, সৎ এবং কাউকে পরোয়া করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতার বাইরে পোস্টিং নিলেন না কখনও। সেই কারণেই আপনার প্রোমোশন, যেগুলোর আপনি সত্যিই যোগ্য, তার অনেক ক-টাই হয়নি। আজ আপনার মুখে শুনে বুঝতে পারলাম, আপনি ঘরকুনো। তাই মিলিটারির চাকরি ছেড়ে ঘরের টানে চলে এসেছিলেন। তার মানে, আপনার পোস্টিং ছিল শহরের বাইরে কোথাও। সেজন্যই জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ছিল। অনেক দূরে বুঝি?' শুদ্ধ সশব্দে নস্যি নিল।

বিমলবাবু শিকারি বেড়ালের মতো শুদ্ধর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল লাফিয়ে পড়বেন সুযোগ পেলেই। তারপর ধীরে ধীরে নিজের শরীর শিথিল করলেন। স্বাভাবিক হয়ে এল তাঁর মুখ। মুখে একবার হাত বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ‘কিছু মনে করবেন না শুদ্ধবাবু। এই মিলিটারি জীবনের সঙ্গে এক বিশ্রী ইতিহাস জড়িয়ে আছে, যেটা আমি ভুলে যেতে চাই। এক নিরপরাধ মানুষের উপর ভুল করে গুলি চালিয়ে দেবার ইতিহাস। সেই অনুশোচনাতেই

চাকরি ছাড়ি। ডিপার্টমেন্টের অনেকে জানে এই ঘটনা। ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি সেই দিকে ইঙ্গিত করছেন।'

শুদ্ধ উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল। প্রণবেশ প্রশ্ন করল এবার, 'আচ্ছা মাধববাবু যদি খুন করেই থাকেন, তাহলে সেটা কখন করেছেন বলে আপনার মনে হয়?'

বিমলবাবুর শিকারি বেড়ালের ভঙ্গিটা এখনও মুছে যাচ্ছে না। তার মধ্যেই স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছেন। উত্তর দেবার আগে ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমার নিজের ধারণা, পার্টি শেষ হবার পর। বাড়ি ফেরার পথে।

'কেন?'

'পার্টির মধ্যে বেরিয়ে খুন করে আসা কষ্টকল্পিত। অন্তত গ্রেট ইস্টার্নের দারোয়ানদের নজরে পড়তই যে মাধব গাড়িতে উঠছে। অথবা গাড়ি পার্ক করবার জায়গায় যারা থাকে। আমরা তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কারোর কিছু নজরে পড়েনি। দ্বিতীয়ত, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মাধব আনিসুরের হোটেলে গেল, সেখানেও কি কেউ তাকে দেখতে পেল না? তার গাড়িটাও না? তখন তো লোডশেডিং হয়নি যে মাধব সেই অন্ধকারের সুযোগ নেবে সে যখন হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠল, তখন তো হোটেলের মালিকও সিঁড়ির নীচে নিজের টেবিলে বসে ছিল। তো, তার চোখে কেন পড়ল না? না, এই ব্যাখ্যা দাঁড়াচ্ছে না। আবার, মাধব বাসায় ফেরবার পর আর বেরোয়নি। দারোয়ান বলেছে। মাধবের চাকর নকুল বলেছে। মাধবের স্ত্রী-ও বলেছেন যে ভোর চারটের সময়ে তাঁর ঘুম ভেঙেছিল। তিনি দেখেছেন মাধব তাঁর পাশে ঘুমোচ্ছে। হ্যাঁ বারোটা থেকে চারটের মধ্যে বেরিয়ে বরানগর থেকে ধর্মতলা গিয়ে খুন করে আবার ফিরে আসা সম্ভব। কিন্তু...'

'না, মাধবের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করে নিয়েছি।' এতক্ষণে শুদ্ধসত্ত্ব মুখ খুলল।

বিমল দারোগা কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছেন। কিন্তু শুদ্ধর মুখে আবার কুলুপ। বিমলবাবু একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বলতে শুরু করলেন, 'দারোয়ান, নকুল, নিজের স্ত্রী, এতগুলো মানুষের মুখ বন্ধ রাখা বড়ো সহজ কাজ নয়। তাহলে একটাই সময় পড়ে থাকে। বাড়ি আসার আগে খুন করে বাড়ি ফিরেছে।'

'কিন্তু' প্রণবেশ হাত তুলল, 'পনেরো মিনিটে ধর্মতলা থেকে বরানগর আসতে গেলে এমনিতেই দ্রুত গাড়ি ছুটিয়ে আসতে হবে। তার মধ্যে যদি খুন করবার জন্য থামতে হয়, তাহলে এগারোটা চল্লিশে বরানগরে ফেরা যে প্রায় অসম্ভব মশায়।'

'যদি এগারোটা চল্লিশে না ফেরে?' বিমলবাবু মিচকি হাসলেন।

'মানে? দারোয়ান বলেছে যে...'

'দারোয়ান কী করে জানল? নিজের ঘরের ঘড়ি দেখেছে, তাই তো? সেই ঘড়ি মাধব আগে থেকেই স্লো করে রাখেনি সেই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত? আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দিলেই তো কাজ চলে যায়। দারোয়ান যখন দেখেছে এগারোটা চল্লিশ, তখন যদি বারোটা দশ হয়?'

প্রণবেশ হাঁ করে চেয়ে থাকল। এই দিকটা সত্যিই তার মাথায় আসেনি।

বিমলবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন, 'এই মাধব মহা ধুরন্ধর লোক মশায়। হুঁ হুঁ, যা বলছে, সব কথায় চোখ বুজে বিশ্বাস করলে নিজেই পরে হাত কামড়াবেন।'

'কিন্তু তাতেও তো চেয়ার সরানো আর জানালার পর্দা কেন গুটিয়ে রাখা, এই দুটো সমস্যার সমাধান হয় না।' শুদ্ধ বলল।

'অবশ্যই হয়। ভেবে দেখুন। মাধব হোটেলের মেইন সুইচ অফ্ করল। তারপর চারতলায় উঠে টোকা দিল আনিসুরের ঘরে। আনিসুর দরজা খুলল। অন্ধকারে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। মাধব বলল, 'তোমার সাথে কিছু কথা আছে।' চেনা গলা পেয়ে আনিসুর দরজা ছেড়ে দিল। মাধব ভেতরে ঢুকে বলল, 'দরজা লাগিয়ে দাও। কথাটা গোপনীয়।' আনিসুর সেই মতো কাজ করল। এবার মাধব বসবে। বসবে, যাতে আনিসুরের সন্দেহ না হয়, যাতে সত্যিই

মনে হয় যে মাধব তার সঙ্গে কথা বলতেই এসেছে। কোথায় বসবে? অন্ধকার ঘরে সে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে চেয়ার টানল। কিন্তু টেবিল এবং চেয়ার যেদিকে, সেটা ঘরের এক কোণায়। সেখান থেকে অন্ধকারে রাইফেল গুলি ভরা কঠিন। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন রাইফেলে কেন আগে থেকেই গুলি ভরে আনেনি। কার কারণ, অকস্মাৎ যদি আনিসুরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হতো, রাইফেল থেকে গুলি ছুটে যাবার সম্ভাবনা থাকত। তাতে আনিসুর ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করে দিত। সেই ঝুঁকি মাধব নেয়নি। সে পকেটে করে বুলেট এনেছিল। তাহলে এবার তার আলো চাই, যাতে রাইফেলে তাড়াতাড়ি গুলি ভরতে পারে। তাড়াতাড়ি কেন? কারণ আনিসুরকে সময় দেওয়া যাবে না। তাই সে চেয়ার টেনে জানালার কাছে আনলো। মনে রাখতে হবে, ওই সময়ে অন্যান্য বাড়ি এবং রাস্তায় বাতি জ্বলছিল। অন্ধকার ছিল শুধুমাত্র আনিসুরের হোটেলে। জানালা দিয়ে যেটুকু আলো আসছিল, সেটুকুই মাধবের কাছে যথেষ্ট ছিল। আনিসুর তখনও ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করছে, 'এত রাতে তুমি কেন এলে?' মাধব চেয়ার টেনে জানালার কাছে এনে দেখল, জানালার পর্দা ফেলা। বেশি আলো আসছে না। এটা সন্ধেবেলা হলে এই সমস্যা হতো না, কারণ রাস্তায় ঝলমলে বাতি থাকত। কিন্তু তখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, তাই রাস্তার আলোও এমনিতেও কম। মাধবকে বাধ্য হয়ে পর্দা সরাতে হলো। যেটুকু আলো এল, তার মধ্যেই দ্রুত রাইফেলে গুলি পুরলো আনিসুর ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই। মনে রাখবেন, অসুখের জন্য আনিসুর কড়া ডোজের ওষুধ খেত প্রতি রাতে। যে ট্যাবলেটের লিস্ট আমরা পেয়েছি, সেগুলো দীর্ঘদিন ধরে খেলে এমনিতেই স্নায়ু শিথিল হয়ে যায়। দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সময় নেয় মানুষ। তাই সে সামনে মাধবকে রাইফেলে গুলি ভরতে দেখেও হয়তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাধব গুলি করল। সাইলেন্সার বোধ করি আগেই লাগানো ছিল। আনিসুর পড়ে গেল। মাধব দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে, কোনো একটা উপায়ে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। সেদিন আপনাদের যে পদ্ধতিগুলো বলেছি, সম্ভবত সেগুলোর মধ্যেই কোনো একটা উপায় অবলম্বন করেছিল সে। তারপর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নীচে নেমে গেল। ব্যাস। কাজ শেষ!'

'কিন্তু রাইফেল কেন? ঘরের মধ্যে পিস্তল নয় কেন?' আবার প্রশ্ন করল শুদ্ধসত্ত্ব।

'মাধবের কাছে হয়তো পিস্তল ছিল না। জোগাড় করবার সময়ও ছিল না। হাতের কাছে যেটা পেয়েছে সেটা দিয়ে মেরেছে।'

'তাহলে কোথায় গেল সেই মার্ডার ওয়েপন?

'সেটা আমরা খুঁজছি। আমার ধারণা, মাধবের বাড়িতেই পাওয়া যাবে।' 'আর দুটো চিঠির রহস্য?'

'আরে মশায় আপনি এখনও ওই ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? হতে পারে যে আনিসুর তার ক্যান্সারের যন্ত্রণার ধাক্কায় গণ্ডগোল করে ফেলেছিল। ভুল করে সাদা কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে। অথবা হতেই পারে যে ওই সাদা কাগজে পেঁয়াজের রস দিয়ে হরিদাসের গুপ্তকথা লেখা আছে। যান গিয়ে আগুনের সামনে ধরুন। পেলেও পেতে পারেন অমূল্য রতন। আপনাদের ব্যোমকেশ বক্সী যেমন পেয়েছিল।' নিজের রসিকতাতে নিজেই হ্যা হ্যা করে হাসছেন বিমল দারোগা।

শুদ্ধসত্ত্ব হাসল না। গম্ভীরভাবে বলল, 'ওই দুটো চিঠির মধ্যেই আসল রহস্য লুকিয়ে আছে বিমলবাবু। ব্যাপারটা আপনি যতটা সহজ ভাবছেন, তত সহজ নাও হতে পারে।'

'কেন? আমার ব্যাখা কি আপনার পছন্দ হলো না?'

'পছন্দের প্রশ্ন নয়। একটা ঘটনা ঘটলে তার বহু রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। আমি সেই প্রশ্নেও যাচ্ছি না। শুধু বলতে চাইছি, আপনার ব্যাখ্যাতে অনেক ফাঁক।'

শিকারী বেড়ালের প্রত্যাবর্তন ঘটল। 'শুদ্ধবাবু, প্রথমেই কিন্তু বলে রেখেছিলাম আমাদের তদন্তে আপনি বাধা দেবেন না।

'দিচ্ছি না। আপনি আপনার মতো করে তদন্ত চালিয়ে যান। শুধু বলছি, যদি বন্দুকটা খুঁজে না পান, অথবা যদি প্রমাণ করতে না পারেন যে দারোয়ানের ঘড়ি সত্যি সত্যিই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই কেস আদালতে টিকবে না।' শুদ্ধসত্ত্ব উঠে পড়ল। 'আজ আসি। যদি কিছু ক্লু পাই, আপনি জানবেন এটা কথা দিচ্ছি।'

এবার আর বিমল দারোগা তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন না।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করল, 'আমার তো বিমলবাবুর ব্যাখ্যা বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হলো। তুমি কেন বললে কাহিনীতে অনেক ফাঁক?'

শুদ্ধ একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সামান্য সময় পরে মুখ খুলল, 'রাইফেল ব্যবহারের ব্যাখ্যায় অনেক গলদ আছে।'

'শুধু এটুকুই?'

'না। আরও আছে। চেয়ার সরাবার যে ব্যাখ্যা বিমলবাবু দিলেন, সেটাও ভুল। মাধব তখনই চেয়ার সরাবেন, যদি তিনি বসতে চান। মানে, কিছুটা সময় কাটাতে চান। কিন্তু মাধবের হাতে ছিল রাইফেল। চেয়ার সরিয়ে নিয়ে এসে কিছুক্ষণ বসবার মতো সময় তাঁর হাতে ছিল না। কারণ সেই সময়টুকুর মধ্যে জানালার বাইরে থেকে আসা আলোতে রাইফেল দেখে আনিসুর প্রতিক্রিয়া জানাবেন। হয় চিৎকার করবেন আর নাহলে ছুটে পালাবেন। পিস্তল হলে এই সমস্যা ছিল না, সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখা যেত। রাইফেল লুকানো সম্ভব নয়। কাজেই, বসবার সময় মাধববাবুর ছিল না। দ্বিতীয়ত, ঘরের মধ্যে ঢুকবার প্রয়োজন মাধববাবুর হলো কেন? আর ঘরেই যদি ঢুকলেন, হেঁটে হেঁটে গোটা ঘর পেরিয়ে দরজা থেকে জানালার কাছে এলেন কেন? মাধব তো আনিসুরকে দরজার বাইরে থেকেই গুলি করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যেতে পারতেন। অন্ধকারে কেউ তাঁকে দেখতেও পেত না। তৃতীয়ত, সুতো টেনে ঘরের বাইরে থেকে ছিটকিনি ওপরে তোলার যে থিওরি বিমলবাবু দিয়েছিলেন, সেটা আলোতে যত সহজ, অন্ধকারে তত নয়। পায়ের অবস্থার জন্য জানালার বাইরে দিয়েও মাধব বেরোতে পারবেন না। তবে সবথেকে দুর্বল হলো দারোয়ানের ঘড়ি পিছিয়ে দেওয়ার যুক্তি। এই ব্যাখ্যা আদালতে দিলে জজ দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে।'

'কেন? সমস্যাটা কোথায়?'

'সেটা তুমি নিজেই দেখতে পাবে। আপাতত আমাদের গন্তব্য বরানগর। মাধববাবুর বাড়ি আর একবার যেতে হবে।' মুচকি হেসে উত্তর দিল শুদ্ধসত্ত্ব।

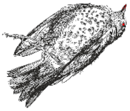

‘আপনি এই বাড়িতে কতদিন আছেন, শিউচরণজি? '

‘বিশ সালের বেশি হয়ে গেল হুজুর।'

‘আচ্ছা, মালিক কি সবসময়েই রাত করে বাড়ি ফেরেন? আর আপনিই গেট খুলে দেন?’

'না হুজুর। মালিক ঘড়ি ধরে চলেন। বেশিরভাগ দিনেই রাত ন-টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন। দশটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে নেন। এ বাড়ির আলো নিভে যায় তারপর। তবে মালিকের ছেলেরা অনেক দিনই ফিরতে রাত করে। এই নিয়ে মালিক বকাবকিও করেছেন অনেক!

‘আপনি কখন ঘুমোতে যান?’

‘রাত এগারোটা হয়ে যায়। তবে তারপরেও কি টানা ঘুমোতে পারি? মালিকের ছেলেদের জন্য উঠতে হয়।’

‘সেই রাতে মালিকের ছেলেরা কখন ফিরেছিল?’

‘একজন ফিরেছিল সকাল সকাল। সাড়ে সাতটার মধ্যে। ছোটো ছেলের ফিরতে দশটা বেজে গিয়েছিল।'

‘তার মানে মালিকই শেষ জন, যিনি বাড়ি ঢুকেছিলেন?’

'হ্যাঁ হুজুর।'

‘আচ্ছা শিউচরণজি, প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত্রে ঘুমানো অবধি আপনি কী কী কাজ করেন? '

‘আমি? বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গাছে জল দিই। তারপর বাড়ি আর বাগানের টুকটাক অনেক কাজ থাকে। সন্ধেবেলা গিন্নিমার ঠাকুরঘরে মাঝে মাঝে গানবাজনা হয়। আশেপাশে গিন্নিমার আরও বন্ধুবান্ধব যারা থাকে, তারা আসে। সেই সময়ে আমিও পুজোর ঘরে গিয়ে বসি। বড়ো সুন্দর ভজন হয়, ভক্তি চলে আসে। মাঝে মাঝে ভোগ চড়ান গিন্নিমা। তার কাজকর্ম থাকে। আর এসব যদি কিছুই না থাকে, নিজের ঘরে চলে আসি। সন্ধে সাড়ে আটটা থেকে রেডিওতে ভোজপুরি গান দেয়। সেটা শুনি। সাড়ে নটা নাগাদ ডাল-রুটি পাকাতে বসি। খেয়ে দেয়ে রাত্রিবেলা সারা বাগান চক্কর মারি একবার। মালিক বার বার বলে দিয়েছেন, রাত করে একবার টহল দিতে, যাতে চোরছ্যাঁচড় জানতে পারে যে এই বাড়িতে পাহারা আছে। সেসবের পর ঘরে এসে আবার রেডিয়ো চালিয়ে শুয়ে পড়ি। গান বা খবর, শুনতে শুনতে চোখে ঘুম চলে আসে।'

‘সেদিনও কি সেটাই করেছিলেন?’

‘হ্যাঁ। সেদিন গিন্নিমার বাতের ব্যথাটা বেড়েছিল বলে ঘরে শুয়েছিলেন। আমি সন্ধেবেলা মালিক বেরিয়ে যাবার পর একবার বেরোই গিন্নিমার জন্য পান জর্দা কিনে আনতে। ফিরে আসবার পর থেকে সারাদিন ঘরের ভেতরেই ছিলাম। গান শুনেছি, রুটি পাকিয়েছি, টহল মেরেছি। মাঝে নকুল একবার বেরিয়েছিল সন্ধে আটটায়। ন'টার সময়ে ফিরে আসে। সাড়ে দশটা নাগাদ আমিও শুয়ে পড়ি।’

‘আপনি কি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে ঘুমোন?’

‘হ্যাঁ হুজুর! মালিক বলে দিয়েছেন। বাইরে অনেক চোর ডাকাত। যেন সাবধানে থাকি।’

'আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ শিউচরণজি।'

নকুল দূরে টুলের উপর দাঁড়িয়ে গাড়িবারান্দার ঝুল সাফ করছিল। মাথা ঘুরিয়ে হেসে বলল, ‘কথা হয়ে গেল বাবু? শরবত খেয়ে যান।’

‘না নকুল। আজ সময় নেই।'

'সময় নেই বললে হবে? বাবু বলে দিয়েছেন, আপনাদের চা-জলের যেন অবহেলা না হয়। যদি দেখেন আতিথেয়তায় ঢিলে দিয়েছি, ধড়ের ওপর মাথাটা আস্ত রাখবেন না।'

'আমি বলে দেব তোমার বাবুকে, তুমি যথেষ্ট করেছ। আজ আসি।' শুদ্ধ পেছন ফিরেছিল। আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'গাড়িবান্দারায় তাহলে বাতি লাগানো হয়েছে?

'হ্যাঁ বাবু। আপনারা যেদিন গেলেন, তার পরেই গিয়ে আলো কিনে আনলাম।'

গাড়িতে উঠে শুদ্ধসত্ত্ব বলল, 'এবার বুঝলে, দারোয়ানের ঘড়ি কেন পিছোনো সম্ভব নয়?'

'না, বুঝলাম না কেন?' প্রণবেশ দেখল, শুদ্ধ নিজের মনে হাসছে।

'আরে বাবা সেদিন মাধব রক্ষিত বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সন্ধে ছটা বাজবার কিছু পরে। তাহলে ঘড়িতে কারিকুরি করতে হলে তার আগেই করতে হবে। এদিকে শিউচরণ রোজ সাড়ে আটটার সময়ে রেডিয়োতে গান শোনে। যদি ঘড়ি পিছিয়ে থাকে, রেডিয়ো চালিয়েই তো বুঝতে পারবে।'

'যদি ঘড়ি তার পরে পিছোয়?'

'কখন? পিছোলে একমাত্র নকুল পিছোতে পারবে। কারণ সেদিন বাড়িতে ওই সময়ে একমাত্র সে-ই ছিল। কিন্তু নকুল আটটা থেকে ন-টা বাড়িতে ছিল না। আর ন-টার পর থেকে একটা বড়ো সময় শিউচরণ নিজের ঘরে বসে রান্না করেছে, রেডিয়ো শুনেছে। যখন টহল মারছিল বাগানে, তখন কেউ এসে ঘড়ি পিছিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ফিরে এসে শিউচরণ আবার রেডিয়ো শুনেছে। রেডিয়োতে ঘন ঘন সময় ঘোষণা হয়ে থাকে।

শিউচরণ দেখেছে যে সে সাড়ে দশটায় শুয়ে পড়েছে। যদি তার আগে রেডিয়ো চালিয়ে থাকে, তাহলে রেডিয়োতে ঘোষণা করা সময় আর নিজের ঘড়ির সময়ের তারতম্য তার চোখে পড়ল না কেন? আর শিউচরণ ঘুমিয়ে পড়বার পরে সময় বদলানো সম্ভব নয়। কারণ সে ঘরের দরজা ভেতরে থেকে বন্ধ করে ঘুমোয়।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কী! মাধব খুন করেননি সে কথা বলছি না। কিন্তু বিমল দারোগার সিদ্ধান্ত ভুল।'

তুমি কি শিউচরণের ব্যাপার আগে থেকে জানতে? আমাকে তখন কেন বললে যে নিজেই কথা বলে বুঝতে পারব?'

'অনুমান করেছিলাম। দেখো, শহরে যে মানুষ থাকে, বিশেষত যে মানুষ কাজের মধ্যে থাকে, তাকে এটা ওটা দরকারে ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে হয়। আর একবার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেলে অপ্রয়োজনেও সে ঘড়ি দেখে। কাজেই ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে-পিছিয়ে সামান্য সময়ের জন্য সম্ভব হলেও, কয়েক ঘণ্টার জন্য এই ফাঁকিবাজি বড়ো সহজ ব্যাপার নয় হে, যদি না পুরো সময়টুকু সে ঘুমিয়ে থাকে!

তাহলে, এবার কোথায়? বাড়ি?'

'আমার একটা খটকা হচ্ছে প্রণবেশ। আর একবার থানায় চলো তো! যাবার আগে কোথাও খেয়ে নিতে হবে। খিদে পাচ্ছে।'

রাত প্রায় সাড়ে নটা হয়ে এসেছে। থানায় বিমলবাবু ছিলেন না। একজন কনস্টেবল বসে বসে ঝিমোচ্ছিলেন। শুদ্ধকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠে সেলাম ঠুকলেন। কলকাতার বিভিন্ন বিখ্যাত কেসের সূত্রে শুদ্ধ এঁদের অনেকেরই মুখ চেনা হয়ে গিয়েছে।

'আপনার নাম ভবানীবাবু না?

'হ্যাঁ, স্যার।'ভবানীবাবু কৃতার্থ ভঙ্গিতে হাত কচলাচ্ছেন। 'কিন্তু বড়োবাবু তো নেই। বাড়ি চলে গেছেন। ফোন করব?'

'না। আপনাকে হলেও হবে। কোথাও বসা যায়?' একটা ফাঁকা ঘরে দুজনকে বসালেন ভবানীবাবু। জানালা দিয়ে বাইরের ঘন অন্ধকার চোখে পড়ছে। মাথার ওপর ক্যাঁচক্যাঁচ করে ঘুরছে পুরোনো পাখা। হলুদ মরা বাল্বের আলো অস্পষ্ট। থানা এখন নির্জন। বাইরে

কয়েকজন পুলিশ বসে গজল্লা করছে। সেকেন্ড অফিসারের ঘর থেকে গান ভেসে আসছে হালকা। ঝিমোচ্ছে চারপাশ।

‘খাবার বলি স্যার?'

'না না, কিছুক্ষণ আগেই খেয়েছি। পেট ভর্তি। আচ্ছা ভবানীবাবু, আনিসুর সাহেবের লাশ যখন বেরোয়, আপনিও কি সেখানে ছিলেন?’

'হ্যাঁ, স্যার। বড়োবাবু আমাকে আর শান্তি মল্লিককে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

‘সেটা তো খুনের দুইদিন পর, তাই না? খুনের দিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

‘মানে পয়লা জুন? সেদিন থানাতেই ছিলাম স্যার। নাইট ডিউটি ছিল। সপ্তাহে তিনদিন করে নাইট করতে হয়।’

‘সেদিন কি অদ্ভুত কিছু ঘটেছিল? খেয়াল করতে পারবেন?

‘অদ্ভুত মানে?’ বিভ্রান্ত চোখে তাকাচ্ছেন ভবানীবাবু

‘মানে এমন কিছু, যেটা হয়তো স্বাভাবিক রুটিনের মধ্যে পড়ে না।’

‘নাহ, তেমন তো...’ বিড়বিড় করে থেমে গেলেন ভবানীবাবু। তারপর বললেন, 'না স্যার, কিছুই মনে আসছ না।’

‘বড়োবাবু কোথায় ছিলেন?'

‘বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। তবে গভীর রাত্রে একবার থানায় এসেছিলেন।

'কেন?'

‘বড়োবাবু মাঝে-মাঝেই রাত্রে আসেন। কাজপাগল মানুষ হলে যা হয় আর কী! সেদিনও সন্ধে আটটায় বাড়ি চলে গেছিলেন। আবার রাত দেড়টার সময়ে এলেন। ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাটি করলেন। ব্যাগে কিছু ফাইল পুরে বললেন, 'আজকের রাতটাও গেল ভবানী! কমিশনার সাহেব বলে দিয়েছেন কাল ভোরের মধ্যে সব ফাইল ক্লিয়ার করতে হবে।’

‘আচ্ছা!’ শুদ্ধসত্ত্ব চিন্তা করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'বড়োবাবুর বাড়ি কোথায়?

‘পার্ক সার্কাসের কাছে স্যার।'

‘যাতায়াত করেন কী করে?’

‘গাড়ি পান তো!'

‘আচ্ছা আপনি তো মাধববাবুর বাড়িতেও তদন্তের জন্য গেছেন। সেখানে কিছু অদ্ভুত লক্ষ করেছিলেন? ‘

'না স্যার। তবে আমার নিজের মাধববাবুকে দেখেই মনে হয়েছিল, এই লোকটা খুনি। কেন মনে হয়েছিল, বলতে পারব না। কিন্তু চোখের দৃষ্টি কেমন যেন! খুনির মতো ঠাণ্ডা। কম দিন তো এই লাইনে হলো না স্যার! আমরা লোক চিনি।'

‘আর কিছু?’

‘নাহ! শুধু বাগানটা দেখার সময়ে এক জায়গাতে দেখলাম, পাঁচিলের কাছে ঝোপটা দলা-মোচড়ানো। অন্য সব জায়গায় ঝোপ সমান ভাবে মসৃণ কাটা। শুধু ওই জায়গার ঝোপ বিধ্বস্ত। যেন পাঁচিল থেকে কেউ ঝোপের ওপর লাফিয়ে পড়েছে।'

‘চোরছ্যাঁচড়? বা পাড়ার বখাটে ছেলে?’

‘হতেও পারে। এত ছুটকো ব্যাপার ছিল যে আমিও ভুলে গেছিলাম। আজ আপনি বলাতে মনে পড়ল।’

‘থানায় পয়লা জুন রাত্রে আপনি ছাড়া আর কে ছিল?'

‘সেকেন্ড অফিসার মল্লিক। এএসআই সুরেন সামন্ত। আমি ছাড়া আর দুজন কনস্টেবল।'

'বিমলবাবু মানে আপনার বড়োবাবু, থানাতে এলেন দেড়টায়। বেরোলেন কখন?'

‘দুটোর আগেই। আমাকে বললেন একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে। সঙ্গে একটা বড়ো ব্যাগ ছিল। ফাইলপত্র ঢেকানো ছিল তাতে। ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

‘বড়োবাবু তখন কেমন ছিলেন? উত্তেজিত? শান্ত?'

‘নাহ। তেমন কিছু না। অন্যান্য দিনের মতোই। চোখ লাল ছিল। তবে সেটা প্রেশার

বাড়লে হয় ওঁর। আগেও দেখেছি।'

'থানার পোশাকেই ছিলেন?'

'না, না। অত রাতে আর ফর্মাল ড্রেস কী! প্যান্ট শার্ট চটি।'

'কিছু বলেছিলেন? হয়তো সামান্য কিছু। তাহলেও চলবে।'

'খেয়াল পড়ছে না স্যার। তবে দুইবার বাথরুমে গেলেন। বারবার হাত পা ধুচ্ছিলেন, কারণ বড়োবাবুর বেরোবার সময়েও হাত পায়ে জল দেখেছি।'

'ইন্টারেস্টিং!আচ্ছা যেদিন বডি বার করা হয়, মানে তেসরা জুন, সেদিন আপনি হোটেলের ঘরে কী দেখলেন? দরজা ভাঙা হয়ে গিয়েছিল তো তখনই!'

'হ্যাঁ, স্যার। ওই হোটেলে আগেও গেছি। একবার নেপালের এক খদ্দেরের সাথে মালিকের ঝামেলা থেকে মারামারি হয়। সেটা সামলাবার জন্য থানা থেকে যেতে হয়েছিল। যাই হোক, গিয়ে দেখলাম অনেক লোক থিকথিক করছে। ভাঙা দরজার ওপারে বড়ি পড়ে আছে। আর সে কী গন্ধ স্যার! বমি উলটে আসে।'

'বড়োবাবু কী করলেন?

'রুটিন কাজ, যা করার। ডাক্তারকে খবর দেওয়া। মর্গে লোক পাঠানো। পুলিশের ফোটোগ্রাফারকে আনানো। পুরো জায়গাটা সিল করে দেওয়া। এসবই।'

'জানালা খোলেননি কেন? এত গন্ধ যখন?'

'বলতে পারব না স্যার। আমারও মনে হচ্ছিল জানালা খুলি। কিন্তু বড়োবাবু বারণ করলেন, যেন ক্রাইম সিন নষ্ট না করে দিই। আর দরকারের বেশি পায়ের ছাপ যেন না পড়ে।'

'আচ্ছা ভবানীবাবু, আপনার প্রথম কী মনে হয়েছিল লাশ দেখার পর? একদম প্রথমে মনে যেটা এসেছিল সেটাই শুনতে চাইছি।'

'বোকা বোকা ভাবনা স্যার। শুনলে হাসবেন।' লাজুক হাসছেন ভবানীবাবু

'তবু বলুন না!'

'আলিবাবার চিচিংফাঁক জানেন তো স্যার? মনে হয়েছিল, কেউ যেন বাইরে থেকে চিচিংফাঁক বলেছিল, দেয়াল দুই দিকে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে গুলি চালিয়েছিল। তারপর চিচিং বনধ বলেছে। দেয়াল আবার জুড়ে গেছে।'

শুদ্ধসত্ত্ব ভবানীবাবুর কাঁধে চাপড় মেরে সপ্রশংস স্বরে বলল, শাবাস ভবানীবাবু। এই অদ্ভুত অন্যরকম ভাবনাগুলোই আপাতত কাজে লাগবে। উপকার হলো আপনার সঙ্গে কথা বলে। আজ উঠি।'

'স্যার একটা কথা।' ভবানীবাবু হাত কচলালেন আবার ৷

'হ্যাঁ, বলুন না!

'মানে, বলছিলাম কী, বড়োবাবুকে বলবেন না স্যার, যে আপনাকে এসব বলেছি। তিনি হয়তো জানলে রাগ করবেন। আমাদের তো নিয়ম নেই এভাবে মুখ খোলার!

'আপনার ভাবনা নেই ভবানীবাবু। আমি কাউকে কিছু বলব না!' আত্মগতভাবে বলল শুদ্ধসত্ত্ব, আপাতত সামনের কয়েকটা দিন হয়তো মুখই খুলব না। শুধু ভাববো।'

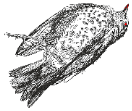

দেয়াল-ফাটলে মাথা খোদাইয়ের, পট পৃথিবীর
অসংরক্ষিত তারকাপ্রহার; শুকনো রক্তে, কালো শার্টের
বোতামে কোনও কৃষ্ণ আগুনের দিন ওঠে জ্বলে
এখানে ঋতু সংগ্রহের দিন, কারও মুখে হাসি নেই
দেয়ালে খড়ির দাগ, চায়ের মদের পরে
শোভাবাজারের দিকে শ্রাবণসন্ত্রাস নেমে এলে
উত্তরবাংলার যে সব নীল শপথের মুখ বহে যায়
রূপনারায়ণে, গঙ্গায় ...

—অনুরাধা মহাপাত্র

গতকাল রাত্রে আমি আবার স্বপ্ন দেখেছি, সল্টলেকের বন্ধ ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়েছি। দরজার তালা খুলে কঁ্যাচ শব্দে ভেতরে প্রবেশ করে দেখেছি, মাকড়সার জাল আমার পথরোধ করতে এগিয়ে আসছে। আধো অন্ধকার ঘর, ডাইনিং টেবিল, তার ওপর রাজ্যের ওষুধ, অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল, প্লাস্টিক, মাদার ডেয়ারির বাতিল কার্ড, ভাঙা থার্মোমিটার, ধুলোর স্তরে সাদা সোফা, ওলটানো চেয়ার, কোথা থেকে ভাঙা সূর্যালোক ম্লান হলদে জন্ডিস রুগীর চোখের মতো, ঠিকরে আসছে বুঝছি না। এগিয়ে যাচ্ছি বাবার ঘরের দিকে। বন্ধ দরজা, অন্ধকারে হাতড়ে নব ঠেলছি। একটা অকস্মাৎ হাওয়াতে সরে যাচ্ছে টেবিলের ধুলো, যে বাতাস ঝাপটা মারছে দরজা খোলার কারণে। ঘরের ভেতর মিটমিটে ল্যাম্প, নিঃসঙ্গ বিছানা। এগিয়ে যাচ্ছি, বাবাকে দেখব বলে। বিছনায় শুয়ে আছে, কেমো নেবার পর সব চুল ওঠা। আবছা আলোয় হলুদ আভা, কিন্তু বেশিটাই অন্ধকারে ঢাকা। ঐ তো, এলোমেলো দাড়ি, দুচোখ খোলা। কিন্তু বাবার দাড়ি ছিল না। ঝুঁকে পড়ে সে মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্ছি, আঙুল দিয়ে খুঁড়ে দেখছি একলঘেঁড়ে কপাল, রুগ্ন চোয়াল, অবাধ্য ভুরু, কারণ আমি জানি, শুয়ে আছে বাবা নয়, অমিতাভ।

'হ্যালো, তনয়া? কী খবর? কাজ কদ্দুর এগোলো?'

'আরও কয়েকদিন থাকতে হতে পারে।'

'কতদিন? একজ্যাক্ট সংখ্যাটা বলো।' 'জানি না এখনও। দুদিন হতে পারে। পাঁচদিনও হতে পারে।' মুশকিল। এইচআর থেকে বাজেট দেবে না।'

'আরে অনেকটা এগিয়েছি, এখন ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসা যায় নাকি?'

'কিন্তু আমাকে তো জাস্টিফাই করতে হবে!'

'আমার পক্ষে সম্ভব না এভাবে বেরিয়ে আসা। সরি।'

'তনয়া, তুমি এবার আমাকে বিপদে ফেলছ।'

'তাহলে একটা কাজ করছি। কাল থেকে ছুটির আবেদন করে দিচ্ছি। তারপর এখানে নিজের পয়সাতে থেকে যাচ্ছি?'

'না না পাগল নাকি! ওসব করতে যেও না। আচ্ছা দেখছি কী করা যায় ৷ তুমি আমার ই-মেলে একটা মেল পাঠিয়ে দাও। সেখানে বিশদে লেখো কেন তোমার আরো সময় লাগবে। এইচআর-কে কপি করবে। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'থ্যাংক ইউ মহেশ। ইউ আর আ সুইটহার্ট।'

'তনয়া!'

'বলো।'

'তুমি নিশ্চিত তো, আমরা একটা টানটান স্টোরি দিয়ে সিরিজ শেষ করতে পারবো?

'আমার ওপর ভরসা করতে পারছো না?'

'উফ, সে কথা বলছি না। কিন্তু পুরো ঘটনাটা নিয়েই সন্দেহ লাগছে। এতদিন আগেকার ব্যাপার, সেটাকে খুঁড়ে বার করে আনা তো সহজ কাজ নয়!

'পারব। আর কয়েকটা দিন শুধু সময় দাও।'

ফোনটা রেখে দিয়ে নিজের মনে হাসলাম। মহেশ এরকমই। প্রতিবার টেনশন করে। বাজেট নিয়ে চিৎকার করে। মাথার চুল ছেঁড়ে। তখন ওর কয়েকটা সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে মৃদু ঘা দিতে হয়। তার মধ্যে একটা হলো আমার নিজের পয়সায় গল্পের পেছনে ছুটব, সেটা বলা। ব্যাস, আর দেখতে হবে না। মহেশ তখন জান লড়িয়ে দেবে। দরকার পড়লে ম্যানেজমেন্টকে ইস্তফা দেবার হুমকিও দিয়ে দেবে। তার অধস্তন সাংবাদিককে নিজের পয়সা খরচ করতে হবে, এটা মহেশের কাছে প্রায় মৃত্যুসম। নার্ভাস, প্রচণ্ড চিৎকার করে, তারকাটা, রেগে গেলে বিশ্রী বকাবকি করে, কিন্তু দরকারে আমাদের যে কারোর জন্য জীবন দিয়ে দেবে— মহেশ হলো সেরকম সম্পাদক।

ঘাড় ঘুরিয়ে অরুণকে দেখতে পেলাম না। প্রকৃতি এখন কিছুটা শান্ত। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু আকাশে কালো গম্ভীর মেঘ চাপ হয়ে ঝুলে রয়েছে। সামান্য খোঁচা পেলেই ফেটে পড়বে। আজ কুয়াশাও কিছুটা কম। অন্তত দৃষ্টি চালানো যাচ্ছে খানিকটা দূর পর্যন্ত। সামনেই খাড়া সবুজ পাহাড়, যার মাথা আপাতত মেঘের ভেতর ঢাকা পড়ে আছে। অপরদিকে ঢালু খাদ হাঁ করে তাকিয়ে ৷ পাইন বার্চের গা থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছে কুয়াশা। বাড়ি আর পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় গম্ভীর অরণ্য, যার মাথার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে আসছে ধূসর মেঘের দল। মনে হচ্ছিল অরণ্যের কাছে গিয়ে কান পাতলে হিংস্র কেউটের ফোঁসফোঁস শুনতে পাব। টুপটুপে কুয়াশার মধ্যে আধো আবছা ঋষি রোডের বাড়িটাকে এখন দূর থেকে জলরঙে আঁকা অসম্পূর্ণ ছবির মতন লাগছে।

উপত্যকার দিকে এগিয়ে চোখে পড়ল, অরুণ পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নীচের অরণ্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। শরীরের একটা পেশিও নড়ছে না। দেখে মনে হচ্ছে প্রস্তরমূর্তি। দুইবার নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দিলেন না। এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত দিতে সামান্য চমকে উঠলেন। একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুঃখিত। অতীতে চলে গিয়েছিলাম।'

'এই জায়গাটা আপনি চেনেন?'

'ওই যে জঙ্গল', আঙুল তুললেন অরুণ, 'ওটা সম্ভবত দার্জিলিং-এর বহু পুরোনো বাসিন্দাই চিনবে।'

'কেন?'

'সত্তরের দশকের বহু তরুণের লাশ ওই অরণ্যের ভেতর লুকিয়ে আছে। দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং, আশেপাশের গ্রামগুলো— সব জায়গা থেকে নকশালপন্থী সন্দেহে ধৃত তরুণদের নিয়ে আসা হতো এখানে। এই উপত্যকায় নেমে যাবার একটা রাস্তা আছে পেছন দিক দিয়ে। জিপ নেমে যেত। ছেলেগুলোকে বার করে আনা হতো। হাতকড়া খুলে দিয়ে পুলিশ বলত, যা ছেড়ে দিলাম।' দৌড়তে শুরু করলেই পেছন থেকে গুলি। মাটিতে পুঁতে দিত, অথবা এমনিই ফেলে রাখত। পরে শেয়াল বা অন্য জানোয়ার এসে টেনে নিয়ে যেত। এতদিন হয়তো সেই সব কঙ্কালরা ধুলো হয়ে গিয়েছে।'

'ড্যানিয়েল লামা।' আস্তে বললাম।

অরুণ হালকা মাথা ঝোঁকালেন। 'শুধু একা ড্যানিয়েল কেন, অনেকেই ছিল তখন। হয়তো ড্যানিয়েল সবথেকে বেশি নিষ্ঠুর ছিল। কিন্তু গোটা সিস্টেমটা একজনের ওপর সব

দায় চাপিয়ে হাত কীভাবেই বা ঝেড়ে ফেলতে পারে?'

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। নীচের দিকটা অন্ধকার। একটা জংলি পোকার টিরিরি টিরিরি করে ডাক ভেসে আসছে। উপত্যকার বাম দিক মেঘের আচ্ছাদনে ঢেকে আছে। যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, তার কালচে সবুজ একটা স্যাঁতসেঁতে জলীয় ভাপ ছুড়ে দিচ্ছে ওপরের দিকে।

অরুণ ঘুরলেন। 'বাড়ির ভেতরে যাব না?'

এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কেঁপে গেল কি বুকটা? সেই কালো ঘোড়া। উপত্যকার জঙ্গলের এক ধারে দাঁড়িয়ে। একই ঘোড়া হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু অবিকল একরকম দেখতে। এই ঘোড়াটাও নিস্পন্দ হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওপর থেকে দেখতে পেলাম। হয়তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তবুও অস্বস্তি হচ্ছে। ভয় লাগছে। অরুণকে দেখলাম, পাশে দাঁড়িয়ে একই দিকে তাকিয়ে। কিন্তু তিনি কি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না? নাকি দেখেও পাত্তা দিচ্ছেন না? আমার তাহলে কেন এই অমূলক অস্বস্তি? পিছু ফিরলাম। আর দেখতে চাই না।

গলা খাঁকরালাম। 'একটা ছবি তুলব?'

অরুণ উত্তর দিলেন না। মোবাইল বার করলাম। এই ধরনের ক্যান্ডিড ছবির দাম পাঠকমহলে অনেক।

'ওদের সময়ের মধ্যে, ও মনে হয় সবথেকে বেশি প্রকৃতির সংলগ্ন ছিল।'আনমনে বললেন অরুণ। টুপ করে এক ফোঁটা বৃষ্টি অথবা কুয়াশা, ঝরে গেল। 'আমাদের সময়কার কবি অরণি বসুর বিখ্যাত লাইন ছিল একটা, 'আমাদের গ্রীষ্মকালীন দার্জিলিং নেই, গাড়িবারান্দা নেই, জলতরঙ্গ আছে।' অমিতাভ থাকলে বলত, ওর আর কিচ্ছু নেই, শুধু সারাজীবনের দার্জিলিং আছে।'

খাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম দুজন। মাথার ভেতর ছেঁড়া ছেঁড়া ভাসছে এক বিস্মৃত কবির প্রোফাইল। তাকে খুঁজতে গেলে কলকাতায় গিয়ে হয়তো সেই সময়কার কবিতাও কিছু পড়তে হবে। কিন্তু এই কাজটা আমি পারব। যেটা এখনও পারব না, সেই কবির হত্যাকারীর প্রোফাইলিং। অরুণ চৌধুরীকে এখনও পুরোটা ধরতে পারছি না। কোথাও গিয়ে একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। বারবার হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে আসল মানুষটা।

'অমিতাভ কি বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি খুন হবেন?

'সম্ভবত। ওর উপন্যাস পড়ে সেটাই মনে হয়েছিল। চলুন, বাড়িটা দেখে আসি। বাড়ির সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা ৷ রামবীর কি তাহলে ভেতরে কাজ করছেন?

শুনেছি অপ্রত্যাশিতভাবে চমকালে মানুষের হাত কেঁপে যায়। বুক ধড়াস করে ওঠে। অনেকেরই নাকি মাথা ঘুরে যায়। আবিষ্কার করলাম, আমার এসব কিছুই হয় না। আমি স্থাণু হয়ে যাই। দরজার কাছে গড়িয়ে আসা রক্তের ধারা দেখেও প্রথমে বুঝতে পারিনি। যখন আমার চোখ রক্তের উৎপত্তি খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছিল, মস্তিষ্ক ক্রমে অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। চোখ যখন স্থির হলো ঘরের মাঝে শুয়ে থাকা রামবীরের দেহটার ওপর, পুরোপুরি স্থবির দাঁড়িয়ে থাকলাম। মনে হচ্ছিল, গতরাতের দেখা স্বপ্নদৃশ্যের ভেতরেই এখনও থেকে গিয়েছি। এবং সামনে রামবীর নয়, অমিতাভর দেহ। বুঝতে পারছিলাম, অরুণও বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন।

দরজার দিকে মাথা আর উল্টোদিকে দুই পা ছড়িয়ে রামবীর পড়ে আছেন। রক্তাক্ত শরীর। ধুলোমাখা রক্ত এখানে ওখানে ইতস্তত। প্রথমে সামলে নিলেন অরুণই। ছুটে গিয়ে রামবীরের পাশে বসে পড়লেন। মাথা উঁচু করলেন যখন, ফ্যাকাশে মুখ দেখে যা বোঝার বুঝে গিয়েছি। মনে হচ্ছিল, এ স্থবিরতা কাটবে না। কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি আমার পা-কে ছুটিয়ে নিয়ে আছড়ে ফেলল রামবীরের শরীরের ওপর। যে শরীরটা এখন পড়ে আছে অরুণের কোলে। তাঁর বুকের বামদিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রামবীরের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটল না।

রামবীরের চোখ খোলা, নিস্পন্দ। মুখ অল্প হাঁ হয়ে আছে। অরুণকে দেখলাম, মড়ার মতো সাদা মুখে তাকিয়ে আছেন রামবীরের দিকে। সেই মুখে আতঙ্ক, অবিশ্বাস, সন্দেহ—সব কটা রং একে অন্যের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। ওপরে তাকালাম। সিঁড়ির মুখের ঘরটা তালাবন্ধ।

বুঝতে পারছিলাম অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কথা বলছি। কিন্তু নিজেকে থামাতে পারছি না। অরুণকে বললাম, 'ডাক্তার। এক্ষুনি। নাহলে হাসপাতাল। অ্যাম্বুলেন্স।' বাক্যগুলোও সম্পূর্ণ করতে পারছিলাম না। অনিয়ন্ত্রিত অশ্রু এসে ঝাপসা করে দিচ্ছিল আমার দৃষ্টি।

অরুণ মাথা নাড়লেন।

মুখে হাতচাপা দিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। মনে হচ্ছিল, চারপাশ দুলছে। অরুণ ছাদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। চোখ বন্ধ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ খুললেন। কাঁপা গলায় বললেন,

'টিনা, এখন ভেঙে পড়বার সময় নয়। পুলিশকে ফোন করতে হবে।'

বিভ্রান্তের মতো অরুণের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মাথা কাজ করছে না। 'আমরা একটা ক্রাইম স্পটে দাঁড়িয়ে আছি।' অরুণ অস্থিরভাবে বললেন আবার। 'এই মুহূর্তে পুলিশকে জানাতে হবে। যত দেরি হবে, অপরাধী তত বেশি করে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। ছেড়ে দিন, আমি যা করবার করছি।' উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ফোন বার করলেন।

থানা থেকে ছাড়া পেতে সন্ধে পেরিয়ে গেল। সারাদিন ধরে অজস্র ফোন এসেছে। মহেশ সম্ভবত নিজের মাথার চুল সবকটাই ছিঁড়ে ফেলেছে এতক্ষণে। আমার পরিচিতি প্রমাণ করবার জন্য শিলিগুড়ি থেকে আমাদের ম্যাগাজিনের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট চলে এসেছেন সন্ধেবেলা। পুলিশের কাজে যা হয়! আমাকে এবং অরুণকেও সন্দেহের বাইরে রাখেনি। জিজ্ঞাসাবাদ করেছে অনেক। আততায়ীর পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। মার্ডার ওয়েপনও নিখোঁজ। পুলিশ যদিও প্রথমেই বুঝেছিল যে আমরা খুন করিনি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওই বাড়ির কী যোগাযোগ ছিল, সেটা জানবার জন্য দিনভর প্রশ্ন করে গিয়েছে। আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম যে পুলিশকে বলব না সত্যিটা। কারণ এটা আমার গল্প। গল্প লেখার আগে সব বেরিয়ে গেলে পেশাগত ক্ষতি হয়ে যাবে। বলেছি যে লেপচাজগতে ঘুরতে এসে এরকম পুরোনো একটা বাড়ি দেখে কৌতূহলী হয়ে ভেতরে ঢুকেছিলাম। অরুণ চৌধুরী দার্জিলিং-এ আমার কনট্যাক্ট, যাঁকে নিয়ে আমি খবর করছি। এই জায়গাটায় অমিতাভ মিত্রর হত্যা রহস্য নিয়ে বলতেই হয়েছে কারণ এতদিনে আনন্দ পাঠক, লালবাহাদুর রাই সহ অনেকেই জেনে গেছেন আমার আসার উদ্দেশ্য। কাজেই এটাকে চেপে রাখার মানে হয় না। পুলিশ বেশি ঘাঁটায়নি। কিন্তু ঋষি রোডের বাড়ি তল্লাশি চালিয়েছে। যদিও পায়নি কিছুই। ওই ঘর বা দেয়ালের আঁকা ছবি দেখে কিছু বোঝেনি, মাথাও ঘামায়নি। অরুণও আমার বক্তব্যে সায় দিয়ে গিয়েছেন।

সারাদিন থানাতে ছিল সিদ্ধার্থ। অনন্যা দুবার এসে ফিরে গিয়েছেন, কারণ তাঁর হাঁপানির কষ্টটা বেড়েছে। বিকেলে দিকে খবর পেয়ে এসেছিলেন আনন্দ পাঠক। তিনিও থানাতে থেকে গেছেন। সেটাই একদিক দিয়ে আমাদের পক্ষে লাভ হয়েছে কারণ আনন্দ পাঠকের এখনও যথেষ্ট প্রভাব এখানে। তিনি অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের হয়ে। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করলেও আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি পুলিশ। তার একটা কারণ অরুণ চৌধুরী, যাঁকে এই শহর সম্ভ্রমের চোখে দেখে। দ্বিতীয় কারণ হলো, আনন্দ পাঠকের হস্তক্ষেপ। তৃতীয় কারণ সম্ভবত আমার সাংবাদিক পরিচয়। নামি মিডিয়া-হাউজের সঙ্গে যুক্ত পেশাদারকে ঘাঁটাতে কেউই চায় না। বিশেষত সেই পেশাদার নিজে যদি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম বা ক্রাইম রিপোর্টিং জগতের কেউ হয়। পুলিশ আমাদের স্টেটমেন্ট নেবার পর শুধু একটাই নির্দেশ দিয়েছে। যেন শহর ছেড়ে না যাই আগামী কয়েকদিন।

'এটা কী করে সম্ভব?' উদ্বিগ্ন স্বরে আনন্দ পাঠককে জিজ্ঞাসা করলাম। 'আমাকে তো অফিসে যোগ দিতে হবে!'

'আপনি রাজ্য পুলিশের থেকে বিশেষ অনুমতিপত্র আনাবার ব্যবস্থা করুন অফিসের সঙ্গে কথা বলে, নাহলে কিন্তু শহরের বাইরে বেরোনো মুশকিল আছে।'

থানা থেকে বেরিয়ে দেখলাম, মদনদা দাঁড়িয়ে। আমার দিকে এগিয়ে এলেন, 'ম্যাডাম, ঘুম উড়ে গিয়েছিল আপনার জন্য। এতদিন গাড়ি চালাচ্ছি, এরকম দেখিনি। আপনি ঠিক আছেন তো?'

পুলিশকে ফোন করে বাইরে বেরিয়ে মদনদাকে ডেকে এনেছিলাম। অরুণ আর মদনদা দুজনেই বাড়ির এখান ওখানে ঘোরাঘুরি করলেন, যদি কিছু চোখে পড়ে কিছু দেখতে পাননি।

থানার বাইরে একপাশে অরুণ দাঁড়িয়ে, অন্য পাশে সিদ্ধার্থ। অরুণ এমনিতেই কম কথা বলেন, আর আজ অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ। গুম মেরে আছেন। মাঝে শুধু একবার বললেন, 'আমাদের চোখের সামনে দিয়ে খুনি বেরিয়ে গেল।'

এতক্ষণে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছি। অরুণের দিকে ফিরলাম, 'রামবীরের খুনের সঙ্গে কি অমিতাভ মিত্রর খুনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? অথবা আমার খবর করতে আসার সম্পর্ক? কী মনে হয় আপনার?

'জানি না। আমাকে একা ভাবতে হবে।' অরুণ গম্ভীরভাবে বললেন। সকালে রামবীরের দেহ কোলে নিয়ে যে অরুণকে দেখেছিলাম, তিনি ক্ষণিকের ভুল। কিছুক্ষণ পরেই সামলে নিয়ে নিজের গর্তে ঢুকে গিয়েছেন আবার। আবারও ফিরে এসেছে ধ্যানী বুদ্ধের চেহারা।

'মিস্টার পাঠক। আপনি শুধু আমাকে বলুন, পুলিশ লাইব্রেরির কার্ড কাল দিতে পারবেন কিনা। গতকাল হাতে পাবার কথা ছিল, কিন্তু পাইনি।

সম্ভবত আমার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে অরুণ, সিদ্ধার্থ এবং আনন্দ পাঠক তিনজনেই সচকিত হয়ে তাকালেন। আনন্দ পাঠক গলা খাঁকরালেন, 'কার্ড হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি বিশ্রাম করুন এখন। সারাদিন অনেক টেনশন নিয়েছেন।

হতাশায় মাথা ঝাঁকালাম। 'আপনারা আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। এদিকে একজন বুড়ো মানুষ মরে গেলেন কিছু না করেই। খুনি হয়তো এই শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা নিয়ে ভাবছেন না।'

'সেটা পুলিশের দায়িত্ব। কিন্তু আপনার কাজ তো তদন্ত করা নয়। যে কাজ নিয়ে এসেছেন, সেটা করতে পারবেন না এই অস্থির অবস্থায়।' আনন্দ বললেন।

ম্যালের কাছে এসে আনন্দ বিদায় নিলেন। 'আমি কাল একবার আপনার হোটেলে এসে খোঁজ নিয়ে যাব। তার মধ্যে সামলে নিন। আর যে-কোনো দরকারে ফোন লাগাবেন আমাকে।'লম্বা শরীরটা কুঁজো হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে।

সিদ্ধার্থ অনেকক্ষণ চুপ ছিল। এবার মুখ খুলল। 'কফি খেলে হয় না?'

সারাদিন প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি। ম্যালের একটা ছোট্ট নির্জন ক্যাফেতে বসলাম তিনজন। নিজের জন্য স্যান্ডউইচ আর কফি বলে অরুণের দিকে ফিরলাম, 'যদি এই হত্যার সঙ্গে অমিতাভর হত্যার সম্পর্ক থাকে, তাহলে অনুরোধ করছি আপনাকে, এবার মুখ খুলুন। আর সবকিছু চেপে রাখবেন না।

অরুণ সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন ধীরে ধীরে। 'অমিতাভর উপন্যাসটা আপনি এখনও শেষ করেননি!

'হ্যাং ইওর উপন্যাস!' বিরক্তিতে হাতের ব্যাগ ছুড়ে ফেললাম মাটির ওপর।

সিদ্ধার্থ চমকে উঠল। সারাদিনের উত্তেজনা, উদ্বেগ এবং হতাশা এবার তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল আমার মধ্যে। চুয়াল্লিশ বছর আগে একজন মানুষ খুন হয়েছেন। আজ খুন হলেন আর একজন। একটাও রহস্যের জট আমরা কেউ খুলতে পারিনি। উলটে এমন

একটা বাড়ির সন্ধান পেয়েছি যেটা রহস্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আপনার কি মনে হয় একটা কাঁচা লিখনশৈলীর বস্তাপচা রহস্যগল্পের মধ্যে এই সবকিছুর উত্তর পাব?

'তনয়া, এর বেশি কিছু আপনাকে বলতে পারব না। কারণটা হয়তো আন্দাজ করতে পারছেন। '

'জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট', সিদ্ধার্থ বলল।

অরুণ সিদ্ধার্থর দিকে তাকালেন। সিদ্ধার্থ নীচু গলায় উত্তর দিল, 'আমি জানি। 'সব কারণ খুলে বলব, কথা দিচ্ছি। শুধু আপনি আগে উত্তরটা খুঁজে বার করুন। আর উত্তর আছে উপন্যাসের মধ্যে। এই উত্তর ধনরাজ পেয়েছিলেন। আপনি অবশ্যই পাবেন। জানি, আপনি পারবেন।

'কিন্তু সেটা নিজের মুখে কেন বলছেন না? '

'বললে বিশ্বাস করবেন না। কেউ করেনি। আপনার কি ধারণা আমি বুদ্ধির পরীক্ষা নিচ্ছি? না। একদমই তা নয়। আমি চাইছি, আপনার গল্পের স্বার্থে। সত্যিটা বাইরে আসার স্বার্থেই, আপনি নিজে সেই উত্তর বার করুন। আমার মুখে শুনলে আপনি কনভিন্সড হবেন না।'

'জানি না, কী করব। গল্পের সন্ধানে এসে নিজে একটা বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, কেন এলাম এখানে।'

কলেজে পড়বার সময়ে বাবা আর আমি দুজন রাত্রিবেলা করে ডেভিড সুশে অভিনীত বিবিসি-র এরক্যুল পোয়ারো সিরিজের একটা করে এপিসোড দেখে ঘুমোতে যেতাম। সেই সময়ে মাঝে মাঝেই সিনেমা থামিয়ে দুজন আলোচনা করতাম, এই রহস্যগুলোর বিকল্প সমাধান কী কী হতে পারত। এক একটা গল্পের চার-পাঁচটা করে বিকল্প সমাধান বার করতাম দুজনে মিলে। সেই ডিডাকশন পদ্ধতি, সেরকম লজিকাল রিজনিং, যেগুলো তখন ব্যবহার করতাম, এখনও পারব কি?

কফিতে চুমুক দিয়ে সিদ্ধার্থ বলল, 'যেদিন আমরা বাড়ির সন্ধান পেলাম, তার পর দিনেই রামবীর খুন হলেন। এটাকে কাকতলীয় লাগছে না? তাহলে কি হত্যাকারীই মেসেজ পাঠিয়েছিল? চাইছিল, যাতে আপনি ওই বাড়িতে যান? যাতে সন্দেহ আপনার ওপর পড়ে?'

'তাহলে প্রথম দিনেই খুন করল না কেন? দ্বিতীয় দিন যে যাবো সেরকম নিশ্চয়তা কোথায় ছিল? আর দ্বিতীয় দিন যাবার কথা জানতই বা কে? আপনি জানতেন, আপনার কাকা জানতেন। ব্যাস। মদনদাও তো আজ সকালে জেনেছেন।'

'আচ্ছা। বাড়ির ভেতর কিছু সন্দেহজনক লেগেছিল? মানে, হয়তো চোখে পড়বার মতো কিছু না, কিন্তু সামান্য কিছু, আলাদা?'

ভাবার চেষ্টা করলাম। রামবীর খুন হবার পরেও বাড়ির ভেতর ঢুকেছি। কিন্তু কিছু কি ভুলভাল দেখেছি? না তো! প্রথমদিনের মতোই লেগেছিল সবকিছু। 'অন্য কারোর উপস্থিতি? হয়তো দেখেননি, কিন্তু অনুভব করতে পারছিলেন কি?

'নাহ। আর কাজ সারবার পর হত্যাকারী সেখানে থাকবেই বা কেন? মদনদাও বললেন তো, গেট দিয়ে তিনি কাউকে বেরোতে দেখেননি।'

'না, হত্যাকারী গেট দিয়ে বেরোয়নি।' অরুণ বললেন।

'কী করে বলছেন এই কথা?'

'কারণ, তাহলে বাগানের মাটিতে তার পায়ের ছাপ পড়ত। পুলিশ পরীক্ষা করে দেখেছে। আমি, আপনি, রামবীর এবং মদন ছাড়া পঞ্চম কোনো পায়ের ছাপ নেই। '

'কিন্তু এমন কি হতে পারে যে খুনি গতরাত থেকেই সেখানে ছিল? কাল রাতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টিতে হয়তো পায়ের ছাপ মুছে গেছে।'

'কেন থাকবে? আপনি খুনি হলে সারারাত ওখানে থাকতেন? কীসের আশায়? রামবীর তো দুপুর হলেই বাড়ি ফিরে যায়।'

'তাহলে? খুনি এল কোথা থেকে?'

'সমাধান সহজ। আপনিও ভাবলে পারবেন।'

'আমার মাথা কাজ করছে না, দুঃখিত।'

'আজ সকালে বলেছিলাম। উপত্যকায় নেমে যাবার একটা রাস্তা আছে, পেছন দিক দিয়ে। সত্তর দশকে পুলিশের জিপ ওখানে নেমে গিয়ে লাশ ফেলত।'

'তার মানে', উত্তেজিত গলায় বললাম, 'খুনি ওখানে গিয়ে গাড়ি রেখেছে। তারপর উপত্যকার খাড়াই অংশ বেয়ে উঠে এসে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঢুকেছে।'

অরুণ মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু তাহলেও তো বাড়িতে তার পায়ের ছাপ থাকবে। বা পেছনের জায়গাটায়, যেখানে দিয়ে উঠে এল।'

'থাকবে না। কারণ যেখান দিয়ে উঠে এসেছে তার পুরোটাই ঝোপঝাড়। ঝোপ হয়তো দুমড়ে গেছে, কিন্তু সেটা পুলিশ খেয়াল নাও করতে পারে, যদি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে পায়ের ছাপ খোঁজার দিকে। আর বাড়ির ভেতর ঢোকার দরকার পড়বে না। পেছনের জানালা দিয়েই গুলি ছুঁড়তে পারে। জানালার কাচ তো ভাঙা ছিল। মনে রাখবেন, রামবীরের মাথা ছিল দরজার দিকে, আর পা অপর প্রান্তের জানালার দিকে। মানে দরজার দিকে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। জানালা দিয়ে গুলি ছুড়লে সোজা বুকে এসেই বিঁধবে।'

'আপনি এটা পুলিশকে বললেন না কেন?'

'বিকেলবেলা বলেছি। পুলিশ কাল খুঁজে দেখবে। বুলেটের ফাঁকা খোল কোথায় পড়েছিল সেটা খুঁজে পেলেই বোঝা যাবে কোথা থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। এটা প্রথমে মাথায় আসেনি। উত্তেজিত ছিলাম ভেতরে ভেতরে। পরে শান্ত মনে ভেবে দেখলাম। এটাই পায়ের ছাপ না থাকার একমাত্র ব্যাখ্যা।

'কিন্তু দেয়ালের ওই ছবি, আর আজকের খুন— এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? সব গুলিয়ে যাচ্ছে। নাকি কিছুই সম্পর্ক নেই?'

'জানি না। হয়তো কোনোই সম্পর্ক নেই। হয়তো সাধারণ ডাকাতির কেস। বাড়িটায় দামি জিনিসের তো অভাব ছিল না! বামাটিকের ওই খাট বলুন অথবা বেলজিয়ান কাচ, কোনোটারই দাম কম নয়। হয়তো আমাদের ঠিক ওই সময়টায় ওখানে যাওয়া, পুরোটাই কাকতালীয়। '

'এই পৃথিবীতে কাকতালীয় বলে কিছু হয় না মিস্টার চৌধুরী!' 'একটা অন্য কথা বলি।' টেবিলের ওপর অবিন্যস্ত ছড়িয়ে থাকা চিনির ছেঁড়া স্যাশেগুলো সাবধানে জড়ো করে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখলেন অরুণ। 'অমিতাভর হত্যারহস্যে দুটো রাইফেল ব্যবহার প্রসঙ্গে আপনার অনুমান সঠিক। দাদার বাড়িতে একজোড়া রাইফেল ছিল। একই কোম্পানির, মেক আর মডেলও এক। দাদুর আমলের। ১৯৭২ সালে সেই বাড়িতে একটা চুরির ব্যাপার ঘটে। কিছু টাকাপয়সা, পুরোনো দিনের বাসন ইত্যাদি চুরি যায়। একটা রাইফেল ও নিখোঁজ হয়ে যায় তখনই। পুলিশে রিপোর্টও করেছিলাম। তারপর অন্য রাইফেলটা আমি জলাপাহাড় রোডের বাড়িতে নিয়ে আসি। দাদুর স্মৃতি, তাই হাতছাড়া হোক চাইনি। পুলিশ সেই রিপোর্ট খুঁজে বার করে। তারপর তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে আমার বাড়িতে যে রাইফেল থেকে গুলি চলেছে সেটা অমিতাভর হাতে গুলি চালানোটার যমজ। তাই ব্যালিস্টিক রিপোর্টে পার্থক্য ধরা যায়নি। পুলিশের রিপোর্ট যদি এখানকার লাইব্রেরি থেকে খুঁটিয়ে পড়েন, তাহলে মনে হয় এর উল্লেখ পাবেন। তবে আপনার পক্ষে এতদিন পরে এসে এর সম্বন্ধে না জানাটাই স্বাভাবিক। কারণ সংবাদমাধ্যমের কাছে পুলিশ এই বিষয়ে মুখ খোলেনি। সঞ্জয় অধিকারীও তাই আর এ ব্যাপারে কিছু লেখেননি।

কয়েক হাজারের মধ্যে অন্তত একটা রহস্যের সমাধান হলো। কিন্তু তবুও সন্তুষ্ট হলাম না। 'তিন বছর আগে চুরি যাওয়া রাইফেল কীভাবে ফেরত আসে? আর একই দিনে দুটো রাইফেল থেকেই কী করে গুলি ছোটে? কাকতালীয়? '

'তিন বছর পর কীভাবে ফেরত এল তা বলতে পারব না। তবে গুলি চালানোটা ইচ্ছাকৃত। ওইদিন গুলি চালাতে বাধ্য করা হয়েছিল।'

'কে করেছিল?'

অরুণ ভুরু কোঁচকালেন। 'আপনি কি সত্যিই এখনও কিছুই বুঝতে পারছেন না?'

'না। আপনার মুখ থেকে পুরোটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করে আছি।'

'সবটুকু, সব সত্যি আপনার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। আপনি দেখতে চাইছেন না। ভাবুন, টিনা? আপনার কলমের ওপরেই সত্যিটা দাঁড়িয়ে আছে।'

'সত্যি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি একটা গল্প চাই।'

'আর সেই গল্পটা আমি আপনাকে দিচ্ছি। রাস্তাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। শুধু হেঁটে যেতে হবে আপনাকে।'

এই চাপান-উতোরে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম ভেতরে ভেতরে। ক্লান্তও লাগছিল। আলোচনা শেষ করবার জন্য বললাম, 'আগে আজ উপন্যাসটা শেষ করি। তারপর এই নিয়ে কথা বলব ।'

অরুণ উঠে পড়লেন। 'বাড়ি যাই এবার। কাল কথা হবে।' পিছু ফিরে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকলেন।

'ঠিক এই অরুণের অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ নীচু গলায় বলল, কারণেই চাইছিলাম না, আপনি আসুন। আবার নতুন সমস্যা, আবার খুন। আবারও সেই মিথ্যে খোঁজা। কাকা এই বয়েসে এসে এতটা নাও নিতে পারত।'

'আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে যে আজকের ব্যাপারটার সঙ্গে চুয়াল্লিশ বছর আগেকার একটা ভুলে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের যোগ আছেই?'

তীব্র অথচ চাপাস্বরে সিদ্ধার্থ বলল, 'আমি জানি না, কেয়ারও করি না। যদি যোগ নাও তাকে, যদি এমন হয়েও থাকে যে রামবীর অন্য কারণে খুন হয়েছেন, তাহলেও, কাকাকে সেই দৃশ্য দেখতে হয়েছে। হয়েছে, কারণ আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন আপনার স্টোরির স্বার্থে। এটুকু সত্যি, খুব তেতো লাগলেও, গিলে নিন মিস ভটচাজ!'

বুঝতে পারছি, সারাদিনের ঝামেলার পর মাথা আমারও নিয়ন্ত্রণে নেই ৷ সামনে ঝুঁকে কেটে কেটে বললাম, 'আপনার কাছে অরুণ চৌধুরী খুবই ভালোবাসার মানুষ, স্বাভাবিক। কিন্তু আমি একটা কাজে এসেছি, এবং আপনার কাকার অনুমতি নিয়েই। সেই জায়গাটায় আমি নৈর্ব্যক্তিক। পছন্দ না হলে আমার অফিসে অভিযোগ জানান৷ দরকারে পুলিশে জানান। কিন্তু প্রতিদিন নিয়ম করে চারবার কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করবেন না কেন এলাম। এসেছি পেশার তাগিদে। আপনার কাছে সেটা তুচ্ছ মনে হলেও আমার কাছে নয়। '

অনেক কিছু বলবার প্রস্তুতি নিয়ে মুখ খুললে মানুষকে যেরকম দেখতে লাগে, বা সাদা বাংলায় কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে যাওয়া লোকের মুখ, সিদ্ধার্থকে সেরকম লাগছিল। কিছু বলতেও গেল, কিন্তু কী ভেবে চেপে গেল দেখলাম। ঠোঁট ওলটালো, 'আপনি বুঝবেন না।'

'কী বুঝব না? অনেকবার এই কথাটা বলেছেন। '

'বুঝবেন না, আমার কাকার ভেতরে কী চলে সারাক্ষণ। প্রথমদিনেই বলেছি এটা। আপনি চেনেন না, আমি চিনি। তাই ভয় লাগে, সব অনুভূতি চেপে রাখতে রাখতে ব্রেকডাউন না হয়ে যায়। আর এটা কাকার বরাবরের। গল্প শুনেছি তো অনেক।'

'হতে পারে, কিন্তু আমি কী করব বলতে পারেন? কাজ গুটিয়ে ফিরে যাব? অযৌক্তিক কিছু দাবি করবেন না প্লিজ!'

'সেটা আমার এক্তিয়ারে নয়।' বিরক্তমুখে সিদ্ধার্থ সিগারেট পাকাতে লাগল। আগুন জ্বালিয়ে তাকালো আমার দিকে, 'আমি আমার কথাটুকু বলেছি মাত্র। কাকাকে যেরকম দেখেছি, আমার সেই দেখাও আপনার কাজে লাগবে বলেছেন। তো, সেই দেখার ভিত্তিতে যদি কোনো সিদ্ধান্তে আসি, বা ছোটবেলা থেকে যেসব গল্প শুনেছি তার ভিত্তিতে, সেটাও

আপনার শোনা কাজ, তাই না?'

'দেখুন, আপনার কাকার বাড়ির মালি চলে গিয়েছিল বলে তিনি দুদিন খাননি, এটা বোঝায় যে অরুণ চৌধুরী খুব সেনসিটিভ একজন মানুষ। সেটা অবশ্যই লেখায় আসবে। কিন্তু তার বাইরে যেটুকু জাজমেন্ট আপনি দিচ্ছেন...'

'আপনি জানেনই না কী ঘটেছিল। আমি কিছুই বলিনি।' সিদ্ধার্থ প্রায় আস্ত সিগারেট মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে জোরে পিষে দিল।

'আমি কিছুই জানি না সিদ্ধার্থ, এবং আপনার কাকা সব জানেন। সমস্যা হলো, তিনি কিছুই বলবেন না। '

'বাবলাকে কাকা ছোটোভাইয়ের মতো দেখত, আগেই বলেছি।' আমাকে অগ্রাহ্য করে বলে চলল সিদ্ধার্থ। তখনও সিগারেটটা পিষে যাচ্ছে। 'আমি যদিও ওকে দেখিনি। বাবলা খুব মদ খেত। কাকার বাড়ির বাগান ওর হাতে। কাকা আর বাবলা, দুজনেই দুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। কীরকম জানেন? কাকার ঊনত্রিশতম জন্মদিনে বাবলা কী উপহার দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে তো গরিব, তার কাছে টাকা নেই যে কিছু দামি কিনে দিতে পারবে। তাই রাত্রিবেলা বটানিকাল গার্ডেনের ভেতরে ঢুকে একটা দুষ্প্রাপ্য সর্পগন্ধার চারা চুরি করে নিয়ে এসেছিল। কাকা জেনে প্রচুর বকাবকি করেছিল, কারণ লোকে জানতে পারলে দুজনেরই জেল হবে। কিন্তু বাবলা গোঁয়ারের মতো বলে গিয়েছিল, হয় চারা নেবে, আর নাহলে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। শেষে কাকা বাধ্য হয়েছিল নিতে। তো, বাবলার তিনকুলে কেউ ছিল না। ছিল শুধু একটা পোষা নেড়ি কুকুর। বাগানের একপাশে ঘর করে দুজন থাকত। বাবলা প্রতিদিন রাত্রিবেলা মদ খেয়ে কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদত। কুকুরটাও ছিল বাবলার ছায়াসঙ্গী। একদিন সেই কুকুরের হলো চর্মরোগ। রাস্তার কুকুর, যেখানে সেখানে যায়। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বেড়ায়। বীভৎস ঘা, পচা গন্ধ ছাড়ছে, আর মাছির দল ভনভন করছে। কাকা বাড়িতে ডাক্তার নিয়ে এসে দেখালো ৷ পশু হাসপাতালেও নিয়ে গেল। যথাসাধ্য করল। কিন্তু সব ডাক্তারই মাথা নেড়ে জানালেন যে কিছু করবার নেই। একে বাঁচানো অসম্ভব, এবং এর থেকেও বেশি যন্ত্রণা পেয়ে মরবে। কাকা বাধ্য হয়ে বাবলাকে জিজ্ঞাসা করল যে সে কী চায়? কুকুরটা কি যন্ত্রণা পাবে, নাকি তার কষ্টের নিরসন ঘটানো হবে? হাউ হাউ করে নাকি কেঁদেছিল বাবলা। কাকা বাবলাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বাবলা যা চায় সেটাই হবে। কিন্তু বাবলাও আর কুকুরটার বীভৎস অবস্থা দেখতে পারছিল না। যারা তখন ওখানে উপস্থিত ছিল তাদের মুখে শুনেছি, কাকা ঘর থেকে বন্দুক এনে নাকি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর বাবলার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'আমার হাতে উঠবে না। পারব না। তুই যা করবার কর।' ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। বাবলার হাত কাঁপছিল। সেই অবস্থাতেই বন্দুক তুলল। কুকুরটা তখন বাগানের একটা বোগেনভেলিয়া গাছের নীচে শুয়ে আছে। তার চোখ বাবলার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকানো। একবার হালকা 'ঘেউ' করে আদরের ডাক ডেকে উঠল। বাবলা গুলি ছুঁড়ল। কুকুরটার মাথায় গিয়ে লাগলো সোজা। বন্দুক ফেলে দিয়ে বাবলা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল। পরে অন্য লোক ডেকে এনে বাগান পরিষ্কার করতে হয়েছিল। বাবলা সেই যে গেল, আর ফিরে এল না। শহর ছেড়েই চলে গিয়েছিল।'

আরেকটা সিগারেট পাকিয়ে ধরালো সিদ্ধার্থ। কয়েকটা টান মেরে বলল, 'ওই গাছটার নীচেই কাকা দুই রাত বসেছিল।'

ঝট করে মুখে কোনো উত্তর আসছিল না। কী বলব ভেবে না পেয়ে মৃদুস্বরে বললাম, 'সরি।'

উত্তর না পেয়ে অপেক্ষা করে করে আবার বললাম, 'ঋষি রোডের বাড়িতে মিস্টার চৌধুরী নিজে থেকে যেতে চেয়েছিলেন। আমার মাথাতেও আসেনি নিয়ে যাবার কথা। কিন্তু আপনিই ঠিক, আমার জন্যই এত কিছু হলো।'

'আপনার ব্যাপারটা বুঝছি। কিন্তু পুরোনো পাপের ছায়া এতই দীর্ঘ যে আমরা কেউ তার

থেকে শত চেষ্টাতেও বেরিয়ে আসতে পারছি না।'

'মজাটা কোথায় বলুন তো? এমনকি এটাও জানি না যে পাপটা আদতে কার!' সিদ্ধার্থ উত্তর দিল না।

ঘরে ঢুকে অমিতাভর উপন্যাসটা হাতে নিলাম। আজ এটাকে শেষ করতেই হবে। সমাধান যদি সত্যিই এর মধ্যে থাকে, তাহলে অন্তত সামান্য মনোযোগ দাবি করে এই লেখা। এরপর আমার নিজের লেখাও বাকি আছে। কিন্তু তার আগে এটা শেষ করব। দরকার হলে ঘুমোতে দেরি হবে। হলে হোক। এমনিই রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। ব্যালকনির দিকে চোখ গেল। ব্যালকনির বাইরে বাগান। তার ওপাশ থেকে শুরু হচ্ছে পাহাড়। অনেকটা ঋষি রোডের বাড়ির মতোই। অন্ধকার গম্ভীর পর্বতের সানুদেশের দিকে তাকিয়ে আবার মনে পড়ে গেল রামবীরের মৃতদেহ

He wasn't there again today
I wish, I wish he'd go away

একজন পাগলাটে মানুষ, যে জানালার অদৃশ্য কাচ মুছে দিন গুজরান করত, সে দুম করে নেই হয়ে গেল। অথবা হয়তো ছিলই না কখনও! সিগারেট টান মেরে পাণ্ডুলিপি খুলে বসলাম। আর তখনই ফোনটা এল। একটা অচেনা নম্বর।

বিশুদ্ধ ব্রিটিশ ইংরেজি টানে, খসখসে গম্ভীর স্বরে ওপার থেকে জবাব এল, আমার নাম ড্যানিয়েল লামা।'

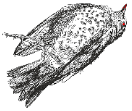

শ্মশানবন্ধুরা জানে কতটা সময় নেবে তোমার শরীরটুকু পুড়ে ছাই হতে। চিরবিদায়ের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে

চরাচর জুড়ে তার লেলিহান আক্রমণে কত দ্রুত পুড়ে যায়

তোমার শরীরজোড়া গৃহস্থালি, গান, মাটি, পূর্ণ ভালোবাসা

—রণজিৎ দাশ

অমিতাভর উপন্যাস

লতিকা হাতের কাজ সেরে আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে খাটের ধারে এসে বসল। ‘গরমে আর পারা যাচ্ছে না মা গো!

প্রণবেশ উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে বালিশ রেখে সিগারেট টানছে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে। লতিকা তার ঠোঁট থেকে সিগারেট টেনে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল, ‘সারা ঘর চিমনি করে রেখেছো। আর একটাও খাবে না আজ। এখন তুমি গল্পটা বলবে আমাকে। একদম শুরুর দিন থেকে যেদিন চিঠি পেলে।'

প্রণবেশ ঘাড় ঘুরিয়ে বউকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। আবার ঠিক দেখছে না, যেন দূরের কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে আছে। 'আচ্ছা, একটা লোকের যদি সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে রাত এগারোটা চল্লিশ পর্যন্ত অ্যালিবাই থাকে, মানে তাকে এই সময়কালের মধ্যে কেউ না কেউ দেখেছে, তাহলে সে কি সম্পূর্ণ অন্য একটা জায়গাতে গিয়ে খুন করতে পারে?' প্রণবেশের মনে হচ্ছে, এ ধাঁধার সমাধান শুদ্ধ বা সে করতে পারবে না। তাদের দৌড় শেষ।

'না। পারে না। কিন্তু তুমি আমাকে গল্পটা না বলে এরকম উদ্ভট প্রশ্ন করতে পারবে না আর!’

প্রণবেশ প্রথম থেকে পুরোটা বলে গেল। লতিকা হাঁটুতে মুখ গুঁজে নীরবে শুনলো। একটা প্রশ্নও করল না প্রণবেশের কথার মধ্যে। প্রণবেশের কথা থামলে তারপর বলল, ‘বিমল সমাদ্দার কি মাধববাবু বা আনিসুর, কাউকে আগে থেকে চিনতেন?’

‘এ আবার কেমনধারা প্রশ্ন?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রণবেশ।

‘আহ্, বলোই না বাপু!'

‘না তো। সেরকম কিছু হলে উল্লেখ করতেন। কিন্তু কেন এই প্রশ্ন করছ?’

‘তাহলে ওভাবে বলছিলেন কেন?’

‘কীভাবে?’

‘মাধব করেছে’, আনিসুর বলেছে’ এরকম? এমনকি মাধববাবু বলেও সম্বোধন করছিলেন না। এদিকে তোমরা যখন এই দুজনের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলে বলছিলে 'মাধববাবু বলেছেন’, ‘আনিসুর করেছেন এরকম। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ তোমরা ওদের চেনো না। কিন্তু বিমলবাবু ওভাবে কথা বলছিলেন কেন? আগে থেকেই কি দুজনকে চিনতেন?

প্রণবেশ বজ্রাহতের মতো বসে থাকল কিছুক্ষণ। হ্যাঁ, বিমলবাবু ঠিক এভাবেই কথা বলছিলেন।' ধীরে ধীরে, যেন নিজের মনে বলছে।

‘তোমাদের সামনেই তো বলেছিলেন। কেন, সে কথা মনে হয়নি শুদ্ধদার বা তোমার?’

‘শুদ্ধ কী ভেবেছে জানি না। কিন্তু আমার মাথাতেই আসেনি।'

লতিকা মুখ টিপে হাসল, ‘জানি তো! তোমার বুদ্ধি বরাবরই কম।’

‘সে জানি।’ প্রণবেশ ব্যাজারমুখে বলল। 'কিন্তু শুদ্ধর এত বুদ্ধি নিয়েও এটা মাথায় আসেনি কেন, ভাবছি।'

‘আমার কি মনে হয় জানো, বিমলবাবু আনিসুর বা মাধববাবুকে চিনতেন আগে থেকেই।’

‘কী থেকে মনে হল তোমার?’

‘মনে করে দেখো, মাধববাবু মিলিটারিতে টেন্ডার পাবার কাজে ঘোরাঘুরি করছিলেন। বিমলবাবুও একসময়ে মিলিটারিতে ছিলেন। দুজনের সেই সময়ে যোগাযোগ হওয়া কি অস্বাভাবিক? আর মাধববাবুর সূত্রেই হয়তো আনিসুরের সঙ্গেও বিমলবাবুর যোগাযোগ হয়েছিল? শুদ্ধদা বিমলবাবুকে মিলিটারির ব্যাপারে প্রশ্ন করল, আর দুইয়ে দুইয়ে চার করল না, এটা হতেই পারে না।’

প্রণবেশ অস্থির ভাবে সিগারেট বার করল আর একটা। ‘আমার মাথায় কেন আসেনি এগুলো?'

লতিকা সিগারেট কেড়ে নিল। ‘আগে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও, তার আগে ধরাতে পারবে না।’

‘অগত্যা! বলো।’ ব্যাজার হলো প্রণবেশ।

‘এই যে, অমিতাদেবী। বাংলাদেশে থাকেন। তাঁকে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না শুনি?’

‘সেটা তো পুলিশ বলবে। তারা ঢাকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তবেই সন্ধান পাবার কথা।’

‘পুলিশ কেন বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি এখনও, সেই প্রশ্ন মনে আসেনি তোমাদের?’

‘বাবা! তুমি তো দেখছি রীতিমতো উকিলের মতো জেরা শুরু করছো!’

‘থামো! পরের প্রশ্ন হলো, মাধব রক্ষিত প্রথমদিন, মানে যেদিন তোমরা আনিসুর রহমানের হোটেলে তাঁকে দেখেছিলে, সেদিন কি জুতো পরে এসেছিলেন না সাধারণ চটি?’

‘জুতো মনে হয়। খেয়াল করিনি। তবে সাফারি সুট পরেছিলেন যখন, পায়ে জুতোই থাকার কথা। কেন এই কথা জিজ্ঞাসা করছ?’

‘যদি মাধব রক্ষিত খুন করে পালাতে যাবার সময়ে পায়ে চোট পেয়ে থাকেন, আর পা তখন থেকেই ফুলে থাকে, তাহলে জুতো পরবেন না। খোলামেলা চটি পরবেন। যাকগে, দেখোনি যখন, কী আর করা যাবে!

তাহলে তোমার সন্দেহও মাধব রক্ষিতের ওপর?

‘গোয়েন্দা গল্পে পড়োনি, একজন গোয়েন্দা সকলকেই সন্দেহ করে? ‘আমার বদলে তুমিই শুদ্ধ-র অ্যাসিসটেন্ট হয়ে যাও, বুঝলে?’

লতিকা ঠোঁট উলটে উত্তর দিল, ‘শুদ্ধদা এত বুদ্ধিমতী মেয়েকে সহ্যই করতে পারবে না। এমনিতেও ও মেয়েদের পছন্দ করে না, আমি দেখেছি। দূরে দূরে থাকে। চট করে সহজ হতে চায় না।

‘ধুর, এসব তোমার মেয়েলি কল্পনা। স্কটিশে শুদ্ধর কত মহিলা অনুরাগী ছিল তুমি জানো?’

‘সেগুলো তো সবই একতরফা প্রেম। আর স্কটিশে আমিও পড়েছি মশাই! যদিও আমার থেকে অনেকটাই সিনিয়র ছিল, কিন্তু ওকে দেখলেও কিছুতেই প্রেমে পড়তাম না। অত কাঠখোট্টা লোকের সঙ্গে প্রেম হয় না। এমনিতেই ওর মনে হয় জন্ম থেকেই মাথার চুল কাঁচাপাকা। ওরকম বুড়ো মানুষ দেখলেই আমি পালাই। তার ওপর নস্যি নেয়, ম্যা গো!’

‘আচ্ছা, তুমি আনিসুরের ঘর নিয়ে কিছু বলবে না? চেয়ার কেন সরানো ছিল? পর্দা কেন গোটানো ছিল? ঘর বন্ধই বা ছিল কী করে?’

‘অত শত জানি না! তবে একটা জিনিস বুঝেছি। খুনি সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক ব্যবহার করেছিল, যাতে ঘর বাইরে থেকে বন্ধ করবার সময় পায়। সে যেভাবেই করুক না কেন।

মানে, ছিটকিনিতে সুতো টেনেই করুক বা খুন করে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাক। সাইলেন্সার ব্যবহার করবার উদ্দেশ্য ছিল নিঃশব্দে কাজ করা নয়। নিজের জন্য কিছুটা সময় বার করতে পারা। যাতে ঘরটাকে লকড রুমের চেহারা দেওয়া যায়। এবার, কেন লকড রুম বানাতে চেয়েছে, সেটা বলতে পারবো না। তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করো গে।'

'নিঃশব্দে কাজ সারা উদ্দেশ্য ছিল না বলছ?'

'তাহলে তো খুন করেই চলে যেতে পারত। ঘর ওভাবে বন্ধ করল কেন?'

'হয়তো পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। খেলতে চেয়েছিল পুলিশের সঙ্গে।'

'মজা করবার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঘর বন্ধ করবে এভাবে? তার মধ্যে তো কারেন্ট চলেও আসতে পারত। যদি কেউ আগেই আবিষ্কার করত যে মেইন সুইচ অফ আছে, আর গিয়ে অন করে দিত? অথবা যদি পাশের ঘরের বোর্ডার বেরিয়ে আসতো? নাহ্। শুধুমাত্র পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করবার জন্য এই কাজ করেনি। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে এটার পেছনে।'

'হুঁ,' প্রণবেশ চিন্তা করল কিছুক্ষণ। 'উদ্দেশ্য কি এটা হতে পারে যে কিছুটা সময় চেয়েছিল পালাবার? হয়তো বাংলাদেশের লোক। যতক্ষণে বডি আবিষ্কার হবে, ততক্ষণে সে পগার পার হয়ে নিজের দেশে চলে গেছে। এরকম কিছু কি?

'হতেই পারে। বললাম তো, এত কিছু জানি না। তবে এটাও হতে পারে, হয়তো কিছু লুকোতে চেয়েছিল। এমন কোনো ক্লু, যেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'সেটা আবার কীরকম? আমার তো এমন কিছু মাথাতেই আসছে না, যা সময় গেলে উবে যায়। এ কি বরফ নাকি, যে জল হবে, তারপর বাষ্প? ধুর, কীসব বলছ!'

আমার মাথাতে আর খেলবে না বাপু! অনেকগুলো প্রশ্ন করেছি। এবার খাবে চলো। রাত কত হলো খেয়াল আছে?'

প্রণবেশ একটা হাত বেড় দিয়ে লতিকার ঘাড়ের কাছে এনে তাকে ঝটকা মেরে নিজের বুকের ওপর ফেলেছে। না, খেয়াল নেই।'

'ধ্যাত, ছাড়ো তো!' লতিকা মুখে বলছে বটে, কিন্তু ওঠবার কোনো রকম চেষ্টা করছে না। প্রণবেশের বুকে থুতনি ঠেকিয়ে ভাবছে। 'আচ্ছা তোমার মনে হচ্ছে না, এই গোটাটাই কেমন যেন সাজানো? যেন একটা সুন্দর ছিমছাম নাটক চোখের সামনে অভিনয় হয়ে যাচ্ছে?'

'একটা জলজ্যান্ত লোক খুন হয়ে গেল, আর তুমি সেটাকে সাজানো নাটক বলছ?'

'কী জানি! আমার কাছে পুরোটাই অবাস্তব লাগছে। যেন কী একটা হারিয়ে গেছে। সেটা যতক্ষণ না খুঁজে পাওয়া যাবে, ব্যাপারটা একটা গল্প হয়েই থেকে যাবে।'

'নিখোঁজ তো অনেক কিছুই। হত্যাকারী নিখোঁজ। খুনের অস্ত্র নিখোঁজ। খুনের একজ্যাক্ট সময়টুকু নিখোঁজ। আর আপাতত আমার বউয়ের আমার প্রতি প্রেমটুকুও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাবেও না।'লতিকা কটাক্ষ হানল। 'তোমার বউ গোয়েন্দা গল্পের পোকা, সেটা প্রেম করবার সময়ে জানতে না বুঝি? যতক্ষণ না সমাধান সামনে আসে, সে আর অন্য কোনোদিকে মন দেবে না বলে ঠিক করেছে।'

'সেজন্যই তো বলছি। কাল থেকেই শুদ্ধর সঙ্গে লেগে পড়ো। আমিও তাহলে চেম্বারে মন দিতে পারি।'

'নাহ। অত রোদের মধ্যে ঘুরতে পারি না। আমি মাইক্রফট্ হোমসের মতো। ঘরে বসে শুধু ভেবে যাই।'লতিকা থামলো। ভুরু হালকা কুঁচকে গেছে। 'মাধব রক্ষিত চিঠিটা ডাকে কেন ফেললেন না বলো তো?'

'বললাম তো। মাধববাবু নিজেই জানিয়েছেন। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন।

'তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে চেয়েছিলেন, এদিকে নিজে দেখা করতে এলেন না। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়?'

‘কলামন্দিরে গিয়েছিলেন, শুনলে না?' আলস্যের হাই উঠছে প্রণবেশের।

‘আচ্ছা আর একটা জিনিস ভেবে দেখেছো? খুনির কাঁধে লম্বা ব্যাগ থাকতে হবে। নাহলে বড়ো রাইফেল হাতে নিয়ে হোটেলে ঢুকছে, রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, সেটা হয় নাকি?'

প্রণবেশ সচকিত হয়ে উঠল। ‘তাহলে তো আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, ওইদিন বড়ো ব্যাগ কাঁধে হোটেলে থেকে কাউকে বেরোতে দেখেছে কিনা!’

‘তোমার কী বুদ্ধি! হোটেলে তো লোকে থাকতেই আসে কয়েকদিনের জন্য। তাদের অনেকের কাছেই বড়ো ব্যাগ, সুটকেস, ট্রাঙ্ক এসব থাকে। এই লোকটাকে আলাদা করে কারোর চোখে পড়বে কেন শুনি? আগের বছর মেজপিসিমাকে নিয়ে কাশী বৃন্দাবন গেলাম যখন, মনে নেই তোমার? তুমি একটা নীল রঙের লম্বাটে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ঘুরছিলে!’

‘ওহ!’ হতাশ গলায় উত্তর দিল প্রণবেশ। ‘এই কারণেই আমার আর গোয়েন্দা হওয়া হলো না। বাড়িতে এত বুদ্ধিমতী বউ থাকলে আমি একদিন হীনমন্যতাতেই মরে যাব।'

ইয়ার্কি মেরো না। আরও একটা ব্যাপার। দেখো, অপরাধী সে-ই হতে পারে, ওখানে মাটিতে যার পায়ের ছাপ থাকবে। মানে আনিসুরের ঘরে। এবার আনিসুরের ঘরে কার কার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে?’

‘আনিসুরের নিজের, মাধবের, আর হোটেলে কাজ করে একটা ছেলে, যে সন্ধেবেলা জল দিতে গিয়েছিল, তার। আর যারা ঘর ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল। মানে সত্যি বলতে কী, বহু লোকের।'

‘আর-একটা পায়ের ছাপ ভুলে যাচ্ছো। পুলিশের।'

‘পুলিশ?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল প্রণবেশ।

‘কেন নয়? ঘরে তো পুলিশও ঢুকেছিল।'

‘সে তো পরে।’

‘সে তো ঘর ভেঙে যারা ঢুকেছিল তারাও পরে ঢুকেছিল। তাদের মধ্যেও খুনি লুকিয়ে থাকতে পারে। হয়তো সেই কারণেই ঢুকেছিল, যাতে মেঝেতে তার পায়ের ছাপ পড়ে। খুনের সময়ে যখন ঢুকেছিল, তখন পায়ের ছাপ ছিল। পরে আবার যখন ঢুকবে, তখন আবার পায়ের ছাপ পড়বে। ফলে আগের ছাপগুলোকেও এখনকার ছাপ বলেই মনে হবে। পুলিশের ক্ষেত্রেও তো একই কথা খাটে।

‘দাঁড়াও, গুলিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ কেন আনিসুরকে খুন করতে যাবে?’

‘কেন যাবে, কী করে বলব? শুধু মনে হলো, যাদের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে, খুনি তাদের মধ্যেই আছে। আগের ছাপকে ঢাকা দিতে আবার ঘরে ঢুকেছে। এই সম্ভাবনা কি থাকতে পারে না?'

‘তা পারে। প্রণবেশ আবার ভাবতে শুরু করল।

লতিকা উঠে পড়ল। ‘শোনো, ভেটকি মাছের পাতুরি করেছি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর কিন্তু গরম করে দিতে পারব না। এবার তুমি না উঠলে আমি খেয়ে নিচ্ছি। তুমি শুদ্ধদাকে ধ্যান করতে করতে রাত কাটিয়ে দিও।'

প্রণবেশ উঠে পড়ল। খিদে পাচ্ছে।

‘আর হ্যাঁ। শুদ্ধদাকে একদিন আসতে বলো। অনেকদিন আসেনি। রাত্রে খেতে বলবে। ওর মুখ থেকে শুনতে চাই, কী ভাবছে। বুঝলে? বলে দেবে, লতিকা জরুরি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে, কাম শার্প লিখে!'

মাঝে দিন তিনেক ব্যস্ততার দরুণ শুদ্ধসত্ত্বের বাড়ি যাওয়া হয়নি প্রণবেশের। রুগীর চাপ সামলে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতেই রাত দশটা বেজে যাচ্ছিল। আজ মঙ্গলবার। চেম্বার বন্ধ থাকে। লতিকাও গেছে আহিরীটোলাতে বাপের বাড়ি। প্রণবেশ শুদ্ধর ঘরে ঢুকে দেখল, ইজিচেয়ারে টানটান হয়ে মড়ার মতো শুয়ে আছে। মুখের ওপর একটা বই পাতা খোলা অবস্থায় উপুড় করে রাখা। প্রণবেশের পায়ের শব্দে ও ভাবান্তর হচ্ছে না। প্রণবেশ উলটোদিকের চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল, ‘বেঁচে আছো?’

‘হুঁ।’ ছোট্ট করে উত্তর দিল শুদ্ধ।

‘তাহলে বলো, এই তিনদিনে কতটা এগোলো।'

‘তোমাকে ফোন করিনি মানে বুঝতেই পারছ, গন্তব্যে এখনও পৌঁছোইনি।' বই মুখে একইভাবে শুয়ে থাকল শুদ্ধ।

‘তোমার তলব পড়েছে। আমাদের বাড়িতে নৈশাহারের। লতিকা নির্দেশ দিয়েছে, যেন অতি শীঘ্রই তোমাকে তার কাছে নিয়ে আসি। তোমার মুখ থেকে সে গল্প শুনতে চায়।’

মুখ থেকে বই সরিয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উঠে বসল এবার। হাত বাড়িয়ে প্রণবেশের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল। ‘যাওয়াই যায়। কাল না কাল নয়, পরশু যাব। আমাকে তুলে নিয়ে যেও।

‘লতিকা আমার মুখ থেকে বিবরণ শুনে অনেক কিছু প্রশ্ন করেছে। আমি নিজেও এতটা ভাবিনি।'

‘বলো শুনি। কী প্রশ্ন।

প্রণবেশ বলে গেল। শুনতে শুনতে শুদ্ধর মুখে হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠছিল। প্রণবেশ শেষ করবার পর শুদ্ধ সিগারেট জোরে টান মেরে অ্যাশট্রেতে ফেলে বলল, 'লতিকা সত্যিই মাইক্রফট্ হোমস। ঘরে বসে অর্ধেক সমাধান করে ফেলেছে।'

‘তুমি তাহলে একমত হচ্ছো ওর সঙ্গে?’

‘বিমলবাবুর মাধব আর আনিসুর নিয়ে বলা কথাগুলোর ভঙ্গিতে আমারও সন্দেহ হয়েছিল। সেই কারণে আমার বাড়ি থেকে বিমলবাবু বেরিয়ে যাবার পর বলেছিলাম যে একটা খটকা লাগছে। কিন্তু দু তরফের সংযোগটা এখনও প্রমাণ করতে পারিনি।'

‘জিজ্ঞাসা করলেই হয়। '

‘গিয়েছিলাম থানায়। মুখ তো খুললেনই না, উলটে ঠাণ্ডা ব্যবহার করলেন। আমার ধারণা, সেদিন যে আমরা তাঁর অসাক্ষাতে ভবানীবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি, তাতে চটে গিয়েছেন।'

'আর কিছু সূত্র পেলে?'

‘আনিসুরের হোটেলে পরপর দু-দিন গেছি। আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। সেই রাত্রে হোটেলের সামনের গলিতে কাউকে এরকম দেখা যায়নি, যে ছুটতে ছুটতে বড়ো রাস্তার দিকে গেছে। ছুটতে ছুটতে তো দূরের কথা, জোরেও হাঁটেনি। অন্তত কেউই তেমন কিছু মনে করতে পারেনি। ওখানে অষ্টপ্রহর বসে থাকে এক স্থানীয় বিহারি ছাতুওয়ালা। সে রামজির দিব্যি কেটে বলেছে, কাউকে ছুটে যেতে বা দ্রুত হেঁটে যেতে দেখেনি। দেখলে নাকি তার মনে থাকত। ওই গলিতে একটা বদমেজাজি কুকুর থাকে। কেউ ছুটলে বা জোরে হাঁটলেই তার দিকে তেড়ে যায়। কুকুরটা সেদিন একবারও কাউকে ধাওয়া করেনি। যদিও কারোর বয়ানই পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়। মানে, হতেই পারে যে কারোর চোখে পড়েনি। তবুও এই ক্লু-টাকে আমি নম্বর দিকে বাধ্য হচ্ছি।'

‘এ আবার কেমনধারা ক্লু?’

‘বুঝতে পারছো না? আনিসুর যে সময়তেই খুন হোক না কেন, ন-টা থেকে এগারোটা পনেরোর মধ্যে হোক অথবা এগারোটা পঁচিশ থেকে এগারোটা চল্লিশ, এই দুই সময়ের মধ্যে যে কোনো স্লটেই, যে খুন করবে তার মনের মধ্যে ধরা পড়বার ভয় থাকবে। আমরা এক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি যে অপরাধী সিঁড়ি দিয়ে উঠে আনিসুরের ঘরে ঢুকেছে এবং সেই জন্য মেইন সুইচ অফ করেছে, যদি এগারোটা পঁচিশের পরে খুন হয়। আর যদি আগের স্লটে খুন হয়, তাহলেও অপরাধীকে সিঁড়ি দিয়েই ওঠানামা করতে হয়েছে বলে ধরে নিচ্ছি। কারণ জানালার ফাঁক গলে অপরাধীর ছাদে উঠে যাওয়াটা ভারি কঠিন সমাধান লাগছে। সেক্ষেত্রে সবসময়েই এই ঝুঁকি থেকে যায় যে আশেপাশের লোকজন বেরিয়ে আসবে। সন্দেহ না করলেও হয়তো অপরাধীর মুখ দেখবে। অথবা এটুকু দেখবে যে আনিসুরের ঘর থেকে কেউ

একজন বেরোচ্ছে, যার কাঁধে একটা ঢাউস ব্যাগ। পরে পুলিশের কাছে তারা বলে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে তুমি হলে কী করতে? খুন করে যত দ্রুত সম্ভব নীচে নেমে বেরিয়ে যেতে। বেরিয়ে যাবার পরেও মনে ভয় থাকতো যে এক্ষুণি বুঝি হইচই শুরু হলো তোমার পেছনে। তুমি সেক্ষেত্রে হয় দৌড়তে, বা দ্রুত হনহন করে হেঁটে যেতে। কেন? কারণ তুমি চাইতে যেন বড়ো রাস্তায় উঠে দ্রুত ভিড়ে মিশে যেতে পারো। এবার, এই অনুমানটা রাত ন-টার আশেপাশে খুন হলে সত্যি। কারণ তখন রাস্তায় ভিড় থাকে। কিন্তু সাড়ে এগারোটায় রাস্তাঘাট শুনশান। সেখানে ভিড়ে মিশে যাবার প্রশ্ন আসে না। সেক্ষেত্রে তুমি দৌড়বে একটাই কারণে। কী কারণ?'

প্রণবেশ ভাবল। তারপর উদ্ভাসিত মুখে উত্তর দিল, 'যদি বড়ো রাস্তায় আমার মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে হনহন করে হেঁটে গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাব।'

'একদম।' ঝকমক করে উঠল শুদ্ধসত্ত্বর চোখ। 'তাহলে, যদি এগারোটা পঁচিশের পরে খুন হয়, তাহলে অপরাধী দৌড়য়নি, তার একটাই কারণ হতে পারে। সে জানে তার দৌড়বার দরকার নেই। অথবা দৌড়ে লাভ নেই।'

'কিন্তু তার কারণ এটাও হতে পারে যে সে ঘরটাকে এমন কারিকুরি করেছে যে ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই, সে জানে যে বডি এখন আবিষ্কার হবে না। তাই নিশ্চিন্তমনে হেঁটে গিয়েছে।'

'খুন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে কারিকুরি করে, সে সুতো দিয়ে ছিটকিনি তুলেই হোক, বা অন্য কিছু সেটা করতে গিয়ে এমনিতেই কিছুটা সময় তার নষ্ট হয়েছে। সে জানে সময় এক্ষেত্রে মূল্যবান, কারণ কিছুতেই তার মুখ দেখানো চলবে না। তো, এই যে খুনি কিছুটা লেট করল, তার পরেও সে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল? সে তো চাইবেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়গাটা থেকে বেরিয়ে যেতে, কারণ তার সময় চলে যাচ্ছে।'

'হয়তো দৌড়য়নি, কারণ দৌড়লে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত!'

'সেটা করলেই বা কী এমন ক্ষতি হতো? লোকে দেখতো যে অন্ধকারে একজন দৌড়ে গলি দিয়ে বেরিয়ে গেল। তুচ্ছ ব্যাপার, কেউ মনে রাখত না। বডি পরের দিন সকালের আগে বেরোতো না। ততক্ষণে তো অপরাধী পগার পার!

'এখানে একটা প্রশ্ন আছে। ধরে নিচ্ছি খুন হয়েছে এগারোটা পঁচিশের পরে। যদিও তোমার ধারণা খুন আগের স্লটে হয়েছে, তবু ধরে নাও। খুনি সেক্ষেত্রে তোমার যুক্তি অনুসারে রাস্তার লোকের দেখা নিয়ে চিন্তিত নয়। কিন্তু হোটেলের লোকের তাকে দেখতে পাওয়া নিয়ে চিন্তিত। কেন? হোটেলের লোকে যদি দেখত আনিসুরের ঘর থেকে একজন বেরোচ্ছে, বা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, তাতেই বা কী ক্ষতি হতো? বডি বেরোবার পর লোকে যদি পুলিশের কাছে এই নিয়ে মুখ খুলতও, খুনি তো ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। তাহলে মেইন সুইচ অফ করে নিজেকে লুকোতে গেল কেন?'

'এক্সাক্টলি!'শুদ্ধ সহর্ষে হাত ঘষতে লাগল। 'এটা দ্বিতীয় পয়েন্ট। রাস্তায় লোকে তাকে দূর থেকে দেখতো। যদি কোনোভাবে মুখ আড়াল করে থাকত, অতটা বুঝতে পারতো না। কিন্তু হোটেলের লোক তাকে দেখতো সামনে থেকে। তার মানে, কাছাকাছি দূরত্বে নিজের মুখ দেখানোয় খুনির সমস্যা ছিল। এগারোটা পঁচিশের পর খুন করলে ওই কারণেই মেইন সুইচ অফ করে রেখেছিল!'

'তার মানে, খুনিকে হোটেলের লোক চিনত? '

'চিনত, অথবা পরে চিনবে। যদি মাধব খুন করে থাকেন, আর তাঁকে কেউ দেখে থাকে, পরের দিন হোটেলে ঢুকলেই তো শনাক্ত হয়ে যাবেন। তাই না?'

'আর রাস্তা দিয়ে দৌড়ল না, কারণ...'

'খুনির কাছে মোটরগাড়ি ছিল না। জানতো, দৌড়ে লাভ নেই। তবে এটা হতে পারে তখনই, যদি এগারোটা পঁচিশের পরে খুন হয়। তার আগের স্লটে খুন হলে, না দৌড়বার

অনেক কারণ থাকতে পারে।'

‘কিন্তু, মাধবের কাছে গাড়ি ছিল।'

‘তাহলে এগারোটা পঁচিশের পরে খুন হলে, খুনি মাধব নাও হতে পারেন। ‘নাহ। গাড়ি না থাকার ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না হে! না দৌড়নোর অন্য অনেক কারণও থাকতে পারে।' প্রণবেশ মাথা নাড়ল ৷

‘আরও একটা কারণ থেকে অনুমান করছি, খুনির কাছে গাড়ি ছিল না।'

'কী সেটা’

‘যে সময়তেই খুন হোক না কেন, খুনি আনিসুরের চেনা ছিল এটুকু বলতে পারি। না হলে আনিসুর তাকে ঘরের মধ্যে ঢোকাতেন না। বিশেষ করে অত রাত্রে। নিজের বাইরে বেরিয়ে আসতেন। চেনা পরিচিতি থাকলে খুনির পক্ষে অনেক সহজ কাজ ছিল আনিসুরকে বাইরে বার করে এনে নিজের গাড়িতে তোলা। তারপর রাত্রের কলকাতার কোনো নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে খুন করা। আনিসুরকে কেউ চিনত না, ফলে তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে ভাবিত হতো না কেউ। একটা নিয়মমাফিক পুলিশে ডায়ারি করে রাখত। আজকাল এই রাজনৈতিক অস্থিরতার বাজারে এমনিই কলকাতার রাস্তায় কত ছেলে খুন হয়ে যাচ্ছে। এক অপরিচিত বাংলাদেশীর খুন নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না। কিন্তু তা না করে খুনি কঠিন রাস্তাটা বেছে নিল। জনবহুল হোটেলের ঘরে খুন করল, যেখানে তার ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কেন? কারণ কি এটা হতে পারে যে, আনিসুরকে হোটেলের বাইরে বার করে নিয়ে দূরে কোথাও যেতে হলে একটা নিজস্ব মোটরগাড়ি লাগত? ট্যাক্সি বা ভাড়াগাড়ি নয়। এমনকি ড্রাইভার দিয়ে ও চালানো গাড়ি নয়। কারণ প্রত্যক্ষদর্শী না রাখতে চাওয়াই স্বাভাবিক। নিজের চালানো মোটর। সেটা কি তাহলে খুনির ছিল না?’

‘গাড়ি ভাড়া করে এল না কেন?’

‘ঠিক। সেটা করতেই পারতো। কিন্তু নিজেকে চালাতে হতো, অচেনা ড্রাইভার চালালে চলবে না। খুনি যখন সেটা করেনি, তাহলে বুঝতে হবে যে সে গাড়ি চালাতে পারতো না। হ্যাঁ, এটাই ঠিক সমাধান।' শুদ্ধ উৎফুল্ল হয়ে নস্যির কৌটোর দিকে হাত বাড়াল। ‘খুনির কাছে গাড়ি থাকতেই পারে। কিন্তু সেটা ড্রাইভার চালাচ্ছিল। এবং খুনি নিজে গাড়ি চালাতে পারে না ৷

‘কিন্তু খুনি তো গাড়ি না থাকলেও অন্যভাবেও আনিসুরকে বাইরে বার করে আনতে পারতো। হয়তো রাত্রিবেলা কোথাও দেখা করতে বলত...’

‘না, পারতো না। মনে রেখো, আনিসুর ক্যান্সারের রুগি। বেশি পরিশ্রম করতে পারে না। খুনি যদি তাকে কোথাও আসতে বলত রাত্রে, আনিসুর উলটে প্রস্তাব দিতেন যে সেই দেখা করাটা তাঁর হোটেলেই হোক, যাতে তাঁর পরিশ্রম বাঁচে। আনিসুরকে একমাত্র বার করা যেতে পারতো যদি তাঁকে গাড়ি চালিয়ে, মানে তাঁর পরিশ্রম না ঘটিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো কোথাও।'

প্রণবেশ আর কোনো প্রশ্ন করতে না পেরে প্রসঙ্গ বদলাল। 'আচ্ছা, তাহলে চেয়ারের সমস্যাটার কী হলো?'

‘এটাও ভেবেছি। আনিসুরের ঘরে আবার গিয়েছিলাম। পুলিশ এখনও সিল করে রেখেছে, কিন্তু বলে কয়ে ঘর খুলিয়েছিলাম। যেটা দেখে এলাম, তা হলো টেবিলের সামনের মেঝেতে চারটে গোল গোল দাগ ৷ বহুদিন ওখানে চেয়ারটা একই জায়গাতে রাখা ছিল বোঝা যায়। তার মানে চেয়ারটাকে সম্প্রতি সরানো হয়েছিল। কে সরিয়েছিল সেটা বোঝা আর সম্ভব নয় ৷ এত লোক ওই ঘরে ঢুকেছে আর এত পায়ের ছাপ যে সব গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু আমার ধারণা, আনিসুর নিজে সরিয়েছেন। কারণ খুনির কাঁধে যদি ঢাউস ব্যাগ থাকে, তাহলে চেয়ার সরাতে গেলে সেই ব্যাগকে মাটিতে বা অন্য কোথাও রাখতে হবে, তারপর চেয়ার সরিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসল, ব্যাগ নিজের কোলে তুলল, রাইফেল বার করল এবং গুলি চালাল। পুরো সময়টা আনিসুর কী করছিলেন? তার থেকে এটা ভাবা

হয়তো অনেক সহজ যে আনিসুর যেই সময় চেয়ার সরাচ্ছিলেন, সেই সময়টায় তার পেছনে দাঁড়িয়ে খুনি সন্তর্পণে ব্যাগের চেন খুলে রাইফেল বার করছিল।'

'কিন্তু আনিসুর চেয়ার সরালেন কেন?'

'এটার একটা ইন্টারেস্টিং অনুমান আছে আমার কাছে,' শুদ্ধ সশব্দে নস্যি নিয়ে রক্তাভ চোখে তাকাল। 'কিন্তু সেটা খাটতে পারে একমাত্র যদি এগারোটা পঁচিশের পরে খুন হয়। ওই কারণেই আগের স্লটে সত্যিই খুন হয়েছিল কিনা তাই নিয়ে আমি এই মুহূর্তে দ্বিধায়।

'ধরে নাও পরের স্লটেই হয়েছিল। তাহলে চেয়ার সরাবে কেন?'

'ধরো তোমার বাড়িতে লোডশেডিং। এক অতিথি এসেছেন। ধরে নাও তুমি সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি, আর অতিথি তোমার বড়োবাবু, যাঁর ওপর এ মুহূর্তে তোমার চাকরি থাকা না থাকা নির্ভর করছে। তুমি কী করবে? তোমার প্রথম প্রতিক্রিয়াই হবে, বড়োবাবুর বসবার চেয়ারের ব্যবস্থা করা। এত বড়ো মানুষকে তো আর বিছানায় বসতে বলা যায় না। কিন্তু চেয়ারটা এখন এমন জায়গায় রাখা আছে, যেখানে অন্ধকার। তাহলে তুমি কী করবে?'

'চেয়ারটাকে নিজের হাতে তুলে আলোর জায়গায় এনে রেখে বড়োবাবুকে বসতে অনুরোধ করবে।'

'ঠিক। আর তুমি নিজে অনুগ্রহপ্রার্থীর মতো হাত কচলে হেঁ হেঁ মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে তাঁর সামনে, যতক্ষণ না তিনি বসতে বলেন।'

'এখানে তার মানে আলোর জায়গা...'

'জানালার পাশে। ওখান দিয়েই বাইরের অলো আসছিল।'

'কিন্তু তাহলে কে সেই লোক, যার সামনে আনিসুর এত বিনয়-বিগলিত হয়ে যাবেন? মাধব?'

'না। মাধব তাঁর বাল্যবন্ধু। তার ওপর মাধবকে তিনি ব্ল্যাকমেইল করছেন। মাধবের সামনে তিনি এইরকম ব্যবহার করবেন না। অন্য কেউ, যিনি পদমর্যাদায় ভারী। হয়তো যাঁকে আনিসুর ভয় পেতেন। যাঁর হাতে ক্ষমতা ছিল। এমন কেউ।'

দুজনেই কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকল। প্রণবেশ তারপর বলল, 'আর ঘরটাকে কষ্ট করে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল কেন? লতিকার অবশ্য বক্তব্য যে অপরাধী সময় বাড়াতে চাইছিল। হয়তো কিছু লুকোতে।'

শুদ্ধ প্রণবেশের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল একটুক্ষণ। তারপর বলল, 'খুনের দিন বিমলবাবু বাড়ি চলে গিয়েছিলেন সন্ধেবেলা। তাঁর ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। নাইট ডিউটিতে ছিলেন সেকেন্ড অফিসার। বিমলবাবুর ডিউটি আবার শুরু হতো পরদিন বেলা এগারোটা থেকে।'

'এর সঙ্গে আমার প্রশ্নের কী সম্পর্ক?'

'তার মানে, যদি লকড রুম না হতো, তাহলে সেদিন রাত বা পরের দিন সকালবেলাই বডি আবিষ্কার হবার সম্ভাবনা থেকে যেত। আর সেক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার হতেন বিমলবাবু নয়, সেকেন্ড অফিসার। তাই না? 'তোমার বক্তব্য কী? মানে, তুমি আর লতিকা দুজনেই একই লাইনে ভাবছ দেখছি!'

'শুধু তাই নয়, একই লোককে সন্দেহ করছি।' মৃদু হেসে উত্তর দিল শুদ্ধসত্ত্ব।

'মানে, পুরোটা বুঝে ফেলেছো?'

'উঁহু! সেটা বুঝতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। মূলত মোটিভ, আর জোড়া চিঠির রহস্য। সেটুকু বুঝলেই কাজ শেষ।'

প্রেশার কুকারের সিটির সঙ্গে মনকাড়া মাংসের সুবাস আসছে রান্নাঘর থেকে। শুদ্ধ

চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। গলায় গুনগুন গান। প্রণবেশ তার মুখোমুখি বসে আড়মোড়া ভাঙল, 'কী ব্যাপার? আজ এত খুশি যে?'

'এভারেস্টের চূড়ায় উঠবে উঠবে করছেন, এরকম সময়ে নোরগেও মনে হয় ফূর্তিতেই ছিলেন।

'তার মানে সমাধান পেয়ে গেছো?'

উঁহু! এখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পাইনি।'

লতিকা রান্নাঘর থেকে উঁকি দিল। 'শুদ্ধদা, আমার প্রশ্নগুলো তাহলে রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছে। ঠিক কিনা বলো?'

'ঠিক, ঠিক। একদম ঠিক! তুই স্কটিশের মেয়ে। আমার কলেজের ছেলেমেয়ের বুদ্ধির দৌড় খাসাই হয়। এ কি আর মেডিকেল কলেজের ছাগল চাষের কারবার রে বাপু?'

'যখন অহরহ ইনফ্লুয়েঞ্জা বাধাও কি হাঁপের টান ওঠে, তখন তো ফোনটা এই ছাগলের কাছেই আসে!' প্রণবেশ মিচকি হাসল।

লতিকা বেরিয়ে এসে বলল, 'আজ তোমার জন্য পরোটা আর রেওয়াজি খাসির ঝোল হচ্ছে। শেষপাতে লবঙ্গলতিকা আর আইসক্রিম। এরপরেও যদি মুখ বন্ধ রাখো, তাহলে বাড়ি থেকে বার করে দেবো কিছু না খাইয়ে।'

'তুই তো অনেকটাই সমাধান করে দিয়েছিস রে! নিজেই ভাবলে বুঝতে পারবি, সত্যিটা কী!'

মাধব তাহলে খুন করেননি, তাই তো?'

'সম্ভবত না।'

'আর জোড়া চিঠি? দ্বিতীয় চিঠি কেন এল?'

'ওটাই একটা খটকার জায়গা। ওটুকু কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তাই খচখচ করছে।' ভুরু কুঁচকে আপনমনে বলল শুদ্ধ।

'বন্ধ ঘরের রহস্যটা ঠিকঠাক বুঝেছো?'

নাহ্! ওদিকে আর মন দেওয়া হয়নি। মানে, কেন ঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেটা বুঝেছি। কিন্তু কীভাবে হলো, এখনও জানি না। হয়তো অপরাধীর মুখ থেকেই জানতে পারব।'

'অপরাধী কে?' প্রণবেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। 'তোমাদের কথা শুনে মাথায় তো একটাই নাম আসছে।'

শুদ্ধ প্রণবেশের দিকে ঘুরে উত্তর দিল, 'আচ্ছা প্রণবেশ, যে রাত্রে আনিসুর খুন হয়েছিলেন, সেই রাত্রেই বিমল দারোগা থানায় এসে বার বার হাত পা ধুচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল চটি। কেন জুতো নয়, চটি কেন, এই প্রশ্ন মনে আসেনি?'

'না আসেনি। আমার সঙ্গে যেন ধাঁধার খেলা খেলছো বলে মনে হচ্ছে খোলসা করে বলবে?'

'বলব বলব। আগে পরোটা মাংস আসুক।' শুদ্ধসত্ত্ব ছদ্ম গাম্ভীর্যে চোখ বন্ধ করল।

লতিকা আবার উঠে রান্নাঘরে গেল। প্রণবেশ রেডিয়ো চালিয়ে দিল। রোজ সাড়ে সাতটায় আকাশবাণীর খবর শোনা তার অভ্যেস।

'আজকের বিশেষ বিশেষ খবর কী?' শুদ্ধ চোখ না খুলেই প্রশ্ন করল। 'কত কী আছে! স্পেনের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী খুন হয়েছেন। গ্রিস ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হবার আবেদন জানিয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দিরা গান্ধির অপসারণের পক্ষে রায় দিয়েছেন। রকফেলার কমিশন সিআইএ-র বিরুদ্ধে আনা আইন বহির্ভূত কাজকর্মের রিপোর্ট পেশ করেছে...'

'ধুর ধুর রাজনীতির খবর জেনে কী করব! ইন্টারেস্টিং কিছু থাকলে বলো।'

'সেসব আর কী-ই বা থাকবে! বিকেল সাড়ে পাঁচটায় খবর শুনেছিলাম। তখন এগুলোই ছিল। এখন নতুন কিছু থাকতে পারে। ও হ্যাঁ, পার্ক স্ট্রিট থেকে নাকি কোকেন চক্রের একটা

গ্যাংকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদের কাছে দেড় কেজি কোকেন পাওয়া গেছে।'

শুদ্ধর চোখ খুলে গেছে। সটান বসে বলল, 'এই খবরটা এতক্ষণ পরে বললে? আরে এটাই তো আজকের সংবাদ! তুমি নিজে বুঝতেও পারছ না, এটার গুরুত্ব কতখানি।'

'মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল প্রণবেশ।

শুদ্ধ উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তখন লতিকা বেরিয়ে এসে বলল, 'এত গরম পড়েছে, জানালাটা খুলে দাও না গো! হাওয়া বাতাস খেলুক ঘরে।'

'উফফ, এই এক গরম হয়েছে! আষাঢ় আসতে চলল, এদিকে বৃষ্টির নামগন্ধ নেই।' বিরক্ত স্বরে বলে উঠল প্রণবেশ।

ভ্যাপসা গরমে সত্যিই কুলকুল করে ঘাম হচ্ছে। প্রণবেশ জানালা খুলে এসে খাটের ওপর বসেছে। তখন দেখল, শুদ্ধসত্ত্ব বিস্ফারিত চোখে বসে। তার মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে নিখাদ বিস্ময়। প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কী, কোকেন চক্র বিষয়ে কিছু মনে পড়েছে নাকি? '

শুদ্ধ ভূতগ্রস্তের মতো প্রণবেশের দিকে তাকালো। তারপর তাকালো লতিকার দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'সব ভুল। সব।' বলে দুড়দাড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে তিনলাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। লতিকা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল হতভম্ব প্রণবেশের দিকে। 'এটা কী হলো?'

প্রণবেশ বোকার মতো মাথা নাড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে এতই হকচকিয়ে গিয়েছে যে.......

এখানেই অমিতাভর ছিন্নোপন্যাসের ইতি

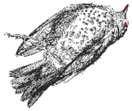

০১/১০/১৯৭৩

প্রিয় সঞ্জয়বাবু,

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে ভালো লেগেছিল, চিঠি পেয়ে আরও ভালো লাগল। এপ্রিল মাসে যখন দার্জিলিং-এ এসেছিলেন, আলাপ হলো বিকাশের বাড়ি, তখনও জানতাম না ফাঁসিদেওয়ার কবিসম্মেলনে আপনি থাকবেন। আপনিও যে সাহিত্যপাগল মানুষ, জেনে ভালো লেগেছিল খুব। আপনাদের যেরকম কাজ, তাতে সুদূর মফস্বলের টিমটিমে কবিতামেলাকে গুরুত্ব দেবার দরকার পড়ে না। কিন্তু সেদিন সারারাত আড্ডা মেরে বুঝেছিলাম, আপনার মধ্যে যে মানুষটা লুকিয়ে আছে, তার ডাকনাম পাঠক।

এবার চিঠির প্রসঙ্গে আসি। আমাকে এবং আমাদের নিয়ে আপনি, খবর করতে চাইছেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু যেটা আশঙ্কার বিষয়, তা হলো একটা বাণিজ্যিক কাগজ আমাদের সাহিত্যপ্রয়াসকে কতটা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখাতে পারবে। কারণ খুব স্পষ্ট ভাষায় বলছি, সত্তর দশকের প্রথম এই তিন বছরে বাংলা কবিতা যেটুকু লেখা হয়েছে তাদের যদি আলোচনা করতে যান, আপনি নকশাল আন্দোলনকে বাদ দিয়ে তা করতে পারেন না। কিন্তু বিগ হাউসের মুনাফাধন্য সংবাদমাধ্যম নকশাল আন্দোলনকে কতটা দেখাবে, রাষ্ট্রীয় অত্যাচারে নিহত অসংখ্য কর্মী, যাদের মধ্যে অনেক কবি ও আছেন, তাদের চালচিত্রে কতটা আজকের কবিতাকে স্থাপিত করবে, আমার সন্দেহ আছে। আপনি কিছু মনে করবেন না, কারণ আপনাকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে এ কথা বলিনি। কিন্তু যখন দেখতে পাচ্ছি তিমিরবরণ, মুরারি মুখোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায় বা দ্রোণাচার্যদের নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না আমাদের বড় সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাধন্য কবি লেখকের দল, তখন সন্দেহ দৃঢ়তর হয়। তিমির বা মুরারি কত বড় কবি ছিল, সদ্যতরুণ তুষারকান্তি চৌধুরী বা অনন্য রায় বা জয় গোস্বামী (অনন্যসাধারণ কবিতা লিখছে তিনজনেই, বলার অপেক্ষা রাখে না, এবং প্রত্যেকেরই খুব তাড়াতাড়ি বই হবে, এই আশা রাখি। শুধু তাই নয়, তুষারকান্তি এবং সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, দুজনে মিলে স্থানাংক নামের একটা উচ্চাঙ্গের লিটল ম্যাগাজিন বার করেছে এই বছরে, যার প্রথম সংখ্যা পড়ে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকছে না), এদের তুলনায় তারা প্রতিভাবান নাকি শুধুই উচ্চকিত স্লোগানের কবিতা লিখে গিয়েছে এসব প্রশ্নই আজ অপ্রাসঙ্গিক, এবং প্রশ্নকর্তার অভিসন্ধি বিষয়ে সন্দিহান করে দেয়। চারজন কবি একটা আন্দোলন করতে গিয়ে আগে পরে নিহত হয়েছে, এবং তাদের সঙ্গে খুন হয়েছে আরও কয়েক হাজার যুবক, অথবা নিখোঁজ হয়েছে, এক কবি ও সম্পাদককে ময়দানে গলা কেটে খুন করা হয়েছে, খোদ আমার জেলাতে কৃষক ইউনিয়ন বা চা-বাগানে স্ট্রাইক করবার অপরাধে গুম করে দেওয়া হয়েছে একের পর এক রাজনৈতিক কর্মীদের। এদের প্রভাব যদি বাংলা কবিতায় সর্বাধিক না হয় তাহলে সে ভাষায় আমি লিখি না এবং লিখতেও চাই না। যদি সব্যসাচী দেব, সমীর রায়, নবারুণ ভট্টাচার্য অথবা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাকেও উড়িয়ে দিতে হয় যথেষ্ট কবিতা হলো না বলে, তাহলে আমিও কিছু লিখি না, পুরুলিয়ার সৈকত রক্ষিতও কিছু লেখে না, এমনকি গল্প লিখতে পারেন না সুবিমল মিশ্রও, এ কথা মানতেই হবে। আর যদি আমাদের লেখালেখিকে মান্যতা দিতেই হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করলে চলবে না। প্রশ্ন হলো, আপনার কাগজ সেটা কতটা পারবে?

প্রশ্ন করছি কারণ আমরা দেখেছি ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং শরণার্থীর আগমন নিয়ে যত যত লেখা হয়েছে সংবাদপত্রে, লিখেছেন আমাদের প্রতিষ্ঠিত কবি লেখকরাই, তার সিকির সিকিও এই নিহত ছেলেমেয়েদের নিয়ে লেখা হয়নি। মাত্র

কয়েকদিন আগে পাবলো নেরুদা মারা গেলেন, অথচ সংবাদপত্রগুলো নীরব। শুনতে পাই, ওদের দেশে নাকি নেরুদার শেষযাত্রা ব্যাপক একনায়কবিরোধী বিক্ষোভের রূপ নিয়েছে। কিন্তু অত বড় কবি হয়েও শুধুমাত্র কমিউনিস্ট হবার অপরাধে নেরুদাকে নিয়ে দায়সারা কয়েকটা লাইনের বেশি খরচ করে না আমাদের কাগজগুলো। এই যাদের দায়বদ্ধতা, তারা কতটা পারবে আমাদের লেখালেখিকে সৎভাবে তুলে ধরতে?

সত্যি বলতে কী, দিনে দিনে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে লিখে ফিখে কিছু হয় না। নাহলে বড় কাগজের উল্টোদিকেই দাঁড়িয়ে অবাণিজ্যিক লিটল ম্যাগাজিনগুলো ভরে উঠেছে নিহত ভাই-বন্ধুদের নিয়ে কবিতায়। শ্রীরামপুরের তরুণ কবি মৃদুল দাশগুপ্তর লেখা আপনি পড়েছেন? বিপুল চক্রবর্তী, অতনু চট্টোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিয়মিত পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছেন লিটল ম্যাগাজিনে, এই বিষয় নিয়ে। বরানগর, কাশীপুর, সাঁইথিয়া, খড়িবাড়ি শুধু লাশ গুনতে গুনতে পচে যাচ্ছে আমাদের কবিজন্ম। তার মানে, কোনো কবিতা, কোনো সৎসাহিত্য বিন্দুমাত্রও কিছু পরিবর্তন করতে পারে না, সে যতই আমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি না কেন। তাই সংকটটা দ্বিবিধ। সমসাময়িকতা না মানলে কবিতাকে ধরা যাবে না, এদিকে কবিতা দিয়ে সমসাময়িকতার কিছুমাত্র বদল হয় না। তাহলে তো আপনারা বলবেন জেনেরিক কবিতা লেখাই ভালো। মানে যার মধ্যে রাজনীতি সমাজ ইত্যাদি থাকলেও তা এতই ব্যাপ্ত যে যুগে যুগে সত্য। হতে পারে, আমি ঠিক জানি না। লিখে আদৌ কতটা কী হয়, জানি না।

তা বলে আবার আমাকে কমিউনিস্ট ভেবে বসবেন না যেন! এদের আন্দোলন, এদের দাবী, এগুলো আমি বুঝি না। যেটুকু বুঝি, একটা সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তি যেখানে অসংখ্য ছেলেমেয়েকে গায়ের জোরে খুন ও গুম করছে, তার বিরুদ্ধে কথা বলবার ক্ষমতা যদি নাও থাকে, অন্তত পক্ষে যেন কথা না বলি। অন্তত যেন নিজের অভিজাত নিরাপদ কোটরের মধ্যে ঢুকে শীলিত বাজারী গোয়েন্দা গল্প লিখে নিজের কেরিয়ার না বানাই। এটা বলবার জন্য আমাকে কমিউনিস্ট হতে হয় না। এমনকি কোনো ধরনের সংগঠিত রাজনীতিকেই আমি সন্দেহের চোখে দেখি। কিন্তু নর্দমার ধারে লাশ হয়ে শুয়ে থাকল আমার যে বন্ধু, তার স্মৃতি যদি আমাকে তাড়িত না করে, যদি তাকে অগ্রাহ্য করে প্রেম যৌনতা পরকীয়া ও ডিটেকটিভ গল্পের দো-আঁশলা মডেলে স্বমেহন করি আর বলে বেড়াই যে রাজনীতির কথা লিখতে আমার সতীত্বে নিউমোনিয়া ধরবে, তাহলে তার থেকে বড় অন্যায় এ মুহূর্তে আর কিছুতে নেই। সেটুকু মোহমায়া আমাকে যেন কখনো না ধরে। এর বাইরে, আপনি আমাকে যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু শর্ত হলো, আমি যা উত্তর দেব সেগুলোকে ছাপতে হবে। পারবেন? আপনার সদিচ্ছা নিয়ে আমার প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন আপনার কাগজের পলিসি নিয়ে।

ভুল বুঝবেন না। আমার ভালোই লাগছে যে এত বড় কাগজে আমাদের লেখালেখি আপনি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করবেন।

এদিকে আবার কবে আসছেন? এবার আপনাকে কালিম্পঙের গ্রামের সাইডে নিয়ে যাব। এখানকার দেশী মদ আর ঝাল মাংসের পিঠে খাওয়াবো। চলে আসুন তাড়াতাড়ি। পাহাড়ি গ্রামে কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটিয়ার ওপর বসে মদ খেতে খেতে সারারাত আড্ডা আর কবিতা পড়ার সুযোগ যদি হাতছাড়া না করতে চান।

অমিতাভ মিত্র

ভালো কথা, জামশেদপুরের কমল চক্রবর্তীরা 'কৌরব' নামের একটা লিটল ম্যাগাজিন বার করছে। ওরা চাইছিল সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা লেখা। আপনি লিখবেন? তাহলে ওদের বলবো আপনার সংগে কথা বলে নিতে।

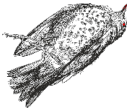

অস্ত্র আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে বহুদিন নীরব
অস্ত্রের নীরবতায় অস্ত্রের গায়ে আমরা পেলাম মরচে
মরচে পড়া অস্ত্র নিয়ে আমরা এইবার ঘাস কাটি-
চলো

—নির্মল হালদার

বহুদিন জলে ডুবে থাকার পর দুম করে যদি মাছকে ডাঙায় তোলা হয় তাহলে অপ্রত্যাশিত সূর্যালোকে তার নাকি চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। জলের অভাবে নয়। আকস্মিক অভিঘাতে। সকালবেলা সিনক্লেয়ারের লাউঞ্জে বসে কফি খেতে খেতে মনে হচ্ছিল, অন্ধকার জলের নীচে কয়েক যুগ কাটাবার পরে হঠাৎ আমাকে মাটিতে আছড়ে ফেলা হয়েছে, আর আমার চোখের ওপর ঝলসাচ্ছে একটা হাজার ওয়াটের বাল্ব। নিজেকে বারবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে, আমি কি এতটাই একচক্ষু যে অন্য কোনো সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখবার কথা এতদিন মাথাতেও এল না?

কাল ড্যানিয়েল লামা ফোন রেখে দেবার পর উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না। যে মানুষটা সমাজবিচ্ছিন্ন এক নিভৃতচারীর দিনযাপন করেন, কারোর সঙ্গে মেশেন না, বাড়ির বাইরে বেরোন না, সেই তিনিই আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন। তাঁর বাড়ি যেতে চেয়েছিলাম। ড্যানিয়েল বললেন তিনি সকালবেলা সিনক্লেয়ারে আসবেন। ফোন রাখবার আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তাঁর, এই মতপরিবর্তন। ড্যানিয়েল কড়াভাবে জানালেন যে আমার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব বোঝাপড়া আছে।

ফোনের পর অমিতাভর উপন্যাসটা ধরে শেষ করলাম। আর অপ্রত্যাশিত আঘাতটা পেলাম তখনই। যে ধারণা মনের মধ্যে নিয়ে ঘুরছিলাম, যে মাধব রক্ষিতই খুন করেছেন, সেটা চুরমার হয়ে গেল। তারপর আবার প্রথম থেকে উপন্যাসটা পড়লাম। পরপর দুইবার। উপন্যাসের ভেতর পাতায় পাতায় যে এত ক্লু ছড়ানো, আমার অলস চোখ সেগুলোকে গত চারদিন ধরে এড়িয়ে গিয়েছিল কীভাবে? কীভাবেই বা গোটা গল্প থেকে বিমলবাবুকে ভুলে থাকলাম? গল্পটা তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, যা দেখাবার। বিমলবাবুই যে অপরাধী, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন নয়। কঠিন হলো, কীভাবে তিনি খুনটা করলেন, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রহস্যগুলোর সমাধান। তাহলে কি এ পর্যন্ত যা যা ভেবে এসেছি, সব ভুল? আবার নতুন করে ভাবতে হবে? কারণ এই উপন্যাস আর বাস্তবের অপরাধ, এই দুটোর মধ্যে আশ্চর্য মিল! অমিতাভ মিত্র কি সত্যিই ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন? এই মিল কাকতলীয় হলেও, বড্ড বেশি চোখে পড়ার মতো।

মিল কি শুধুই মাধব আর আনিসুরের বিবরণে? অমিতাভ আর অরুণ, আনিসুর আর মাধব। একজনের খুনের দায় চাপল অন্যের ঘাড়ে, কিন্তু অ্যালিবাইকে ভাঙা গেল না। কিন্তু শুধু সেটুকুতেই তো মিল আবদ্ধ নেই! পাতায় পাতায় মিল। বাস্তব এই গল্পকে শিকারির মতো পিছু পিছু ধাওয়া করে গিয়েছে। হত্যাকারী কি অসমাপ্ত উপন্যাসটা পড়েছিল?

মোবাইল খুলে সময় দেখলাম। আটটা বাজতে পাঁচ। আর তখনই সিনক্লেয়ারের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন এমন একজন, যিনি নিজের পরিচয় না দিলেও গোটা পৃথিবী সুতীব্র চিৎকারে জানিয়ে দিতে পারে, ইনিই ড্যানিয়েল লামা।

রিপোর্ট অনুসারে, ড্যানিয়েলের বয়স এখন পঁচাশি। অমিতাভ-কাণ্ডে জীবিত সাক্ষীদের মধ্যে প্রবীণতম। সেই বয়স জানান দিচ্ছে মুখের কুঁচকে থাকা চামড়া, চোখের কোণার ভাঁজ,

ধবধবে সাদা চুল ও গোঁফ, এবং হাতের লাঠি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার বাইরে যেটুকু পড়ে থাকে, সেটাকে বয়স দিয়ে মাপা যায় না। যখন হেঁটে আসছিলেন, মনে হচ্ছিল হোটেলের করিডর একটা স্টেজ, আর তার মধ্যে দিয়ে সম্রাটের ভূমিকায় অভিনেতা হাঁটছেন। নিখুঁত সাহেবি বহিরঙ্গে ছাই রঙের টি-শার্ট এবং আকাশি জিনস। হাতের লাঠিটা সম্ভবত শোভা বাড়াবার জন্যে, কারণ হাঁটাচলায় কোনোরকম বার্ধক্যের ছাপ চোখে পড়ল না। ঠোঁটের কোণ থেকে পাইপ ঝুলছে অবহেলায়। সেটা যে চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী, ধরার কায়দা থেকে পরিষ্কার। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ সরু করে দাঁড়িয়ে পড়লেন, এবং চোখের ভেতর বহুদিনের সযত্নলালিত অভ্যাসের চিহ্ন হিসেবে একটা ক্রূরতার ছাপ যে পাকাপাকি থেকে গিয়েছে, সেটা লুকোবার কোনো চেষ্টাই নেই।

লাউঞ্জে সেই দম্পতি বাচ্চা ছেলেটির সঙ্গে একপাশে বসে প্রাতরাশ করছিল। মহিলা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। এখন ড্যানিয়েলকে দেখে স্বামীকে কনুইয়ের খোঁচা মারলেন। ভদ্রলোক বেচারি শীর্ণ, টাকমাথা, নিতান্তই ভালোমানুষের মতো মুখ। তিনি কিছু না বুঝে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন আমাদের দিকে।

ডানিয়েল আমার দিকে এগিয়ে এলেন। সাহেবি উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন, 'তনয়া ভট্টাচার্য, রাইট? '

উঠে করমর্দন করলাম। ড্যানিয়েলকে অনুরোধ করলাম ব্রেকফাস্ট করতে। ড্যানিয়েল হাত নেড়ে না জানালেন। নিজের জন্য অর্ডার দিলেন আর্ল গ্রে। তারপর ঠোঁটের পাইপ নামিয়ে আবার সরু চোখে তাকালেন, 'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন কেন?'

বিশদে নিজের আসার কারণ বললাম। গতকালের রামবীর হত্যার কথাও বাদ দিলাম না। শুধু বাড়িটার সঙ্গে অমিতাভর যে কোনো রকম সম্পর্ক ছিল, সেটা চেপে গেলাম। পুলিশকে এই কথা জানাইনি। কাজেই ড্যানিয়েলকে এখন বললে, যদি তিনি পুলিশকে বলে দেন, পুলিশের আবার নতুন করে সন্দেহ তৈরি হবে।

'আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আপনার ভার্সনটা শুনতে চাই। তার থেকেও বড়ো কথা, যে জায়গাগুলোতে খটকা লাগছে, সেগুলো পরিষ্কার করতে চাই। যেমন, খুনের দিন রাত্রিবেলা আপনি থানায় গেলেন কেন। কেন ধনরাজ গম্বুর হাত থেকে তদন্ত নিয়ে নিলেন, আর দশ দিন পরে কেনই বা আপনাকে কেস থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।'

'আমি এসব ভুলে গিয়েছি। দিজ ড্যাম টাউন ডাজ নট ডিজার্ভ মি। আমিও তাই এদের সবাইকে পরিত্যাগ করেছি। এখন এসব প্রশ্নের কোনো মানে নেই আমার কাছে।' গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন ড্যানিয়েল।

'তাহলে আজ দেখা করতে এলেন কেন? কেনই বা বললেন যে আমার সঙ্গে আপনার কিছু বোঝাপড়া আছে?' হাসার চেষ্টা করলাম।

'এসেছি এটা দেখতে যে আপনি ভুল পথে কতদূর হেঁটে গিয়েছেন!'

'মানে?'

'মানে এটাই, নিজেকে যতই বুদ্ধিমান ভাবুন না কেন, আপনি স্টুপিড মহিলা টিকটিকি সাজার অভিপ্রায় আপনার মতো বহু অকর্মণ্যের মধ্যে আমি এর আগেও দেখেছি। কিন্তু সত্যিটা হলো যে আপনি কিছু জানেন না, কিছুই বোঝেন না। পাইপে আবার অগ্নি-সংযোগ করতে করতে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন ড্যানিয়েল।

নিজেকে শান্ত করলাম। প্রথমেই উত্তেজিত হয়ে সংঘাতের রাস্তায় গেলে ড্যানিয়েলের মুখ থেকে কোনো কথাই বেরোবে না।

'মিস্টার লামা। আমি আমার ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে একটা স্টোরি করতে এসেছি শুধু। আর কিছুই না। তদন্ত করছি না, গোয়েন্দাগিরিও না। আমার পাঠকের স্বার্থে কিছু প্রশ্ন করতে হয়েছে। এবার সেগুলোর উত্তর যদি না মেলে, আমাকে সেই প্রশ্নগুলোকেই খোলা অবস্থায় তাঁদের সামনে উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু সেট করার আগে আমি তো চাই বই যতগুলোর সম্ভব যেন উত্তর পাওয়া যায়, তাই না? হতেই পারে আমি কিছু জানি না, এবং সম্পূর্ণ ভুল

রাস্তায় হাঁটছি। সেক্ষেত্রে ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করতে পারি কি?'

ড্যানিয়েল আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর একটা হিমশীতল হাসি উপহার দিলেন, যেটা দেখে বুঝলাম কেন এই ভদ্রলোক সত্তর দশকের টেরর ছিলেন। দুই ঠোটের ফাঁক দিয়ে শ্বাপদের দাঁত বেরিয়ে এল, আর চোখদুটো সেই অনুপাতে সেজে উঠল নির্মম। যখন পুলিশে ছিলেন, সন্দেহ নেই এই হাসি দেখে সন্দেহভাজন অথবা অপরাধীদের মনের অবস্থা কীরকম হতো। আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা গুবরে পোকা হেঁটে হেঁটে ওপরের দিকে উঠছিল। সোজা চোখে মুখ একটুও বিকৃত না করে তাকিয়ে থাকলাম ড্যানিয়েলের দিকে।

'আপনি ঋষি রোডে গিয়েছেন। একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকেছেন। সেখানে একটা ডেডবডি দেখেছেন। সেই মার্ডার আপনি নিজেও করতে পারেন। সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। কিন্তু চোখের সামনে রক্ত দেখার পরেও হাতে গল্প নেই বলছেন?'

'নেই। আমার সামনে প্রশ্ন আছে। ধাঁধা আছে। জট আছে। কিন্তু সমাধান নেই। কিছুটা অন্তত সমাধান না থাকলে এই গল্প অসম্পূর্ণ।'

'আপনারা সকলে গল্প খোঁজেন।' আবার শ্বাপদের হাসি হেসে উঠলেন ড্যানিয়েল। 'আর সেটা খুঁজতে খুঁজতে সত্যিটার থেকে দূরে চলে যান। যেমন এখন যাচ্ছেন।

'তাহলে আমাকে বলুন, সত্যিটা কী! অরুণ চৌধুরী বলেননি। ক্রমাগত ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। আপনিও কি....

'অরুণ চৌধুরী!' অস্ফুটে বললেন ড্যানিয়েল। তাঁর হাসি মুছে গেল এবার। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা তেতো ভাব। ঠোঁট বেঁকে গেল। 'আশির দশকে যখন গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন থেকে আনরেস্ট ছড়ালো পাহাড়ে, প্রচুর বাঙালি পরিবার সমতলে নেমে গিয়েছিল। অরুণ যায়নি। হুমকির মুখেও বাড়ি ছাড়েনি। দ্যাট অরুণ! সেলিব্রেটেড রাইটার! আপনিও সেই বাইরের জৌলুশটা দেখেই মাথা ঘুরিয়ে ফেললেন। স্বাভাবিক। তবে শেষ দান এখনও বাকি।'

'বুঝলাম না। আপনার দাবিটা কী, মিস্টার লামা?'

'এই অমিতাভ মিত্রর হত্যা, বা পরের কোনো ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

'আপনি তদন্তকারী অফিসার ছিলেন, আর আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই বলছেন?

'না, নেই। আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' ড্যানিয়েলের গলা নিজের অজান্তেই চড়ে গেল।

'কিন্তু কেন? আপনার মতো এরকম দক্ষ অফিসারকে সরিয়ে অধস্তনের হাতে কেন কেস তুলে দেওয়া হলো?'

'সেটা ডিপার্টমেন্টকে প্রশ্ন করুন, কেন। কারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাকে বলির পাঁঠা বানিয়েছিল, খোঁজ নিন। আমার হাতে যদি থাকতো, অরুণকে গুলি করে মারতাম। আমি জানি, খুনটা ও করেছে।'

'তদন্তের আগেই মেরে দিতেন? যেরকম প্রচুর ছেলেকে মেরেছিলেন?' না চাইলেও মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

খুলে গেল চেপে রাখা আগ্নেয়গিরির মুখ। ড্যানিয়েল এতক্ষণ নিজেকে সংযত করছিলেন বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু এবার আর পারলেন না। আমার দিকে ঝুঁকে জ্বলন্ত চোখে হিসহিসে চাপা গলায় বললেন, 'হাউ ডেয়ার ইউ! আপনার সাহস হয় কী করে আমার ডিউটি নিয়ে প্রশ্ন তোলবার?

'আমি...'

'মিস ভট্টাচার্য, আপনি অলরেডি একটা খুনের মামলায় ফেঁসে আছেন। যদি এখান থেকে একটা আঙুল নাড়ি, আপনার কেরিয়ার বরবাদ করে দিতে পারি। আমার অতীত নিয়ে খোঁচা মারছিলেন না? হ্যাঁ, আমি মেরেছি। আমাকে আর্মস দেওয়া হয়েছিল মারবার জন্যই। যত

দরকার ছিল, তার থেকে বেশিই মেরেছি। আর এখনও সেই... এই শাট আপ!'

শেষের কথাটা প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে বললেন ড্যানিয়েল। চমকে উঠে দেখলাম, সেই দম্পতির বাচ্চাটা একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে আমাদের টেবিলের কাছে এসে ক্যাড়ক্যাড় করে চালাচ্ছিল। ড্যানিয়েল তাকেই ধমকাচ্ছেন। এক লহমায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল হোটেলের লাউঞ্জ। বাচ্চাটা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বোবা চোখে ড্যানিয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার মা তাড়াতাড়ি এসে ছেলেকে টেনে নিয়ে গেলেন। একবার পেছন ফিরে আমার দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা আর অভিযোগ। চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না, কারণ এতটাই অবাক হয়েছিলাম যে কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না।

লাউঞ্জের অন্যরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ড্যানিয়েল নিজেও সম্ভবত বুঝেছেন যে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলেছেন। পাইপটা বিরক্তভাবে টেবিলে ঠক করে নামিয়ে রাখলেন। 'সরি। আমি একটানা যান্ত্রিক শব্দ নিতে পারি না ছোটোবেলা থেকেই। নার্ভের সমস্যা।'

এরকম অস্বস্তিকর একজন মানুষের সামনে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। নিজেকে সামলে নিয়ে ফোনের রেকর্ডার অন করলাম। 'আপনাকে কি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

ড্যানিয়েল আবার গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। সম্ভবত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলবার জন্য নিজের উপরে কিছুটা বিরক্ত। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমার যেটুকু কথা আছে, বলে চলে যাব। রেকর্ড করে লাভ নেই। নিজেই লিখে নিতে পারবেন। আমাকে কেস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কারণ আমি থাকলে অনেকের অসুবিধে হতে পারত। আর অরুণ চৌধুরীই এই খুনটা করেছে। আপনি কেস ফাইল পড়লেন, কিন্তু আসল খটকাগুলো হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে। চোখে পড়লে এতদিন এখানে বসেও থাকতেন না। সে যাই হোক। আপনার প্রোফাইল থেকে ভেবেছিলাম হয়তো সত্যিটা বার করতে পারবেন। কিন্তু আপনারই চোখের সামনে আর একটা হত্যা হয়ে গেল, এবং সম্ভবত আবারও নিরপরাধ একজন মানুষ তার জন্য শাস্তি পাবে। আপনি কিস্যু করতে পারবেন না। আজ শুধু এই কথাটা বলব বলেই এসেছিলাম, ইউ ডিজঅ্যাপয়েন্ট মি।' শেষ কথাগুলো বলার সময়ে এক ধরনের হতাশা ঝরে পড়ল ড্যানিয়েলের গলা থেকে। ক্রোধ নয়, বিরক্তি নয়, নিখাদ হতাশা।

'নিরপরাধ মানুষ শাস্তি পাবে, কেন এই কথা বলছেন মিস্টার লামা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। 'কেউ তো ধরাই পড়েনি এখনও।'

ড্যানিয়েল উত্তর না দিয়ে উঠে পড়লেন। চেয়ার সরিয়ে বেরোতে যাবেন, তখন মনে পড়ল কথাটা। 'মিস্টার লামা!'

ড্যানিয়েল ফিরে তাকালেন।

'অমিতাভর খুনের রাত্রে আপনি যখন থানায় এসেছিলেন, আপনার পায়ে চটি ছিল কেন?'

ড্যানিয়েল ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, 'আমি ভুল ভেবেছিলাম। আপনি কখনোই সেই শেষ ঘোড়া নন, যার ওপর সর্বস্ব বাজি রাখা যায়।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে ড্যানিয়েল একটা জিপে উঠলেন। কাচের ওপাশ থেকে দেখতে পেলাম, জিপের চালকের আসনে বসে গিরিরাজ। সেই গিরিরাজ, যাকে আসার দিন সন্ধেবেলা শহরের বাইরে দেখেছি। সেও আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এবং দৃষ্টি থেকে চুঁইয়ে পড়ছে ঘৃণা।

পুলিশ লাইব্রেরির কার্ড সকালবেলাই আনন্দ পাঠক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুপুর পর্যন্ত কেটে গেল লাইব্রেরিতে। বিভিন্ন রিপোর্ট পড়লাম, নোটস নিলাম, ছবি তুললাম। যা যা অনুমান করেছিলাম, অনেক কিছু বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে মিলে গেল। তারপর গেলাম থানাতে। আমাকে আর অরুণকে আলাদা আলাদা ভাবে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সেই জন্য আজ সময় দেওয়া হয়েছিল। মাঝে অফিসে ফোন করে আবার বললাম, এই শহর

ছাড়বার প্রয়োজনীয় অনুমতির যেন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হয়। নাহলে এখানেই আটকে থাকতে হবে কতদিন কেউ জানে না। কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যেও মাথার পেছনে অস্বস্তিটা থেকেই গেল। ড্যানিয়েল লামা আমার ওপর বাজি রাখার প্রসঙ্গ তুললেন। কে বাজি রাখবে? তাঁকে সরিয়ে কাদের স্বার্থসিদ্ধি হয়েছিল? আর যেটা অস্বস্তিকর, আমি একবারও জানতে চাইনি অমিতাভকে কে মেরেছিল। ড্যানিয়েল একাধিকবার জোর দিয়ে অরুণ চৌধুরীর নাম করে গেলেন। তাহলে কি অমিতাভর উপন্যাসেই লুকিয়ে আছে সূত্র? যে সত্যিটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন অমিতাভ মিত্র, সেই একই সত্যি বাস্তব জীবনেও খেটে গিয়েছিল, এ প্রায় কাকতলীয় হয়ে যাচ্ছে। উপন্যাস, আর বাস্তব। অপরাধের যদি সাদৃশ্য থাকে, সমাধানের কেন থাকবে না? বিমলবাবু যদি অপরাধী হন, ড্যানিয়েলও কি অপরাধী? কিন্তু এতগুলো না মেলা প্রশ্নের উত্তর কী করে মেলালেন ড্যানিয়েল?

বামে কেভেন্টার্স ডানদিকে প্ল্যান্টার্স ক্লাবকে পিছনে ফেলে উঠে এলাম ম্যালের দিকে লাঞ্চ করতে। থানার জিজ্ঞাসাবাদ সুষ্ঠুভাবেই মিটেছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল সাবধানে কথা বলা দরকার। যেহেতু কিছু তথ্য চেপে গিয়েছি, তাই আগের বলা কথার সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য থাকে।

আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শেষ দুপুরে ম্যালে এখন রং-বেরঙের ছাতার মেলা। ভুটিয়া এবং নেপালি একঝাঁক উজ্জ্বল শিশু লাফালাফি করছে গোটা চত্বর জুড়ে। দূরে গভর্নর হাউস আধা কুয়াশার ভেতর দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছে উঁকি দেবার। একটা মনমরা আলো মেঘ ছিঁড়ে ফুটিফাটা হয়ে সারা ম্যাল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম একটা দিনে হয়তো ভেবেছিলাম হাতের কাজ কমলে অক্সফোর্ড বুক শপে চলে যাব। সারি সারি পেপারব্যাক আর হলদে হয়ে আসা পুরোনো বইদের সঙ্গে কাটিয়ে দেব ঝিমধরা বিষণ্ণ দুপুর। কিন্তু লাঞ্চ করেই ছুটতে হবে মৃত্যুঞ্জয় সোমের বাড়ি। মৃত্যুঞ্জয় সোম, সদর আদালতের উকিল। অরুণ চৌধুরীর বন্ধু। আনন্দ পাঠক এঁর ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছিলেন। আমাকে বিকেল পাঁচটায় সময় দিয়েছেন।

একটা ছোটো চাইনিজ রেস্তোরাঁতে বসে কী মনে হতে সিদ্ধার্থকে ফোন লাগালাম। একটা প্রশ্ন কাল থেকেই মনে উঁকি মারছে।

দুইবার রিং হতে তুলে নিল সিদ্ধার্থ। ‘বলুন।’

‘অপ্রাসঙ্গিক লাগতে পারে, তবু জিজ্ঞাসা করছি। আপনি বলেছিলেন, অরুণের ঊনত্রিশতম জন্মদিনে বাবলা-সর্পগন্ধার চারা এনে দিয়েছে। এটা কি ঊনত্রিশ বছরের জন্মদিন না কি ঊনত্রিশ থেকে তিরিশে পা রাখার দিন?’

‘দুটোয় তফাত কী?’ বিস্মিত স্বরে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল।

‘জন্মের দিন, মানে ১৯৪৭ সালের ১৮ মে প্রথম জন্মদিন হিসেবে গণ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে ঊনত্রিশতম জন্মদিন হয় ১৯৭৫ এর ১৮ মে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে জন্মদিন হয় ১৯৭৬—এ। আপনি কোনটা মিন করেছিলেন? আমরা দুটোকে খুব গুলিয়ে ফেলি।'

জানি না, কাকাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এতদিন আগেকার কথা, তারও মনে থাকলে হয়! কিন্তু কেন?’

‘এমনিই। কোনো কারণ নেই। খুবই বোকা ব্যাপার। আচ্ছা, এই বাবলা, এর তারপর কী হলো? আর ফিরে আসেনি বলেছিলেন তো।'

‘অনেক পরে একবার এসেছিল। বাবলা চলে যাবার বেশ কিছুদিন পর কাকা ওর গ্রামে গেছিল। দেখা হয়নি। বাবলা ততদিনে কাজ জুটিয়ে আসানসোল চলে গেছে। কাকা কিছু টাকাপয়সা দিয়ে আসে ওর বাড়িতে। তারপর, সেটা মনে হয় দু-হাজার দুই কি তিন, আমি পুজোর ছুটিতে কাকিমার সঙ্গে এলাহাবাদ ঘুরতে গেছিলাম কাকিমার বাড়ি। দার্জিলিং ফিরে শুনলাম, বাবলা এসেছিল দেখা করতে। আসানসোলে থকে তখন। বয়স হয়ে গেছে, বিয়ে-থাও করেছে। তবুও কীসের এক টানে কাকাকে দেখতে আবার দাজিলিং এসেছিল। কুকুরটার ওপরেও টান থাকতে পারে হয়তো। বাগানে ওই গাছের নীচটায় অনেকক্ষণ

দাঁড়িয়েছিল। কাকা বলেছিল, বউ বাচ্চা নিয়ে চলে আয়, আমার কাছে থাকবি। তখন বাড়ির কাজ করত যে ছেত্রীদা, সে কাজ ছেড়ে চলে গেছিল। বাবলা ফিরে এলে সুবিধেই হতো। কিন্তু বাবলা থাকতে চায়নি। সংসারী হয়ে যাবার পর দুম করে ওভাবে শেকড় ওপড়ানো কঠিন।'

'ওহ, আচ্ছা ঠিক আছে।'

'কী ব্যাপার বলুন তো? '

'কিছুই না। আজ সন্ধেবেলা ফ্রি থাকলে দেখা হবে। ড্যানিয়েল লামা এসেছিলেন, হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম আপনাকে। কয়েকটা খটকা লাগল কথাবার্তা শুনে। একবার আলোচনা করে নিলে ভালো হতো। যদি হাতে কাজ না থাকে তো জানাবেন। এখন রাখি। লাঞ্চ করছি। আবার ছুটতে হবে।'

লেবঙের দিকে যাবার রাস্তায় মৃত্যুঞ্জয় সোমের বাড়ি। মদনদা সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, কারণ কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। পেছনের সিটে মাথা হেলিয়ে বসে ভাবছিলাম। যুক্তিকাঠামো বানাতে হবে। যা নিশ্ছিদ্র হয়। ফাঁকফোকর না থাকে।

বিমল এবং ড্যানিয়েল, দুজনেই যদি হত্যাকারী হন, তাহলেও অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। যদি সত্যিই আনিসুরের হত্যাকারী গাড়ি চড়ে না আসে, অমিতাভর হত্যাকারীও কি গাড়ি ব্যবহার করেনি? গাড়ি এত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর কীভাবে হয়ে উঠল? ড্যানিয়েল তো গাড়ি চালাতে পারেন না। বিমলবাবু— তিনিও পারেন না। ঠিক! এটা এতক্ষণ মনে আসেনি তো! কিন্তু ড্যানিয়েল যদি খুন করেও থাকেন, মাঝখানের গল্পগুলোকে মেলাবো কী করে? তিনিও কি আর এতদিন পরে এসে কনফেস করবেন? চটি— ড্যানিয়েলের পায়ে ছিল চটি। কেন? কারণ বুট তাঁর কাছে ছিল না। বেশ ছিল না? বুট ফেলে দিয়েছিলেন। কেন ফেললেন? কারণ বুট একটা এভিডেন্স। সাক্ষ্য লোপাট করলেন। কীসের এভিডেন্স? বুট মানে— পায়ের ছাপ। মানে, মানে...

হুড়মুড় করে একঝলক মেঘ জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে ভেঙে পড়ল মুখের ওপর। আকশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে নিশ্বাস নিলাম জোরে। দুই চোখ বুজে ফেললাম। এটাই কি তাহলে সেই সত্যি, যেটা গত চুয়াল্লিশ বছর ধরে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে? এত সহজ? এত সাধারণ? অনন্যা যেমন বলেছিলেন, ওকামস রেজর?

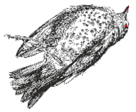

ফণাটনা উঁচিও না আর, ঢোঁড়া সাপকে মানায় না হে, তাছাড়া
আমি বাখরগঞ্জ, গৈলাগ্রামে আমার পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে
লিখেছিলেন মনসামঙ্গল,
গরল আমি ডরাই না হে
বিষে আমি ভয় পাই না
আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি।।

—মৃদুল দাশগুপ্ত

মৃত্যুঞ্জয় সোমের সাক্ষাৎকার

অরুণ আমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোটো। ওদের চা-বাগানের আইনি কেসগুলো মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত। তখন আমি জুনিয়র অ্যাডভোকেট। সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। পড়াশোনা শেষ করবার পর অরুণ পৈতৃক ব্যবসাতে কিছুকাল ঢুকেছিল, যদিও সুবিধে করতে পারেনি। তখন মাঝে মাঝেই কোর্টে আসত মামলাগুলোর সূত্রে। সেই থেকে ওর সঙ্গে আলাপ। হ্যাঁ, অমিতাভকে ও দেখেছি তো! অরুণের সঙ্গে দু-একবার আদালত চত্বরে এসেছে কয়েকবার। ওই ১৯৭০/৭১ নাগাদ। অরুণ ততদিনে কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে। খুব বন্ধু ছিল দুজন। আর একজনও আসতো মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে! তাকে আর মনে নেই এতদিন পরে। না না, অমিতাভ যে পাগলাটে, অন্যরকম, সে কথা কে না জানত? ওরকম বড়ো বড়ো দাড়িগোঁফ, অস্বাভাবিক দৃষ্টি, সারাক্ষণ নখ খেতে খেতে আপনমনে বিড়বিড় করছে, দেখলে বুঝবেন ঠিক সুস্থ মাথার নয় মাঝে মাঝেই তো পালাতো। একবার কলকাতায় গিয়ে কোন কবি বন্ধুর সঙ্গে নাকি কিছুদিন কাটিয়ে এসেছিল। পরে জানলাম, মেটেবুরুজের ডক এলাকার বস্তিতে ছিল দুজন। আর একবার পালিয়ে গিয়ে ফিরল মাস দুই পর। অরুণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, থানা পুলিশও করেছিল, আর আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম যে অমিতাভ মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ভিড়ে গিয়েছে। যাই হোক, অমিতাভ ফিরে আসবার পর অরুণ আমার কাছে দুঃখ করে বলেছিল, প্রতিভাবান বন্ধু থাকার অসুবিধেটা হলো সারাজীবন তোমাকে তার পেছন পেছন উপগ্রহের মতো ঘুরতে হয়, যাতে পাগলামি তাকে বিপদে না ফেলে। তবে আমিও নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম। অরুণের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। ওর মুখ থেকে অমিতাভর খবর পেতাম। দুজনের মধ্যে শত্রুতার খবরও শুনেছিলাম। আমি যদিও বাংলার শিল্পসাহিত্য নিয়ে অত খবর রাখতাম না। তবে অরুণ ভেঙে পড়েছিল। কাছের বন্ধুর কাছ থেকে ছুরি খাওয়াটা মানতে পারেনি মনে হয়। অমিতাভকে তো ছোটো ভাইয়ের মতন ভালোবাসত। আমি তো দেখেছি, কী না করেছে ওর জন্য? হ্যাঁ, ড্যানিয়েল লামাকে চিনতাম তো। সে বেঁচে আছে এখনও? আমি যদিও সিভিল লইয়ার ছিলাম, তবে অনেক সময়েই নানা মামলায় মুখোমুখি হতে হয়েছিল। থানাতেও যেতে হয়েছে। ড্যানিয়েলের কাজকর্ম সম্বন্ধে শুনেছেন নিশ্চয়? ও ছিল দার্জিলিঙের রুণু গুহনিয়োগী। তবে একটা কথা বেশি লোক জানে না। ওর একটা নার্ভের সমস্যা আছে। আর জোরে ছুটতে গেলে পা কাঁপে। না না, আমাকে কেন বলবে? আমার সঙ্গে কেন, কারোর সঙ্গেই ওর হৃদ্যতা ছিল না। ওর ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আমার বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন। ছোটো থেকে দেখেছেন, যা হয় আর কী! একদিন কথায় কথায় বাবাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, এই স্নায়ুর রোগই এত সম্ভাবনাময় পুলিশ অফিসারকে ওপরে উঠতে দেবে না। ওদের তো ফিটনেস

চেক হয় প্রতি প্রমোশনের আগে। সে যাক, যা বলছিলাম। ড্যানিয়েলের সঙ্গে আলাপ তেমন ছিল না। ওই হাই হ্যালো। তবে ধনরাজ গম্বুর সঙ্গে ছিল। ভালো মানুষ, অনুভূতিপ্রবণ, ন্যায়নিষ্ঠ, ভদ্র। ড্যানিয়েলের ঠিক উল্টো। আর ডিপার্টমেন্টের সুনাম রক্ষা করা নিয়ে তেমনই সতর্ক। গোর্খাল্যান্ডের সময়ে আমরা বাঙালিরা ধনরাজের ভূমিকা সারাজীবন মনে রাখব। তিনি না থাকলে আমাদের সবাইকেই প্লেন এরিয়াতে নেমে যেতে হতো। সেই রাত? দাঁড়ান, ভাবি। মনে নেই বিশেষ। মনে হয় বাড়িতেই ছিলাম। বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন, ঘন ঘন বাজ পড়ছিল। এটুকু মনে আছে যে পরের দিন অরুণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। চুপচাপ শুয়ে ছিল খাটের ওপর। কোনো কথা বলছিল না। সময়টা আর খেয়াল নেই। দুপুরের আগেই সম্ভবত। কারণ যদ্দুর মনে পড়ছে ওখান থেকে বেরিয়ে কোর্টে এসেছিলাম। ও হ্যাঁ, যখন অরুণের বাড়ি ঢুকছি, অরুণের দাদা আর ওদের উকিল মিস্টার প্যাটেল বেরোচ্ছেন। সে যাই হোক, তারপর তো অরুণ গ্রেপ্তার হলো। কিন্তু কী জানেন, আমার কখনও মনে হয়নি অরুণ খুন করতে পারে। অমিতাভকে ও কীরকম ভালোবাসতো আমি তো দেখেছি! নিজের ভাইয়ের জন্যও মানুষ এত করে না। তবে মানুষের মন, কখন কী ঘটে যায়, আমরা আর কতটুকু জানি। না সেসব বলতে পারব না। ড্যানিয়েল বা ধনরাজ, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ড্যানিয়েল কেন কেস ছেড়ে দিল এগুলো ওদের ভেতরকার ব্যাপার। তবে এরকম হামেশাই ঘটতে দেখেছি। হ্যাঁ ড্যানিয়েলের চাকরি ছেড়ে দেবার খবর শুনে অবাক হয়েছিলাম বটে। এই ঘটনার পরপরই চাকরি ছেড়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই। অরুণের সঙ্গে? তা আমিই তো শেষ অ্যাটাকটা হবার পর থেকে আর বাড়ির বাইরে বেরোই না। যোগাযোগ থাকা কি সহজ? অরুণ খবর পেয়ে দেখতে এসেছিল আমাকে। সেও বছর ছয়েক হয়ে গেল। এখন দিব্যি আছি। বাড়িতে থাকি। টিভি দেখি। অবসরে গান শুনি। আচ্ছা দাঁড়ান, আর একজনের কনট্যাক্ট দিচ্ছি। সে ওদের চা-বাগানের অ্যাকাউন্টান্ট ছিল এক সময়ে। অরুণকে চিনতো। বীরবিক্রম তামাং। এখন নিজের বড়ো ফার্ম খুলেছে। মস্ত বিজনেস। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো করেই চিনি। আমারই বয়সি হবে, দু-এক বছরের এদিক ওদিক হয়তো। ভিক্টোরিয়া ফলস রোড ধরে ওর বাড়ি যেতে হবে। বর্ধমান মহারাজার প্যালেসের কাছেপিঠে পড়বে। দাঁড়ান, আমিই ওকে ফোন করে কথা বলিয়ে দিচ্ছি আপনার সঙ্গে, আহা, এতে আবার এত ধন্যবাদের কী আছে? আমরা সবাই অরুণকে ভালোবাসতাম। আমিও তো চাই যে এত দিন হয়ে গেল, এবার সমাধানটা অন্তত বেরোক!

বীরবিক্রম তামাঙের সাক্ষাৎকার

আনন্দ পাঠককে হ্যালো বলে দেবেন। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি ওর সঙ্গে। এককালে ভালো বন্ধুত্ব ছিল। অরুণকে চিনব না কেন! একসঙ্গে কাজও তো করেছি। নাহ অমিতাভর নাম শুনেছি বটে, তবে চিনতাম না। তবে আমাদের ট্রাস্ট থেকে একটা মাসিক টাকা ওর জন্য অরুণ ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তার কাগজপত্র আমিই বানিয়েছি। অরুণও বেশিদিন ব্যবসার কাজে থাকেনি। ওর মধ্যে সেই উপাদানটাই ছিল না। লেখালেখির জগতের মানুষ, সেসব নিয়েই বুঁদ থাকত। ড্যানিয়েল লামা? মুখে চিনতাম। তবে সেসব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এসেছে। অরুণকে যখন অ্যারেস্ট করেছিল, ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। চাপা ছেলে তো, ভেঙে পড়লেও মুখে প্রকাশ করেনি। সেই জার্নালিস্টও ছিলেন। কী নাম ভুলে গেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সঞ্জয়। তিনি মনে হয় অরুণের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন, কিন্তু পুলিশ দেখা করতে দিচ্ছিল না। আমার মনে আছে সেই দৃশ্যটা। পুলিশ মনে হয় অমিতাভর ঘর ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল। সব মালপত্র থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ড্যানিয়েল লামা বসে বসে সিজার লিস্ট মেলাচ্ছেন, আর পাশে ধনরাজ গম্বু দাঁড়িয়ে। না না, ড্যানিয়েল তদন্তের মাথা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ধনরাজ তো টিমে ছিলেনই। তিনিই মনে হয় রেইড করেছিলেন। তা সেসব কী কী মালপত্র ছিল, অত কি মনে আছে আর? অনেক কাগজ ছিল, এটুকুই খালি স্মরণে আসছে। নাহ, অরুণের সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছিল

সেসব আর মনে নেই। সাধারণ টুকটাক কথাই হবে হয়তো। খুনের দিনটা কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। কারণ তার পরের দিন আমার জন্মদিন ছিল। স্ত্রী আর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে স্থানীয় একটি পানশালায় ছিলাম, হ্যাঁ, ফেরবার সময়ে রাস্তায় ড্যানিয়েলকে দেখেছিলাম তো। জলাপাহাড় রোড ধরে হাঁটছিলেন। না না সেন্ট পলসের দিকে। মনে আছে কারণ আমার স্ত্রী হাত তুলে দেখিয়ে বলেছিল, 'এত বড়ো পুলিশ অফিসার এদিকে নিজের গাড়ি নেই?' তখন কটা হবে? ওই, একটা নাগাদ। হ্যাঁ, একটাই হবে, তার আগে নয়। মদ্যপান করতে করতে আমাদের রাতই হয়ে গিয়েছিল। ও হ্যাঁ, ড্যানিয়েলের হাতে একটা প্লাস্টিকের ঝোলা ছিল। কিন্তু ছাতা বা রেনকোট ছিল না। অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। ভিজতে ভিজতে হাঁটছিলেন। ব্যাপারটা মনে আছে, কারণ দুদিন পর যখন অমিতাভ মিত্রর বড়ি পাওয়া গেল, শহর সরগরম হয়ে উঠল, ড্যানিয়েল আমাদের অফিসেও এসেছিলেন জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তখন তাঁকে দেখে আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ড্যানিয়েল যখন জলাপাহাড় রোডে, তাঁরই কয়েক কিলোমিটার দূরে একটা খুন হয়ে গেল, এদিকে জানতেও পারলেন না — এই সব হাবিজাবি। এ আবার কী অদ্ভুত প্রশ্ন! ড্যানিয়েলের পায়ে তখন কী ছিল, দেখেছি নাকি? কী আবার থাকবে, জুতো ফুতোই ছিল হয়তো। দেখুন চটি না জুতো না গামবুট, অত দেখিনি। আর দেখলেও মনে নেই। অত দিন আগেকার ব্যাপার! অরুণের সঙ্গে এখনও ভালোই যোগাযোগ আছে। মাসখানেক আগেই ফোনে কথা হলো। ওর স্ত্রী আমার মেয়ের শিক্ষক ছিলেন, কলেজে। তার অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। না, দেখুন, এসব ব্যাপারে আমার বিশেষ ইন্টারেস্ট নেই। অরুণ খুন করেনি বলেই আমার মনে হয়েছিল, এখনও সেটাই মনে হয়। আমরাও তো মানুষ চরিয়ে খাই! কে কেমন লোক সেটা বুঝি। এত বড়ো লেখক, এত বড়ো ফ্যামিলির ছেলে, সে এসব ক্রুড ব্যাপারে থাকবেই বা কেন! অমিতাভর ব্যাপারটা তো অন্য ছিল। মানে, ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তো ছিল না! ভালোবাসা অন্ধ হয়। অরুণ সেইজন্য অমিতাভর চরিত্রের ত্রুটিগুলো দেখতে পেত না। নাহ, সেই সময়কার আর কে বেঁচে আছে, এগুলো ভালো জানবে... মনে হয় না আর কেউ। ফাদার স্যামুয়েলসও তো বহুদিন হলো মারা গেছেন। ইনি অমিতাভকে ছোটো থেকে দেখেছিলেন। অমিতাভর লাশও শনাক্ত করেছিলেন। আমার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। আমাদের ফার্ম তাঁর অনাথ আশ্রমে অনুদানও দিয়েছে অনেক। ভালোমানুষ ছিলেন। আচ্ছা, আপনার নাম আমি শুনেছি। আমার নাতনি, কলকাতায় লোরেটোতে পড়ে, সে আপনার লেখার ভক্ত! আপনি তো একটা সিরিজ লিখছেন, তাই না? ও সেটার কথাই আমাকে বলেছে অনেকবার। নাকি প্রতি সপ্তাহে হাঁ করে আপনাদের ম্যাগাজিনটার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে। যদি কিছু মনে না করেন, একটা অটোগ্রাফ দেবেন? ও নাহলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে আপনি এসেছিলেন। ওকে বলব আপনার কথা। আর পরে যদি কখনও নিছক ছুটি কাটাতে এখানে আসেন, জানাবেন। আরামে থাকা এবং ঘুরবার সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনি হলেন আমাদের শহরের অতিথি। নাতনির মুখ চেয়ে এটুকু তো করতেই হবে! হাঃ হাঃ হাঃ...’

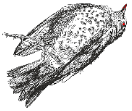

ফোন বন্ধ করে সিদ্ধার্থের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, ‘কী মনে হচ্ছে? মাথায় আসছে কিছু?’

বার্গারে কামড় বসাবার আগে সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'গল্পের জন্য প্রচুর উপাদান তো জোগাড় হয়েই গেছে। আর কত চাইছেন?’

রাত প্রায় নটা। আমরা ডিনার করছিলাম চৌরাস্তার কাছে একটা রেস্তোরাঁয়। আমিই সিদ্ধার্থকে ফোন করে আসতে বলেছিলাম, এতটাই উত্তেজিত লাগছে যে সেটা ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করছিল।

আনন্দ পাঠকের লিস্টের আর একজনকে কনট্যাক্ট করে পাইনি। বিনয়েন্দ্র মুস্তাফি, অরুণের স্কুলের বন্ধু। শুনলাম, কলকাতায় গেছেন। তবে তাঁকে আর দরকার নেই হয়তো। আপনার কাকা ঠিকই বলেছিলেন সিদ্ধার্থ। অমিতাভর উপন্যাসই হলো রহস্যের দরজা খোলার চাবি।'

‘হতে পারে। ফটোকপি করে রেখে দিয়েছি আমার কাছে, কিন্তু অর্ধেকের বেশি পড়তে পারিনি। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, একেবারে সমাধানে পৌঁছে গিয়েছেন?'

‘কিছু ছোটোখাটো খটকা এখনও মেলেনি। কিন্তু হ্যাঁ, বড়ো প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে গিয়েছি ধরতে পারেন।'

‘তাহলে বলুন আমাকে। বোঝান। তার আগে এটা বলুন, আমার কাকা কি হত্যাকারী? এটা জানা সবার আগে দরকার।

‘না। অরুণ চৌধুরী হত্যাকারী নন।

সিদ্ধার্থ একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। জানালার দিকে চোখ মেলে বলল, ‘মুখে যতই বলি না কেন, কাকার হাতে রক্তের দাগ লেগে আছে এটা ভাবতেই আমার...'

‘কিন্তু আমার ধারণাগুলো প্রমাণ করতে পারব না। পারব না, তার কারণ মাঝে অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছে। বহু সাক্ষ্যপ্রমাণই লুপ্ত। অন্তত সঞ্জয় অধিকারী বেঁচে থাকলেও কিছু সাক্ষ্য দিতে পারতেন, যেহেতু অমিতাভকে চিনতেন। তিনিও আর নেই।'

‘ধারণাগুলো বলুন।'

‘অরুণ চৌধুরী খুন করতে পারেন না, কিন্তু খুন এমনভাবে হয়েছিল যে তাঁর ওপর সন্দেহ পড়ে।

‘খুন করতে পারেন না কেন?'

‘পারেন না, কারণ এক তো অ্যালিবাই। দ্বিতীয়ত, আজ পুলিশ লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরোনো রিপোর্ট ঘেঁটে একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য পেয়েছি। অমিতাভর মুখে এবং বুকে গুলি করা হয়েছিল ৭.৬২ × ২৫ মিলিমিটার টোকারেভ বুলেট দিয়ে। এই বুলেট মূলত ব্যবহার করা হতো সোভিয়েত পুলিশে। সত্তরের দশকে ভারতের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রক সোভিয়েত থেকে এই বুলেট আমদানি করে। রাজ্য পুলিশের হেডকোয়ার্টারে নির্দেশ আসে এবার থেকে এটা ব্যবহারে। ইন্দিরা গান্ধির আমলে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীর ফলে যে বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো হয়েছিল, টোকারেভের আমদানি সম্ভবত তারই অংশ ছিল। সত্তরের দশকে নকশাল দমনে এবং আশির শুরুতে খালিস্তানি সমস্যা দমনে এই বুলেটের ব্যবহার প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। আজকাল এই বুলেট আর বিশেষ জনপ্রিয় নয়।

মজার ব্যাপার যেটা, টোকারেভের ব্যবহার পুলিশের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক ছাড়া নিষিদ্ধ ছিল।'

‘তো এটাই, অরুণের যদি কোনো সহকারীও থাকে, সে কীভাবে টোকারেভের সন্ধান

পাবে? যদি না...'

'যদি না সে নিজে পুলিশ হয়।'

'ঠিক। আর পুলিশের মধ্যে অরুণের সহকারী লুকিয়ে থাকলে অরুণ গ্রেপ্তার হতেন না। সব সন্দেহ তাঁর ওপর পড়তো না, পুলিশ তাঁকে হ্যারাসও করতো না। বরং সেই সহকারী তদন্তের অভিমুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিত।'

'কিন্তু যদি এমন হয় যে ধনরাজ গম্বু কাকার সহকারী? মনে রাখবেন, কেস ধনরাজের হাতে আসার পরেই কিন্তু কাকা ছাড়া পেয়েছিল।'

'ধনরাজের হওয়া অসম্ভব। কারণ সেদিন রাত দশটা থেকে তিনি তদন্তে ঢুকে গেছেন। অরুণ চৌধুরীর বাড়িতে গেছেন, সেখান থেকে থানায় এসে সারারাত ছিলেন। তাঁর অ্যালিবাই অরুণের মতোই পোক্ত। এবার বলতে পারেন, ধনরাজের নির্দেশে তাঁর অধস্তন কোনো পুলিশ গিয়ে খুনটা করেছে। তা সেই পুলিশকে ধনরাজ জানালেন কখন? দুজন কনস্টেবল তাঁর সঙ্গে রাত দশটা থেকে বারোটা, মানে অরুণের বাড়ি থেকে থানায় আসা অবধি পুরো সময়টা ছিলেন, এবং তার পরেও ভোর অবধি ডিউটি করেছেন। তাহলে ধনরাজকে যদি নির্দেশ দিতেই হয়, থানায় ফিরে এসে দিতে হয়েছে, মানে রাত বারোটার পর। কিন্তু পুলিশ রিপোর্ট বলছে, সেদিন থানায় যাদের ডিউটি ছিল, সকলেই পুরো সময়টা কভার করেছে, এবং থানাতে থেকেছে, কারণ সেই রাতে মিসেস বাসুর ফোন ছাড়া আর কোনো অভিযোগ আসেনি। তাহলে যদি নির্দেশ দিতেই হয়, একমাত্র সেই সব পুলিশের কাছেই নির্দেশ যেতে হয় সেই রাত্রে যাঁদের ডিউটি ছিল না। ঠিক? ধনরাজ কীভাবে এই নির্দেশ দিতে পারতেন? ফোন করে। কিন্তু থানা থেকে রাত বারোটার পর একটাই ফোন গিয়েছিল। সেটা অরুণ চৌধুরীর আইনজীবী মিস্টার প্যাটেলের বাড়ির নম্বরে। সম্ভবত অরুণ থানা থেকে ফোন করেছিলেন। কীভাবে জানলাম এটা? ধনরাজ গম্বু টেলিফোন অফিস থেকে কল লিস্ট আনিয়েছিলেন। সেটাও পুলিশ ফাইলে আছে। সম্ভবত এটা চেক করবার জন্য যে ড্যানিয়েলকে সেই রাত্রে কেউ ফোন করেছিল কিনা। আরেকটা সম্ভাবনা আছে, ধনরাজ আগে থেকেই কোনো অধস্তনকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। বাকিটা নাটক। কিন্তু সেই নাটক করবার দরকার পড়ল কেন? পুলিশ সেই সময়ে অনেককে মারছে, অমিতাভকে চুপচাপ এনকাউন্টার করে দিলেই পারতো, কেউ জিজ্ঞাসাও করত না। এমনভাবে সাজাবার দরকার পড়ল কেন যে অরুণের উপর সন্দেহ হয়? না, পুলিশের সঙ্গে অরুণের যোগসাজশ যৌক্তিক নয়। আজকের স্মার্টফোনের যুগ হলে ধনরাজকে এত সহজে ক্লিনচিট দেওয়া যেত না। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ধনরাজ এই খুনে জড়িত নন।

'কিন্তু আপনার সূত্র মানলে, অমিতাভকে তো খুন করেছে পুলিশেরই কেউ।' 'ধনরাজও সেই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন সম্ভবত। আর তাঁর অনুমানকে সিলমোহর দিয়েছিল অমিতাভর উপন্যাস। '

উপন্যাসের কথায় পরে আসব। ওটা পুরোটা না পড়লে আলোচনা করা যাবে না। আমি এখন ডেভিলস অ্যাডভোকেট সাজতে চাই। যতক্ষণ না কাকার নির্দোষ থাকাকে নিজের কাছে নিশ্চিত করতে পারছি, প্রশ্ন করেই যাব।'

'বলুন।'

'এমন কি হতে পারে না যে কাকার সেই তথাকথিত সহকারী টোকারেভ বুলেট চুরি করেছিল?'

'মানে পুলিশের কাছ থেকে? এটা অসম্ভব, যদি না ডাকাতি হয়। সেরকম ডাকাতির কোনো খবর চকবাজার পুলিশ স্টেশন বা সদর পুলিশের ইতিহাসে নেই।'

'উঁহু, ভুলে যাচ্ছেন কেন যে নকশাল জমানায় পুলিশের মালখানা থেকে অস্ত্র লুঠ হতো প্রচুর।

'ঠিক। কিন্তু ১৯৭৫ সালে নকশাল জমানা বলে আর কিছু ছিল না। ১৯৭২ সালের পর থেকেই সব প্রায় শেষ। দার্জিলিং জেলাতে শেষ অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটেছে ১৯৭০-এর

জানুয়ারিতে। চার-পাঁচ বছর আগে লুঠ হওয়া বুলেট ব্যবহার না করে রেখে দেওয়া হলো, এবং ১৯৭৫ সালে এসে সেটার ব্যবহার করা হলো, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়? যারা বুলেট লুঠ করেছিল, তারা তো রাজনৈতিক কর্মী। নিজেদের ব্যবহারের জন্য লুঠ করেছিল। অস্ত্র ব্যবসায়ী নয় যে খোলা বাজারে বিক্রি করবে।'

হুঁ, তাহলে কাকা খুন করতে পারে না। তাই তো?'

'না। কিন্তু খুন এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে তাঁর ওপর সব দোষ এসে পড়ে।

'কে খুন করেছিল তাহলে?'

'এখনও বুঝছেন না? ড্যানিয়েল লামা। একমাত্র ওটাই সলিউশন।'

'কিন্তু এত কিছু সাজাল কীভাবে?'

উত্তর দিতে যাব, হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম। একটা জিপের উপর বসে গিরিরাজ একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার কী যে হলো, রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সটান গিরিরাজের দিকে চলে গেলাম। সিদ্ধার্থ ব্যাবাচ্যাকা খেয়ে অনুসরণ করবে কিনা বুঝতে পারল না। রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। গিরিরাজও চমকে উঠেছে। ভাবেনি যে আমি ওর সামনে এসে দাঁড়াব।

গিরিরাজের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আমাকে অনুসরণ করবার নির্দেশ কি ড্যানিয়েল দিয়েছেন?'

গিরিরাজের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বলল, 'আপনি এখান থেকে চলে যান ম্যাডাম! এতে আপনার এবং আমাদের সবার মঙ্গল, এখন ভালোভাবে বলছি, কিন্তু এর পরে আর এত ভদ্র ভাষা ব্যবহার নাও করতে পারি।'

'সেদিন রাত্রিবেলা জিপ করে আপনিই তাহলে আমাদের অনুসরণ করছিলেন?'

গিরিরাজ শক্তহাতে গাড়ির স্টিয়ারিং চেপে ধরল। হাতের মোটা মোটা গাঁটগুলো ফেটে পড়ছে। সামনের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, 'আমি কারোর হুকুমে কাজ করি না।'

'আর আমি আসার দিন জলাপাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা? হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আমার ওপর নজরদারি চালানো? সেগুলোও কি কারোর নির্দেশে না? আপনি চানটা কী? আপনার মালিকই বা কী চান? আমাকে ভয় দেখাতে?'

লাল হয়ে উঠল গিরিরাজের মুখ। আমার দিকে শরীরটা এগিয়ে দিল, নাকে ধক করে এসে লাগল সস্তা মদের উগ্র গন্ধ, 'আমার মালিক বলে কেউ নেই। গিরিরাজ কারোর পোষা কুকুর নয় যে চাবুকের ভয়ে কাজ করবে। আপনাকে ওয়ার্নিং দেবার ছিল, দিয়ে দিয়েছি। তার পরেও যদি শহর ছেড়ে না যান, তার ফল ভালো হবে না।

'কার জন্যে ভালো হবে না? ড্যানিয়েলের জন্য?' গিরিরাজ উত্তর দিল না।

'আমি এখনই ড্যানিয়েলের বাড়ি যাব। ভয় নেই, আপনাকে নিয়ে যেতে হবে না। আমার গাড়ি আছে। কেন যাব বলুন তো? গিয়ে বলে আসব যে ওঁকে ভয় পাই না। আরও কিছু কথা বলব, কিন্তু সেগুলো আপনার না জানলেও চলবে।' মাথায় আগুন জ্বলছিল। চিবিয়ে চিবিয়ে গিরিরাজকে আরও আহত করবার জন্য বললাম, 'মালিকদের মধ্যেকার সব কথা চাকরবাকরদের জানতে নেই।' গিরিরাজ দাঁতে দাঁত চিপল। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল। ততক্ষণে সিদ্ধার্থ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার দিকে ঘুরলাম। 'চলুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'ড্যানিয়েল লামার বাড়ি।'

এবার ড্যানিয়েলের বাড়িতে ঢুকতে বেগ পেতে হলো না। নিজের নাম বলবার দু-মিনিটের মধ্যে গেট খুলে গেল। একটা ছিমছাম আধুনিক কেতায় সাজানো ড্রইং রুম। এলইডি স্ক্রিনের বিশাল টিভি, তার সামনে তিন দিক ঘিরে সাজানো ধবধবে সাদা সোফা। একদিকের দেয়ালের কাচবন্ধ তাকে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র রাখা। নানারকম মডেল তাদের, অদ্ভুত সমস্ত শেপ। টেবিলের ওপর একটা ক্যাটালগ দেখতে পেলাম। ২০১০-এর পর তৈরি হওয়া বিভিন্ন ধরনের বন্দুকের ক্যাটালগ। ড্যানিয়েলের শখ কিছুটা বুঝতে পারছি।

দেয়ালের অন্যপাশে একটা ছোটো বুকশেল্ফ। অবাক হয়ে দেখলাম, সারি সারি বিদেশি নাটকের বই সাজানো। লোকটা কি তাহলে গল্প উপন্যাস পড়ে না? নাকি শুধুই নাটকীয়তা নিয়ে অবসেসড?

স্লিপিং গাউন পরা ড্যানিয়েল সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। চোখ রক্তাভ। বোঝা গেল, ড্রিংক করেছেন। ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকালেন, ‘আমি এত রাত্রে কোনো অতিথিকে ঢুকতে দিই না বাড়িতে। আপনাকে দিয়েছি, কারণ মনে হয়েছে আপনি হয়তো কোনো নতুন উপায়ে আমার সময় নষ্ট করতে পারেন। তিন মিনিট দিতে পারি। আর ইনি কে? আপনার ওয়াটসন?’

সংক্ষেপে সিদ্ধার্থর পরিচয় দিলাম। ড্যানিয়েল গ্রাহ্যও করলেন না। একটা সোফায় বসলেন, কিন্তু আমাদের বসতে বললেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললাম, ‘মিস্টার লামা, এটাই বলতে এলাম যে আপনার হুমকিতে ভয় পাই না। গিরিরাজকে বলে দেবেন, দরকার পড়লে পুলিশের সুরক্ষা নিয়ে এই শহরে আমি থেকে যাব।'

‘শুধু এটুকু বলতেই এত দূর এলেন? আমার ফোন নাম্বার সম্ভবত কাল রাত থেকেই আপনার কাছে আছে।'

‘শুধু এটুকুই নয়।’আমি থামলাম, এবং তারপর বড়ো একটা শ্বাস নিয়ে গুছিয়ে নিলাম নিজেকে। ‘এটাও বলতে এলাম যে অমিতাভ মিত্রর হত্যারহস্য আমি সমাধান করেছি।’

‘যে রহস্য নিয়ে গত চল্লিশ বছর ধরে লোকজন মাথা কুটে মরেছে তার সমাধান সাতদিনেই করে ফেললেন? আপনি কি নিছকই শার্লক হোমস, না নিজেকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ওভারে এস্টিমেট করা শার্লক হোমস?'

‘সমাধান আপনার জন্য সুখকর হবে না।’

‘মানে?’

‘মানেটা আপনিও জানেন। এই কারণেই পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই না? না কি একরকম সরিয়েই দেওয়া হয়েছিল? এক্সট্রাজুডিশিয়াল কিলিং-এর কারণে সত্তরের দশকে অবশ্য অনেক পুলিশ অফিসারেরই কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আবার অনেকের শাস্তিও হয়নি। অমিতাভ মিত্রকে এনকাউন্টার করবার কারণেই আপনাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নাকি পেছনে আরও বড়ো গল্প আছে?’

প্রস্তুত ছিলাম, ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটবে। হয়তো শারীরিক আক্রমণও করতে পারেন। কিন্তু ড্যানিয়েল দুম করে কেমন নিভে গেলেন। কাঁধ ঝুলে গেল মনে হলো। নিজের মনেই দু-বার মাথা নাড়লেন। তারপর চোখ নামিয়ে বলেন, 'এই তাহলে আপনার সমাধান?’

‘আপনি কি শুনতে চান? ‘

‘না। শুনতে চাই না।’ ক্লান্তভাবে নিজের শরীরটা এলিয়ে দিলেন সোফাতে। ‘আমি আর কিছুই শুনতে চাই না। এই শহর, এই ডিপার্টমেন্ট, এরা কেউ আমাকে ডিজার্ভ করে না। এই ভয়টাই পেয়েছিলাম। ভয় পেয়েছিলাম, যে....

‘যে, আমি সত্যিটা খুঁজে বার করব।'

ড্যানিয়েল আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ‘ভয় পেয়েছিলাম যে, আপনি কিছুই বুঝবেন না। আর সেই না বোঝাটা আপনার কলমের মধ্যে দিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ ইডিয়ট অর্ধশিক্ষিত পাঠক গিলবে।'

‘আর সেই জন্য হাতকে নিষ্কলঙ্ক রাখবার জন্য নিজে থেকেই আজ সকালবেলা বারবার বলে যাচ্ছিলেন যে অরুণ চৌধুরী খুনি? আমি জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও?'

‘আমার হাত নিষ্কলঙ্ক নয়।' গর্জে উঠলেন ড্যানিয়েল, কিন্তু আমার কানে সেটা হাহাকারের মতো শোনাল। ‘আমি নিজে কোনোদিন এই অহংকারে মরতে পারবো না যে আমার হাতে রক্ত লেগে নেই। এই অহংকারের মুখে আমি লাথি মারি! আই অ্যাম প্রাউড অফ মাইসেল্ফ! আর যা বলেছি, আবার বলব। অরুণই খুনি।'

‘ঠিক যেটা বলে বলে মানুষকে বিশ্বাস করিয়েছেন এতদিন? জানেন তো, বারবার একটা

মিথ্যেকে বলে যেতে যেতে সেটাই সত্যি বলে মানুষ ধরে নেয়?

'আপনার কি মনে হয় মানুষ কী ধরে নিল তা নিয়ে আমার কিছু যায় আসে? মানুষকে আমি ঘৃণা করি। যা খুশি লিখুন। আর কিস্যু এসে যায় না। অনেকটা সময় চলে গেছে।' আবার সেই পুরোনো ড্যানিয়েল ফিরে আসছেন। খোঁচা খাওয়া আহত বাঘের মতো অপেক্ষা করছেন, কখন লাফিয়ে উঠে চুঁটি টিপে ধরবেন।

'আপনার দেওয়াল ঘড়ি জানান দিচ্ছে যে নির্ধারিত তিন মিনিট শেষ। কাজেই, আমরা এবার বেরিয়ে যাব। ভয় নেই, পুলিশকে কিছু জানাবার দায় আমার নেই। নিজের লেখাতে সিদ্ধান্তগুলো শুধু দেখিয়ে দেব। তার ওপর ভিত্তি করে পুলিশ কিছু ব্যবস্থা নেবে কিনা, সেটা তাদের ব্যাপার।

বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। সিদ্ধার্থও আমার পেছনে। ড্যানিয়েল তখন ডাকলেন, 'মিস ভট্টাচার্য!' গম্ভীর এবং অন্যরকম সেই ডাক। কোণঠাসা মানুষটা আর নেই। ফিরে দেখলাম, আবার সম্রাট বসে আছেন নিজের সিংহাসনে।

'বলুন।'

'রহস্যকাহিনীর প্রতি আপনার আকর্ষণ কেন? এটা সবার খেলাধুলো করবার জায়গা নয়, জানেন না? আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। সেটা যে হাত দিচ্ছে, তার দোষ। আগুনের নয়।'

'কী করব বলুন! আমার বাবা ছোটোবেলা থেকেই আগুন সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করে দেননি যে! নিজে হাতে করে রহস্য আর থ্রিলার কিনে আনতেন। সৌভাগ্যক্রমে বাবা আপনার মতো কেউ ছিলেন না যিনি জোনাকির আলোকে আগুন বলে সাবধান করে দেবেন।'

'ওয়ার্থলেস!' গর্জে উঠলেন ড্যানিয়েল। 'জীবনটা কোনান ডয়েলের উপন্যাস নয়। একবারও ভেবে দেখলেন না অরুণ চৌধুরীর হাতে আঁচড়ের দাগ কীভাবে এল! পুলিশ রিপোর্টে ছিল। হয়তো পড়েওছেন। কিন্তু খতিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করেননি। এটাও নজরে পড়ল না যে আমি যদি ওই ১১ জুনের খুনটা করতাম তাহলে সোজাসুজি গুলি চালাতাম, যেটা আমার মোডাস অপারেন্ডি। গুলি চালাবার আগে তার কবজি কাটতে যেতাম না। কোনো পুলিশ অফিসার সেটা করবে না, কারণ সেটা তার চরিত্রের বিরুদ্ধে যায়। আরও একটা কথা। স্পষ্ট ভাবে শুনে নিন। আপনাকে কে কী বুঝিয়েছে জানি না, কিন্তু আমার নার্ভের সমস্যা। জোরে আওয়াজ সহ্য করতে পারি না। না বোঝেন সাইকোলজি, না বোঝেন লজিক। কী সাংঘাতিক ডিজঅ্যাপয়েন্টিং আপনি।'

কোথা থেকে কী প্রসঙ্গ! অরুণ চৌধুরীর হাতে আঁচড়ের দাগ থেকে নিজের নার্ভের সমস্যা! চাপে পড়ে এবার দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন ড্যানিয়েল। উলটোপালটা বকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। হালকা গলায় উত্তর দিলাম, 'সব সমাধান কি এখানেই শুনতে চান? সময় তো দিয়েছিলেন তিন মিনিট মাত্র! স্টোরিটা বেরোলে পাঠিয়ে দেব না হয় আপনাকে! কিস্তিতে কিস্তিতে।'

'দরকার নেই! জানি কী লিখবেন। আপনি নতুন করে কিছুই আবিষ্কার করেননি। ঠিক এই অভিযোগেই কেস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাকে। আপনারা কেউ কিচ্ছু বোঝেন না, বোকা অশিক্ষিত সমাজকে দাবিয়ে রাখার জন্যে যেমন আমার মতো পুলিশ অফিসারের দরকার পড়ে, তাদের ভুল তথ্য গেলাবার জন্যে দরকার পড়ে আপনাদের।'

'একটা জিনিসই বুঝিনি। আপনার অপরাধ পুলিশ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি কেন?'

'বেরিয়ে যান।'চিৎকার করে উঠলেন ড্যানিয়েল। দূর হয়ে যান আমার চোখের সামনে থেকে। আপনারা সবাই!'

মায়া লাগল। নখদন্তহীন বৃদ্ধ বাঘকে দেখে যেমন লাগে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া উচিত হবে না আর। 'চলে যাচ্ছি। গিরিরাজকে বলে দেবেন, আমাকে ফলো করে বা ভয়

দেখিয়ে লাভ হবে না।'

বেরোতে যাচ্ছি, ড্যানিয়েল ডাকলেন আবার, 'মিস ভট্টাচার্য।'

পিছু ফিরলাম।

ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজলেন ড্যানিয়েল। 'অরুণ চৌধুরীর হাতে আঁচড়ের দাগ ছিল। ওটাই একমাত্র ক্লু। একমাত্র।'

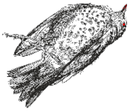

২৩/০৩/১৯৭৪

শম্ভু

মেদিনীপুরের কবি সম্মেলনে যাওয়া হবে না ভাই। লিভারের সমস্যাটা ভোগাচ্ছে খুব। অরুণ বলছে, না কমলে কলকাতায় নিয়ে যাবে। এখন কিছু দিন বাড়িতেই থাকতে হবে। তবে কবিতা পাঠিয়ে দেব যথাসময়ে। তুই পড়ে নিস।

এবার যেটা বলার, আসল সে-কথায় আসি। একটা ভুল স্বীকার করবার আছে শম্ভু। কোনো এক অজ্ঞাত কারণেই আমি তোর কবিতাকে গুরুত্ব দিইনি এতদিন। ভাবতাম তুই মূলত সংগঠক আর সম্পাদক হিসেবে বেশি দক্ষ। তুইও নিজে থেকে কখনো নিজের ব্যাপারে একটাও কথা বলিসনি। কিন্তু প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না পড়ে আমার ভুল ভেঙেছে। দার্জিলিং-এ তো সব বই ঠিক সময়ে মেলে না, তোর বইও আসতে দেরি হলো অনেকটা। এবং পড়ে তড়িদাহত হয়েছি। মনে হয়েছে, আমার এ যাবৎকালের সমস্ত প্রস্তুতি এক লহমায় মিথ্যে হয়ে গেল, কারণ এ কবিতা আমি কখনো লিখতে পারবো না। সময়ের কাছে কেন আমি বা কেন মানুষ কোনো এক উন্নাসিকতা থেকে আক্রান্ত হয়েই পড়িনি। প্রিয় ধ্বনি পড়বার পরে ফিরে গিয়ে পড়লাম তোর প্রথম বই। আমার এ যাবৎ সমস্ত পাঠের অভিজ্ঞতা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। স্থিতিশীল মুদ্রা ও পালক ও পশুপাখির রূপায়ণ— প্রীতিময়ী সরস্বতী তুমি, নানারকম ধারণা মতামত প্রকাশ করে যাও/ রঙে ও সবুজে বরফস্তূপে, বিস্ময়কর অভিকর্ষের সম্ভারে/ যেমন নিয়মের কোনখানে পদার্থের বা ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দেওয়ার সার্থকতা— এতবার পড়েছি যে মুখস্থ হয়ে গেছে, স্মৃতি থেকে লিখলাম। শব্দের পুনরাবৃত্তি সিনট্যাক্সের বিপর্যয়, আকস্মিক বিপরীতধর্মী শব্দের ব্যবহার, এগুলো এতটাই অভিনব লাগছে যে ফিরে ফিরে পড়তে হচ্ছে। এতদিন কেন আমি ভেবেছিলাম শম্ভু ভিড়ের মধ্যে নিছক একটা মুখ? জানি না। কিন্তু ভুল ভেঙেছে শম্ভু। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সম্ভবত আমাদের দশককে চিহ্নিত করবার সময়ে যে চার-পাঁচটা নাম বলতে হবে, তার মধ্যে তুই থাকবি। এখনই বলছি, তুই বীতশোক, পার্থ, তুষার, অনন্য (একে না চিনলে চিনে নে, মণীন্দ্র রায়ের ছেলে, বাচ্চা বয়েস থেকে লিখছে, এখনও গাল টিপলে দুধ বেরোবে, কিন্তু অন্য গ্রহের কবিতা লিখছে)— আর কে কে জানি না, হয়তো আরও আসবে আগামী দিনে, কিন্তু আমার আজকের কথাগুলো মিলিয়ে নিস।

আর কিছু লেখার নেই। সেই তোর সঙ্গে দেখা পাঁচ বছর আগে। কতদিন কেটে গেল তারপর! নির্জন কোণায় পড়ে আছি, কারোর সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই। উত্তরবঙ্গকে কেউই মনে হয় ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তবু তোদের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে ভালো লাগলো। যাওয়া হবে না। আজকাল কোথাও যাওয়া হয় না। নির্জনে চলে গেছি অনেক। তবে কবিতা লিখব অনেক। গল্পও। গদ্য লিখতে ভালো লাগছে আজকাল, মনে হচ্ছে অনেক অনেক গল্প ভাঁড়ারে, কবিতার গণ্ডীতে যাদের ধরা যাবে না।

ভালো থাকিস

অমিতাভ

আগামী কিছুদিন গল্পই লিখবো ভাবছি। কবিতা থেকে একটা ব্রেক দরকার। আর তোরা চলে আসার পর আমি এমন কিছু লিখবো না, যা খুব নতুন হবে। চারপাশের অবস্থা দেখে মাথা একটু গরমও আছে। এই মেজাজে কবিতা লেখা কঠিন। ভালো থাক।

মিলন আজ চলে গেল। অসহনীয় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে আর পারলো না। মিলন কবি

ছিল না। গল্পকারও না। হয়তো একটা-দুটো কবিতা লিখেছে কখনো, কিন্তু সেটা ওর আসল পরিচয় নয়। ও আসলে লিটল ম্যাগাজিনের সংগঠক, দিনহাটায় যে চার-পাঁচটা সিরিয়াস কাগজ এখন বেরোচ্ছে, তার দুটোর সঙ্গে ও শুরু থেকে জড়িয়ে। প্রেসের কাজ, কাঁধে করে বই নিয়ে আসা, ডিস্ট্রিবিউট করা, যে যে কাজগুলো থ্যাংকলেস, সেগুলোর জন্য মিলন ছিল। একটা টাকাও এসব থেকে ও কোনোদিন পায়নি। টাকা কোথায় যে পাবে! এমনকি ওর নাম ও বেরোতো না কাগজগুলোতে। তা সত্ত্বেও কোথায় ওর ভালোবাসা লুকিয়ে ছিল, আমরা বুঝিনি কেউ। মিলন কোনো চাকরি পায়নি। গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসেছিল অনেকদিন, তারপর '৬৬ সালে একটা চায়ের দোকান দিল ধারদেনা করে। অনেকদিন ধরেই সেই দোকানে কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো। অশ্বমেধের ঘোড়ার প্ল্যান ওখানেই। দোকানের সময় বাদে বাকি সময়টা মিলন লিটল ম্যাগাজিনে দিত। সিপিআই-এমএলদের সঙ্গে ওর কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল, যে কারণে পুলিশের খাতায় নাম উঠে যায়। '৭১-এ পুলিশ ওর দোকান ভেঙে দেয়। তুলে নিয়ে যায় ওকে, মারধর করে। মালপত্র সব সিজ করে। ফিরে এসে আর নতুন করে দোকান করবার সামর্থ্য মিলনের ছিল না। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতো। দাদাদের সংসারে দুমুঠো ভাত জুটে যেত ঠিকই, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। সেটাও দিনে দুবার। বাকি সময়টা প্রচণ্ড খিদে পেলেও চেপে রাখতে হতো ওকে। অনেক সময় দেখেছি বাসি মোমো খেয়ে ঢকঢক করে জল খেয়ে নিচ্ছে। যাতে অম্বলের জ্বালায় সারাদিন খিদে না পায়। চায়ের দোকানটা টিকে থাকলে মিলনও টিকে যেত। ওর নিউমোনিয়ার চিকিৎসা হলো না ঠিক করে। মিলনকে খুন করা হয়েছে। খুন করেছে পুলিশ।

মিলনকে নিয়ে কবিতা লেখার ন্যাকামি আমি অন্তত করব না। আমি প্রতিশোধ চাই। মিলনের খুনের প্রতিশোধ। কবিতা লিখে কারোর কিচ্ছু ছেঁড়া যায় না।

আমিই বা কেন নাকে কাঁদছি? মিলনের এলিজি লিখে কার কী লাভ! কত মিলন মরে গেল হাজারে হাজারে!

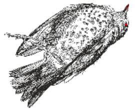

ভেসে যাওয়া বাড়িগুলো যে ভয় থেকে কথা বলে কুয়াশাদের সঙ্গে
সেই ভয় থেকেই
দরজা খোলার শব্দে, রাত্রে
বোবা মেয়েটি কামড়ে ধরে তার বেড়ালকে
ঠিক সেই ভয়েই একটা দেয়াল ঘড়ি জড়ানো গলায় বলে চলে
আড়াইটে বাজবে না আর কোনওদিনই
জানলায় পর্দা লাগানো যাবে না সেই ভয়েই কোনওদিন।
জানালার পর্দা লাগানো যাবে না।

—অমিতাভ মৈত্র

ফেরার পথে একটাও কথা বলিনি কেউ কারোর সঙ্গে। সিদ্ধার্থ নিজের ভাবনায় ডুবে ছিল। আর আমি ভাবছিলাম কীভাবে স্টোরিটাকে দাঁড় করাব। মাথার ভেতর মাঝেমাঝেই ঘুরছিল ড্যানিয়েলের কথাগুলো— অরুণ চৌধুরীর হাতে আঁচড়ের দাগ! আমি তো জানি, ড্যানিয়েলই অমিতাভ মিত্রকে হত্যা করেছেন। তার পরেও কেন তাঁর প্রলাপকে পাত্তা দিতে হবে?

হোটেলে নেমে সিদ্ধার্থকে বিদায় দেব, তাকিয়ে দেখলাম ভুরু কুঁচকে আছে, চিন্তাচ্ছন্ন মুখ। 'কী হলো আপনার?'

'পরশু, যেদিন কাকা আপনাকে ডিনারে ডাকলো, একটা সময়ের পর আমি কাকিমার সঙ্গে ওপরে উঠে গিয়েছিলাম, একটা পেপার পড়তে। মনে আছে?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'আপনি তখন নীচে কাকার সঙ্গে ছিলেন। ঋষি রোডের বাড়ি নিয়ে, বাড়ির ডেসক্রিপশন নিয়ে কোনো কথা হয়েছিল? '

'না তো!'

'খুব ভালো করে ভেবে বলুন।'

'স্পষ্ট মনে আছে, কোনো কথাই হয়নি। কিন্তু কেন?'

'আমার সঙ্গেও কাকিমার আর কথা হয়নি ওই নিয়ে। পরের দিনও কাকাকে কিছু জানাননি? অথবা পুলিশ আপনাদের নিয়ে বাড়িটা ঘুরে দেখেছিল, এমন কিছু ঘটেছে কি?'

'প্রশ্নই ওঠে না। হঠাৎ এই প্রসঙ্গ কীসের জন্য?

'এমনি। আগে আপনি বলুন, বাবলার কথা জানতে চাইছিলেন কেন।'

'ঠিক জানি না, একটা খটকা লাগল। বাবলা অরুণের ঊনত্রিশতম জন্মদিনে সর্পগন্ধার চারা এনেছিল। সেটা তার মানে ১৯৭৫ সালের ১৮ই মে। ১৯৭৬ হতে পারে না। আর অমিতাভ নিখোঁজ হন ১১ জুন, মানে চব্বিশদিন বাদে। তখন বাবলা কোথায়?'

আমি তো জন্মাইনি তখন। তবে বাড়িতে এই ঊনত্রিশতম জন্মদিনের গল্পটা অনেক শুনেছি। বাবলা আর কোথায় বাড়িতেই থাকবে হয়তো!'

'সেখানেই তো খটকা লাগছে। অরুণ চৌধুরী গত পরশু বললেন, থানা থেকে ফিরে এসে তিনি শুয়েছিলেন বাড়িতে। চব্বিশ ঘণ্টার কাজ করে যে ছেলেটি, সে দেশের বাড়ি গেছিল। বাবলাও চলে গেছে ততদিনে। মানে কুকুরের ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৮ই মে আর ১১ই জুনের মধ্যিখানে কোনো একদিন। ব্যাপারটা অদ্ভুত না? ঠিক সেই সময়টাতেই বাড়ি ফাঁকা থাকতে হলো, যাতে কোনো সাক্ষী না থাকে?

'কিন্তু ঘটনাটা তো সত্যি! প্রত্যক্ষদর্শী অনেকের মুখে শুনেছি। কাকা কুকুরটাকে মারতে পারেনি। বাবলা মেরেছিল, বাধ্য হয়ে।

চব্বিশদিনের মধ্যে তার মানে দুটো ঘটনা ঘটেছিল, পিঠোপিঠি। বেশ ঘটনাবহুল সময় ছিল তার মানে।

'কিন্তু ১৯৭৬ হতে পারে না কেন?'

'আপনার কাকা নিজেই তো বলেছেন, অমিতাভ মারা যাবার দিনে বাড়িতে কেউ ছিল না, বাবলাও ততদিনে চলে গেছে। আর তো ফিরে আসেনি। তার মানে বাবলা ছিল ১৯৭৫ এর মে অথবা জুন অবধি। তাই না?'

সিদ্ধার্থ উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। ভাবটা এমন, এত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন। আমারও ক্লান্ত লাগছিল। একটা গোটা রাত্রি দরকার সমস্ত ফাঁকফোকরগুলো মেলাবার জন্যে। কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিলাম। সমাধানটা জানি, এবার সেটাকে ধরে আগের স্টেপগুলো মেলাতে মেলাতে যেতে হবে। অনেকটা সময় একা একা বসে ভাবনা দরকার তার জন্য।

গভীর রাত্রে যখন ব্যালকনিতে বসেছিলাম, ছিপছিপে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। পোকাদের দল অধিকার করে নিচ্ছে এই শহরটা। মাঝে মাঝে জোলো হাওয়া পাহাড়ি শীতলতাকে কাঁধে করে ঝাপটে পড়ছে। শালটাকে ভালো করে মুড়ে নিলাম সর্বাঙ্গে। দুর্বল টনসিল কতদিন এই আবহাওয়া সহ্য করতে পারবে জানি না।

অমিতাভকে বুঝতে হলে সত্তর দশকের কবিদের মেজাজ বুঝতে হবে, বলেছিলেন অরুণ। আবার ড্যানিয়েলও সত্তরের নৃশংসতার জন্য কুখ্যাত। তাহলে কী— কিন্তু অমিতাভ তো প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতেন না! আজকাল কবিতা আন্দোলন, নিওলিট মুভমেন্ট, নিম সাহিত্য — যে যে ধারাগুলো পড়াশোনা করতে গিয়ে জেনেছি, তার কোনোটার মধ্যেই অমিতাভকে পুরোপুরি ধরা যায় না। আবার হাংরি আন্দোলনের প্রভাবও তাঁর মধ্যে পড়েনি। 'নতুন জবার মতো যোনির সুস্থতা' ও 'কাচের টুকরোর মতো ঘামের সুস্থতা, মলয় রায়চৌধুরীর প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার কবিতায় যেরকম শব্দবন্ধ দেখা যায়, সেগুলো অমিতাভ ভাবতেও পারতেন না— যে কটা কবিতা পড়েছি তাতে মনে হয়েছে। তাঁর এমনকি শেষজীবনের রাজনৈতিক কবিতাগুলোও শব্দের ব্যবহারের দিক থেকে পুরোপুরি নাগরিক নয়। হিমেল নাভিমূলে ঝাঁপ দেবে ঘাতক গুবরেপোকা'— নকশাল জমানায় পুলিশি অত্যাচারের আখ্যান হিসেবেও যদি ধরা হয়, তাহলে ও 'নাভি'-র বদলে 'নাভিমূল' শব্দের প্রয়োগ অন্যরকম। শহুরে কাটাকাটা নয়, কিছুটা অতিকথন। রহস্য, পরাবাস্তব, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ — এগুলো দিয়েও পুরোটা ধরা যায় না। ঐতিহ্যের থেকে প্রেরণা? নাহ, বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ মনে পড়ল, অরুণ সেদিন কথায় কথায় সত্তরের একটা কবিতা বলছিলেন। 'আশ্বিন, ধ্বংসবীজের মতো নীলরং আকাশের। নীচে/চালচিত্র, মুখের গর্জনতেল, মনে পড়ে দিদিকে মানাত।/আমরা কয়েকজন আনমনে দেখে নিই সবুজ অসুর/সাবর্ণ চৌধুরীর বাড়ি— কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো প্রতিমা/ সবুজ রঙের অর্থ ঘৃণাঃ আমি আমার বন্ধুর কাছে দ্রুত/ জেনে নিই, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একরকমই লেখা আছে নাকি।/কেউ কি পেয়েছে টের, সবুজ থাবার নিচে রোগাবোকা দিদি/ বিবাহের উনিশ বছর ধরে ক্ষয়ে ঝরে, তারপরে শ্মশানে শুয়েছে।' মিথ, পুরাণের উৎসস্রোত, ভারতচেতনা, সব একাকার। অমিতাভ গুপ্তর কবিতা। কিন্তু যেটা মনে পড়ে চমকে গেলাম, কাকতলীয় কিনা জানি না, অরুণের একটা উপন্যাসে বাড়ির পুজোর প্রতিমাকাঠামোর সিংহের থাবার নীচে শুইয়ে রাখা ছিল গর্জনতেল মাখানো কিশোরীর মৃতদেহ। সেখানেও মিথের ব্যবহার। আবার অমিতাভ মিত্রর একটা কবিতায় এখন দেখতে পাচ্ছি, 'বুলেটের গর্জন। পোড়া ডিজেলের গন্ধ। সেজে ওঠো প্রতিমার মুখ। জেগে ওঠো ছিন্ন শরীর।' আগে হলে অন্যরকমভাবে পড়তাম, নিছক প্রতিবাদের কবিতা। কিন্তু গর্জনতেল আর দুর্গাকাঠামো সম্পর্কিত তিনটে টেক্সটকে পাশাপাশি রাখলে কী দেখছি? মিথ, পুরাণ, সেখান থেকে সমসাময়িক। অরুণ, দুই অমিতাভ, আরও অন্যেরা, সবাই কি

একে অন্যকে এভাবেই প্রভাবিত করছেন? একের টেক্সটে ঢুকে পড়ছেন অন্যেরা? ওইজন্যেই কি বারবার এই কবিতাগুলো পড়তে বলেছিলেন অরুণ? নাহ, মাথাকে শান্ত করা দরকার। সমাহিত অবস্থাতে একে একে সমাধানগুলো আসে আমার কাছে।

আবার রাত্রে স্বপ্নে ফিরে এল অমিতাভ। অমিতাভ, না বাবা, নাকি রামবীরের শান্ত দেহ, বুঝিনি। কিন্তু ওই ধুলোভর্তি ঘর, টেবিলে ওষুধের স্ট্রিপ, মাদার ডেয়ারির কার্ড, আরশোলার জ্বলজ্বল চোখ— আমাকে ঘুমোতে দিল না। অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে থাকলাম, বুঝছিলাম না, স্বপ্ন না বাস্তব। ধ্বংসবীজের মতো নীলরং আকাশের নীচে উনিশ বছর শ্মশানে শুয়েছে। শুতে গেছে যুবারা শ্মশানে। গর্জনতেল মাখা দিদি। সত্তরের গর্জন। সাবর্ণ। বর্ণ। সবুজ। গর্জন। তেল। ডিজেল.....

পরদিন সকাল আটটায় অরুণ চৌধুরীর বাড়ির দরজায় টোকা দিলাম। অরুণ নিজেই দরজা খুললেন। জিনসের ওপর হালকা ক্রিম রঙের পুলওভার চাপিয়ে আছেন। দেখে মনে হলো, আমার জন্যেই বসে ছিলেন। মুখে কিছু বললেন না। ‘বাগানে গিয়ে বসি?' বললাম আমি।

‘দাঁড়ান। কফি বানাই আগে।' অরুণ কিচেনের দিকে গেলেন। কফিমেকারে মেপে কফি বসিয়ে চামচের পিঠ দিয়ে কফির গা সমান করে দিলেন একবার। তারপর জল ঢেলে কাপের দিকে তাকিয়ে আবার ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর।

‘গোবর্ধনকে বহুবার বুঝিয়ে আর পারছি না, কাপ যেন না মেশায়। কিছুতেই শুনবেনা। বাঁদিকের তাক থেকে দুটো খয়েরি রঙের কাপ বার করে দেবেন প্লিজ?'

ফ্লাস্কে করে কফি আর কাপ নিয়ে বাগানের ধারের সেই বারান্দায় এসে বসলাম আমরা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বাম পাশে পাইনের দুর্ভেদ্য জঙ্গল ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে কুয়াশাতে। টুপটাপ ভিজে নেতিয়ে আছে বাগানের ঘাস। অরুণ ভুরু উঁচিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

‘কাল সিদ্ধার্থ আপনাকে ফোনে সব জানিয়েছে, তাই না? আমি যে ড্যানিয়েল লামার বাড়ি গিয়েছিলাম, সে সব?’

অরুণ উত্তর দিলেন না। অমিতাভ মিত্রর হত্যা-রহস্যের সমাধান আমি করেছি। আর সেটা করেছি উপন্যাসের সাহায্য নিয়েই। আপনি যেরকম বলেছিলেন।'

‘সিদ্ধার্থ কিছুটা জানিয়েছে আমাকে। বলুন। আমি শুনছি।'

‘মোটিভ এখনও জানি না। ঠিক যেমন জানি না আনিসুরকে হত্যার মোটিভ। সেটা তবু নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু বাস্তবের মোটিভ তো বানানো যায় না, তাই সেটা আপনার মুখ থেকে শুনব। শুধু জানতে চাই, নিরপরাধ হয়েও আপনি কেন নিজেকে সন্দেহমুক্ত করতে গেলেন না।’

অরুণ নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকলেন। একটা দমকা হাওয়ায় তাঁর মাথার চুল এলোমেলো হয়ে গেল। মুখ নীচু করে কফির কাপে চুমুক দিলাম, যাতে দেখতে না হয়। সেভাবেই উত্তর দিলাম, 'আগে অমিতাভর উপন্যাসে সমাধান আপনাকে বলব। তারপর বলব, সেখান থেকে কীভাবে বাস্তব সমাধানে পৌঁছলাম।'

‘বেশ। শুনছি।'

‘আনিসুরের হত্যায় প্রথম এবং স্বাভাবিক সন্দেহ পড়বে মাধবের ওপর। কিন্তু মাধব খুন করতে পারেন না। কারণ তাঁর অ্যালিবাই ভাঙা যাচ্ছে না। তাহলে প্রশ্ন হলো, আর কে? এমন কেউ, যাকে আনিসুর চিনতেন। আর তাই রাত্রিবেলা নিজের ঘরে ঢুকিয়েছেন। এমন কেউ, যাকে আনিসুর সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। তাই তাঁর জন্য চেয়ার পেতেছেন নিজের হাতে। পর্দা সরিয়ে আলোর ব্যবস্থা করেছেন। এবং তাঁর সামনে অনুগ্রহপ্রার্থীর মতো দাঁড়িয়েছেন। এমন একজন, যাঁর কাছে গাড়ি ছিল না। সবশেষে, এমন একজন, যিনি সতর্ক ছিলেন যেন তাঁর মুখ না দেখা যায়। কারণ হোটেলের বাসিন্দারা তাহলে পরবর্তীকালে তাঁকে চিহ্নিত

করলেও করতে পারেন।

'কে হতে পারেন সেই ব্যক্তি? যিনি-ই হোন না কেন, তাঁর পায়ের ছাপ ছিল আনিসুরের ঘরে। অন্য অনেক ছাপের মধ্যে লুকিয়ে। সেটাই একটা কারণ, আনিসুরের ঘরকে ভেতরে থেকে বন্ধ করে রাখার। যদি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ না থাকত, যদি কেউ খোলা দরজা দিয়ে অথবা দরজার ঠেলা মেরে খুলে আনিসুরের মৃতদেহ আবিষ্কার করত, তাহলে সে প্রথমেই চেঁচামেচি করত। তাতে লোক জড়ো হতো। কিন্তু অনেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো। কাছে যেতে সাহস করতো না। অপেক্ষা করতো পুলিশের। অপরদিকে, যদি ঘর বন্ধ থাকে, সেই ঘরকে খোলার জন্য স্বাভাবিকভাবে অনেক মানুষ জড়ো হবে। ঘর ভাঙার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে অনেকে মিলে ভেতরে ঢোকা। বহুজনের নানারকম পায়ের ছাপ। চেষ্টারটনের ক্লাসিক রহস্যের মতো। একটা গাছের পাতাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়? গাছের মধ্যে। একটা গাছকে কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়? জঙ্গলে। একটা পায়ের ছাপকে কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়? বহু পায়ের ছাপের ভিড়ে। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ ছিল না। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।'

'সেই ব্যাক্তি মাধব হতে পারেন না, কারণ মাধবের কাছে গাড়ি ছিল। মাধব গাড়িও চালাতে পারতেন। সে প্রসঙ্গ উপন্যাসেই আছে। দ্বিতীয়ত, মাধবের মুখ চেনবার প্রশ্নটাই অপ্রাসঙ্গিক। কারণ খুনের দুপুরেই তাঁকে হোটেলের সকলে দেখে নিয়েছে। আর তৃতীয়ত, মাধবের অ্যালিবাই।'

কফিতে চুমুক দিলাম। তারপর বললাম, 'ওপরের ক্রাইটেরিয়া ফলো করেছেন একজনই।'

'বিমল সমাদ্দার।' ধীরে ধীরে বললেন অরুণ।

'বিমলবাবু মাধব আর আনিসুরকে যেভাবে সম্বোধন করেছেন, বোঝা যায় যে তাদের তিনি আগে থেকে চিনতেন। পুলিশের অফিসার হিসেবে আনিসুর তাঁকে সম্ভ্রমের চোখে দেখবেন, তাঁর জন্য চেয়ার জোগাড় করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, স্বাভাবিক। বিমলবাবুকে কিছুতেই নিজের মুখ দেখানো চলত না। কারণ হত্যার তদন্ত করতে তাঁকেই আসতে হবে। কাজেই মুখ দেখালে চিহ্নিত হয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি। সেই জন্যেই মেইন সুইচ অফ করতে হয়েছিল। আর সব শেষে, বিমলবাবু গাড়ি চালাতে পারতেন না। নিজের গাড়িও ছিল না তাঁর।'

অরুণ ভুরু তুললেন।

'প্রণবেশের অ্যাম্বাসাডর দেখে বিমলবাবু কী বলেছিলেন, সেটা আমি বারবার পড়ে এতক্ষণে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি। অনেকদিনের ইচ্ছে, কিনি একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড। কিন্তু গিন্নির বাধা। এই মাগ্গি-গণ্ডার বাজারে আবার ড্রাইভার রাখার খরচ জোগানো তো চাট্টিখানি কথা নয়? বিমলবাবু নিজে গাড়ি চালাতে পারলে ড্রাইভার কেন রাখবেন?'

অরুণের হাসি চওড়া হল। 'শাবাশ!'

আর ঠিক এই কারণেই, বিমলবাবু খুন করে হেঁটে হেঁটে থানায় এসেছিলেন। না, ট্যাক্সি ধরেননি। কারণ অত রাত্রে ঢাউস ব্যাগ নিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি থানার সামনে নামতেন, ট্যাক্সিওয়ালা তাঁকে মনে রাখতো। সাবধানতা অবলম্বন করবার জন্য বিমলবাবু কোনো প্রত্যক্ষদর্শী চাননি। চটি পরে থানায় এসেছিলেন, কারণ আনিসুরের ঘরে পুলিশের জুতোর ছাপ থাকুক, সেটা চাননি। যদি দৈবাৎ এমন হতো যে ঘর ভাঙবার পরেও কেউ ঢুকলো না, আদর্শ নাগরিকের মতো ক্রাইম স্পটকে কনট্যামিনেট করল না, তাহলে পুলিশের জুতোর ছাপ পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, কোন ছাপ কত পুরোনো। অপরদিকে, সাধারণ চটি পরে এলে সেই ভয় নেই। হোটেলের বহু বাসিন্দাই এই ধরনের চটি পরেন। যদি ঘর ভাঙার পর ভেতরে ঢোকেন, মিটেই গেল। যদি নাও ঢোকেন, কলকাতা শহরে এরকম চটি ব্যবহারকারী কয়েক লক্ষ মানুষ আছেন। পুলিশ কাকে ধরবে?

'এবার প্রশ্ন, বিমলবাবু থানায় আসতে গেলেন কেন। এলেন, কারণ তিনি নিঃসন্দেহ হতে

পারছিলেন না। যদি কোনোভাবে মৃতদেহ রাত্রের মধ্যেই আবিষ্কার হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তদন্তের ভার পড়বে সেই সময়কার ডিউটি অফিসারের উপর। বিমলবাবু কোনোমতেই এই খুনের তদন্তভার অন্যের ওপর দিতে চাননি। সেটাও একটা বড়ো কারণ আনিসুরের ঘরকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবার। ঘর ভাঙা হলে সকালবেলার আগে হবে না, এটা বিমলবাবুর হিসেবের মধ্যে ছিল। সেই সময়ে তিনি থানাতে থাকবেন। যদি কোনো গতিকে তার আগে, মানে রাত্রেই ভাঙা হয়ে যায়, সেটাকে ম্যানেজ করবার জন্য রাত্রে থানাতে এসেছিলেন। বারে বারে হাত পা ধুচ্ছিলেন কারণ আমার ধারণা রক্তের কিছু ছিটে তাঁর পায়ে এসে লেগেছিল। যাই হোক, বিমলবাবু যখন দেখলেন যে গভীর রাত অবধি কোনো ফোন আসেনি থানায়, নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

'বন্ধ ঘরের রহস্য নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না। কীভাবে বন্ধ করা হয়েছিল সেটা অপরাধের গৌণ অংশ। হয়তো অমিতাভ উপন্যাসটা শেষ করতে পারলে আমাদের থেকে ভালো কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে যেতেন।' ভুরু কোঁচকালাম। শুধু দুটো জায়গা নিয়ে নিশ্চিত নই। বিমলবাবু কাছ থেকে গুলি করবার জন্য রাইফেল কেন ব্যবহার করলেন। আর জোড়া চিঠির রহস্যটা কী।'

'আমি ভেবে কিছু ব্যাখ্যা বার করেছিলাম। বিমলবাবুকে খুন করতে হলে সার্ভিস রিভলভার ব্যবহার করা চলতো না। সেক্ষেত্রে ব্যালিস্টিক রিপোর্টে ধরা পড়ে যেত। সম্ভবত এই রাইফেলটা তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের। চাইলে চোরাপথে পিস্তল জোগাড় করতেই পারতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে জানাজানি হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। আর হাতে বেশি সময়ও ছিল না। সম্ভবত আনিসুরের বাংলাদেশে ফিরে যাবার দিন এগিয়ে আসছিল। দ্বিতীয়ত, জোড়া চিঠির ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয়েছে, মাধব প্রথম চিঠিটা সত্যিই পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল আনিসুর তাঁকে হত্যা করতে পারেন। বিমলবাবু কোনোভাবে খুনের সন্ধেবেলা মাধবের কাছ থেকে সেটা জানতে পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন যে শুদ্ধসত্ত্ব এবার জড়িয়ে পড়বেই। সে তিনি আনিসুরকে না মারলেও জড়াবে। তিনি যখন আনিসুরকে মারলেন, আনিসুরের টেবিলে একটা খাম দেখেছিলেন। শুদ্ধসত্ত্বর ঠিকানা লেখা। আনিসুর সম্ভবত বিমলবাবুর পর্দা ফাঁস করে দেবার উদ্দেশ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে চিঠি লেখবার পরিকল্পনা করেছিলেন। বিমলবাবু বুঝতে পেরে খামের মধ্যে সাদা কাগজ পুরে পাঠিয়ে দেন। উদ্দেশ্য কিছুই না, গোয়েন্দাকে বিভ্রান্ত করা। শুদ্ধসত্ত্ব যখন জড়িয়েই পড়েছে, তাকে ঘেঁটে দেওয়া যাক।'

মাথা নাড়লাম। সম্ভব।

'কিন্তু খুনের মোটিভ? সেটা নিয়ে কি কিছু ভেবেছেন?' অরুণ জিজ্ঞাসা করলেন। — মোটিভ কি এই উপন্যাসে জরুরি? অমিতাভ থাকলে সম্ভবত অনেক শক্তিশালী মোটিভ দিতে পারতেন। আমার যা মনে হয়েছে, বিমলবাবু যখন মিলিটারিতে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে মাধবের পরিচয় হয়েছিল। মাধব থেকে আনিসুর। কোনোভাবে বিমলবাবুও কোকেন পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে যান। এখনও জড়িত ছিলেন কিনা জানি না, তবে আনিসুর সম্ভবত দুজনকেই ব্ল্যাকমেইল করতেন। এবার, আনিসুর যখন দেখলেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন, ভাবলেন চিঠি লিখে বিমলবাবুর মুখোশ খুলে দিয়ে যাবেন। একরকম প্রায়শ্চিত্ত করবেন তাঁর পাপের। বিমলবাবু বুঝতে পেরে আনিসুরকে মেরে দেন। কিন্তু মোটিভ জরুরি নয় এই কারণে বলছি, এর বদলে অন্য কোনো মোটিভ হতেই পারত। হয়তো আনিসুরকে আইন ধরতে পারেনি কখনো, আর আজ সে মরে যাচ্ছে শাস্তি না পেয়েই। বিমলবাবু তাই তাকে আইন-বহির্ভূত শাস্তি দিলেন। অথবা হয়তো বিমলবাবু ফাঁসাতে চেয়েছিলেন মাধবকে। আনিসুর সেখানে তাঁর বোড়ে ছিল মাত্র। এটা তৃতীয় মোটিভ। এরকম আরও অনেক অনেক...

'বুঝেছি। আমিও যে মোটিভ নিয়ে বিশেষ ভেবেছিলাম এমনটা না। তবুও আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম, কী ধরনের হতে পারে।'

'এবার আমি কীভাবে এই উপন্যাস থেকে অমিতাভ মিত্রর হত্যা রহস্যে এলাম? ব্যাপারটা কাকতলীয়। কারণ উপন্যাস আর বাস্তবের মধ্যে এমন মিল তো এভাবে সম্ভব নয়, হয়তো এই দুটোর মধ্যে তেমন সম্পর্কও নেই। আপনি ওভাবে না বললে আমিও তলিয়ে পড়তাম না। কিন্তু হয়তো সম্পর্ক আছে, এটা ভেবে পড়েছি বলেই মিলগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আনিসুরের হত্যা আর অমিতাভ হত্যার মধ্যে অদ্ভুত মিল। অরুণ আর মাধবের ব্যাপারে আগেই বলেছি। দুজনেরই স্ট্রং অ্যালিবাই ছিল। দুই ক্ষেত্রেই পায়ের ছাপ নিয়ে একটা ধাঁধা ছিল। তদন্তকারী অফিসার দুই ক্ষেত্রেই খুনের রাত্রে থানায় এসেছিলেন, ডিউটি না থাকা সত্ত্বেও। দুজনের পায়েই ছিল চটি। ড্যানিয়েল যেমন বারবার বলে আসছিলেন যে অরুণ চৌধুরীই খুনি, বিমল সমাদ্দার ও মাধবের দিকেই সন্দেহ নিয়ে যেতে চাইছিলেন। দুই ক্ষেত্রেই মৃতদেহ আবিষ্কার হয়েছিল দুই দিন পর, যার ফলে খুনের একজ্যাক্ট সময় বার করাটা দুই ক্ষেত্রেই একটা বড়ো সমস্যা। এ ছাড়াও মিল যেটা, তা হলো ড্যানিয়েলও বিমল সমাদ্দারের মতোই গাড়ি চালাতে পারেন না। আনন্দ পাঠক বলেছিলেন প্রথম দিনেই।'

'এই মিলটাই আমাকে সবার প্রথমে ভাবিয়েছিল, যখন পাণ্ডুলিপিটা পড়ি। বললেন অরুণ।

'পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল, অমিতাভ মিত্র বড্ড বেশি করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, অপরাধী কে। বিমলবাবুর উপর জোর করে সন্দেহ এনে ফেলেছেন। এতে করে যা হয়, শুদ্ধসত্ত্বের মতো গোয়েন্দার সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার রাস্তাটা ট্রিভিয়ালাইজড হয়। পাঠক অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করতে শুরু করে দেয়। যাই হোক, সেটা লেখার দুর্বলতা। অমিতাভ তো আর পাকা রহস্য লিখিয়ে ছিলেন না। কিন্তু যখন থেকে আমি বিমলবাবুকে সন্দেহ করতে শুরু করলাম, মনে একটাই প্রশ্ন বারবার উঁকি দিচ্ছিল। সমস্যা যদি একই ধরনের হয়, সমাধানও কি একই ধরনের হবে না? বিমলবাবু যদি হত্যাকারী হন, ড্যানিয়েল লামাও কি তাহলে হত্যাকারী?

'এতদিন আমার সন্দেহের অভিমুখ ছিল স্বাভাবিকভাবেই আপনার দিকে। কিন্তু ড্যানিয়েল লামাকে যখন থেকে ভাবনার পরিসরে আনতে শুরু করলাম, জটগুলো কাটতে শুরু করল। বাগানে গামবুটের ছাপ। বাগানে ঢুকেছে, একপাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, তারপর বেরিয়ে গেছে। পুলিশের গামবুট। ড্যানিয়েল লামাকে সেদিন রাত পৌনে দশটার সময়ে জলাপাহাড় রোডে অনেকেই দেখেছে। আবার রাত একটা নাগাদ জলাপাহাড় রোড দিয়েই বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে তাঁকে হাঁটতে দেখেছেন আপনার পরিচিত বীরবিক্রম তামাং। ড্যানিয়েল আড়াইটের সময়ে থানায় এসেছেন। তাঁর পায়েও ছিল চটি। আর অদ্ভুতভাবে, কেস থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। এর কয়েক মাসের মধ্যেই ড্যানিয়েল চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন।'

কফি ঢেলে নিলাম। সারারাত বসে ভেবেছি। এখন ক্লান্তি গুঁড়ি পায়ে এগোচ্ছে শরীর জুড়ে।

'আর একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, সেটা হলো বুলেটের ব্যবহার। গতকাল পুলিশের লাইব্রেরিতে গিয়ে বুলেটের রকম সম্বন্ধে জেনেছি, আর তারপর বাকিটা গুগল।' অরুণকে বিশদে বললাম। অরুণ কোনো উত্তর দিলেন না। নিবিষ্টমনে শুনছিলেন।

'এই টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোকে যদি সুতো দিয়ে বোনা যায়, তাহলে কীরকম ছবি পাওয়া যেতে পারে? ১১ জুন রাত্রিবেলা অমিতাভ আর ড্যানিয়েল দুজনেই আপনার বাড়ি এসেছিলেন। সেখানে দুজনের উত্তেজিত কথা কাটাকাটি হয়।

ড্যানিয়েল বাগানে দাঁড়িয়েছিলেন। অমিতাভ আর আপনি লনে। তাই আপনাদের পায়ের ছাপ বাগানে পড়েনি, কিন্তু ড্যানিয়েলের পড়েছিল। অমিতাভ আপনার রাইফেল বার করে ড্যানিয়েলকে গুলি করতে যান। আপনি বাধা দেন। ধস্তাধস্তিতে আপনার হাত আঁচড়ে দেন অমিতাভ, আর রাইফেল থেকে গুলি বেরিয়ে গিয়ে অমিতাভর হাতে লাগে। অমিতাভ ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যান। আপনি তাঁর পিছু পিছু গিয়েও থামাতে পারেননি। ড্যানিয়েল নিজের

রেনকোটের ভেতর থেকে আপনার চুরি যাওয়া রাইফেলটা বার করেন। এবার প্রশ্ন হলো, ড্যানিয়েল সেটাকে পেলেন কী করে। তিন বছর আগে চুরি যাওয়া রাইফেল, ড্যানিয়েল সেটাকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। এর আগে আপনাদের বাড়ি ড্যানিয়েল এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। চা-বাগান সংক্রান্ত ঝামেলা মেটাতে বেশ কয়েকবার এসেছেন। দাদার বাড়িতে, আমার বাড়িতেও। এই রাইফেল চুরি যাবার কেসটাতেও এসেছিলেন।'

'তার মানে তিনি জানতেন, জোড়ার একটা নেই। এই রাইফেল সম্বন্ধে আমি কিছু পড়াশোনা করেছিলাম। রেমিংটনের এই মডেলটা রেয়ার, যেটা জোড়ায় মিলত। এখন আর পাওয়াই যায় না। ড্যানিয়েলের শখ হলো আগ্নেয়াস্ত্র। নিয়মিত ক্যাটালগ দেখে নিজেকে আপডেটেড রাখেন। হয়তো চোরাবাজারে সন্ধান লাগিয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই রাইফেল তখনও ক্রেতার ঘরে গিয়ে ওঠেনি। ড্যানিয়েল সেটাকে নিজের জিম্মায় এনেছেন। এটা একটা সম্ভাবনা। আর একটা সম্ভাবনা হলো, পুলিশ চোরাবাজার থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল। ড্যানিয়েল তাদের মধ্যে থেকে আপনার রাইফেলের যমজটিকে চিনতে পেরে তুলে আনেন। হয়তো কালেকশনের শখ বলেই আপনাদের হাতে আর দেননি। নিজের কাছে রেখেছিলেন। যেটাই হোক না কেন, ড্যানিয়েল সেদিন রাইফেলটাকে নিয়ে এসেছিলেন আপনার ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্যে। হয়তো অমিতাভকে তিনি প্রোভোক করেছিলেন রাইফেল বিষয়ে কোনো খোঁচা মেরে। স্বভাবপাগল এবং উত্তেজিত অমিতাভ ঘরে টাঙানো রাইফেল হাতে নিয়ে ড্যানিয়েলকে মারতে যান। তারপর যেটা হলো আগেই বলেছি। অমিতাভ বেরিয়ে যাবার পর ড্যানিয়েল অন্য রাইফেলটি বার করে ঘরের ভেতর গুলি ছোঁড়েন।

আলমারির ওপর রাখা কাচের জারটি ভেঙে যায়। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ মিসেস বাসু শুনতে পেলেন না কেন। সেদিন বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি পড়ছিল। ঘন ঘন বাজের আওয়াজের সঙ্গে গুলির আওয়াজ গুলিয়ে ফেলা স্বাভাবিক ছিল। তাহলে প্রথম গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন কী করে? কারণ সেই গুলিটা বাগানে চলেছিল। আর দ্বিতীয় গুলি আপনার বাড়ির ভেতরে, যখন মিসেস বাসুও নিজের ঘরে ঢুকে গিয়েছেন পুলিশকে ফোন করবেন বলে। তাঁর পক্ষে নিজের ঘর থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা আপনার বাড়ির ভেতর গুলির আওয়াজ ঘন ঘন বাজ পড়বার রাতে আলাদা করে চিনতে না পারারই কথা। ড্যানিয়েল গুলি করে বললেন, এই গুলিটা চালানো হলো অন্য গুলিকে ঢেকে দেবার জন্য। তারপর রাইফেলের নল আপনার দিকে ঘুরিয়ে হুমকি দিলেন, যদি এই ব্যাপারে মুখ খোলেন, তাহলে গুমখুন হতে আপনারও বেশি সময় লাগবে না। আর নির্দেশ দিলেন, এই বাড়িতে অমিতাভ যে এসেছিলেন, তার চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। পায়ের ছাপ যেন পুলিশ আসার আগে মুছে দেন। আপনি ভয় পেয়েছিলেন। কেন, সেটা জানি না। কিন্তু এখানে একটা চাল চাললেন। ড্যানিয়েলের খুঁটি হবেন না ঠিক করলেন মনে মনে। ড্যানিয়েলের সামনে অমিতাভর আসার পায়ের ছাপ জল দিয়ে মুছে দিলেন। ড্যানিয়েল অত খেয়াল করলেন না, করলে দেখতে পেতেন যে অমিতাভর যাবার পায়ের ছাপ আপনি মোছেননি। আপনি হয়তো চাইছিলেন পুলিশ আবিষ্কার করুক যে অমিতাভ এই বাড়িতে এসেছিল। আরও যেটা ইচ্ছাকৃত ভুলে গেলেন, তা হলো ট্রিগার থেকে অমিতাভর আঙুলের ছাপ মুছতে ড্যানিয়েল যাবার আগে আপনাকে একজোড়া জুতো দিয়ে বলে গিয়েছিলেন সেগুলো দিয়ে বাগানে নকল ছাপ বানাতে হবে। প্রশান্ত গুরুঙের জুতো সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলেন ড্যানিয়েল। প্রশান্তকেও আগে থেকে গল্প তৈরি করে রাখবার নির্দেশ দেন। সেই গল্পটাই আপনাকে বলে গেলেন, যাতে দুজনের ভাষ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তার মানে, ড্যানিয়েল আগে থেকেই গল্প তৈরি করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ এই খুন পূর্বপরিকল্পিত হবার সম্ভাবনাই বেশি। আমি প্রথম থেকে ভাবছিলাম যে প্রশান্ত গুরুংকে টাকা খাইয়েছেন আপনি। এটা ভাবিনি যে টাকার থেকে অনেক বড়ো অস্ত্র হলো পুলিশকে হুমকি। বিশেষ করে সেই পুলিশ যদি সত্তর দশকের নির্মম ড্যানিয়েল হয়। প্রশান্ত হুমকির মুখে ড্যানিয়েলের

কথামতো কাজ করলেন। বলাই বাহুল্য, প্রশান্ত গুরুংকে ড্যানিয়েলের দরকার হয়েছিল প্রথম গুলির ব্যাখ্যার জন্য। আপনি ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু এটাও বুঝেছিলেন যে ড্যানিয়েল যেভাবে ঘরের ভেতর গুলি ছুঁড়ে গল্প সাজিয়েছেন, তাতে করে আপনি বেঁচে যাবেন। কাজেই প্রশান্ত গুরুংকে আপনিও আঁকড়ে ধরলেন। বাগানের ঘাসে রক্তটা মনে হয় খেয়ালে আসেনি আপনাদের কারোর নাকি ওটাও ইচ্ছাকৃত? ড্যানিয়েলের ওপর আর একটা শেষ কিস্তি নিজে মারতে চেয়েছিলেন, তাই কি? ওটা মুছে দিলেই পুলিশ আপনাকে থানায় নিয়ে যেত না। কিন্তু ভাগ্যিস নিয়ে গিয়েছিল! নাহলে আপনার অ্যালিবাইটা তৈরি হতো না যে! নাকি অমিতাভ খুন হবেন, সেটা আন্দাজ করেই চিহ্নগুলো মোছেননি, যাতে থানায় গিয়ে আপনার অ্যালিবাই তৈরি হয়? ড্যানিয়েল জলপাহাড় রোড ধরে নেমে গেলেন। সেই সময়ে অনেকেই তাঁকে দেখেছে। এবার প্রশ্ন হলো, ড্যানিয়েল গেলেন কোথায়। অমিতাভই বা কোথায় গেলেন। অনুমান করছি, জলাপাহাড় রোডের কোনো এক প্রান্তে ড্যানিয়েলের গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। সঙ্গে ছিল চালক। ড্যানিয়েল গাড়িতে উঠে অমিতাভকে ধাওয়া করলেন। সেটা কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ অমিতাভ যেদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, তার পাঁচ মিনিট পরে বেরোলেও সঙ্গে গাড়ি থাকলে অমিতাভকে ধরে ফেলা সম্ভব। সম্ভবত অমিতাভ ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাত থেকেও রক্ত ঝরছিল। ড্যানিয়েল গাড়ি নিয়ে অমিতাভকে ধরে ফেলেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো, খুন হয়তো পূর্বিপরিকল্পিত ছিল না। ড্যানিয়েল তখনও হত্যা করবেন কিনা মনস্থির করতে পারেননি। তিনি অমিতাভকে ধাওয়া করবার বদলে নিজের বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অমিতাভ ড্যানিয়েলের বাড়ি এসে হাজির হন এবং হুমকি দেন যে তিনি থানায় ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবেন। যে কারণেই হোক না কেন, অমিতাভর মুখ বন্ধ করা ড্যানিয়েলের পক্ষে জরুরি ছিল। কিন্তু আমার নিজের ধারণা হত্যা পরিকল্পিত। প্রশান্ত গুরুঙের জুতো সেই কারণেই ড্যানিয়েল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। প্রশ্ন উঠবে, আপনার কাছেও তো সেই জুতো থাকতে পারতো। কিন্তু হত্যার পরিকল্পনা যদি আপনি না করেন, তাহলে প্রশান্ত গুরুঙের জুতো খামোখা আপনার কাছে থাকবে কেন? আর যদি আপনি হত্যার পরিকল্পনা করেন, নিজের বাগানে এরকম সিন ক্রিয়েট না করে অমিতাভকে গোপনে মেরে দিলেন না কেন? সেটা তো অনেক সহজ পন্থা হতো।'

'ড্যানিয়েলই জুতো সঙ্গে করে এনেছিল। আপনার প্রথম অনুমান ঠিক। পুরোটা প্ল্যান করে হয়েছে। ওর উদ্দেশ্য ছিল হয় আমাকে, নাহলে প্রশান্তকে ফাঁসাবে। সেটা পরে বুঝেছি।'

বড়ো একটা নিশ্বাস ফেললাম। এই প্রথম অরুণ চৌধুরী স্বীকার করলেন, খুনটা ড্যানিয়েল লামা করেছেন।

'তাহলে, ড্যানিয়েল কোনোভাবে অমিতাভর সন্ধান পান। অবশ্য সন্ধান এমনিতেও পেতেন, কারণ অমিতাভকে আর কোথাও না পেলে তাঁর আস্তানাতেই মিলতো। অমিতাভর পকেটে মদের বোতল ছিল। হাতে গুলি খেয়ে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছেন, ব্যাথা ভুলতে মদ খাচ্ছিলেন। হয়তো জলাপাহাড় রোডের একপাশে দাঁড়িয়ে ব্যাথায় গোঙাতে গোঙাতে মদ ঢালছিলেন গলায়, যাতে অনুভূতিগুলো অসাড় হয়ে যায়। এটা অনেক বক্সার এবং রেসের মাঠের জকির পুরোনো অভ্যেস। শারীরিক ব্যথা ভুলতে অনেকটা কড়া রাম একসঙ্গে খেয়ে ফেলা যাতে স্নায়ু অবশ হয়ে যায়। যাই হোক, এই মদ খাবার সময়ে ড্যানিয়েল তাঁকে তোলেন। অমিতাভকে নিয়ে ওল্ড সেমেট্রিতে আসেন। গাড়ি ছেড়ে দেন কারণ সাক্ষী থাকলে চলবে না। ঝোড়ো বৃষ্টির রাত্রে সাবধানে গাড়ি চালালেও ওল্ড কার্ট রোডের কবরখানায় সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। তাহলে সাড়ে দশটা থেকে রাত অন্তত বারোটা, ড্যানিয়েল অমিতাভকে নিয়ে করলেনটা কী? এই জায়গাটায় আমি ধাঁধায়। আমার নিজের ধারণা, কিন্তু সেটা ভুলও হতে পারে, ড্যানিয়েল প্রথম অমিতাভকে জেরা করছিলেন— সে কতটা জানে পুলিশের কুকীর্তি। তারপর তাকে মারছিলেন। প্রচণ্ড আক্রোশে অমিতাভকে

কিল চড় লাথি ঘুষি মারতে পারেন। অথবা অমিতাভর সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়েই কোনো ছুরি দিয়ে অমিতাভর হাতে আঘাত করতে পারেন। উদ্দেশ্য ছিল, যে হাত দিয়ে অমিতাভ লেখেন, সেটা কেটে ফেলা। সেই কারণে কবজির কাছে কাটা ছিল। কেন এমন করেছিলেন, সেটা জানি না। আপনি বলতে পারবেন হয়তো। কিন্তু সম্বিত ফেরবার পর ড্যানিয়েল দেখলেন, এতে সমস্যা বাড়বে। আগেই অমিতাভর হাতে গুলি লেগেছে, তার রক্তক্ষরণে অমিতাভ দুর্বল হয়ে গেছেন। এরপর আরও বেশি রক্তপাত যদি হয়, অমিতাভ তাতে অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। মারাও যেতে পারেন। কিন্তু যদি অরুণের ঘাড়ে দোষ চাপাতে হয়, তাহলে এখনই অমিতাভ মারা গেলে অরুণ অ্যালিবাই পেয়ে যাবেন। ড্যানিয়েল জানতেন, অরুণের বাড়ি পুলিশ আসতে পারে। অন্তত ঘণ্টাখানেক থাকবে। কাজেই, অমিতাভকে বারোটার আশেপাশে মরতে হবে। কারণ হত্যা করতে গেলে পুলিশ চলে যাবার পর অরুণকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কার্ট রোডে আসতে হবে। পুলিশ যদি এগারোটার সময়ে বেরিয়ে যায়, তারপর অরুণকে এখানে আসতে আসতে এই ঝড় বৃষ্টির দিনে, বারোটাই বাজার কথা। কিন্তু এই পুরোটা আমার নিজের অনুমান। আপনি সত্যিটা জানলে বলুন।'

অরুণ জোরে নিশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'ভাবতে পারছি না! এতটা অত্যাচার! আমিও এ ব্যাপারে জানি না। অনেকবার ভাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এত নিখুঁত ভাবে আপনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, মনে হচ্ছে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পুরোটা।'

'অমিতাভর কবজিতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে তাঁকে ফেলে রাখা হলো। ব্যান্ডেজ সম্ভবত ড্যানিয়েল নিয়েই বেরিয়েছিলেন। বাকি রক্ত বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেল। অমিতাভ ঝিমিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েক পর, রাত বারোটার আশেপাশে অমিতাভকে গুলি করলেন ড্যানিয়েল। নিজের সংগ্রহের রিভলভার দিয়ে। কিন্তু বুলেট ছিল পুলিশের হেফাজত থেকে আনা। এখানেই ভুলটা করেছিলেন। মুখে গুলি করলেন, কারণ অমিতাভর প্রতি তাঁর ঘৃণা এতই তীব্র ছিল যে মুখটাকে নষ্ট করে দিতে চাইছিলেন। তারপর লাশ উপুড় করে দিলেন, যাতে মুখ দেখতে না হয়। এই ঘৃণার কারণ আমি জানি না। আপনি হয়তো জানেন। মুখে গুলি করার আর একটা কারণ হতে পারে, লাশ শনাক্ত করতে সময় লাগবে। যে কোনো কারণেই হোক, ড্যানিয়েল নিজের জন্য কিছুটা সময় চাইছিলেন। এরপর চিহ্ন লুকোবার পর্যায়। যেহেতু অরুণ মিসেস বাসুর সামনে অমিতাভর নাম ধরে ডেকেছেন, ড্যানিয়েল জানতেন অমিতাভর খোঁজ হবেই। হয়তো পুলিশ কুকুরও আনা হতে পারে। বডি খুঁজে পাওয়া যাবে, আর কুকুর সেখান থেকে গামবুটের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিকই পৌঁছে যাবে ড্যানিয়েলের বাড়ি। কাদায় ড্যানিয়েলের বুটের ছাপ পড়েছিল, কিন্তু সেটাকে ম্যানেজ দেওয়া যায়। কারণ যখন পুলিশ বডির সন্ধান পাবে, তাদের বুটের ছাপের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া যাবে নিজের জুতোর ছাপ। আবারও, অমিতাভর উপন্যাসের সঙ্গে মিল আর ঠিক এই কারণেই, বিমলবাবু যেমন তদন্তের ভার অন্যের হাতে ছাড়তে চাননি, ড্যানিয়েলও চাননি। সেই কারণেই থানায় এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তদন্ত নিজের হাতে নেওয়া। ক্রাইম স্পট কন্টামিনেট করে দেওয়া। এবার, বুট পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাবে না। কুকুর সন্ধান পাবে। সঙ্গে গাড়ি নেই। ড্যানিয়েল গাড়িও চালাতে পারেন না। তাহলে উপায়? উপায় একটাই, বুট খুলে হাতে নেওয়া। কিন্তু রাস্তা দিয়ে এভাবে হেঁটে গেলে লোকের চোখে পড়বে। ড্যানিয়েল নিজের রেনকোট খুলে ফেললেন। সেটাকে বস্তা বানিয়ে ভেতরে বুট ভরে ফেললেন। মনে রাখতে হবে, বুটকে আশেপাশে কোথাও ফেললে চলবে না, কারণ পুলিশের কুকুর। ফেলতে হবে দূরে কোথাও। ড্যানিয়েল নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। বাড়ি তাঁকে যেতেই হতো। কারণ জামা প্যান্টেও রক্ত লেগেছিল। সেগুলোকে খুলে ফেলে হাপিশ করতে হবে। বীরবিক্রম যখন ড্যানিয়েলের হাতে প্লাস্টিকের ঝোলা দেখেছেন, তখন ড্যানিয়েল নিজের বাড়ির দিকে খালি পায়ে হাঁটছেন। হাতের রেনকোটের ঝোলায় বুটজোড়া। বৃষ্টিতে ভিজছেন। বাড়ি এসে পোশাক পালটালেন। স্নান করলেন।

তারপর থানায় বেরোবার জন্য তৈরি হলেন। থানায় আসার কারণ আগেই বলেছি। এই কেস নিজের হাতে নিতে হবে। কিন্তু পুলিশের গাড়ি নিলেন না। কারণ জামাকাপড় এবং জুতোজোড়াকে ফেলতে হবে। তার সাক্ষী রাখা চলবে না। হেঁটে থানায় এলেন। চটি পরেছিলেন, কারণ খালি পায়ে কার্ট রোড থেকে নিজের বাড়ি আসতে গিয়ে তাঁর পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। পায়ে সম্ভবত মলম লাগিয়ে সেটাতে হাওয়া লাগাতে চাইছিলেন। চাপা জুতোর মধ্যে ক্ষতবিক্ষত পায়ের পাতা ঢোকালে আরও বেশি যন্ত্রণা হতো। খোলামেলা চটি সেক্ষেত্রে অনেক বেশি সুবিধেজনক, বিশেষত যেখানে তাঁকে আবার বেশ খানিকটা রাস্তা হাঁটতে হবে। সেই জন্যই খোঁড়াচ্ছিলেন, কারণ পা কেটে গিয়েছিল। মাঝে কোনো এক নির্জন খাদের ধার দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিলেন অপরাধের চিহ্ন সমস্ত জামাকাপড়। কিন্তু থানায় এসে স্তম্ভিত হয়ে ড্যানিয়েল দেখলেন অরুণকে, মানে আপনাকে আটক করা হয়েছে। ব্যাপারটা তাঁর হিসেবের বাইরে ছিল কারণ বাগানের ঘাসে রক্তের দাগ তাঁর খেয়ালে আসেনি। এটাও বোঝেননি যে অরুণ তাঁকে পালটা চেকমেট করবেন। পুরো প্ল্যান ভেস্তে যাবার উপক্রম, কারণ আপনি অ্যালিবাই পেয়ে গেছেন। ঠিক এই জায়গা থেকেই গল্পের মোড় ঘুরে গেল।

‘এতক্ষণ যা যা বললাম, তার মধ্যে ঋষি রোডের বাড়ি একটা অন্যতম জায়গা অধিকার করে আছে। ড্যানিয়েল নকশাল জমানার তরুণদের লাশ গায়েব করতেন এই বাড়ির আশেপাশের জঙ্গলে। তাই বাড়িটা তিনি চিনতেন। কিছুদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন, যাতে এখানে বসে পুরো প্ল্যান করতে পারেন। প্ল্যান মানে, বাজেয়াপ্ত রাইফেল, প্রশান্ত গুরুঙের জুতো, খুনের পিস্তল ইত্যাদি রেখে দেওয়া। শুধু সেটাই না, তাঁর অন্যান্য অপরাধের সাক্ষ্যগুলোকেও হয়তো রেখে দিতেন এখানেই। অথবা সন্দেহভাজনদের বাড়ির ভেতর ঢোকাতেন জেরা করবার জন্য। নকশাল জমানায় এরকম প্রচুর গোপন বাড়ির সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলোকে পুলিশ টর্চার সেল হিসেবে ব্যবহার করতো। আনন্দ পাঠক ও বলেছিলেন যে ড্যানিয়েলের জিম্মায় এরকম কয়েকটা আস্তানা ছিল সেই সময়টায়। রামবীরের ওই কারণেই প্রবেশাধিকার ছিল না বাড়ির ভেতর। ড্যানিয়েল হয়তো ভেবেছিলেন অমিতাভকেও এখানেই মারবেন। কিন্তু তাহলে অরুণের ওপর সন্দেহ ফেলা মুশকিল ছিল। কোনো এক রাত্রে এখানে থাকবার সময়ে নিছক খেয়ালের বশে দেয়ালের গায়ে ছবিটা এঁকেছিলেন। ছবির মূর্তির মাথায় টুপিটা দেখেই সন্দেহ প্রথম হয়েছিল ড্যানিয়েলের উপর। সাধারণ মানুষ কেন টুপি পরবে খামোখা? টুপি পরে পুলিশ। ড্যানিয়েল নিজের পুলিশ-সত্তা নিয়ে এতই সচেতন ছিলেন যে ছবিতেও নিজেকে অজান্তে প্রকাশ করে গিয়েছেন। কেন ছবিটা এঁকেছিলেন, সেই কারণ আজ আর জানা যাবে না। সম্ভবত প্রবল ঘৃণা থেকে উদ্ভূত জিঘাংসা।'

অনেকটা বলার পর থামলাম। প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফির অবশিষ্টাংশ এক চুমুকে শেষ করে বললাম, ‘বাকি গল্পটা আপনি বলবেন। কী ছিল এই হত্যার মোটিভ। ড্যানিয়েলের ঘৃণার কারণ কী ছিল। আপনিই বা কেন মুখ খোলেননি। বরং নিজেকেই হত্যাকারী হিসেবে দাবি করেছিলেন। এবার আপনার বলার পালা। আর আমি শুনব।'

ঘন তন্দ্রায় ঢেকে আছে চারপাশ। টুপটাপ করে টালি থেকে কুয়াশা ঝরে পড়ছে। পাশের নির্জন ভৌতিক জঙ্গল স্তব্ধ। চরাচর জুড়ে এই অপার্থিব নির্জনতার মধ্যে অরুণকে দেখে মনে হচ্ছিল, নিঃসঙ্গ একটা পত্রহীন বৃক্ষ। আমার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে অজান্তেই যার বয়স অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। অজস্র বলিরেখা দেখা দিয়েছে মুখ জুড়ে। ভেঙেচুরে যাচ্ছে পাথরখণ্ড। কপালের ওপর ঝুলে পড়া চুল থেকে প্রাণপণে চোখ সরিয়ে নিলাম। দেখবো না কিছুতেই।

বেশ অনেকটা সময় নীরব থাকার পর অরুণ বলতে শুরু করলেন।

অনুষ্টুপের জন্য একটা গল্প লিখতে হতো। তোমাকেও পাঠালাম এক কপি। পড়ে মতামত দিও, তারপর ওদের জন্য ডাকে ফেলব।

১৯/০৬/১৯৭৪

প্রিয় সঞ্জয়,

আমার সাক্ষাৎকার বেরোবার পর কিছু প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি। সবটাই বিরূপ এমন না হলেও, বাঁকা চোখ চিহ্নিত করবার ক্ষমতা কিছুদিন সামান্য লেখালেখির সূত্রে আয়ত্ব হয়েছে। সেগুলোকে উপেক্ষা করাই যেত, তবে আমারও দায় থেকে যায় নিজের অবস্থান খোলাখুলি বলবার। কেন বড় কাগজে আমরা ডাক পাই না, সেই ক্ষোভেই যদি এমন অভিযোগ করে থাকি বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন, এবং তাদের মধ্যে যদি একজনও থাকেন যিনি অবাণিজ্যিক কাগজের তন্বিষ্ঠ পাঠক, তাহলে তাঁকে রিচ করা লেখকের কর্তব্য বলেই মনে করি। এর মধ্যে যেটা হয়েছে, উল্লিখিত সংবাদপত্র নাকি বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে আমার লেখা ছাপবে না। অরুণেরও নয়। ওর কী মনে হবে জানি না, কিন্তু এর ফলে যদি আমি খুব ভেঙে পড়েছি বলে ভাবা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে নিজের অবস্থান আমিই স্পষ্ট করিনি, এ কথাও জোরের সঙ্গে বলতে পারিনি যে আমরা বড় কাগজের শারদীয়ার মুখ চেয়ে লেখালেখি করি না। আমি একটা লেখা পাঠালাম, যদি তুমি মনে করো তোমার কাগজে ছাপাতে পারবে, বার করে দিও। যেহেতু সাক্ষাৎকার তোমার কাগজে বেরিয়েছিল তাই রিজয়েন্ডার ওখানেই আসা উচিত। তবে আমার মনে হয় না এত ছোটো ব্যাপারকে তোমরা প্রকাশ করবে। যদি মনে হয় কাটছাঁট করে চিঠি আকারে প্রকাশ করতে পারবে, সেটাই করে দিও। তবে যা যা লিখেছি, সেগুলো সত্যিই প্রকাশ করবে কিনা তোমার কাগজ, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। না করলেও তোমাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা এদিক থেকে নেই, কারণ এদের চরিত্র সম্পর্কে আমি সম্যক ওয়াকিবহাল

উপন্যাসের ব্যাপারে তোমাকে বলেছিলাম, ওটা হয়ে এসেছে। কম্পোজের জন্য পাঠিয়ে দিতে তাড়া দিচ্ছে ওরা। যদি এ বছর বেরোয়, তাহলে কলকাতা যাব হয়তো। তোমার জন্য এক কপি অবশ্যই তোলা থাকবে। দেখা হবে তখন।

—অমিতাভ

তোমার সত্যিই মনে হয় এ লেখা ছাপাতে পারবে? আমার মনে হয় না। তবুও পাঠালাম, অন্তত একটা ডকুমেন্টশন থাকুক।

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে

আমি কারোর নাম নেবনা। না কোথাও সংবাদপত্রের, না তাদের পোষা লেখক কবিদের। একেই মনে করা হচ্ছে আমি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলায় নেমেছি। সেটাকে আর বাড়তে দেব না।

আমরা অনেকেই যখন আজ থেকে বছর দশেক আগে লিখতে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম পৃথিবী উলটে দেব। এখন দেখতে পাচ্ছি, ঘরের কোণা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবার ক্ষমতাও লেখালেখি করার মাধ্যমে অর্জন হয় না। স্বভাবতই এই আত্ম-আবিষ্কার জরুরি হলেও বেদনাদায়ক। আবার স্বাভাবিকও বটে। সমাজ সাহিত্য ও সভ্যতার ঝোঁক যে এভাবে পাল্টানো যায় না সেটা উন্মোচিত হবার পর কেউ লেখা থামিয়ে দেয়, কেউ চলে যায় কনভেনশনের নিরাপদ পক্ষপুটের তলায়, আবার কেউ কেউ অভ্যাস অথবা জেদের বশেই নিজেকে পাল্টাতে পারে না। এরকম সব যুগেই হয় ও হয়ে চলেছে।

কিন্তু এতটা স্বাভাবিককে গ্রহণ করে নেবার পরেও দু চারটে কথা থেকে যাচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই বিশ্বাস করি না যে অবস্কিওরিটি একজন লেখকের সাধনার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। লেখার পর যদি কানেক্ট করতে না চায় তাহলে ছাপাবার দরকার থাকে না,

লিখে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলেই হয়। অখ্যাতি ও হা হা অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে রাজপুত্রের তরবারি, এমন রোমান্টিকতাতেও সহমত পোষণ করি না। কিন্তু তারপরেও, ক্রমে ক্রমে একটা ভাষার সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে গুটিকয় সংবাদপত্র এবং তাদের অধীনে থাকা কিছু বাণিজ্যিক পত্রিকা, এই ঘটনাটাকে চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে যদি না দেওয়া যায়, এবং কীভাবে একজন কমিটেড লেখককে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে সেটাকে যদি চিহ্নিত না করা যায়, তাহলে অন্যধারার লেখালেখির পরিণতি সেটাই হতে পারে, পঞ্চাশের দশক থেকে যা হয়ে এসেছে। কেরিয়ারের শুরুতে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গা গরম ভাষণ শুনিয়ে তারপর যেই বিগ হাউসে লেখার সুযোগ মিলবে, মাথা নিচু করে সেই কনভেনশনের খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়া। ব্যাপারটা এমন নয় যে আমি এগুলো প্রথম বলছি। আমার আগেও অনেকে বলেছেন, পরেও বলবেন। কিন্তু কয়েক দশক ধরে বৃহৎ পুঁজি এবং লগ্নিশাসিত যে সাহিত্যবাজার এখানে তৈরি হয়েছে, সেখানে লেখালেখি আর বাণিজ্যিকে তফাত করা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। এটুকুর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ক্রোধ, চোয়ালচাপা রাগী প্রবন্ধ এবং লিটল ম্যাগাজিন গোষ্ঠী তৈরি হওয়া বাদে আর কিছু হয়নি, হয়নি কোনো সম্মিলিত প্রতিরোধ। তাই আমাদের সত্যভাষণে নিজেদের ইগো সন্তুষ্ট হওয়া বাদে আর কিছুই হচ্ছে না। সত্যি বলতে কী, আমি তোমাকে বলছি সঞ্জয়, লিটল ম্যাগাজিনও দলাদলি আর ঈগোর চাপে শ্বাসরুদ্ধ হবে, আর নয়ত একদিন হয়ে উঠবে পাল্টা প্রতিষ্ঠান। ফলত, যেটা ঘটছে, বিগ হাউসের মুনাফার চাপে বছরে চারটে করে উপন্যাস নামিয়ে যেতে হচ্ছে একজন সৃষ্টিশীল লেখককে। পুজো, পয়লা বৈশাখ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে। বিনিময়ে অবশ্যই মোটা অর্থ, উপঢৌকন অথবা চাকরির নিরাপত্তা থাকছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশের লেখকের কথা আমি জানি না যাকে বছরে চারটে কি পাঁচটা উপন্যাস লিখতে হয়, নিয়ম করে বছরের একটা কি দুটো বিশেষ সময়ে লিখতে হয় গুচ্ছখানেক কবিতা। এখানে হয়, কারণ এখানে প্রকাশনা ব্যবসা চালায় বৃহৎ সংবাদপত্র। এমনকি আমাদেরই বহু বন্ধু, যারা সূচনায় কমিটেড ছিল, নিরীক্ষামূলক লেখাপত্র লিখতেই লিখতেই কফিহাউসে বসে তারাও মনে মনে প্রত্যাশা করে চলে, বড় বাড়ি থেকে কবে আসবে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পুজোর চিঠি। আর এভাবেই প্রতিদিন হত্যা করা হয় একজন স্বপ্নদর্শী লেখক বা কবিকে। তার গলায় এস্টাব্লিশমেন্টের দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে পুরে দেওয়া হয় গোয়ালঘরে, যেখানে পরিচিতি, পুরস্কার, অর্থ ও সামাজিক সম্মানের খড় বোঝাই করা আছে। সেই গোয়ালঘর থেকে যে বস্তুগুলো বেরুচ্ছে ইদানীং তাদের অভিধা পরকীয়া প্রেম, নিষিদ্ধ যৌনতা, মধ্যবিত্তর পারিবারিক সংকট, এবং গোয়েন্দা ক্রাইমের অঞ্চল। পরিবেশ, পরিস্থিতি বিষয়ক লেখা এখানে ট্যাবু। ভাষা ও শৈলী বিষয়ক পরীক্ষা ব্রাত্য, যেহেতু তা প্রতিস্পর্ধার জন্ম দেয়। অবশ্য সেই প্রতিস্পর্ধাকেই আবার গ্রহণ করা হয়, যখন তার সময় পেরিয়ে গিয়েছে। পঞ্চাশের দশকের বিদ্রোহ যখন সত্তরে এসে গলিত ক্লীব, তাকে রঙচং মাখিয়ে নতুন যুগের নতুন শৈলী হিসেবে সামনে আনা হয়। ততদিনে নখ দাঁত হারিয়ে সেই প্রতিস্পর্ধা নির্বিষ বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে।

উল্টোটাও সমানভাবে সত্যি। নন-কনফর্মিস্ট লেখককে সহ্য করতে পারা কঠিন, যেহেতু সে রেজিস্টান্স দিচ্ছে। তাই যেন তেন প্রকারেণ তাকে চেপে দাও, তাকে প্রচার করো ডিফিক্যাল্ট হিসাবে, তাকে ঠেলতে ঠেলতে একটা কোণায় সরিয়ে দাও, যে অন্ধকারে পাঠকের চোখ যায় না।

অমিয়ভূষণ মজুমদার অবস্কিওর কারণ তাঁর লেখা পাঠক পড়ে না। পাঠক পড়ে না কারণ বড় পাবলিশার ছাপায় না। বড় পাবলিশার ছাপায় না কারণ তিনি বড় কাগজে লিখতে পারেন না। বড় কাগজে লিখতে পারেন না কারণ তিনি ডিফিক্যাল্ট। এবং তিনি ডিফিক্যাল্ট কারণ তিনি অবস্কিওর। এই ভিসাস সার্কেল তৈরির পেছনে পাঠকের ক্যালাসনেস দায়ী তো বটেই কারণ তিনি বড় পাবলিশিং হাউস পেরিয়ে ছোটো প্রকাশনার দিকে তাকাতে চান না, কিন্তু একইসঙ্গে দায়ী আমাদের মতো তথাকথিত ভিন্নধারার লেখক ও লিটল ম্যাগাজিন কর্মীরা,

যারা অমিয়ভূষণকে সংগঠিত দায়িত্ব এবং নিজেদের চেষ্টায় বৃহত্তর গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিল না। দিল না কারণ বৃহৎ পুঁজির বিপরীতে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ নই, আমাদের ভেতরেও গোপনে লালিত হয়ে চলেছে বিগ হাউসে ডাক পাবার স্বপ্ন। তাই ভালো লেখককেও লিখতে হচ্ছে বাজার-চলতি গোয়েন্দা গল্প, কমিটেড বামপন্থী সাহিত্যিক রগরগে যৌনতায় ভরা আখ্যান লিখছেন, কবি হয়ে যাচ্ছেন পুজো সংখ্যায় চোলাই করা ঔপন্যাসিক, এবং এই গোটা প্রক্রিয়াটার মধ্যে দিয়ে ভাষাকে হত্যা করা হচ্ছে। এক মেদুর ভাষাহীনতায় গৌণ হয়ে যাচ্ছে আমাদের সাহিত্যজগৎ যেখানে একজনের লেখা থেকে অন্যজনেরটা আলাদা করা যাচ্ছে না। আর গোটাটাই করা হচ্ছে সাহিত্যপ্রসবের নামে কিন্তু পেছনে প্রায় অদৃশ্য ক্রিয়াশীল থাকছে মুনাফার অঙ্ক।

তাই পুজোসংখ্যা, পয়লা বৈশাখ সংখ্যা, দোল সংখ্যা, ঈদ সংখ্যাতে লেখালেখির ডাক পেয়ে উল্লসিত হলে, আমি আবার দুঃখিত হবার মতো রোমান্টিকতারও পক্ষপাতী নই, বুঝতে হবে যে আমাদের এই প্রতিস্পর্ধা নামক অবাণিজ্যিক প্র্যাকটিসটার মধ্যেই গলদ লুকিয়ে আছে। বাণিজ্যিক পত্রিকাতে অর্থ ও উপঢৌকনের বিনিময়েও রদ্দি ডিটেকটিভ গল্প ছাপানো যায়, এবং উল্টোদিকে বছরের পর বছর সেসব জায়গাতে ডাক পান না জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, অসীম রায়ের মতো সিরিয়াস কবি লেখক। শম্ভু রক্ষিত ব্রাত্য থাকে কারণ আবারো, সে ডিফিক্যাল্ট। নিত্য মালাকার, নির্মল হালদার, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালদের নাম সুকৌশলে ভুলিয়ে দেওয়া হয় কারণ তারা সেই প্রতিস্পর্ধী স্বরটির প্রতিনিধিত্ব করে। এক সরল আপাত-স্মার্ট খুকুগদ্যকে আধুনিক সাহিত্যের নাম দিয়ে বেচে দেওয়া হয় বাংলা বাজারে, এবং সে কাজে প্রধান সহায়ক থাকেন এক সময়কার সিরিয়াস কবিলেখকের দল, যাঁরা পৃথিবী উলটে দেবার স্বপ্ন নিয়ে লিখতে এসে যখন দেখলেন যে তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছেপূরণের কোনো দায় বা শক্তি তাঁদের কলমের নেই, সেই ফ্রাস্টেশনকে সামাল দিতে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়লেন হাত কচলানোর রোল পাবার উদ্দেশ্যে।

অবশ্য ভাসা ভাসা প্রতিষ্ঠান বিরোধী অনেক মাল তুমি পাবে, যাদেরকে এস্টাব্লিশমেন্ট পুষেও রাখে। দরকারে অদরকারে এদের কুমীরছানা দেখানোর মতো করে তুলে দেখিয়ে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করে।

তবু উল্টোদিকেও রেজিস্ট্যান্স থাকবেই। ভাষাকে ছেনে নিয়ে তার অভ্যন্তরের অন্ধকার মহাদেশ খুঁজে আনতে প্রাণপাত করলেন যে লেখক, খনির ভেতর থেকে দুর্মূল্য আকরিক তুলে আনার মতো শব্দ তুলে এনে ডিনামাইটের তার বিস্তার করলেন যে কবি, প্রচলিতকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তথাকথিত অবস্কিওরিটির থমথমে সিঁড়িতে পা রাখলেন যে তরুণ গল্পলেখক, তাঁদের জায়গা থেকে যাবে। তাঁরা জগৎ ওলটাতে না পারুন, তাঁদের লেখালেখি দিয়ে কারোর কিছু না যায় আসুক, তবুও সেগুলো থাকবে। মাত্র কয়েকদিন আগেই খবর পেলাম মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত পরমায় তিনজন কবি শিরোনামে এই সময়কার প্রধান তিনজনের কবিতা নিয়ে বই প্রকাশ হচ্ছে, যাদের মধ্যে মাত্র তেইশ বছর বয়সে স্থান পেয়েছে মেদিনীপুরের বীতশোক ভট্টাচার্য। কবিতায় তার উজ্জ্বল উদ্ধার স্বীকৃতি পাচ্ছে এমন করেই। অঞ্জন সেন, নিশীথ ভড়, অমিত চক্রবর্ত্তী, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়ের মত অসংখ্য তরুণ কবি ক্ষেত্রনির্মাণ করে চলেছে। এটাও জানি যে এদের মধ্যে অনেকেই আবার বড় সংবাদপত্রের ডাক পেয়ে চলে যাবে, সেখানে প্রথমে কয়েকটা ভালো কবিতা বেরোবার পর ভাববে বিগ হাউসে তার মানে নিরীক্ষাধর্মী লেখালেখি নিজের টার্মসেই করা যায়, এবং আস্তে আস্তে এস্টাব্লিশমেন্টের ভেতর ঢুকবে, খুব ধীরে নিজের ভেতরেই সিস্টেম তৈরি হবে যাতে মেনে নেওয়া যায় একের পর এক শর্ত, এবং এই প্রক্রিয়াতে স্বধর্ম খোয়াবে। এসবও হবে, এবং তার বিপরীতে ভিন্নধর্মী লেখালেখিও ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে থাকবে। আমার বন্ধুরা অনেকে রাগ করবেন এসব পড়ে, অভিযোগ করবেন আমি অযথাই সিনিক হচ্ছি। কিন্তু দলবদ্ধ সংহতি যদি বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে তৈরি না করা যায়, আমি রাজনীতির কথা আনতে চাইনি কিন্তু এসেই যাচ্ছে, বিশেষত সেই সময়টায় যখন একটি প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক স্বরকে

শুধুমাত্র সাইলেন্স দিয়ে বিগ হাউস স্তব্ধ করে দিতে যাচ্ছে তখন রাজনীতি বাদ দিয়ে এত কথা লেখা সম্ভব নয়, যদি না তৈরি করা যায় রেজিস্টান্সের দলগত স্বর, তাহলে ছায়া ঘনাতেই থাকবে, দীর্ঘ হবে, এবং রাত্রির কোনো তপস্যাই দিনের প্রস্তুতি আনতে পারবে না।

একটা কথা তো বুঝছো, অরুণের বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ ব্যক্তিগত নয়। কিন্তু এই বিরাজনীতির আবহ, যেটা মুনাফার জন্য একজন লেখককে কচুর গাঁটি বিক্রেতার সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দিতে পারে, সেটা আর নিতে পারি না সঞ্জয়।

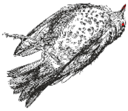

কারা প্ররোচিত করে কঙ্কালের রণলিপ্সা, নারকীয় আত্মহত্যা,
বারাসাত-বরাহনগর
বোবা ভ্রূণ, ঠ্যাংবিম্ব : ভাঙা সাম্রাজ্যের কামজ্বরে মুগ্ধ হীরের সুন্নত!

-অনন্য রায়

'এই গল্পের শুরু ১৯৬৭ সালে। দার্জিলিং সহ গোটা বাংলা তখন নকশাল আন্দোলনে অশান্ত। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পুলিশের নির্মমতা। ড্যানিয়েল লামার উত্থান সেই সময়কালে। দক্ষ এবং নিষ্ঠুর অফিসার হিসেবে সদর পুলিশ থেকে তাকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। গোটা জেলায় সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে যে বিশেষ পুলিশি বিভাগ তৈরি হয়েছিল, ড্যানিয়েল ছিল তার শীর্ষের দিকে, অপারেটিং কয়েকজনের মধ্যে অন্যতম। মূলত নোংরা কাজগুলোই করতো, যেগুলো আইপিএস র‍্যাঙ্কের বড়ো অফিসাররা নিজের হাতে না করে ওর মতো কয়েকজনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল, দার্জিলিং জেলাকে শান্ত রাখতে হবে। যদি সাফল্য আসে, পুরস্কার হিসেবে ডিএসপি-র পদ। মানে, জেলার শাসনভার চলে আসবে নিজের নিয়ন্ত্রণে।

'সাফল্য এসেছিল, যদি সেটাকে সাফল্য হিসেবে ভাবতে পারা যায়। ড্যানিয়েলের নির্মমতায় কেঁপে উঠেছিল দার্জিলিং। শহরে আন্দোলনের তীব্রতা সেভাবে ছিল না, তাই আমাদের অনেকের গায়েই আঁচ লাগেনি। কিন্তু আশেপাশের গ্রাম মহকুমাতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল। ইনফ্যাক্ট, শুরুই তো হয়েছিল এখান থেকে। চা-বাগানগুলো তখন জ্বলছে। প্রতিদিন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের খবর। বিগল কিষাণ, সোনম ওয়াংদি, জংগল সাঁওতাল, খোকন মজুমদারের নাম রোজ খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। পরিস্থিতি শান্ত করতে ড্যানিয়েল লামার মতো বেশ কিছু পুলিশ অফিসারের দরকার পড়েছিল। সেই ইতিহাস অনেকেই জানে। সরকারি হিসেবের বাইরেও ডাকাত বা ছেলেধরা নাম দিয়ে এনকাউন্টার করে দেবার ঘটনা ভুরিভুরি ঘটছিল। একটা সময়ের পর পুলিশ ফোর্সের ভেতর থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল, এতটা নৃশংসতার দরকার পড়ছে কেন! জেলার বিভিন্ন গ্রাম বা টাউনে কত ছেলে নিখোঁজ হয়েছিল, তার আসল সংখ্যা এখনো কেউ জানে না। অথবা কতজনকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে আটক করে রাখা হয়েছিল। পুলিশ তো হুকুমের চাকর, সরকার থেকে যা নির্দেশ আসবে, তা মানতে বাধ্য কিন্তু নির্দেশের অতিরিক্ত যেটুকু, তার দায়ভাগ অন্য কারোর ওপর বর্তায় না। কিন্তু ড্যানিয়েল তখন দার্জিলিং-এর মুকুটহীন সম্রাট। তার বিরুদ্ধে সামনাসামনি কথা বলতে পারে এমন কেউ ছিল না। পুলিশের কর্তারাও প্রমাদ গুণতে আরম্ভ করেছেন ততদিনে। কারণ ড্যানিয়েল ফ্রাঙ্কেন্সটাইনের দানব হয়ে উঠছে। একদিন গোটা ফোর্সকে সে গিলে খাবে। দরকার হয়ে পড়ছিল ড্যানিয়েলের বিপরীতে একটা র‍্যাশনাল মুখকে তুলে আমার। কিন্তু গোটা কাজটাই করতে হবে গোপনে ফোর্সের মধ্যেও সকলকে জানানো চলবে না। ড্যানিয়েল যেহেতু পুলিশের ওপর মহলেরই সৃষ্টি, সে বেঁকে বসলে বহু ভেতরের কথা বাইরে বেরিয়ে যাবে। তাই অপেক্ষা করতে হবে। ড্যানিয়েলের কোনো একটা ভুলের অপেক্ষা, যার সুযোগ নিয়ে তাকে বৈধ উপায়েই সাইডলাইন করে দেওয়া যায়। দরকার ছিল একটা বিকল্প গ্রহণযোগ্য মুখ। এখানেই ধনরাজ গম্বুর আগমন। সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং যুক্তিবাদী এক আদর্শ পুলিশ অফিসার। উন্মাদ ড্যানিয়েলের বিপরীতে ঈশ্বরসম। পুলিশের উপরমহলের একটা অংশ ধনরাজকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে লালন করতে শুরু

করে দিলেন। অপর অংশ অবশ্য তখনও নানা কারণে, মূলত ক্ষমতালাভের সমীকরণেই, ড্যানিয়েলের পাশে থাকলেন।

‘এই লড়াইতে নিজের অজান্তেই দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে গেল অমিতাভ। আমি বা অমিতাভ, কেউই রাজনীতিতে অংশ নিইনি। কিন্তু অমিতাভ ছিল সংবেদনশীল। চোখের সামনে এত ছেলেকে মরতে দেখে ওর মাথা বিগড়ে যাচ্ছিল আরও বেশি করে। অমিতাভর ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যেকার কবিতাগুলো পড়লে দেখবেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখে গিয়েছে। আরও অনেকের মতোই। কিন্তু সে সবই লিটল ম্যাগাজিনের কবিতা। বিশেষ কেউ পড়ত না। অমিতাভ চাইতো আমিও যেন এগুলো নিয়ে লিখি। আমি পুলিশের বাড়াবাড়ি কখনও পছন্দ করিনি। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে কোনোকালে উৎসাহ বোধ করিনি। আমার প্রিয় বিষয় ছিল নিখাদ সাহিত্য। তার মধ্যে সমাজ রাজনীতি বিপ্লব এসবের কোনো ছিটোফোঁটাও ছিল না, যতক্ষণ না লেখার উপাদান হিসেবে আসে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে একজন অরাজনৈতিক মানুষ হিসেবে মনে করি এখনও। তাই ওর চাওয়াতে কর্ণপাত করিনি। আমাদের বিচ্ছেদের একটা বড়ো কারণ ছিল সেটা। অমিতাভর মনে হয়েছিল, আমি প্রতিষ্ঠানের হাতে লালিত-পালিত হতে হতে নিজের স্বতন্ত্র স্বর হারিয়ে ফেলেছি। বড়োলোকের ছেলে, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বড়ো হয়েছি। নিজেও স্বপ্ন দেখি সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে বাণিজ্যিক সাহিত্য করে খ্যাতি লাভ করবার। অমিতাভর কাছে অসহ্য ছিল সেসব। আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছিল আমার থেকে। আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু কী করতাম আমি? নিজের স্বাভাবিক প্রবণতার বিপরীতে গিয়ে মেকি প্রগতিশীল সাজতাম? সেটা সম্ভব? নাকি সততা?’

অরুণ মাথা নাড়লেন নিজের মনে। ‘আমি একজন সাহিত্যিক। রাজনীতি দিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকের কী এসে যায়?’

হঠাৎ চোখে পড়ল, অনন্যা বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভাব দেখে বুঝলাম, এইদিকেই আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে দেখে থমকে গিয়েছেন। দোনোমনো করছিলেন। ফোনের রেকর্ডার বন্ধ করে চেয়ার থেকে উঠে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। অনন্যা তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখছিলেন। বললাম, ‘আমার সমাধানে কেউ আঘাত পাবে না, মিস চৌধুরী। আপনার ভয় নেই।'

অনন্যা প্রথমে উত্তর দিচ্ছিলেন না। হয়তো বুঝতে পারছিলেন না কী বলবেন। তারপর নীচু গলায় প্রশ্ন করলেন, ‘সমাধান করে ফেলেছেন?

‘সম্ভবত।’ হেসে উত্তর দিলাম।

অরুণ বসে ছিলেন বারান্দায়। অনন্যা সেদিকে তাকালেন। ‘অরুণের সমস্ত খেয়াল আমাকেই রাখতে হয়, তনয়া। অসুস্থ শরীরেও। কারণ ও আমার থেকে দশগুণ ভালনারেবল। ভেতরে ভেতরে। বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব না।

‘আপনার স্বামী নির্দোষ।

অনন্যা নির্নিমেষে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হয়তো দেখতে চাইছিলেন, সত্যি বলছি কিনা। কী দেখলেন জানি না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিছু ফিরলেন। শরীরটা আবার মিলিয়ে গেল বাড়ির পথে।

আমি ফিরে এসে অরুণের সামনে বসলাম। অরুণ অনন্যার চলে যাবার দিকে তাকিয়েছিলেন। একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না, কী কথা হলো। শুধু প্রশ্ন করলেন, ‘সিদ্ধার্থ জানে?’

‘আপনার অনুমতি না নিয়ে আপাতত কাউকে কিছু জানাবো না। তবে লেখাটা তো লিখতেই হবে। তখন সকলেই জানবে।

‘ওকে বলতে পারেন।’ অরুণ সম্মতিসূচক মাথা ঝোঁকালেন।

‘আপনি বলুন, যা বলছিলেন।' আবার ফোনের রেকর্ডার অন করে দিলাম। ‘আমার বইগুলো ফ্লপ করছিল। নিজের মতো করে জায়গা বানিয়ে নেবার জন্য লড়ছি তখন। এর

মধ্যে অমিতাভর নাম উঠে এল প্রতিশ্রুতিমান কবি-লেখকদের তালিকায়। মিথ্যে বলব না, সঞ্জয় অধিকারীর রিপোর্ট দেখে তীব্র হিংসে হয়েছিল। কিন্তু নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, আমার আর ওর রাস্তা আলাদা। ও নিরীক্ষামূলক লেখা লিখতে চায়। লিটল ম্যাগাজিনের জন্য আদর্শ। আমি লিখতে চাই সাহিত্যের মিশেলে রহস্য গল্প। সিরিয়াস সাহিত্যের ভিড়ে কল্কে পেতে গেলে অনেকটা রাস্তাই চলা বাকি আছে আমার।

'কিন্তু অমিতাভ ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছিল। দেখতে পাচ্ছিল যে কবিতা লিখে কিছু হয় না। রাষ্ট্রীয় দমনের বিপরীতে প্রতিবাদী শিল্পসাহিত্য কার্যক্ষেত্রে অসাড়। গোটা রাজ্য জুড়ে লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে তখন আগুন-ঝরানো কবিতা লেখা হচ্ছে, আর একটা পর একটা ছেলে খুন হয়ে যাচ্ছে। অমিতাভ বুঝছিল, কলমের একক প্রতিরোধ যথেষ্ট নয়। তাহলে সে আর কী করতে পারে? দলীয় রাজনীতি ওর মতো ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। অমিতাভ ঠিক করল, সে প্রোভোক করবে। তাতে যদি নিজের মৃত্যুও হয়, হোক। সেটাকেই সে ইন্সটলেশন আর্ট হিসেবে ব্যবহার করবে। নিজের কবিতা দিয়ে স্টেটমেন্ট রাখতে পারছে না যখন, জীবন দিয়ে রেখে যাবে। অবিশ্বাস্য লাগছে, না? আজ ফিরে দেখলে আমারও মনে হয় ওই সময়টা অবাস্তব ছিল। কিন্তু সত্তরের অনেক কবি বাস্তবতার গণ্ডিতে আটকে থাকতে কোনোদিনই চায়নি। তার কিছুদিন পরেই আমার বিরুদ্ধে অমিতাভর সেই অভিযোগ। আমার কেরিয়ারের অনেকটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল তখন। সঞ্জয় সেই সময়ে অমিতাভর যে সাক্ষাৎকারটা নিয়েছিলেন, সেটা কি আপনি পড়েছিলেন? পড়লে দেখতেন, হাবিজাবি অনেক কথার পাশাপাশি অমিতাভ আরও একটা বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিল। দার্জিলিং শহরে কিছুকাল আগেও নকশাল দমনের নাম করে যে বর্বর পুলিশি সন্ত্রাস হয়েছিল, তার ভেতরকার খবর এবং সেই সন্ত্রাসের মাথা জনৈক পুলিশ অফিসারের বিষয়ে তথ্য অমিতাভর কাছে আছে। একদিন সে সমস্ত কিছুই প্রকাশ করবে।

'কলকাতায় বসে এই খবর পড়লে আপনি এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না। কারণ কলকাতার বরানগরে, কাশীপুর থেকে শুরু করে সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেসি জমানার সন্ত্রাস ততদিনে যে পর্যায়ে গিয়েছে, সেখানে অমিতাভর এরকম অভিযোগ নেহাতই জলভাত। দার্জিলিঙের মতো অবস্থা তখন কলকাতার পাড়ায় পাড়ায়। কিন্তু আমাদের এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম। এই শহর বরাবরই শান্তিপূর্ণ ছিল। যেটুকু অস্থিরতা, নকশাল আমলেই। গোর্খাল্যান্ড তখনও বহু দূরের ব্যাপার। সেই কিলিং, হানাহানি আর সন্ত্রাসের ক্ষত সারিয়ে ছোট্ট জেলাটা আবার আস্তে আস্তে সেরে উঠছে। অতীতকে মাটিচাপা দিয়ে দিচ্ছে পুলিশও। ড্যানিয়েলের পতনের অপেক্ষায় একটা অংশ, ঠিকই। কিন্তু তাদেরও কোনো তাড়াহুড়ো নেই এরই মধ্যে অমিতাভর অভিযোগ বাংলার প্রথম সারির দৈনিকের পাতায়। নাম না করলেও ড্যানিয়েলের দিকেই যে অভিযোগের তির, সেটা বুঝতে কারোর বাকি থাকেনি। পুলিশের বাঙালি অংশের হাত ঘুরে কথা উঠল ড্যানিয়েলের কানে। ড্যানিয়েল ভুরু কুঁচকেছিল কিনা জানি না। হয়তো অমিতাভকে পাত্তাই দেয়নি। তবু একবার ঘুরে এল অমিতাভর আস্তানা। রুটিন খানাতল্লাশি চালালো। অমিতাভকে তুলেও নিয়ে গিয়েছিল মনে হয়। যেহেতু অভিযোগই করেছে, আর কিছু না, ড্যানিয়েলও আর ঘাঁটায়নি। তা ছাড়া বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ির পর সে নিজেও সাবধান হয়ে গিয়েছিল। ওপরতলা থেকে নির্দেশ এসেছিল, আইন নিজের হাতে নেওয়া চলবে না ৷ আগে হলে এরকম রুটিন নির্দেশকে ড্যানিয়েল থোড়াই কেয়ার করতো। কিন্তু সেই সময়ে জেলা পুলিশের মধ্যে বেশ কিছু ট্রান্সফার হয়। শাস্তিমূলক ছুটিতে পাঠানো হয় কিছু অফিসারকে। ড্যানিয়েল তাই নিজেকে কিছুটা বাঁচিয়ে চলছিল। এটাও বুঝতে পেরেছিল যে ধনরাজ গম্বু তার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে।

'পরের বোমাটা ছিল অমিতাভর উপন্যাস, যেটা ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের এক পাহাড়ি শহরের নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখা। উপন্যাসটা যদি পড়েন, দেখবেন পাতায় পাতায় রাস্তাঘাট ঘরবাড়ির প্রায় নাম ধরে ধরে বিবরণ দেওয়া আছে, কোন জায়গা থেকে কতজন ছেলেকে তুলে এনে পুলিশ গায়েব করে দিয়েছে। ভুয়ো কেস

সাজানো, হত্যাপদ্ধতি এবং লাশ গায়েব করে দেবার নিখুঁত বর্ণনা। শীর্ষে যে পুলিশ অফিসার, পড়লেই এই শহরের যে কোনো মানুষ বুঝতে পারবেন কার আদলে তৈরি। কলকাতায় আলোড়ন ওঠেনি, কিন্তু দার্জিলিঙের বাঙালি মহলে নড়াচড়া শুরু হয়ে গেল। যারা এত বিশদে জানতো না, তারাও জানলো। একটা মানবাধিকার সংগঠন অমিতাভর সঙ্গে যোগাযোগ করলো। একমাস বাদে তাদের রিপোর্ট বেরোলো সংবাদপত্রের পাতায়। তার ওপর ভিত্তি করে একটা জনস্বার্থ মামলার আবেদন পেশ করা হলো দার্জিলিং কোর্টে, পুলিশের খাতায় নিখোঁজ বলে বর্ণিত তরুণতরুণীদের সন্ধানের ইস্যুতে। অন্যান্য বহু জনস্বার্থ মামলার মতোই এই মামলাও ঝুলে রইল। কিন্তু ড্যানিয়েল প্রমাদ গুনলো এবার। কারণ সে বুঝতে পারছিল, এগুলোকে ব্যবহার করেই তার বিরুদ্ধে ঘুঁটি সাজানো শুরু হয়ে যাবে। দরকার অমিতাভকে থামানো। অমিতাভকে হুমকি দিল ড্যানিয়েল। বলল, ভুয়ো কেসে ফাঁসিয়ে দেবে। কিন্তু যেহেতু অমিতাভ তখন একটা ছোটখাটো নাম, আর শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়েছে, তাই তার গায়ে সরাসরি হাত দেবার সাহস ড্যানিয়েলের ছিল না। যদি অমিতাভকে তুলে নিয়ে এসে এনকাউন্টার করে দিত, ড্যানিয়েলকে ছিঁড়ে খেত মিডিয়া, এনজিও, এবং পুলিশের একাংশ। তাই ড্যানিয়েল অমিতাভর উপর চাপ দেওয়া শুরু করলো। ওকে অনুসরণ করা, রাতবিরেতে ওর ঘরে পুলিশ পাঠানো এইসব। এগুলোই অন্যের মুখে পরে শুনেছি। কিন্তু অমিতাভ দমে তো গেলই না, উলটে ড্যানিয়েলকে জানাল যে সে এরপর একটা নন-ফিকশন লিখছে। দার্জিলিং অঞ্চলে পুলিশের সন্ত্রাস নিয়ে এবার নাম করে করে বিবরণ দেবে। সেই মানবাধিকার সংগঠনটি তাকে সহায়তা দেবে সমস্তরকম, আর কলকাতার এক প্রকাশক এর মধ্যেই বই করবার আগ্রহ দেখিয়েছেন। আবার সেই প্রোভোক করা। মৃত্যুকে ডেকে আনা হাত ধরে, কারণ ওটাই তখন ওর কাছে আল্টিমেট শিল্প।

'আজ ২০১৯ সালে এসে সত্তরের সন্ত্রাস নিয়ে আমরা যতই গলা ফাটাই না কেন, খোদ সত্তর দশকের মধ্যে বসে সেগুলো নিয়ে লেখালেখি করা একটা বড়ো সাহসের ব্যাপার ছিল। সেই সময়কার সংবাদপত্রগুলো দেখবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন অথবা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যত লেখা হয়েছে, তার এক শতাংশও লেখা হয়নি পুলিশের গুলিতে নিহত রাজনৈতিক কর্মীদের বিষয়ে। না, কেউ লেখেননি। কোনো প্রতিষ্ঠিত কবি বা লেখক, কেউ না। লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে বহু কবিতা বেরোতো ঠিকই, সেখানে ধারাবাহিকভাবে এগুলো নিয়ে লিখে গিয়েছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত রুদ্র, সব্যসাচী দেব বা সমীর রায়ের মতো কবি, কিন্তু সেসব ম্যাগাজিনের আর কতই বা পাঠক! মূলধারার সংবাদ এবং সাহিত্য গোটা সময়টা জুড়ে হিরন্ময় নীরবতা পালন করে গিয়েছিল। এগুলো লেখার কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। দ্রোণাচার্য ঘোষ, যাকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন 'সম্ভাবনাময় কবি', পুলিশ লকআপে তার হত্যা নিয়ে কোনো মূলধারার কবি বা লেখক একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি। অথবা তিমিরবরণ সিংহ। একমাত্র শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন 'নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই তোমার ছিন্ন শির, তিমির'। তিনি হয়তো ব্যতিক্রম ছিলেন। কিন্তু অন্যেরা? যুবকের স্নানে মুগ্ধ একটা প্রজন্ম দেখেও দেখেনি যে সেই যুবকেরাই একে একে নর্দমার ধারে লাশ হয়ে পড়ে থাকছে। আর নৈঃশব্দের মধ্যেই অমিতাভ সংবাদপত্রের পাতায় ঘোষণা করে দিল, সে কলকাতার প্রতিষ্ঠিত এক প্রকাশকের ঘর থেকে বই বার করবে উত্তরবঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিষয়ে!

'আবারও বলছি, কলকাতার কাগজের রিপোর্ট পড়লে এগুলো কিছুই জানতে পারবেন না। কারণ কলকাতায় বসে এখানকার বাস্তবতা বোঝা সম্ভব নয়। অমিতাভর উপন্যাস নিয়ে যতখানি অভিঘাত উত্তরবঙ্গে উঠেছিল, কলকাতায় তার সিকির সিকিও ওঠেনি। কারণ ওখানে রাষ্ট্রীয় হত্যা ততদিনে জলভাত, আর সেগুলো নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা কথা বলেন না। কিন্তু ছোটো শহরের ক্ষেত্রে হিসেব অন্যরকম হয়। আরও বেশি অন্যরকম হয়, যদি সেই ছোটো শহরের পুলিশ অফিসার হয় ড্যানিয়েল লামার মতো কেউ। ক্রোধে, ঘৃণায় পাগল হয়ে

গেল ড্যানিয়েল। সে জানত, এই ধরনের রিপোর্ট বা বই প্রকাশ করবার ফল কী হতে পারে। কমিশন বসবেই তার বিরুদ্ধে। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে তার এতদিনকার সযত্নলালিত কেরিয়ার। কিন্তু অমিতাভকে সে ছুঁতেও পারছে না। ড্যানিয়েলের একটা ব্যাপার ছিল। ও যাকে শত্রু বলে একবার ধরে নিত, সে সারাজীবনের মতো ড্যানিয়েলের ব্ল্যাকলিস্টে ঢুকে যেত। সে যদি অপরাধীও হয়, বা রাজনৈতিক কর্মী, ড্যানিয়েলের তার ওপর ক্রোধটা হয়ে দাঁড়াতো ব্যক্তিগত। সে মনে করতো, এরা তার ব্যক্তিগত শত্রু। একে উন্মাদনাও বলতে পারেন। কিন্তু অমিতাভকে ড্যানিয়েল তার ব্যক্তিগত শত্রুদের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। আর এসব ক্ষেত্রে যা হয়, ড্যানিয়েল স্থির করল অমিতাভকে শেষ করতে হবে। এমনভাবে, যাতে তার ওপর সন্দেহ না পড়ে।

'ড্যানিয়েল আমার সঙ্গে দেখা করল। বোঝালো যে অমিতাভর এই ধরনের লেখালেখিতে পুলিশের একাংশ তার উপর ক্ষুব্ধ। কারণ গোটা ফোর্সের নাম খারাপ হচ্ছে। তাই, ড্যানিয়েল কিছু না করলেও, অন্য যে কেউ অমিতাভকে গুম করে দিতেই পারে। দোষ ড্যানিয়েলের ঘাড়ে পড়বে, কিন্তু তাতে অমিতাভর তো লাভ কিছু হবে না! সে ততদিনে পুলিশের খাতায় নিখোঁজ। ড্যানিয়েল চাপ দিল অমিতাভর সঙ্গে তার কথা বলিয়ে দিতে। কোনো নিউট্রাল জায়গাতে। আমার বাড়ির প্রস্তাবটাও ও-ই দিয়েছিল। আমি ড্যানিয়েলকে চিনতাম। ও যে কীরকম মানুষ, সেই সম্বন্ধেও ধারণা ছিল। মনে হয়েছিল, ড্যানিয়েল এবার চরম কোনো রাস্তা বেছে নেবে। সেটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানাতে এসেছে। যখন বলছে যে ফোর্স থেকে অমিতাভকে গুম করে দেওয়া হবে, বাস্তবে সেটা ড্যানিয়েল নিজেই করবে বলে মনে হয়েছিল। এটা থামাতেই হবে। ভয় পেয়ে অমিতাভর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ওর আস্তানায় গিয়ে পেলাম না। শেষে একে ওকে জিজ্ঞাসা করে স্থানীয় শুঁড়িখানা থেকে ধরে আনলাম।'

এবার কফি ঢেলে অরুণের দিকে এগিয়ে দিলাম। কথাগুলো বলছিলেন যখন, একটা ভেঙে পড়া মানুষের মতো লাগছিল তাঁকে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। বার বার মনের ভেতর উঁকি দিচ্ছিল কেমো হয়ে যাবার পর বাবার কেশহীন মাথা আর কঙ্কালের মতো মুখটা।

'অমিতাভ প্রথমে আমাকে বিশ্রী অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনদিন ধরে গিয়ে বোঝানোর পর রাজি হলো। শর্ত দিল, ড্যানিয়েল বাড়ির ভেতর পা রাখতে পারবে না। ওর নাকি নিজেকে কলুষিত লাগবে ওরকম লোকের সঙ্গে এক ছাদের তলায় দাঁড়াতে। পাগলের কতরকম অদ্ভুত খেয়াল! কিন্তু পরে বুঝেছি, ও তখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল মৃত্যুর। নিজের মৃতদেহকে শিল্পের চরমতম রূপ হিসেবে ব্যবহার করবে, ঠিক যেমন সায়গনে নিজেদের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা, ভিয়েতনামে আমেরিকান আগ্রাসনের প্রতিবাদে। অমিতাভও আত্মহননের রাস্তাতেই গিয়েছিল বলে মনে করি।

'এর পরের ঘটনা আপনি যেরকম বললেন, তেমনই। অমিতাভ আগে এসেছিল। পরে ড্যানিয়েল। ড্যানিয়েল বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। কিন্তু দেখলাম, অমিতাভকে বোঝানোর বদলে আরও বেশি করে ওকে উত্তেজিত করে দিচ্ছে। রাগিয়ে দিচ্ছে। অথবা, অমিতাভ ভেবেই এসেছিল যে সে উত্তেজিত হবে। একটা সময়ে দেখা গেল দুজনেই দুজনকে প্রোভোক করে যাচ্ছে সমানতালে। ড্যানিয়েল বলল, এই বাড়িতে একটা রাইফেল আছে। চাইলে সেটা দিয়ে গুলি করে কুকুরের মতো তোমাকে মারতে পারি এখানেই। লাশ পুঁতে চুন চাপা দিয়ে দেব পুলিশের কুকুর টের পাবে না। আগুনে ঘি পড়ল। অমিতাভ ছুটে বাড়ির ভেতরে গেল। রাইফেল নিয়ে এসে ড্যানিয়েলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'জল্লাদ', ওকে থামাতে গেলাম। তারপর তো গুলি চলল। অমিতাভ ছুটে বেরিয়ে গেল। জানি না মিসেস বাসু কেন বলেছিলেন যে আমি নীচু হয়ে কিছু খুঁজছি। এতদিন পরে এসে আর সত্যিই মনে নেই। যাই হোক, অমিতাভ বেরিয়ে যাবার পর ড্যানিয়েল আমার দিকে ফিরে ঠাণ্ডা গলায় বলল, অমিতাভ এসেছিল এটা যদি জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে তোমাকেও কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না। অমিতাভকে সবাই চেনে, তোমাকে কেউ চেনে না।

কারোর কিছু আসবে যাবে না। বেঘোরে মারা পড়তে না চাইলে যা যা বলছি, সেগুলো করো। সত্তর দশকের কুখ্যাত পুলিশ অফিসারের মুখে এই হুমকি শোনার তাৎপর্য কী, সেটা আজ দাঁড়িয়ে বোঝা সম্ভব নয়। আমি জমে গেলাম। ড্যানিয়েলের চোখ দেখে বুঝলাম, ও ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে না।'

অরুণ থামলেন। সেই সুযোগে আলতো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, 'সত্যিই কি এতটাই ভয় পেয়েছিলেন? একবারও কি চাননি যে আসল সত্যিটা বাইরে আসুক? তাহলে অমিতাভর পায়ের ছাপ বা বন্দুকে আঙুলের দাগ মুছলেন না কেন? কেন আপনার হাতে অমিতাভর আঁচড়ের দাগ নিয়ে অন্য কোনো ব্যাখা দিলেন না পুলিশকে? কেন বললেন যে ভুলে গেছেন, যাতে পুলিশের সন্দেহ হয়?'

হাসলেন অরুণ। আমি ব্যগ্রস্বরে আবার প্রশ্ন করলাম, 'বলুন মিস্টার চৌধুরী। আজ এতদিন পরে এসে অন্তত স্বীকার করুন যে আপনি ড্যানিয়েলের হাতের পুতুলে পরিণত হতে সেদিন অস্বীকার করেছিলেন।'

'সেই স্বীকারোক্তিতে কি আপনার স্টোরিতে কোনো উন্নতি হবে?

'জানি না, অথবা কেয়ার করি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি শুনতে চাই। আপনার মুখ থেকে। বলুন, আপনি ভয় পাননি।' ঝুঁকে পড়ে অরুণের হাতের ওপর হাত রাখলাম। অরুণ হাত সরালেন না।

মৃদুস্বরে, নিজেকেই শোনাচ্ছেন এমনভাবে বললেন, 'তবুও গ্লানির মতো মানুষের মনের ভিতরে এই সব জেগে থাকে বলে/শতকের আয়ু—আধো — আয়ু – আজ ফুরিয়ে গেলেও এই শতাব্দীতে তারা/ কঠিন নিস্পৃহভাবে আলোচনা করে/আশায় উজ্জ্বল রাখে।'

একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলে সরে এলাম। অরুণ অস্ফুটে বললেন, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।' তারপর দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি ধীরস্বরে বললাম, 'গল্পটা এবার শেষ করুন, মিস্টার চৌধুরী।'

'আমাকে হয়তো অপরাধীই সাব্যস্ত করা হতো, যদি না ড্যানিয়েল অনেকগুলো ভুল করতো। বাগানের মাটিতে বুটের ছাপ দেখে প্রথম সন্দেহ হয়েছিল ধনরাজ গম্বর। সে অমিতাভর অভিযোগ, সাক্ষাৎকার, প্রকাশিত উপন্যাস এবং ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে অঙ্গুলিনির্দেশ, সবটাই জানত। সেই রাত্রে ড্যানিয়েলের থানায় চটি পরে আসাটা ছিল মারাত্বক ভুল। এবং মিথ্যে কথা বলা যে তার কাছে থানা থেকে ফোন এসেছিল। ধনরাজ শুনেছি পরে ফোন লিস্ট বার করিয়েছিল সরকারি নির্দেশের সাহায্য নিয়ে। ড্যানিয়েলের কাছে স্বাভাবিকভাবেই কোনো ফোন আসেনি। ড্যানিয়েলের অন্য ভুল যেটা ছিল, খুনের জায়গাতে বুটের ছাপ। যে ছাপ বাগানের বুটের সঙ্গে হুবহু এক। আর সবথেকে বড়ো ভুল তো টোকারেভ বুলেটের ব্যবহার, যেটা এখন জানছি। ধনরাজ এগুলোকে এক জায়গায় আনতে শুরু করেছিল আস্তে আস্তে। ড্যানিয়েলের অ্যালিবাইকেও ভাঙা গিয়েছিল বীরবিক্রম তামাঙের সাক্ষ্য দিয়ে। আর ধনরাজকে এই কাজে সহায়তা করেছিল অমিতাভর অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। অমিতাভ বুঝেছিল যে ড্যানিয়েল তাকে ছাড়বে না। অথবা, চায়নি ড্যানিয়েল তাকে ছাড়ুক। তাই উপন্যাসটা লিখতে শুরু করেছিল, অনেকটা প্রতীকী ঢঙে। যাতে তার মৃত্যু বিফলে না যায়। এই কাহিনী মানুষ পড়বার পর যেন বুঝতে পারে, কে অপরাধী। মৃত্যু যদি তার শিল্পের মূল প্লট হয়, উপন্যাসটা হোক সহযোগী সাবপ্লট। দুটি ইনস্টলেশন আর্ট, দুটো আলাদা অর্থ, কিন্তু ও বুঝতে পারেনি, এত তাড়াতাড়ি খুন হবে। বুঝলে, আরও দ্রুত লিখে হয়তো শেষ করবার চেষ্টা করত। 'বডি শনাক্ত হবার পর অমিতাভর ঘর ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল পুলিশ। কাগজপত্র সিজ করেছিল সব। তার মধ্যেই পাণ্ডুলিপিটা ছিল। ড্যানিয়েল বাংলা পড়তে পারতো না, তাই সে উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু ধনরাজ পারতো। পাণ্ডুলিপির উপর বাংলায় লেখা ছিল, 'অপরাধ ও শাস্তি'। মনে আছে, প্রথমদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্ট' পড়েছেন কিনা? এরকম অদ্ভুত নাম দেবার কী মানে আমি জানি না। কারণ লেখার বিষয়ের সঙ্গে নামটা যায় না।

যখন পরে কপিটা পুলিশের হেফাজতে থেকে নিয়ে আসি, নামের কভার খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই নামটাই সম্ভবত ধনরাজকে আকৃষ্ট করেছিল। অপরাধ বিষয়ে অমিতাভ কী লিখেছে সেটা পড়বার জন্যে হয়তো ধনরাজ পাণ্ডুলিপিটা পড়তে শুরু করেছিল। যখন শেষ করল, আপনার মতোই পুরো ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার সামনে। বাস্তবের সঙ্গে মিলগুলো দেখে, অপরাধ ও তার সমাধান, উভয়ের মিলকে সাযুজ্যপূর্ণ করে ধনরাজ তার সিদ্ধান্তে পৌঁছোল। আমার সঙ্গে যখন কথা বলতে এল, আপনার মতোই সে-ও পুরো গল্পটা সামনে রাখল। এবার মুখ খুললাম। প্রথম থেকে বলে গেলাম যা যা ঘটেছে। এর আগে ড্যানিয়েলের ভয়ে কিছু বলতে পারছিলাম না কারণ সে নিজেই ছিল তদন্তকারী অফিসার। কিন্তু ধনরাজ আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে তার কাছে সব স্বীকার করলে সে আমার পাশে দাঁড়াবে। ধনরাজের মতো মানুষ ফাঁকা কথা বলবার লোক নয়। তাই ওকে বিশ্বাস করেছিলাম আমি। ধনরাজ পুলিশের উপরমহলেও পুরোটা জানাল। অমিতাভ রাজনৈতিক কর্মী নয়। সাধারণ মানুষ। কোনো কেস ছাড়া ড্যানিয়েল আবার বিচারবহির্ভূত হত্যা করেছে। সেটাও এক অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে। শুধু সেটাই নয়। সেই খুনের দায়ে আর একজন অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষকে ফাঁসাতে চাইছে। এই শেষটুকু ধনরাজের কাছে ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। এই খবর বাইরে ছড়ালে গোটা ফোর্সের বদনাম, এবং অনেককেই হয়তো দায় মাথায় নিয়ে সরে যেতে হবে। ড্যানিয়েলকে তাই সরতেই হবে এবার। ঘুঁটি প্রস্তুত হলো। তার প্রথম ধাপ হিসেবে ড্যানিয়েলকে সরিয়ে কেস তুলে দেওয়া হলো ধনরাজের হাতে। সমস্যা হলো, যা যা সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে, সবটাই সারকামস্টানশিয়াল। সেখান থেকে ড্যানিয়েলকে সরাসরি অভিযুক্ত করা কঠিন। আদালতে যদি বলা হয় যে মৃত লেখকের অসমাপ্ত উপন্যাস থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গিয়েছে, কেস সেখানেই খারিজ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়। ড্যানিয়েলের অপরাধ বাইরে জানাজানি হোক, ধনরাজ তীব্র বিপক্ষে ছিল এমন মতামতের। তার কাছে সবার আগে ডিপার্টমেন্টের সম্মান। সে চেয়েছিল, ড্যানিয়েল পদত্যাগ করুক। এমনকি আসল খবর পুলিশের নীচতলাতেও যাওয়া চলবে না। সাফাই অভিযান হোক, কিন্তু ঢাক পিটিয়ে নয়। কিন্তু এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটবে, আর পুলিশের কেউ জানবে না, তা হয় না। কয়েকজনকে জানাতেই হতো, তাদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেওয়ানো হলো। ঐ যে কনস্টেবল, কুলবির থাপা, যাঁর কাছে গিয়ে আপনি কোনো সাহায্যই পাননি তিনি বোধহয় সেই কয়েকজনের একজন ছিলেন। সেই কারণেই পাথরের মতো মুখ করে বলে গিয়েছিলেন যে কিছুই জানেন না, মনে নেই। আর যারা জানতো কেউ সম্ভবত বেঁচে নেই। শেষদিন অবধি তারা মুখ খোলেনি।

'কিন্তু ড্যানিয়েলকে যে সরানো হবে, এই কাজে মূল বাধা কে? অরুণ চৌধুরী এবং তার উকিল। তারা মুখ খুলতে শুরু করলে অনেক কিছুই বাইরে চলে আসবে। তার সূত্র ধরে ড্যানিয়েলের অতীত কাজ, হত্যা, অত্যাচার, অমিতাভর বিবৃতি, জনস্বার্থ মামলা, সমস্ত কিছু। ক্ষতিটা একা ড্যানিয়েলের হবে না, হবে সমগ্র পুলিশ ফোর্সের। এবং যে ভয়ংকর ডামাডোল শুরু হবে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, তার সুযোগ পুরোটাই নেবে ড্যানিয়েল। সে এক এক করে সবার নাম করতে শুরু করবে। কোন হত্যায় কে জড়িয়ে ছিল, কোন ভুয়ো কেস কার মস্তিষ্কপ্রসূত। পুরো পরিস্থিতিটা তখন হয়ে পড়বে কুৎসিত। এটাকে এড়ানো যায় একমাত্র যদি গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। ধনরাজ এবং তৎকালীন ডিএসপি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সমস্তটা জানিয়ে অনুরোধ করলেন, আমরা যদি মুখ বন্ধ রাখি, তাহলে এবং একমাত্র তাহলেই সাফাই অভিযান সম্ভব। ড্যানিয়েলকে সরানোও সম্ভব। না, তার শাস্তি হবে না। কারণ তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাকে পাকাপাকিভবে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব। এর পরিবর্তে আমাদের মুখ বন্ধ রাখতে হবে আজীবনের জন্য। আর আমরা যদি মুখ খুলি, মিডিয়া, মানবাধিকার, আইন আদালত সবাই চলে আসবে ঠিকই, কিন্তু সেই হট্টগোলে ড্যানিয়েল বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা উঠবে, সেটা সত্যি। কিন্তু পুলিশ তখন নিজেদের জঞ্জাল এবং

কুকর্মের ইতিহাস পরিষ্কার করতে এতই ব্যস্ত থাকবে, যে আমাদেরই বিরুদ্ধে চলে যাবে। নিজেদের পিঠ বাঁচাবার জন্য ড্যানিয়েলকে না চাইলেও তারা সমর্থন করে দেবে তখন। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। ফল যেটা হবে, মামলা ঝুলে থাকবে বছরের পর বছর। হ্যাঁ, সেটা সামাজিক ন্যায় হয়তো হবে।

পুলিশের নির্মমতাকে সামনে আনা অবশ্যই ন্যায়। কিন্তু ড্যানিয়েল বেঁচে যাবে। ধনরাজ আমাদের কাছে দুটো রাস্তা দিলেন। প্রথম রাস্তায়, আমরা মুখ খুলব না। আমি নিঃশর্ত মুক্তি পাব। ড্যানিয়েলকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় রাস্তায়, আমরা আমাদের পছন্দমতো যা করবার করবো। কিন্তু সেক্ষেত্রে পুলিশ নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই ড্যানিয়েলের পাশে দাঁড়িয়ে যাবে, হয়তো আমাকে ফাঁসিয়েও দেবে অমিতাভর হত্যায়। এবং ড্যানিয়েল শাস্তি নাও পেতে পারে।

আপনি হলে কোন রাস্তা বেছে নিতেন, জানি না। আমার কাছে প্রথম রাস্তা বেশি গ্রহণীয় ছিল। আমি সামাজিক ন্যায় নিয়ে ভাবিত নই। আমার দরকার ছিল বন্ধুর হত্যার বিচার। ধনরাজের সঙ্গে আমার মৌখিক চুক্তি হলো। জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট। আমরা দুজনেই এ ব্যাপারে নিজের জীবদ্দশায় বাইরে কিছু বলব না। আমি একটা বাড়তি শর্ত রেখেছিলাম। অন্য কেউ যদি নিজে থেকে এই সত্য আবিষ্কার করে, তাহলে তার কাছে পুরোটা স্বীকার করব। এটার কারণ, আমি চেয়েছিলাম মৃত্যুর আগে অমিতাভর উপন্যাসটা অসমাপ্ত অবস্থাতেই প্রকাশ করে যেতে। সেটা পড়ে যদি কেউ সত্যিটা বার করে, তাহলে লুকোবো না। ধনরাজ কী ভেবেছিল জানি না। শর্তে রাজি হলো।

'ড্যানিয়েল চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। তাকে প্রথমে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হলো। তারপর সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। সে প্রতিদিন থানাতে আসতো। হাতে কোনো কাজ নেই। বসে বসে মাইনে পেত। কারণ হিসেবে ওর বিরুদ্ধে একটা মানবাধিকার সংগঠনের দায়ের করা মামলার কিছু আইনি মারপ্যাঁচ তুলে আনা হলো। সেই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নাকি অভিযুক্ত অফিসারকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া চলবে না, এরকম একটা আইন ধুলো ঝেড়ে সামনে হাজির করা হলো। ড্যানিয়েল সমস্তটা বুঝলো। কিন্তু অমিতাভ মিত্র-র হত্যা বিষয়ে যেহেতু কেউ তাকে অভিযুক্ত করেনি, একটা কথাও বলেনি সেই বিষয়ে, ড্যানিয়েল প্রত্যাঘাত করতে পারলো না। তার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ, জনস্বার্থ মামলা, সেটা আপাতভাবে সত্যি। সেই মামলাতে অভিযুক্ত হবার ফলে যদি তাকে কিছুদিন বসিয়ে রাখা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে টেকনিকালি কিছুই বলার নেই। এটা তো আর শাস্তি নয়! ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে এমনকি কমিশনও বসেনি। শুধু বসিয়ে রাখা হলো দিনের পর দিন। এই অবস্থা কোনো আত্মসম্মানওয়ালা মানুষের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কয়েক মাস পর ড্যানিয়েল পদত্যাগ করলো। দীর্ঘ চেষ্টার অবসান হলো। ঘুঁটি নড়ে গেল ড্যানিয়েল লামার। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল নতুন নায়ক, ধনরাজ গম্বু।

'এই যে কথাগুলো আপনাকে বলছি এখন, এতকিছু আমি একদিনে জানিনি বহুদিন ধরে খুঁজে খুঁজে, একে ওকে জিজ্ঞাসা করে, পুলিশের মধ্যে খোঁজ লাগিয়ে আস্তে আস্তে পুরো গল্পটা জেনেছি। শেষে গিয়ে সবাই সব কিছু পেল, যা তারা চেয়েছিল। আমি পেলাম ড্যানিয়েলের শাস্তি। ধনরাজ পেল ক্ষমতা। পুলিশ পেল দুর্নামের ভয় থেকে মুক্তি। শুধু আমার বন্ধুটাই আর বেঁচে থাকলো না।'

অরুণ থামলেন। দেখলাম, তাঁর চোখে জল টলটল করছে। টোকা মারলেই ভেঙে পড়বে। নিজেকে প্রবল চেষ্টায় সামলে চোখে হাত চাপা দিলেন অরুণ। কিছুটা সময় পর হাত সরিয়ে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন। 'সরি।'

'শেষ একটাই কথা জানার। ঋষি রোডের বাড়ির ঠিকানা আর ছবি, আপনিই মেসেজ করেছিলেন৷ তাই তো?'

অরুণ চমকালেন। 'আপনি বুঝলেন কী করে?'

'কবিতাটি। আপনিও তো আমার মতোই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। কিন্তু নিজের মুখে

বললেন না কেন?’

‘বাড়িটার কথা আমাকে অমিতাভ বলেছিল। তখনও আমাদের বন্ধুত্ব অটুট। ও ড্যানিয়েলের পিছু নিয়ে ওই বাড়ির সন্ধান পেয়েছিল। ড্যানিয়েলের টর্চার সেল। মুক্তি পেয়ে আমি বাড়িটাকে খুঁজে বার করি। দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবিটা দেখি। রামবীরকে ড্যানিয়েলের ছবি দেখাই। রামবীর শনাক্ত করে, এই লোকটাকে সে বাড়ির ভেতর দেখেছে। তারপর থেকে আর ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারিনি। জানতাম, ঢুকলেই অমিতাভর স্মৃতি তাড়া করবে। কিন্তু ছবি তুলে রেখেছিলাম। খবর রাখতাম, বিক্রি হয়ে গেল কিনা, বেহাত হলো কিনা। বাড়িটা ইম্পর্ট্যান্ট ছিল, কারণ ওটা ছিল ড্যানিয়েলের কুকীর্তির একটা সাক্ষ্য ৷ কিন্তু ধনরাজের সঙ্গে চুক্তির ফলে বাইরে সে কথা প্রকাশ করিনি। আর ড্যানিয়েল ও ততদিনে নিজের যা প্রাপ্য সেটুকু পেয়ে গিয়েছে। আপনাকে সরাসরিই বলতে পারতাম। কিন্তু তখন আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন। হয়তো ভাবতেন, বাড়ির ব্যাপারটা বানানো। আপনার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্য আমার চাল। তাই নিজের মুখে বলতে চাইনি।'

‘আপনি কি এই কারণেই বারবার অমিতাভর সময়কার কবিতা পড়তে বলছিলেন? রাজনীতি, প্রতিশোধের থিমগুলোকে দেখাতে চাইছিলেন? অমিতাভর কবিতায়, পরে গল্প বা গদ্যেও, এত রাগ, বিস্ফোরণ সেটার পেছনে যে নকশালবাড়ির সময়, সত্তর দশকের কবিতা, আর সেটা এই রহস্যের মূল পটভূমি, এগুলো কানেক্ট করা সত্যিই সম্ভব নয়, যদি না সেই সময়কার সাহিত্য অন্তত কিছুটা না জানা থাকে।’

অরুণ উত্তর দিলেন না।

‘আপনাকে সন্দেহ করবার কারণ একটাই। প্রথম দিন বলেছিলেন, অমিতাভকে আপনি হত্যা করেছেন।

‘সেটা এখনও আমি মনে করি। ওকে হত্যার দায় যতটা ড্যানিয়েলের, ততটাই আমার। যদি ওকে সেদিন বাড়িতে না ডাকতাম, ও বেঁচে থাকতো। চুয়াল্লিশ বছর ধরে প্রতিটা দিন ভেবে গিয়েছি, কেন ওকে সেদিন ডাকলাম! কেন ড্যানিয়েলের কথায় ভুললাম, রেগে গিয়েছি, ঘৃণা করেছি নিজেকে। হয়তো অনেকটা সেই কারণেই আমিও আর জনসমক্ষে তেড়েফুঁড়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতাম না। ভেতরে ভেতরে জানতাম, রক্ত আমার হাতেও লেগে আছে।’

কুয়াশাটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে। কাঁপা ছবির মতো ভেসে উঠছে দূরের পাহাড়, জঙ্গল। বহু, বহুক্ষণ আমরা মুখোমুখি বসে ছিলাম নীরব। হয়তো দুজনেই মনে মনে এক অকালমৃত তরুণ কবির কথা ভেবে চলেছিলাম। অথবা ড্যানিয়েলের কথা। অথবা হয়তো না। আমি শুধুই দেখে যাচ্ছিলাম অরুণের কপালের ওপর ঝামরে পড়া চুলকে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম। অরুণও উঠলেন। সম্ভবত আমার কিছুই বলবার ছিল না। বিদায় নেবারও ছিল না। তবুও আমি চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ফিরে দেখলাম, অরুণ আমার চোখে চোখ মেলে দিয়েছেন। সেই দৃষ্টির ভাষা বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম তাঁর হাত। কিন্তু ছুঁতে পারলাম না। সরিয়ে নিলাম নিজেকে। তারপর ফিসফিস করে বললাম, 'আপনার কোনো দায় ছিল না। হাতে রক্তের দাগ ছিল না। আমি বিশ্বাস করি, ছিল না।'

গেট দিয়ে বেরোবার সময়ে পেছন ফিরে দেখলাম, অস্বচ্ছ কুয়াশার মধ্যে অরুণ নিশ্চল হয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

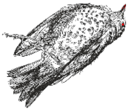

তুমিই দাঁড়াও তাই
বেলেল্লা রাস্তার মোড়ে
অন্ধতার বিষ ঢেলে চোখে
কেননা এ আত্মরক্তপাত
ঘূর্ণি তোলে অঘ্রাণেও
জ্বলে যায় প্রত্যাশী খামার
সিংহাসনে ক্লীব আর
শুতে গেছে যুবারা শ্মশানে

—জয়া মিত্র

'তাহলে, আজই শেষ রাত?'

'হ্যাঁ।' আমি হাসলাম। 'কাল দুপুরবেলা বেরিয়ে যাব। এমনিতেও যা স্টোরি পাবার, সব হয়ে গিয়েছে। সকালবেলা একবার শুধু আপনার বাড়িতে যাব। আপনার বাবামায়ের একটা সাক্ষাৎকার নেব। তাহলে এখানকার কাজ শেষ। এরপর দিল্লি ফিরে লিখতে বসতে হবে।'

অরুণের বাড়ি থেকে বেরোবার পরেই অফিসের ফোন এসেছিল। শহর ছাড়ার অনুমতিপত্র চলে এসেছে। হোটেলের রিসেপশনে রাখা আছে। সেটা নিয়ে প্রথমে থানা এবং তার পরে সদর কোর্টে গিয়ে সই করিয়ে আনতে হবে। পুলিশ সহযোগিতাই করল। রামবীরের মতো এক অজ্ঞাতকুলশীল গরিব মানুষের মৃত্যু নিয়ে আর কতই বা মাথা ঘামাবে? তার ওপর নামকরা সাংবাদিককে কেউই ঘাঁটাতে চায় না। আদালতের কাজ মিটিয়ে একবার গেলাম আনন্দ পাঠকের বাড়ি। তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার ছিল। প্রচুর সাহায্য করেছেন ভদ্রলোক। সেখান থেকে বেরিয়ে সিদ্ধার্থর সঙ্গে দেখা করলাম। তখন বিকেল হয়ে গেছে। অফিস থেকে প্লেনের টিকিট কেটে দিয়েছে। কাল সন্ধেবেলায় ফ্লাইট। আজ আর বিশেষ কিছু করবার নেই। হোটেলের বাইরে একটা বেঞ্চিতে দুজন পাশাপাশি বসেছিলাম। ওকে গল্পটা বলতে হবে।

'আপনার কাকা অনুমতি দিয়েছেন। আপনাকে বলা যায় এখন। কিন্তু বাইরে কাউকে বলবেন না। আমাকেও তো এটাকে বেচতে হবে বাজারে!' সিদ্ধার্থকে পুরো গল্পটা বলে গেলাম।

'তাহলে রামবীরকে খুন ....

'ড্যানিয়েল করেছেন। সম্ভবত গিরিরাজ আমাদের অনুসরণ করে এসে জানিয়েছিল যে বাড়িটার সন্ধান পেয়েছি। রামবীরকে ড্যানিয়েলের অল্প বয়সের ছবি দেখালে চিনতে পারার সম্ভাবনা ছিল। হয়তো এখানে ঘটে যাওয়া অনেক গোপন কথাই ফাঁস করে দিতে পারত। তাই মুখ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। উপত্যকা দিয়ে যে ঘুরপথে উঠে এসে খুন করে আবার নেমে গিয়েছিলেন, সেই রাস্তা সত্তর দশক থেকেই তাঁর চেনা। আমার আরও আগে বোঝা উচিত ছিল। এই রাস্তা ব্যবহার করতো মূলত পুলিশই। তাহলে আজ সেই রাস্তা দিয়ে যদি হত্যাকারী আসে, তার পুলিশ হবার সম্ভাবনাই সবথেকে বেশি থাকে। ড্যানিয়েল গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। গিরিরাজ চালিয়ে এনেছিল।'

অনেকক্ষণ আমরা বসে থাকলাম বেঞ্চে। বৃষ্টি এখন পড়ছে না। কিন্তু ভেজা ভাব চারদিকে। কালচে অন্ধকার নিজের ডানা প্রসারিত করে দিচ্ছে। টুপটাপ ফুটে উঠছে

পাহাড়ের গায়ে জোনাকির মতো আলো। আমার মনের ভেতরে খচখচ করছে কাঁটার মতো। যতই অন্ধকার নামছে, ভার হয়ে চেপে বসছে অনেকগুলো অস্বস্তি। বুঝতে পারছি না সেগুলো কী। কিন্তু তবুও মাথা থেকে নামানো যাচ্ছে না। খালি মনে হচ্ছে, অনেকগুলো প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর এখনও মিলছে না।

'কিছু ভাবছেন? এত গম্ভীর কেন?' প্রশ্ন করল সিদ্ধার্থ।

'নাহ। খালি মনে হচ্ছে, অমিতাভকে চিনত এমন কারোর সঙ্গে কথা বলা হলো না। বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে অমিতাভর চরিত্রটা আলাদা আলাদা দিক ফুটে উঠলে স্টোরি হিসেবে ইন্টারেস্টিং হতো। একমাত্র আপনার কাকার বয়ানের ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে।'

বৃষ্টি থামবার পর আস্তে আস্তে সন্ধের ফূর্তি বাড়ছে। আলোর মালায় সেজে উঠেছে কাছে-দূরের পাহাড়, যেগুলো আপাতত ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে কুয়াশার চাদর। আমাদের হোটেলের সামনের কাদামাখা জায়গাটায় সেই বাচ্চা ছেলেটা, যাকে ড্যানিয়েল ধমকেছিলেন, সে মহা ফূর্তিতে লাফালাফি করছে। তার মা তাকে বকছেন। বকতে বকতে কাদার মধ্যে দিয়েই তার পেছনে ছুটেছেন, আর ছেলেটি মায়ের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে দূরে। বাচ্চাটা একবার লাফালে, খানিকটা কাদা ছিটকে লাগল মায়ের সালোয়ার কামিজে। মা কোমরে হাত দিয়ে ছেলেটির জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কান ধরে মুলে দিলেন আচ্ছা করে। ছেলের কোনো বিকার নেই। হি হি করে হাসতে হাসতে ছোটাছুটি করছে। ছেলের বাবাকে দেখলাম বারান্দায় বেরিয়ে এসে হিপপকেট থেকে পার্স বার করলেন। তার ফাঁকে গোঁজা চিরুনি। পাতলা চুলের ফাঁকে চিরুনি চালাতে চালাতে বউ ছেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার সবাই ঘুরতে বেরোবে, শুধু আমারই কোনো অবসর নেই। হঠাৎ সিদ্ধার্থ একটা পাকানো সিগারেট এগিয়ে দিল আমার দিকে। দেখলাম, একটা দুষ্প্রাপ্য হাসি ওর ঠোঁটের কোণায় ঝুলছে। ভুল দেখছি না তো? 'কালকের পর আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তাই না?'

আকস্মিক তুমি সম্বোধনে হকচকিয়ে গিয়েও সামলে নিলাম। 'সম্ভবত না। আবার হতেও পারে, যদি তুমি দিল্লি আসো।' হাসলাম আমিও। ওর হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে জ্বালালাম না, ব্যাগের ভেতর একটা লুকানো চেনের খাপে সাবধানে রেখে দিলাম।

'হয়তো কখনও। অন্য কোনো দিন। অন্য কোনো সময়ে।' সিদ্ধার্থর হাসির মধ্যে কোনো জড়তা নেই। এইরকম সহজ রূপে ওকে প্রথম দেখছি। হয়ত অরুণকে সন্দেহমুক্ত দেখে মন খুলে কথা বলতে পারছে এখন। চোখ সরিয়ে নিলাম ওর চোখ থেকে। এবং আবার সেই অস্বস্তিটা গলায় কাঁটা ফোটার মতো খচখচ করে উঠল 1

'তুমি কাল কেন জানতে চাইছিলে, আমি তোমার কাকার কাছে ঋষি রোডের বাড়ির ডেসক্রিপশন দিয়েছি কিনা?'

সিদ্ধার্থ মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, 'সামান্য ব্যাপার। কতরকম ভাবনা আসে মনে! সে যাক ৷ আজ তুমি ডিনার ট্রিট দাও। কাল চলে যাবে, তার আগে তোমার ঘাড় ভাঙবার এই সুযোগ ছাড়ছি না!'

'তোমার হলো কী? সব রাগ বিদ্বেষ ভুলে গেলে, যেই শুনলে চলে যাচ্ছি? নাকি হাঁফ ছেড়ে বাঁচছো?' ঠোঁট টিপে একটা রহস্যময় হেসে মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে দিল সিদ্ধার্থ। ওর হাতে হালকা চাপ দিলাম, 'তুমি না থাকলে এতদূর আসতে পারতাম না সিদ্ধার্থ। এই গল্প যতটা আমার, তোমার তার থেকে একটুও কম নয়।'

একটা রেস্তোরাঁয় এসে বিরিয়ানি আর কাবাব অর্ডার দিলাম। অনেকদিন পর মশলাদার ভারতীয় খাবার খেতে ইচ্ছে করছে। সিদ্ধার্থ নিল তন্দুরি আর রেজালা।

'যদি এই গল্প আমারও হয়ে থাকে, তুমি যেমন বললে, তাহলে তোমার স্টোরিতে আমার কথা লিখবে? '

'লিখব তো? জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্টের ব্যাপারটা তুমি না থাকলে বুঝতামই না। আবার সেই রাতে যখন গিরিরাজের জিপ আমাদের পিছু নিয়েছিল, খেয়ে ফেরার রাস্তায়, সেই

থ্রিলটা— এগুলোই তো গল্প হয়ে থাকবে আমাদের!'

'আমি যে ভীতু, বুঝেছিলাম সেদিন। তোমার হাত চেপে ধরেছিলাম।'

'চেপে নয়। খিমচে! কী অবস্থা করেছিলে কবজিটার! নখ বসে গিয়েছিল।' কাবাবের খণ্ড কাসুন্দিতে ডোবালাম।

'সরি! চমকে উঠেছিলাম। নখ কাটার কথা মনেই থাকে না সবসময়ে।

আকাশ আর পৃথিবীটা এতক্ষণ খাপে খাপ হচ্ছিল না কিছুতেই। এবার আকাশের ঢাকনা আলতো ঘুরে গেল, আর খুট করে মিলে গেল একে অপরের সঙ্গে। আমার চোখ পলকের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল। মুহূর্ত খানেক পরে যখন চেতনা ফিরল, নিজেকে অনেক শান্ত, ধীর ও সুস্থির লাগছিল। মনে হচ্ছিল, পেরিয়ে আসা রাস্তা যদি পুরোটাই ভুল হয়, সামনের রাস্তাটুকুকে ঠিক করে বানাবো। বুকের ভেতর ওঠাপড়া করছিল না। হাত পা-ও কাঁপছিল না। বস্তুত, নিজেকে এত শান্ত দেখে আমার নিজেরই অবাক লাগছিল।

কাঁটাচামচে গাঁথা কাবাব নামিয়ে রাখলাম। 'কাল আমার প্লেন ধরা হবে না সিদ্ধার্থ।'

'কেন?' হালকা ভাবে জিজ্ঞাসা করল সিদ্ধার্থ, 'দার্জিলিংকে ভালোবেসে ফেলেছো?'

আমিও হাসলাম। তারপর শান্ত গলায় বললাম, 'এতদিন ধরে যে গল্পটায় এসে পৌঁছেছি, পুরোটাই ভুল। এবং মিথ্যে। এই ভুলটাকে ঠিক করতে হবে সবার আগে।'

সিদ্ধার্থ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ফিসফিস করে বলল, 'সব ভুল?'

'সব। পুরোটাই। একটা বিশাল মিথ্যে আমাদের সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।' সিদ্ধার্থ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নীচু করলো।

'তোমাকে দেখে অবাক হওনি বলেই মনে হচ্ছে। কেন?'

'আমি ভয় পাচ্ছিলাম, তনয়া, যে তুমি ধরতে পারবে। এই গল্পের আরও কত লেয়ার থাকবে, জানি না।' মাথা তুললো না সিদ্ধার্থ।

'মানে? তুমি জানতে?'

'না। সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু সেটার কথা পরে বলবো। তুমি বলো, কী থেকে মনে হলো তোমার?'

'এক্ষুণি বললাম, আমার হাত তুমি খিমচে দিয়েছো বড়ো নখ দিয়ে। তোমার মনে আছে, যে রাতে অমিতাভ খুন হয়েছিলেন, অরুণ চৌধুরীর হাতে আঁচড়ের দাগ ছিল?'

'হ্যাঁ, অমিতাভর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে হয়েছিল।'

'কী বোকা আমি!' হতাশায় মাথা নাড়লাম। 'বারবার ড্যানিয়েল এই দিকটা দেখাতে চাইলেও বুঝিনি। কিছুতেই একটা সহজ সত্যি মাথায় এল না যে অমিতাভ কিছুতেই অরুণকে আঁচড়াতে পারেন না। অমিতাভর মুদ্রাদোষ ছিল নখ খাওয়া। সারাদিন ধরে নখ খেয়ে যেতেন। অরুণ বলেছেন। মৃত্যুঞ্জয়ও বলেছেন। এতই নখ খেতেন যে হাতের চামড়া মাংস বেরিয়ে এসেছিল। তাঁর হাতে কোনো নখই থাকবার কথা নয়, যাতে আঁচড় দিতে পারেন।

'অমিতাভ তাহলে কাকাকে আঁচড়ে দেয়নি?'

'না।' তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে নিজের আখ্যানকে ভেঙে যেতে দেখছিলাম চোখের সামনে। 'এটা খুব ছোটো একটা মিথ্যে। কিন্তু যে মানুষ একটা মিথ্যে বলবেন, তিনি শুধু এই একটাতে থামবেন না। এই গল্পের পুরোটাই বানানো।'

দুজনেই মাথা নীচু করে বসেছিলাম। খাবার ইচ্ছে ছিল না আর। ক্লান্ত লাগছিল। 'তোমার সন্দেহটা বলো।'

'তনয়া, আমি চেয়েছিলাম কাকা যেন নির্দোষ হয়। তাই তুমি যখন ড্যানিয়েলকে দোষী সাব্যস্ত করলে, মনে হয়েছিল এর থেকে সুবিধেজনক সমাধান কিছুই হতে পারে না। তাই নিজের সন্দেহটা খুলে বলিনি। নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে বেশি ভাবছি।'

'এখন আর আমাদের হাতে অন্য তাস নেই সিদ্ধার্থ। সব সন্দেহ, যত ছোটোই হোক না কেন, বলো আমাকে।'

'যেদিন আমরা কাকার বাড়ি ডিনার করছিলাম, কাকিমা জানতে চেয়েছিল, ঋষি রোডের

বাড়ির ভেতরের ডেসক্রিপশন কীরকম। গথিক কারুকার্য নিয়ে কাকিমার উৎসাহের কথা বলেছিল। কিন্তু তুমি উত্তর দেবার আগেই কাকা একটা অন্য প্রশ্ন করে। তারপর আর ওই প্রসঙ্গে ফেরা হয়নি। তারপর আমি কাকিমাকে বা তুমি কাকাকে আর ওই বাড়ির ভেতরের কথা জানাইনি। মানে ভেতরটা কেমন দেখতে ছিল, ঘর কীরকম। ঠিক? এমনকী তোমরা যখন রামবীরের মৃতদেহ আবিষ্কার করলে, তখনও ওই ঘরের ভেতরে পা দেবার সুযোগ ছিল না। ঘর তালাবন্ধ ছিল। নিজেই বলেছো।'

'হ্যাঁ, ঠিক। তোমার বক্তব্যটা কী?'

'সেদিন, মানে রামবীরের বডি পাওয়ার দিন, থানা থেকে বেরিয়ে আমরা কফি খেতে গেলাম। আমি, তুমি, কাকা। কথা প্রসঙ্গে কাকা বলল যে ব্যাপারটা সিম্পল। ডাকাতি হতেই পারে। কী বলেছিল, মনে আছে? 'বাড়িটায় দামি জিনিসের তো অভাব ছিল না! বামাটিকের ওই খাট বলুন অথবা বেলজিয়ান কাচ, কোনোটারই দাম কম নয়।' যদি কাকা ওই ঘরে নাই ঢোকে, বার্মাটিকের খাট সম্বন্ধে জানল কী করে?'

'এটা তো সোজা! তুমি কি ভালো করে শোনোনি? তোমার কাকা তো স্বীকারই করেছেন যে ওই বাড়িটা তিনি খুঁজে বার করেছিলেন পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর। তখন গিয়ে দেখে এসেছেন। দেওয়ালে আঁকা ছবিটাও দেখেছেন।

'তুমি ধরতেই পারলে না এখনও! কাকা বলেছে যে ১৯৭৫ সালের পর আর ওই বাড়িতে পা দেয়নি কারণ অমিতাভর স্মৃতি তাকে তাড়া করতো। কিন্তু তনয়া, ১৯৭৫ সালে তো ওই ঘরে বার্মাটিকের খাট ছিল না! মনে নেই, ধিংড়া সাহেবের মেয়ের বার্ণিশের রঙে অ্যালার্জি ছিল বলে সবকিছু ছিল স্টিলের খাট। এসব ফার্নিচার বানানো হয় ধিংড়ার মৃত্যুর বছরখানেক আগে। ধিংড়া মারা গেছেন পঁচিশ বছর হলো, রামবীর বলেছিলেন। তাহলে, ১৯৯৩ সালে এই খাট আনা হয়েছিল। কাকা যদি না গিয়ে থাকে, এবং তুমি যদি না বলে থাকো, তাহলে বার্মাটিকের খাট বিষয়ে জানল কী করে?'

স্তব্ধ হয়ে দুই চোখ বুজে ফেললাম আমি।

'আমি চাইনি বলতে।' মাথা নীচু করে বিড়বিড় করল সিদ্ধার্থ। বারবার মনে হয়েছে, কিছু কিছু সন্দেহ চাপা থাক। কাকার হাতে যেন দাগ না লাগে। আমি কী করতাম, তনয়া? ভুল করলাম কী?'

উত্তর না দিয়ে মহেশের নম্বরে ডায়াল করলাম। বেশ অনেকবার রিং হবার পর ব্যস্ত মহেশ উত্তর দিল, 'তনয়া, সবে বাড়ি ফিরলাম, এখনই কি তোমাকে নিজের আইডিয়া সব বলতে হবে?'

পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'আমার ফেরার ফ্লাইট বাতিল করতে হবে মহেশ।' মাঝে মাঝে মনে হয়, মহেশ আর পারবে না। সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়ে আমাকে হয় স্যাক করবে, আর নাহয় সামনাসামনি থাকলে সটান থাপ্পড় বসিয়ে দেবে। আজও সেটাই মনে হলো, যে আজই শেষদিন। কিন্তু মহেশ বরাবরের মতোই একটা বিশাল বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'তুমি তো সব জানোই, কী কী করতে হবে। আমাকে আর এইচআর কে মেইল পাঠিয়ে রাখো এক্ষুনি।'

'জিজ্ঞাসা করলে না কেন প্ল্যানের বদল করলাম?'

'নতুন কোনো লিড পেয়েছ, যার ফলে তোমার গল্পে অভাবনীয় মোচড় আসবে। জানি।' ভাবলেশহীন গলায় উত্তর দিল মহেশ।

'মহেশ, কী বলব জানি না। কলকাতা থেকে তোমার পছন্দের রাবড়ি এক কেজি কিনে নিয়ে যাবো, কথা দিলাম।'

'সেসব পরে হবে। আমি কি দয়া করে এখন রেস্ট নিতে পারি, তনয়া? আমার স্ত্রী তোমার এই হুটহাট ফোনগুলোর জন্যেই ডিভোর্স দেবে এবার।

ত 'আজ উঠি। বুঝলে?' কিছুটা পর বলল সিদ্ধার্থ।

অনেকটা খাবার নষ্ট হলো। কারোরই আর খাবার মতো মনের অবস্থা নয়। দুজনে মুখে

না বললেও মনে মনে জানি, হৃদয় খুঁড়ে এবার অনেক বেদনা জাগাবার সময় আসন্ন।

বেয়ারাকে বিল আনতে বললাম। ফোন বেজে উঠল। অচেনা নম্বর - 'তনয়া ভট্টচার্য? আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন। বাড়ির নম্বরে। আমি শহরের ছিলাম না। একটু আগে ফিরেছি। আমার নাম বিনয়েন্দ্র মুস্তাফি।'

'ওহ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আপনার নম্বর পেয়েছি আনন্দ পাঠকের কাছ থেকে। পুলিশের অফিসার মিস্টার পাঠক। কিছু কথা বলবার ছিল।'

'আপনি কি সাংবাদিক তনয়া ভট্টাচার্য? আপনার লেখা আমি পড়েছি।'

'ধন্যবাদ। মিস্টার মুস্তাফি, আমি আপনাকে অরুণ চৌধুরী আর অমিতাভ মিত্রর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম। এই স্টোরিটা করবার জন্যই দার্জিলিং এসেছি। দুজনেই আপনার স্কুলের বন্ধু ছিলেন, তাই না?' ইশারায় সিদ্ধার্থকে বললাম আমার ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বার করে দিতে।

অপরপ্রান্তে নীরবতা। তারপর বিরক্তি মেশানো গলায় উত্তর এল, 'এতদিন পরে এসে আবার পুরোনো কাদা ঘাঁটতে চাইছেন? কেন?'

নরম গলায় পুরোটা বোঝালাম। আসার উদ্দেশ্য, গল্পের সিরিজ, সবটুকু। কিন্তু বুঝলাম, বিনয়েন্দ্র বিরক্ত। বললেন, 'আমার এসবে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আপনি নিজের ফোন নম্বর বাড়ির লোকের কাছে দিয়েছিলেন বলে ফোন করলাম। ভেবেছিলাম কোনো সিরিয়াস বিষয়ে দরকার আছে। কিন্তু পুরানো লেবু আবার কচলাবেন, বুঝতে পারিনি। এসব ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না প্লিজ। নিজের ব্যবসা নিয়ে থাকি, ফালতু জিনিসে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

'কিন্তু অরুণ আর অমিতাভ দুজনেই তো স্কুলে আপনার....'

'বন্ধু নয়। সিনিয়র ছিল তিন বছরের। আনন্দ পাঠক আর সেসব কী জানবে! দেখেছে এক স্কুল, নাম দিয়ে দিয়েছে। হুঁ, সে যাকগে। চিনতাম দুজনকেই। লায়েক ছিল খুব। ছোটো বয়সেই ডানা গজিয়েছিল দুজনেরই। দুজনের কেন বলছি, ওই তিনজনেরই গজিয়েছিল; সাহিত্য করবে! নিজেদের মিলটন শেকসপিয়র এসব ভাবতো মনে হয়। তবে অমিতাভ খুন হবার দুই বছর আগে আমি আমেরিকা চলে গিয়েছিলাম। ফিরেছি ১৯৯২ সালে। কাজেই আমার জানাটুকুও সব এর ওর মুখে শুনেই। তখন তো আর ইন্টারনেট ছিল না, আর বাংলা কাগজও পড়বার সুযোগ ছিল না। আমার কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু জানতে পারবেন না। ,

'এক মিনিট। তিন বন্ধু মানে? আর একজন কে?'

'আরে ওই তো ছিল, কে একটা। স্কুলে তিনজন সবসময়ে একসঙ্গে। তিনজনেই নাকি সাহিত্যিক হবে! এসব সাহিত্য-ফাহিত্য করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষজনের সাজে না, বুঝলেন মশায়? দেখলেন তো, মরলো কে? গরিব ছিল যে, সে-ই।'

'কিন্তু তৃতীয়জন কে? নাম মনে আছে? তাহলে তিনি বেঁচে থাকলে একটা সাক্ষাৎকার নিতাম।'

'নাম-ফাম মনে নেই। ঊনসত্তর কমপ্লিট করলাম এই এপ্রিলে। স্মৃতি সব ধূসর শুনেছি তিনজনের সেই মক্কেল সাহিত্যের বাজারে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। পরে খবরের কাগজে চলে গিয়েছিল।'

'তিনি কি বেঁচে আছেন?'

'আমি কী করে জানব?' এবার খেঁকিয়ে উঠলেন বিনয়েন্দ্র মুস্তাফি। 'সবার সব খবরের ঠেকা নিয়ে বসে আছি নাকি আমি? '

'এই বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায়...' শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রশ্ন করলাম। 'জানি না। বলতে পারব না। এমনিও ইন্টারেস্ট নেই, আর অরুণ অমিতাভরা আমার বন্ধুও ছিল না। স্কুলে দূর থেকে দেখতাম, ব্যাস। অন্য ছেলেটির মুখটুকুই যা মনে আছে। নাম ঠিকানা এসব মনে রাখা অসম্ভব। সম্ভবত তন্ময় বা ওরকম কিছু নাম ছিল। আর কিছু? দেখুন আমি এসব

কবি সাহিত্যিক ব্র্যান্ডটাকেই পছন্দ করি না। না সমাজের কোনো উপকারে লাগে, না নিজেদের উপকারে লাগে। দার্জিলিং-এ কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই, ছেলেদের চাকরি নেই, ইন্ডাস্ট্রি নেই, আর বাবুরা চললেন সাহিত্য করতে! যাকগে, কিছু মনে করবেন না। হয়তো রুড হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে সত্যিই সাহায্য করতে পারবো না। আমি তখন দেশ থেকে বহু দূরে।'

ফোন রেখে ভুরু কুঁচকে খাতার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মৃত্যুঞ্জয় সোম ও বলেছিলেন অরুণ আর অমিতাভর সঙ্গে আর এক বন্ধু আদালতে আসত। সেই কি তাহলে এই ছেলেটি? তন্ময়? যে পরে খবরের কাগজে গিয়েছিল? তন্ময়! এই নামের কেউ...

জলের গ্লাসটা মুখে তুলতে গিয়ে হাত কেঁপে গেল। থরথর করে গ্লাস নামিয়ে রাখলাম, নাহলে হাত থেকে পড়েও যেতে পারত। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে খাতার লেখা 'তন্ময়' নামটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করলো, 'কী হলো?'

আমি ভূতগ্রস্তের মতো ওর দিকে তাকিয়ে ছুঁড়ে দিলাম একটা ছোট্ট শব্দ, 'সঞ্জয়'।

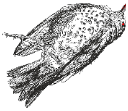

পরের দিন। সন্ধে নেমে এসেছে ম্যালের উপর। আমি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। সিদ্ধার্থ থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু অনেক আগেই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি ওকে। একলা হতে চাইছিলাম। শান্ত হয়ে বসে থাকাটা এখন দরকার। নাহলে জট ছাড়ানো সম্ভব নয়।

আজ সকালবেলাই সিদ্ধার্থকে নিয়ে ছুটেছিলাম। আনন্দ পাঠকের বাড়ি। তাঁকে হাতে পায়ে ধরেছিলাম, যেন একবার আমাকে ঋষি রোডের বাড়িতে ঢুকবার অনুমতি দেওয়া হয়। অদ্ভুত ধৈর্য আনন্দ পাঠকের। এত কিছুর পরেও বিরক্ত হলেন না। মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন থানায়। কী বোঝালেন জানি না। একজন কনস্টেবলকে দেওয়া হলো, সঙ্গে যাবে। গোটা রাস্তা কারোর সঙ্গে একটাও কথা বললাম না। মাথার মধ্যে ঢং ঢং করে বাজছিল শুধু বিনয়েন্দ্র মুস্তাফির উক্তি, 'দেখলেন তো, মরলো কে? গরিব ছিল যে, সে-ই।'

বাড়ির চারদিক পুলিশের হলুদ ফিতে দিয়ে আটকানো। বাগানে এবং দরজার সামনেও হলুদ টেপ। তালা খুলে ভেতরে ঢোকা হলো। সিঁড়ির মুখের ঘরটার ও খোলা হলো তালা। ভেতরটা আগের দিনের মতোই। যেমন ছিল, সব তেমন। কনস্টেবলের দিকে ফিরলাম। 'খাটটা সরাতে চাই। সাহায্য করবেন? '

তিনজনে মিলে খাট সরিয়ে গোটা দেয়াল আবার চোখ চালালাম। বেশিক্ষণ লাগল না। ওপরের ছবিটার ফুটদেড়েক নীচেই আর একটা ছবি। একটা চার পা-ওয়ালা লেজ বার করা জন্তু। হাতি ঘোড়া কুকুর বেড়াল যা খুশি হতে পারে। খাট দিয়ে দেয়ালটা আড়াল করা ছিল বলে দেখা যায়নি। সেই একই রং দিয়ে আঁকা, যে রঙে ওপরের মনুষ্যমূর্তিগুলির ছবি আঁকা হয়েছে। শুধু ওপরের ছবিতে টুপি আর অমিতাভর নামটা অন্য রঙের।

দেখা হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়ালাম, 'এবার যেতে পারি।'

সিদ্ধার্থ কাল থেকে অস্বাভাবিক নির্বাক। আমারও কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। একটা হালকা আলোর রেখা দেখতে পেয়েছি। জানি না সেটা মরীচিকা কি না।

দার্জিলিং-এ ফিরে আবার পুলিশ লাইব্রেরিতে ছুটলাম। প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করে নেবার ছিল। যে সত্যিটা এখন মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি, সেটাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হবে। কিছু তথ্যের জন্য কলকাতায় কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিক বন্ধুকে ফোন করতে হলো। সেসব কাজ মিটিয়ে বেরোলাম যখন, দুপুর পেরিয়ে গেছে। সিদ্ধার্থকে আগেই বিদায় দিয়েছিলাম, কারণ একা থাকবার দরকার পড়ছিল বেশি করে। হোটেলে ফিরলাম। বিশ্রাম প্রয়োজন। পর পর দু-দিন ঘুম হয়নি রাত্রে। ঘরে ঢুকে বালিশে মাথা রেখে হাত পড়লো অমিতাভর পাণ্ডুলিপির ওপর।

যদি বাস্তবের এই সমস্ত ঘটনাই মিথ্যে হয়, যদি পুরোটাই ভুল করে থাকি, তাহলে এই উপন্যাসের সিদ্ধান্তও কি ভুল? নাকি সেখানেও এক বিরাট মিথ্যে? বাস্তব কি সত্যিই উপন্যাসকে এতটাই নকল করতে পারে? তাহলে আনিসুরের হত্যারহস্যের আর কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে?

উপন্যাসটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ কী একটা মনে হলো। তাড়াতাড়ি ফোন হাতে নিয়ে গুগল্ খুললাম। এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য হৃদস্পন্দন মনে হচ্ছে বন্ধ হয়ে গেল আমার। হ্যাঁ, গল্পটা, এবার সম্ভবত প্রায় পুরোটাই দেখতে পাচ্ছি। ছোটোখাটো কিছু ফাঁক বাদ দিয়ে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল ছিল না। চোখ মেললাম, তখন সন্ধে ছ-টা বেজে গেছে। মুখে চোখে জল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে বসলাম ম্যালের রাস্তায়। সেই থেকে বসেই আছি। চোখে পড়ল, গতকালকের দেখা সেই বাচ্চা ছেলেটি আজ বাবা মায়ের সঙ্গে বেরিয়েছে। স্বভাবশত লাফালাফি করছে এখনও। টাইট ড্রেস পরা মা নিজের পোশাক সামলাতে, মূলত হাঁটু ঢাকতে হিমশিম খাচ্ছেন। তার মধ্যে ধমকাচ্ছেন ছেলেকে। বাবা উদাসীন ভাবে নীচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে। সেই দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল গতকালকের দৃশ্য— ছেলেটির লাফালাফি, মায়ের রেগে যাওয়া, হিপপকেটের পার্স বার করে বাবার চুল আঁচড়ানো। চোখ বন্ধ করলাম। একে একে সব জট খুলে যাচ্ছে।

রাত হয়ে আসছিল। ম্যাল থেকে হাঁটা লাগাতে যাচ্ছি, চমকে উঠলাম। দেখি, আধো অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ড্যানিয়েল লামা। তাঁর পেছনে প্রহরীর মতো খাড়া গিরিরাজ।

ড্যানিয়েলের দিকে এগিয়ে গেলাম। এখন আর ভয় লাগছে না। সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনাকে ফোন করেছিলাম। ধরেননি, তাই মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। এটাই বলতে যে গল্পটা আমি এখন জানি। পুরোটাই।'

ড্যানিয়েল নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বললাম, 'যেদিন এই শহরে আমি পা দিলাম, গিরিরাজের কাছ থেকেই আপনি খবরটা পেয়েছিলেন, তাই না? আমার নামটা গিরিরাজ মদনের কাছ থেকে জেনেছিল। আপনারও আমার নাম জানা ছিল, আমার ম্যাগাজিনের সূত্রে। বুঝেছিলেন, কেন এখানে আসছি। নজর রাখবার জন্য সেদিন জলাপাহাড়ের ধারে রেইনকোট পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিন রাত্রেও হোটেলের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনিই। প্রথমে ভেবেছিলাম গিরিরাজ। কিন্তু দায়টা আপনারই ছিল। গিরিরাজের নয়।'

গিরিরাজের দিকে তাকালাম আমি। গিরিরাজ অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নিল। 'শুধু এক রাত্রে, আমি আর সিদ্ধার্থ ডিনার করে হোটেলে যখন ফিরছিলাম, সেদিন গিরিরাজ গাড়ি চালিয়ে আমাদের অনুসরণ করছিল, আপনি কি সেই গাড়িতে ছিলেন? আমার ধারণা, ছিলেন।'

ড্যানিয়েল ধীরে ধীরে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসলেন। গিরিরাজকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ড্যানিয়েল আমাকে ইঙ্গিত করলেন, তাঁর পাশে এসে বসতে।

'আজ আপনার চলে যাবার কথা ছিল না?' পাইপে টান দিয়ে ড্যানিয়েল বললেন। 'সত্যিটার খোঁজ আমি পেয়েছি, মিস্টার লামা। অরুণ চৌধুরীর হাতের আঁচড়ের ব্যাখ্যাও।'

'ঋষি রোডের বাড়ির দেয়ালের ছবিটা আঁকতে দুটো আলাদা রং কেন ব্যবহার হয়েছিল, সেটাও বুঝতে পেরেছেন কি?'

হাসলাম। 'ওই ছবিটার আপনাকে ভাবাবে, স্বাভাবিক ব্যাপার। হ্যাঁ, বুঝেছি।

অন্ধকার পাহাড় গয়না পড়েছে সর্বাঙ্গে, মিটমিটে হলুদাভ আলোর দল আকাশ ছুঁতে চাইছে। সেদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললাম, 'প্রশ্নটা হলো, এই সত্যিগুলো কি আপনি এই বয়সে হ্যান্ডেল করতে পারবেন? আমি কিন্তু গল্পটা লিখব।'

'আপনার কি মনে হয়, আমি আর কেয়ার করি? আমি যা করেছি, বেশ করেছি। নিজের ডিউটি ছিল, তাই করেছি। কিন্তু অন্যের পাপের বোঝা আমি বহন করব না। নেভার!'

'আমি ভেবেছিলাম, আপনি আর গিরিরাজ আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। অনুসরণ করছেন, যাতে বিপদে ফেলা যায়। এখন বুঝতে পারছি, আপনি প্রথম থেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন আমার সুরক্ষা নিয়ে। দেখতে চাইছিলেন, আমি কোথায় যাই। আপনার মনে হয়েছিল, যদি এতদিনকার লুকিয়ে রাখা সত্যটাকে খুঁজে বার করেই ফেলি, তাহলে আমার বিপদ হতে পারে। তাই আমাকে কভার করতে চেয়েছিলেন। কারণ আমিই ছিলাম আপনার শেষ ঘোড়া।'

ড্যানিয়েল চোখ বন্ধ করলেন। এই প্রথম দেখতে পেলাম এক ক্লান্ত অবসন্ন বৃদ্ধের জরাগ্রস্ত অবয়ব। আমাকেও নিজের কিছু কথা বলতে হতো। 'মিস্টার লামা, আপনি ভেবেছিলেন আমাকে ব্যবহার করবেন। আর তাই নিজে অদৃশ্য থেকে ম্যানিপুলেট করে গিয়েছেন আমায়। যখন দেখলেন ভুল রাস্তায় চলেছি, তখন মরিয়া হয়ে অরুণ চৌধুরীর হাতে আঁচড়ের দাগের কথা মনে করিয়ে দিতে চাইলেন। মনে করাতে চাইলেন নিজের নার্ভের সমস্যার কথা। এই ক্লুগুলো আমার মাথায় হয়তো এভাবেই গজাল মেরে ঢোকাতে হতো। ঠিকই বলেছিলেন, আমি নিজেকে অত্যন্ত বেশি ওভারএস্টিমেট করা শার্লক হোমস।'

'যা করেছি, সারাজীবনে যা করেছি, তার জন্য আমার একফোঁটাও অনুতাপ নেই। শাস্তি পেতে হলে পাব। কিন্তু আজ আপনার কাছে এসেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কারণে। শুধু এটা বলতে যে আমি নিজের শাস্তিটুকুই নেব। অন্যেরটা নয়।' উত্তর দিলেন ড্যানিয়েল।

ড্যানিয়েলের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা জরুরি প্রশ্ন মাথায় এল, যেটা করা হয়নি এতক্ষণ। 'আপনার বাড়িতে দেখেছি, অনেক নাটকের বই। ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ আর আমেরিকান নাট্যকারদেরই মূলত আধিক্য সেখানে। আপনি তাহলে এই সময়টার নাটক অবসর সময়ে পড়তে ভালোবাসেন, তাই তো?'

ড্যানিয়েল উত্তর না দিয়ে সামনে তাকিয়ে থাকলেন। আবার মুখ খুললাম, 'এবার কি আপনার ভার্সনটা আমাকে বলবেন, মিস্টার লামা?'

তারপর বেশ অনেকটা সময় দুজন পাশাপাশি বসেছিলাম। ঘন বৃষ্টির দল আমাদের ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা নিচ্ছিল, কিন্তু চক্রবৃহ্য নিয়ে আমার তখন আর কিছুই এসে যেত না।

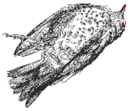

সুষুপ্ত, একাকী, শান্তঃ তুমি যেন পোকাটিকে বিরক্ত কোরো না;
যা তার লালা বা জাল, মধু বিষ, মধু মোম,সমস্ত আবার
একত্র ভরেছে শূণ্য, তাকে বলে শাঁস, রস, ফল, হাহাকার;
জড়ানো মাংসের মধ্যে স্বপ্নের দংশন, আরো স্বপ্নের করুণা;

—বীতশোক ভট্টাচার্য

অনেকগুলো বছর পরে কর্ণেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া যখন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর মনে এসেছিল বাবার সঙ্গে প্রথম বরফ দেখবার স্মৃতি। আমি জানি না, বহু বছর পরে নিজের মৃত্যুশয্যায় দার্জিলিং-এর কুয়াশা, হিমাভ স্যাতস্যাতে বাষ্প অথবা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসা মেঘেদের কথা আমার মনে পড়বে কিনা। কিন্তু একটা দৃশ্য সম্ভবত কখনও ভুলবো না। শেষদিন সকালবেলায় যখন অরুণের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম, সেই কালো ঘোড়াকে আবার দেখেছিলাম জলাপাহাড় রোডে। সারা গায়ে শিশির মেখে আবছা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে ছিল, আগের মতোই। ঘাস খাচ্ছিল না। শূন্যচোখে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে। একটা ধাতব মূর্তির মতো লাগছিল। অদ্ভুত দৃশ্য। মাথার ওপর উঠে গেছে গগনচুম্বি পাহাড়, যার চূড়া দেখা যায় না। থকথকে মেঘের দল পেছন থেকে গুঁড়ি মেরে ধেয়ে আসছে। ভেজা কালচে সবুজ থমথম করছে চড়াই-উৎরাই জুড়ে। আর সে-সবকে পেছনে পেলে নিশ্চল দাঁড়িয়ে অছে একটা ঘোড়া। শরীরের একটা পেশিও কাঁপছে না। নড়ছে না লেজ। একটা বিয়োগান্তক মহাকাব্যের অন্তিম দৃশ্য দেখছি মনে হলো।

বাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম, অরুণ আর অনন্যা বাগানে বসে আছেন। তাঁদের সামনে বসে সিদ্ধার্থ। আমিই তিনজকে ফোন করে জানিয়েছিলাম, আজ আসব।

'আজ চলে যাচ্ছি। তার আগে দেখা করে যাবার দরকার ছিল আপনাদের সকলের সঙ্গে।' বাগানের চেয়ারে বসে বললাম।

অরুণ স্মিত চোখে তাকালেন। অনন্যা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন কফির কাপ। কফিতে চুমুক মেরে বললাম, 'দিল্লি ফিরে গল্পটা সম্পূর্ণ লিখে জানাবো। কিন্তু কাল রাত্রে গল্পের একটা আউটলাইন বানিয়ে সেটা কপি করে এনেছি আপনাকে দেবার জন্য।' একটা কাগজ এগিয়ে দিলাম অরুণের দিকে।

অরুণ মৃদু হেসে কাগজটার দিকে তাকালেন। 'আপনি নিজেই তো সবটা সাজাতে পেরেছেন। আমাকে না দেখালেও চলতো।'

'চলতো। তবুও, আপনার গল্প, আশা করি একবার চোখ বোলাবেন।' হাসলাম আমিও। তারপর আর এক প্রস্থ কাগজ বার করলাম, 'আর এটাও আপনার দেখা উচিত। এটা একটা বিকল্প গল্প। প্রত্যেক সত্যির পেছনে যেমন একাধিক বিকল্প থাকে।'

অরুণ ভুরু কোঁচকালেন। সিদ্ধার্থকে দেখলাম, কঠিন মুখে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। অনন্যা বিস্মিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিকল্প মানে?'

'মানে, অন্য গল্পটাও সত্যি হতে পারে। সেটা যদিও মিস্টার চৌধুরীই ভালো বলতে পারবেন কারণ তাঁর কাছ থেকে আমি একটা গল্প শুনেছি। ভুল হলো। আমি নিজে একটা গল্প সাজিয়েছিলাম। সেটাকে খণ্ডন করে আপনার স্বামীর সাহায্যে আর এক একটা গল্পে উপনীত হয়েছিলাম। আর এইটা', হাতের কাগজ তুলে দেখালাম, 'এইটা হলো তৃতীয় একটা গল্প। কোনটা সত্যি, সেটা কি আপনি বলবেন, মিস্টার চৌধুরী?'

‘তৃতীয় গল্পটা তো আমি এখনও জানি না।'

‘তাহলে আমিই বলি? আমার এবং আপনার সামনে দুটো আলাদা গল্প পড়ে আছে। আপনি আমাকে একটা গল্প বলেছেন, কিছু দৃশ্য দিয়েছেন। আমি আপনাকে এবার অন্যটা বলবো, সঙ্গে অনুমানের সাহায্যে জুড়ে দেব কিছু দৃশ্য। তারপর দেখা যাবে, কার দৃশ্য সত্যের কত কাছাকাছি।'

অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ নেমে এল বাগান জুড়ে। অরুণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। অনন্যার ভুরু কুঁচকে গেছে। একমাত্র সিদ্ধার্থকেই দেখলাম, এতক্ষণে একটা কথাও বলল না।

‘আপনি এবং আমি গত পরশু সকালবেলায় যে গল্পটায় এসে পৌঁছেছিলাম, তাতে এমনিতে বিশেষ সমস্যা ছিল না। থাকার কথাও নয়। ড্যানিয়েল লামা, সত্তরের কুখ্যাত পুলিশ অফিসারই যে হত্যাকারী, এমন সিদ্ধান্ত আমাদের সকলের পক্ষেই স্বস্তিদায়ক। কিন্তু সফল গোয়েন্দাকাহিনীর লেখক হলেও সে গল্পে কিছু ফাঁক ছিল! যেমন ফাঁক ছিল অমিতাভর উপন্যাসেও। নাকি, একে অমিতাভর উপন্যাস বলাটা আর উচিত হবে না?'

অরুণের মুখে কোনো বিকার দেখা গেল না। শুধু দেখলাম তাঁর কপালের শিরাটা দপদপ করছে।

‘এই গল্পের প্রথম লেয়ারে আমি ভেবেছিলাম, আপনি হত্যাকারী। তারপর ধীরে ধীরে পেঁয়াজের খোসা খুলবার মতো করে রহস্যের পরতগুলো তুলতে তুলতে যখন দ্বিতীয় লেয়ারে পৌঁছোলাম, সিদ্ধান্তে এলাম যে ড্যানিয়েলই আসল অপরাধী, একটা কথাই মনে হয়েছিল তখন। কী অসামান্য আখ্যান! কী অসামান্য বন্ধুত্ব!'

অরুণ একটাও কথা না বলে তাকিয়ে আছেন। সেই গভীর, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ‘আর তারপর বুঝতে পারলাম, কী অসামান্য ধোঁকাবাজি!' কেটে কেটে উচ্চারণ করলাম।

অনন্যাকে দেখলাম, শক্ত করে চেয়ারের হাতল চেপে ধরলেন। সিদ্ধার্থর মাথা ঝুঁকে গেল। দেখে মনে হলো, গভীর যন্ত্রণা চাপতে চাইছে। শুধু অরুণ একইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

‘অমিতাভ যে আপনার হাতে আঁচড়ে দিতে পারেন না, কারণ অবিরত নখ খাবার দরুণ তাঁর হাতে নখ ছিলই না কিছু, সেটা এই গল্পের প্রাথমিক ফাঁক।

সেটাই খচখচ করছিল, কী একটা মিস করে যাচ্ছি। পরশু রাত্রে মনে পড়ল এই নখের ব্যাপারটা। বুঝলাম, আপনি মিথ্যে বলছেন। তারপর সিদ্ধার্থ আমাকে দেখিয়ে দিল চোখে আঙুল দিয়ে ঋষি রোডের বাড়িতে আপনি যে গত চল্লিশ বছরে যাননি বলেছিলেন, সেটাও মিথ্যে। কিন্তু শুধু এই দুটো মিথ্যেই যথেষ্ট ছিল না। আপনার তৈরি করা দৃশ্যগুলোকে ধ্বসিয়ে দেবার জন্য দরকার ছিল আরও কিছু। আরও শক্ত একটা প্রমাণ। সেটা দিল অমিতাভর উপন্যাস। কাল দুপুরবেলা হোটেলের ঘরে শুয়ে শুয়ে উপন্যাসটা আবার পড়তে গিয়ে দেখলাম, আপনার তৈরি করা গল্পটাকে এক লহমায় তাসের ঘরের মতো ভেঙে ফেলা সম্ভব।'

‘আপনার দাবিটা ঠিক কী, তনয়া?' এবার প্রশ্ন করলেন অনন্যা।

অনন্যার দিকে দৃকপাত না করে অরুণের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ‘উপন্যাসটার শেষ পরিচ্ছেদে, যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব গিয়েছিল প্রণবেশের বাড়ি, সেখানে প্রণবেশ রেডিয়ো চালিয়েছিল। আপনার মনে থাকবার কথা। সেখানে প্রণবেশ সেদিনকার বিশেষ বিশেষ খবরগুলো বলছিল, মনে আছে? তার মধ্যে একটা ছিল, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দিরা গান্ধির অপসারণের পক্ষে রায় দিয়েছেন। '

‘সমস্যাটা হলো, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস জগমোহনলাল সিনহা ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে এই রায় দিয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের ১২ জুন। যে রায়ের ফলশ্রুতিতে কিছুদিন পর ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হবে। তাহলে যে অমিতাভ মিত্র ১১ জুন খুন হয়েছেন, তিনি কী করে ১২ জুনের ঘটনা লিখে গেলেন?'

অরুণ এই প্রথম একটা বড়ো নিশ্বাস ফেললেন। তারপর চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন অনেকটা নিজের মনেই।

‘তার মানে, এই উপন্যাসটা অমিতাভ লেখেননি। লিখেছেন আপনি, কারণ এরকম ডিটেকটিভ গল্প একমাত্র আপনিই লিখতে পারেন। অমিতাভ আপনার হাতে আঁচড় দেননি, এবং উপন্যাসটাও তিনি লেখেননি। তাহলে সত্যিটা কী? মনে হয়েছিল, আবার ফিরে যাওয়া যাক অসমাপ্ত উপন্যাসেই। এবং আবারও, উপন্যাসেরও মধ্যেই সন্ধান পেলাম আমার প্রশ্নের। কাকতলীয়ভাবেই হয়তো। উপন্যাসটা যদি নাও লেখা হতো, তাহলেও হয়তো উত্তর পেতাম। আমি না পেলেও কেউ না কেউ তো পেতই। তবে এই লেখাটা কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। আর ব্যাপারটা তো কাকতালীয় ছিল না, তাই না? ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেটারই একটা রোডম্যাপ দিয়ে গিয়েছিলেন উপন্যাসের মধ্যে।

‘আপনার মনে আছে তো, আমাদের সিদ্ধান্ত? বিমল সমাদ্দার আনিসুরকে খুন করেছিলেন। মাধব রক্ষিত করেননি। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল না। জোড়া চিঠির রহস্য তার মধ্যে একটা। মাধবের গাড়িবারান্দার লাইট কেন ভাঙা ছিল, সেটা দ্বিতীয় রহস্য। আর প্রণবেশের ঘরের জানালা খুলতে দেখে শুদ্ধসত্ত্ব কেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল উপন্যাসের শেষে, সেটারও সমাধান কেউ জানে না। কিন্তু আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ খটকা আছে, যেটার দিকে কেউ নজর দেয়নি। আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, মাধব গ্রেট ইস্টার্ন থেকে বেরিয়ে দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে নিজের বাড়িতে গিয়েছেন। এটা সম্ভব নয়। মাধব রক্ষিতের পায়ের যা অবস্থা, সেখানে ডাক্তার তাঁকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন যেন পায়ের পাতায় চাপ না পড়ে। এদিকে ধর্মতলা থেকে বরানগর, এই দশ কিলোমিটার রাস্তা গাড়ি চালিয়ে পনেরো মিনিটে যাবার অর্থ হলো অ্যাক্সিলারেটরে জোরে চাপ দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে। মাধবের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু হোটেলের সকলেই দেখেছেন যে মাধব নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাহলে?

‘দ্বিতীয়ত, আনিসুর যদি রাত বারোটার আগে খুন হন, বিমল সমাদ্দার খুন করবার পরে রাত দেড়টায় থানায় এসেছিলেন। ডেকার্স লেন থেকে তালতলা থানা ধীর পায়ে হেঁটে এলেও আধ ঘণ্টার বেশি লাগে না। মাঝখানের সময়টার রাইফেলের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বিমল সমাদ্দার কী করছিলেন? ডেকার্স লেন এবং তাঁর বাড়ি, মানে পার্ক সার্কাস— এই দুইয়ের মাঝে পড়ে তালতলা থানা। সাধারণ বুদ্ধি বলে, বাড়ি যাবার আগেই তাহলে তিনি থানায় আসবেন। আর তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে তিনি বাড়িতেই গিয়েছিলেন, এবং সেখান থেকে আবার থানায় আসেন, তাহলে রাইফেলের ব্যাগ বাড়িতেই রেখে আসবেন। থানাতে নিয়ে আসবেন না। কিন্তু বিমলবাবু থানায় ব্যাগ নিয়ে এসেছেন। তাহলে তিনিই যদি খুন করেন, সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে ডেকার্স লেন থেকে বাড়ি ফেরেননি। সেক্ষেত্রে মাঝের সময়টায় কোথায় ছিলেন? এই ধাঁধাগুলো থাকেই না, যদি একটা বিকল্প সিদ্ধান্ত করা যায়। সেটা হলো, বিমলবাবু সন্ধেবেলা থানা থেকে বাড়ি গিয়েছেন। মাঝের সময়টার কোথাও বেরোননি। মাঝরাতে বাড়ি থেকেই থানায় এসেছেন, যেরকম মাঝে মাঝেই আসেন। এবং তাঁর ব্যাগে বন্দুক নয়, সত্যিকারের দরকারি কাগজপত্রই রাখা ছিল। উচ্চ রক্তচাপের কারণে বাথরুমে ঢুকে বারে বারে ঘাড়ে এবং চোখে মুখে জল ছিটিয়েছেন। মানে, খুনটা তিনি করেননি।

‘যখন এই প্রশ্ন মাথায় এল, বুঝলাম, উপন্যাসেও পুরোটাই এক মস্ত বড়ো ধোঁকাবাজি। আমাদের সামনে যে দৃশ্যগুলোকে হাজির করা হয়েছে, তাদের ফাঁকে-ফোঁকরে অজস্র অসংগতি, যেগুলো হয়তো বা চোখেই পড়ছে না। আর সেগুলোকে উত্তর দিতে দিতে যদি একটার সঙ্গে আর একটাকে মেলানো যায়, তাহলে আমরা উপস্থিত হব সম্পূর্ণ অন্য এক সত্যে। বাস্তবের মতোই। দুটো চিঠির সত্যি যেখানে উন্মোচিত হবে।

‘জানি না, উপন্যাসের শেষটা আপনি এরকমই ভেবেছিলেন কিনা। কিন্তু আমার সমাধানটা ভেবে দেখতে পারেন। হয়তো আপনার স্বনির্মিত মিথ্যের আবরণটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে

ফেলবার জন্য ওটাই আপাতত সবথেকে ধারালো। আমার গল্পের শুরু স্বাধীনতার আগে। যখন মাধব আর আনিসুর, দুই সমাজবিরোধী এবং কোকেনের চোরাচালানকারী, নেশার বিস্তৃত সাম্রাজ্য শুরু করতে যাচ্ছেন। ব্যবসার শুরুতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আনিসুর দেখবেন এপার বাংলার ব্যবসা, আর মাধব দেখবেন ওপার বাংলার। কারণ, এখানে আমি পোয়েটিক লাইসেন্স নিচ্ছি, আনিসুর আসলে মুর্শিদাবাদের মানুষ, তাই এপার বাংলার অপরাধজগতের আনাচ কানাচ তাঁর চেনা। মাধবও রাজশাহীর অন্ধকার জগতের সঙ্গে ওঠাবসা করতে করতে কিছুটা সেখানকার অলিগলি চিনেছেন। কিন্তু শুরুর আগেই তাঁরা দেখলেন, একটা বড়ো অসুবিধে থেকে যাচ্ছে। ততদিনে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং হয়ে গিয়েছে, তার রেশ ধরে এখানে ওখানে দাঙ্গা চলছে, এবং অন্যান্য ব্যবসার মতো অপরাধ জগতেও তীব্র হিন্দু-মুসলমান ভাগ। সেক্ষেত্রে আনিসুরের কলকাতা এবং মাধবের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান অপারেট করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, অপরাধ জগতের নিজস্ব সমীকরণেই তাঁদের গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু মাধব যদি কলকাতায় আসেন আর আনিসুর যান পূর্ব পাকিস্তানে, তাহলেও সম্ভব নয়। কারণ মাধব কলকাতার ঘাতঘোঁত কিছুই জানেন না, যেমন আনিসুর চেনেন না পূর্ব পাকিস্তানেক অন্ধকার জগৎকে। তাহলে উপায় একটাই। ব্যবসার অঞ্চল দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। পূর্ব পাকিস্তান আর ভারত। সেই সঙ্গে মাধব হয়ে গেলেন আনিসুর, আর আনিসুর হয়ে গেলেন মাধব। কিন্তু নাম বদলের পরে নকল আনিসুর তো আর বগুড়াতে থাকতে পারেন না, সেখানে তাঁকে সবাই মাধব বলে জানে। তিনি ঢাকায় চলে এসে ব্যবসা শুরু করলেন, সেখানে তিনি অপরিচিত। অপরদিকে আসল আনিসুর, মানে নকল মাধব, চলে গেলেন কলকাতায়, যেখানে তাঁকে কেউ না চিনলেও তিনি এখানকার জগৎ হাতের তালুর মতো চেনেন। আর এভাবেই দুজন ঢুকে গেলেন নিজের নিজের গোষ্ঠীর ভেতর, শুরু হলো বিস্তৃত ব্যবসা। হুট করে এরকম নাম বদলে ফেলা সহজ নয়। কিন্তু অন্ধকার জগতের মানুষদের কাছে খুব কঠিনও নয়, বিশেষত তারা যদি বাইরে খুব চেনা মুখ না হয়। হয়তো একদিনে হয়নি, বেশ কয়েক মাস ধরে এই প্রসেস চলেছিল, জানি না। এটা সম্ভব হয়েছিল ব্যবসা তখনো শুরু হয়নি বলেই। যদি শুরু হয়ে যেত, দুজনেই মুখচেনা হয়ে উঠতেন অনেকের, ফলত তখন নাম বদল সহজ হতো না। তবুও, কেউ কি জানতো না? তাঁদের কাছের লোকেরা সম্ভবত জানতো। হয়তো টাকাপয়সা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছিল। যাই হোক, আমি এখন থেকে তাঁদের আসল নামেই ডাকব। এইভাবে চলল বহু বছর। কিন্তু মাধব, মানে নকল আনিসুর, তিনি ঢাকায় সুবিধে করতে পারলেন না। ব্যবসা মার খেল। তিনি আনিসুর, মানে নকল মাধবের কাছে এসে হাত পাতলেন। আনিসুর ততদিনে সমাজের উঁচুতলায় উঠছেন। তিনি মাধবের মুখ বন্ধ রাখার জন্য বছরের পর বছর টাকা দিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

'১৯৭৫ সালে মাধবের ক্যান্সার ধরা পড়ল। হাতে আর বেশিদিন নেই। তিনি ঠিক করলেন, মৃত্যুর আগে এই মিথ্যের আবরণ ছিঁড়বেন। সব স্বীকার করে যাবেন পুলিশ অথবা অন্য কারোর কাছে। হয়তো অনুতাপ হয়েছিল তাঁর। হয়তো প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছিলেন। অথবা হয়তো বছরের পর বছর একটা অন্য নাম আর অন্য পরিচয় বহন করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ভেতরে ভেতরে। মোট কথা, কলকাতায় এসে আনিসুরকে তিনি জানালেন তাঁর সিদ্ধান্ত।

এবং আনিসুরের চোখ দেখে বুঝলেন, আনিসুর তাঁকে ছাড়বেন না। এতদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা সামাজিক সম্মান, ব্যাবসায়িক প্রতিপত্তি এবং সম্পদের পৃথিবী এক লহমায় ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে মাধবের জন্য, এটাকে আনিসুর কিছুতেই হতে দেবেন না। মাধব বুঝলেন, আনিসুর তাকে হত্যা করবেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, শুদ্ধসত্ত্বকে সব বলে যাবেন। সেই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলেন। লিভার ক্যান্সারের একটা স্টেজ পেরিয়ে গেলে হাত কাঁপে, লেখা যায় না। তাই চিঠি টাইপ করালেন অন্য কাউকে দিয়ে। সেই চিঠিতে স্পষ্ট করে লিখে দিলেন, মাধব রক্ষিত আপনার সাহায্য চেয়েছে। মাধব রক্ষিতই, অন্য কেউ নয়। তিনি

জানতেন, লোকে তাঁকে শনাক্ত করবে আনিসুর বলে। কিন্তু তিনি তো মাধব। নিজের যে নামটাকে এতদিন ধরে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারেননি, শুদ্ধসত্ত্বের কাছে অধীর ব্যাকুলতায় বারবার লিখে গেলেন সেই নাম। সেদিন দুপুরবেলাই কোনো এক অছিলায় আনিসুর এলেন মাধবের হোটেলে। মাধব হয়তো বাথরুমে গিয়েছিলেন কথার ফাঁকে। আনিসুর দেখলেন টেবিলের উপর রাখা খাম, তাতে শুদ্ধসত্ত্বের নাম লেখা। এই নাম আনিসুরের অজানা ছিল না। তিনি বুঝে গেলেন, মাধব স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন। ত্বরিতগতিতে খাম থেকে চিঠি বার করে সেই খামের ভেতর একটা সাদা কাগজ পুরে ফেললেন আনিসুর আর সিদ্ধান্ত নিলেন, সেই রাতেই মাধবকে খুন করতে হবে। আর বাঁচিয়ে রাখা বিপজ্জনক। কারণ মাধব এরপর পুলিশের কাছে চলে যেতে পারেন। 'হোটেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি এলেন আনিসুর। মাধবের চিঠিটা ফেলেই দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কী মনে হতে একবার পড়লেন। এবং দেখলেন, এই চিঠি নামবিভ্রাটের কারণে তাঁর পক্ষে বড়ো অস্ত্র হতে পারে। একটা খামে শুদ্ধর ঠিকানা লিখলেন। প্রেরকের জায়গাতে লিখলেন নিজের নাম ঠিকানা। খামের ভেতরে চিঠি পুরে নকুলকে বললেন যেন শুদ্ধসত্ত্বের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। ডাকবাক্সে না ফেলে নকুলের হাতে দেবার কারণ, চিঠি যেন তাড়াতাড়ি পৌঁছোয়। যে চিঠি আসল মাধবের পাঠাবার কথা ছিল, সেই চিঠিই দাঁড়িয়ে গেল নকল মাধবের পক্ষে। অপরদিকে, অসুস্থ মাধব টেবিলে রাখা খাম আর খুলে দেখলেন না। সাদা কাগজ ভর্তি খাম ফেলে এলেন ডাকবাক্সে। শুদ্ধসত্ত্ব প্রথম চিঠি পেল মাধবের লেখা, খামের উপরে আনিসুর মানে নকল মাধবের হাতের লেখায় বাড়ির ঠিকানা দেওয়া। দ্বিতীয় চিঠি পেল সাদা কাগজ, খামের উপরে মাধব মানে নকল আনিসুরের হাতের লেখায় হোটেলের ঠিকানা দেওয়া। চিঠি একটাই। একটা আসল, অপরটা জাল, মানে সাদা কাগজ।'

দেখলাম, অরুণের জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। কপালের ওপর দেখা দিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। স্থৈর্য ভাঙছে আস্তে আস্তে। সিদ্ধার্থ মাথা ঝুঁকিয়ে নিশ্চল বসে। অনন্যা স্তব্ধ হয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে।

'আপনি এটা বুঝলেন কী করে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন অরুণ।

'একদিন সিদ্ধার্থ আমাকে বলেছিল, ও ডাবলিন আর দার্জিলিং-এর মধ্যে তফাত করতে পারে না। নকল ডাবলিনে ফিরছে নাকি আসল দার্জিলিং ছেড়ে যাচ্ছে, এই সংশয় তার বারবার হয়। দুটো শহর, কিন্তু বস্তুত যেন একটাই। একটা আসল, আর অপরটা তার প্রতিলিপি। কথাটা মনে ছিল। কাল মনে হয়েছিল, শহরের মতো চিঠিও যদি এরকমই হয়? একটাই চিঠি, দুটো নয়? যদি সেটাই হয়, তাহলে দ্বিতীয় চিঠি পাঠানো হয়েছে এই ভেবে যে সেটাই আসল চিঠি। কিন্তু দ্বিতীয় চিঠি পাঠিয়েছেন আনিসুর। তিনি যদি সেটাকেই প্রথম চিঠি ভেবে পাঠান, তাহলে প্রথম চিঠিটা তিনি লিখেছেন। আর সেক্ষেত্রে, আনিসুর আসলে, আনিসুর নন। তিনি মাধব। এবং উল্টোদিকেও, মাধব আসলে আনিসুর।'

অরুণ শক্ত করে কপালের চুল চেপে ধরলেন। মাথা নাড়িয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, 'আপনাকে আমি কেন আসতে বললাম এখানে? কেন?

'আর এই দুটো চিঠির রহস্যকে সমান্তরাল টেনে পৌঁছেছিলাম অমিতাভ মিত্রর রহস্যে। কিন্তু সেটায় পরে আসব। আগে এই গল্পটা শেষ করি।'

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। মাঝে বাগানের দিকে পা বাড়াল। তারপর কী ভেবে ফিরল আবার। অনন্যা তার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বললেন, 'আমাকে কি শুনতেই হবে?'

'আমি শুনব। যত অসুবিধেই হোক না কেন।'

'মাধবের হোটেলের উলটোদিকে আছে আর একটা সস্তার হোটেল।' আবার শুরু করলাম। তার জানালা খুললে মাধবের ঘরের জানালার মুখোমুখি হয়।

আনিসুর আগের দিনই সেই ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন। রাইফেল তাঁর কাছেই ছিল। মনে রাখতে হবে, মিলিটারিতে টেন্ডারের কাজে তিনি কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। কাজটা যদিও

ভড়ং ছিল। আসল উদ্দেশ্য সামরিক বাহিনীকে হাত করে চোরাচালানের পথ সুগম করা। যাই হোক, এই সূত্রে মিলিটারি লোকেদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এবং রাইফেল চালানো সম্ভবত তাদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। আরও একটা কাজ করলেন আনিসুর। সেদিন বাড়ি থেকে বেরোবার আগে গাড়িবারান্দার আলো ভেঙে দিলেন।

'এবারে আসছি প্রথম প্রশ্নে। আনিসুর গাড়ি চালালেন কী করে, যদি তাঁর পায়ের অবস্থা ওরকম হয়? উত্তর একটাই। আনিসুরের গাড়িতে লুকিয়ে ছিল অন্য কেউ। আনিসুর গাড়ি নিয়ে এগিয়ে সকলের চোখের আড়ালে চলে এলেন, এবং ড্রাইভারের সিট ছেড়ে দিলেন সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে, যে সম্ভবত নকুল। দারোয়ান বলেছিল যে সেই রাত্রে নকুল একবার সন্ধে আটটার সময়ে বেরিয়ে নটা নাগাদ ফিরে আসে। এর আগেও নকুল একবার বরানগর থেকে দক্ষিণে এসে আনিসুরের চিঠি দিয়ে গিয়েছিল শুদ্ধসত্ত্বর বাড়ি। ছ-টা নাগাদ বেরোলে, চিঠি দিয়ে আবার বাস ধরে ফিরতে সাড়ে সাতটা থেকে আটটাই বাজবার কথা। তারপরে আবার বেরিয়ে ফিরে আসা সম্ভবত দারোয়ানকে বোঝানোর জন্য যে নকুল রাত ন-টা থেকে বাড়ির ভেতরেই ছিল। কিছুক্ষণ পরে নকুল পাঁচিল টপকে বেরিয়ে যায় এবং বাস ধরে গ্রেট ইস্টার্নের কাছে আসে। পার্টি শেষ হবার পর নকুল তীব্র বেগে গাড়ি চালিয়ে বরানগর চলে যায়। তাহলে আনিসুর কোথায় গেলেন? তিনি নেমে গেলেন ডেকার্স লেনে। হোটেলের কাছে গিয়ে মেইন সুইচ অফ করলেন। তারপর উলটোদিকের হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকলেন। চাবি তাঁর কাছে আগেই ছিল।'

'এক মিনিট।' সিদ্ধার্থ মুখ তুলল। যন্ত্রণাক্লিষ্ট, কিন্তু কঠিন। অমিতাভর উপন্যাস কাল রাত্রে আমি শেষ করেছি। মেইন সুইচ বন্ধ করবার ব্যাপারটা জানি। কিন্তু সেটাকে অফ করা হয়েছিল অন্ধকারে গা ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে। আনিসুর যদি উলটোদিকের আলোওয়ালা হোটেলে ঢোকেন, তাহলে মাধবের হোটেলের মেইন সুইচ অফ করবার দরকারটা কী ছিল?'

'মেইন সুইচ বন্ধ করবার উদ্দেশ্য অন্ধকার আনা ছিলই না। এখানেই আমরা সকলে ধোঁকা খেয়েছি।'

'মানে?' বিভ্রান্ত স্বরে বলল সিদ্ধার্থ।

'আগেই বলেছিলাম, এই গল্পের পুরোটাই ধোঁকা? উপন্যাসেও তাই। মৃদু হাসলাম।' সেদিন ভ্যাপসা গরম ছিল। দরজা-জানালার কবাট আঁটা বদ্ধ ঘরের ভেতর লোডশেডিং হলে মানুষ প্রথমেই কী করে? জানালা খুলে দেয়, যাতে কিছুটা হাওয়া আসে। আনিসুর উলটোদিকের হোটেলের ঘরে নিজের জানালায় রাইফেল হাতে প্রতীক্ষায় ছিলেন, মাধব কখন জানালা খুলবেন। প্রণবেশের ঘরে যখন লতিকা বলল যে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে জানালা খুললে হাওয়া আসবে, শুদ্ধসত্ত্ব এটা শুনে চমকে উঠেছিল। বুঝতে পেরেছিল খুনটা কীভাবে হয়েছে। কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, 'লোডশেডিং-এর উদ্দেশ্য আলো বন্ধ করা ছিল না। ছিল পাখা বন্ধ করা।'

'মাই গড!' এবার বিড়বিড় করলেন অনন্য।

'মাধব কী করলেন? লোডশেডিং হলে কী করে মানুষ? তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করলেন। তারপর উঠে আলোর সুইচ টিপে দেখলেন সত্যিই কারেন্ট গেছে কিনা। হয়তো দরজা খুলে বাইরেও বেরিয়েছিলেন একটু, অন্যান্য ঘরে কারেন্ট আছে কিনা দেখবার জন্য। আবার ভেতরে ঢুকে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন প্রচণ্ড গরমে। জানলার কাছে এলেন। পর্দা সরালেন। কিন্তু জানালার কাচ টেনে তুলতে পারলেন না। কারণ কাচ জ্যাম হয়ে আটকে ছিল। মাধবের উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, উপন্যাসেই বলা আছে। আর জানালার উচ্চতা? মেঝে থেকে চার ফুট উপর থেকে শুরু হচ্ছে, তিন ফুট উচ্চতার জানালা। মানে জানালার মাথা মাটি থেকে সাত ফুট। মাধব হাত উঁচু করেও সেই মাথা ছুঁতে পারবেন না। ফলে ওপরের কাচ টেনে নামাবার মতো প্রয়োজনীয় উচ্চতা তাঁর ছিল না। তিনি চেয়ার টেনে আনলেন। চেয়ারের উপর উঠে দেখতে গেলেন জানালার উপরের কাচ নামানো যায় কিনা। নামানো গেল না। চেয়ার সরিয়ে আবার নীচের কাচই তুলতে গেলেন। এবার কাচ

উঠল। যখন মাধবের বডি আবিষ্কৃত হবার দিন দুপুরবেলা শুদ্ধসত্ত্বরা সেই ঘরে ঢুকেছিল, পুলিশের এক কনস্টেবল জানালা খুলতে গিয়ে প্রথমে পারেনি। তারপর টানাটানি করতে আস্তে আস্তে কাচ ওপরে উঠেছিল। সেই রাত্রেও সেটাই হয়েছিল। মাধব টানাটানি করছিলেন, কাচ আস্তে আস্তে ওপরে উঠছিল। জানালার অর্ধেকটা নীচের কাচ, মানে তার দৈর্ঘ্য দেড় ফুট। সেটা পুরোটা উপরে ওঠা মানে মাটি থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতায় কাচ ওঠা— ফাঁকা হয়ে যাওয়া মাঝখানের দেড়ফুট দৈর্ঘ্য। সেটা মাটি থেকে চারফুট ও সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার মাঝের অঞ্চলটুকু। মানে মোটামুটি মাধবের বুক থেকে মাথা পর্যন্ত। উলটোদিকের রাইফেল হাতে বসে ছিলেন আনিসুর। অনুমান করছি, মাধব কাচ পুরোপুরি তুলবার অবসর পাননি। তার আগেই, তাঁর বুক যখন উন্মুক্ত হয়েছিল, আনিসুর সাইলেন্সার লাগানো রাইফেল থেকে গুলি ছুড়লেন। আনিসুর সম্ভবত জানালার কবাট বা অন্য কোথাও একটা পেনসিল টর্চ রেখেছিলেন, যাতে অন্ধকারে নিশানা করতে পারেন। গুলির ধাক্কায় মাধব ঝাঁকুনি খেয়ে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে গেলেন। জানালার কাচের নীচ থেকে হাত সরে গেল। কাচ দড়াম করে পড়ে গেল আবার। লকড রুম! চিচিং-ফাঁক আর চিচিং বন্ধ! ঠিক যেমনটি বলেছিলেন পুলিশের কনস্টেবল ভবানীবাবু। ঠিক এই কারণেই পিস্তল নয়, রাইফেলের ব্যবহার। কারণ ঘরের মধ্যে নয়, বরং ঘরের বাইরে বেশ খানিকটা দূরত্ব থেকে গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল, যা মিড রেঞ্জ রাইফেল ছাড়া সম্ভব নয়। বুলেটের ফাঁকা খোলও এই কারণে মেলেনি। আর লকড রুম ভেবেচিন্তে করা হয়নি। হয়ে গিয়েছে দৈবাৎ। অপরদিকে নকুল গাড়ি চালিয়ে আনিসুরের বাড়ির সামনে পৌঁছল। হর্ন বাজিয়ে দারোয়ানকে তুলল। ঘুমচোখে দারোয়ান দেখল আনিসুরের গাড়ির জ্বলন্ত হেডলাইট। তীব্র আলোয় সারা বাগান ধাঁধিয়ে আছে। সেই হেডলাইটের পেছনে চালকের আসনে কে বসে আছে সে অত খুঁটিয়ে দেখল না। কারণ সে তো জানে যে আনিসুরের গাড়ি যখন, মালিক নিজেই চালাবেন। সে গেট খুলে দিল। গাড়ি গিয়ে গাড়িবারান্দার সামনে দাঁড়াল। গাড়িবারান্দার আলো ভাঙা হয়েছিল যাতে দারোয়ান দেখতে না পায় অন্ধকারে কে গাড়ি থেকে নামছে। অন্যদিকে আনিসুর খুন করে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে বরানগর এলেন। নকুলের সাহায্যে বাগানের পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকলেন।

ওই কারণেই ভবানীবাবু দেখেছিলেন যে বাগানের একটা দিকের ঘাস দলামোচড়া হয়ে আছে। আর সেই সঙ্গে আনিসুর ওরফে নকল মাধবের অ্যালিব্যাই হয়ে গেল দুর্ভেদ্য। একই সঙ্গে আনিসুর শুদ্ধসত্ত্বের সামনে অমিতা বলে এক কাল্পনিক নারীর আখ্যান হাজির করলেন, যাতে তাঁর গল্পটা শক্তিশালী হয়।

'বিমলবাবু কি মাধব আর আনিসুরকে আগে থেকে চিনতেন? সম্ভবত। সম্ভবত বহু দিন ধরে এদের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। আনিসুর এমন ভাবে খুনটা করলেন, যাতে মনে হয় বিমলবাবু খুন করে আনিসুরের উপর দোষ চাপাচ্ছেন। এই হত্যার চমকটা এখানেই। শিকারি শিকার করল, এবং নিজের কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে গেল শিকারের আশেপাশে, যেন তার নিজের উপর সন্দেহ পড়ে। তারপর সে অঙ্গুলিনির্দেশ করলো এক খড়ের মানুষের দিকে। স্টু-ম্যান! সারা বিশ্বকে দেখালো, সেই খড়ের মানুষই অপরাধী, যে শিকারিকে ফাঁসাচ্ছে। সত্যিটা হলো, খড়ের মানুষ ছিল শিকারির দ্বিতীয় শিকার।'

বিকৃত গলায় হিসহিসানি স্বরে অরুণ বললেন, 'আপনার এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি কী? '

'আপনি একটা গল্প বলেছেন। আমি তার উল্টোদিকে আর একটা বিকল্প গল্প বলছি। আর আপনিও মানবেন, এই গল্পটা পুরো কংক্রিট। কোনো ফাঁক নেই এতে। তাই না?' হালকা গলায় উত্তর দিলাম।

অরুণের মুখ আস্তে আস্তে পালটাচ্ছে। শান্ত স্থিতধী প্রতিবিম্ব ভেঙে বেরিয়ে আসছে একজন অস্থির হিংস্র মানুষ। ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে। চোখ হয়ে উঠছে লাল। হাত মুঠো করে নিজেকে সামলাচ্ছেন প্রাণপণে।

নিস্পৃহভাবে অরুণের দিকে তাকালাম। 'আর এখানেও কী অদ্ভুত মিল উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবের! মাধবের যে সহকারী ছিল একজন, তেমনই বাস্তবে আপনারও ছিল একজন সহকারী। কিন্তু শুধু এটুকুই নয়। উপন্যাসে যেমন শিকারি একজন খড়ের মানুষ খাড়া করে দেখাতে চেয়েছিল যে সেই খড়ের মানুষ শিকারিকে ফাঁসাতে চাইছে, বাস্তবেও তাই। এখানে সেই স্ট্র-ম্যানের নাম ড্যানিয়েল লামা। আরও যে কত কত মিল! আপনি তো আমার থেকে অনেক ভালো জানবেন, কারণ লিখেছেন আপনিই। দুটো চিঠি, নাকি একটাই চিঠি? একটা মানুষ, নাকি দুটো আলাদা মানুষ? এই গল্পটা কি এবার বলবেন, মিস্টার চৌধুরী?'

অরুণকে দেখলাম, অবরুদ্ধ ক্রোধে অল্প অল্প কাঁপছেন। মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আগেকার স্থির লোকটা অদৃশ্য। তার জায়গা নিয়েছে কোণঠাসা আহত এক জানোয়ার। চাপা গর্জন করে উঠলেন, 'আমি চাইলে আপনি দার্জিলিং থেকে সারাজীবনের জন্য বাইরে বেরোতে পারবেন না টিনা! সামলে খেলুন।'

'এই হুমকি ড্যানিয়েলও দিয়েছিলেন আলাপের প্রথম দিন। কী আশ্চর্য মিল দুজনের! কিন্তু আপনারা কেউই কিছুই করতে পারবেন না, সেটাই যা দুঃখের দুই কাগুজে বাঘ বৃথাই একে অপরের বিরুদ্ধে এতদিন নখে শান দিয়ে গেলেন।'

সিদ্ধার্থ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, এই অরুণকে সে চেনে না। এবার কাকার হাত ধরতে গেল। অরুণ ফিরেও তাকালেন না। ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিলেন।

'আপনি যখন গল্পটা বলবেন না, আমিই বলছি।' অরুণের চোখে সোজাসুজি দৃষ্টি মেললাম। কপালের ওপর এসে ঝামরে পড়া চুলের গোছা চোখেই পড়ল না এবার। 'গতকাল পুলিশের লাইব্রেরিতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে পুরোনো তথ্য, এফআইআর কপি এই সমস্ত কিছু জোগাড় করেছি। ফটো তুলেছি। আর সেখান থেকে গল্পটা দাঁড় করিয়েছি। প্রথমে বলি, যে গল্পটা আপনি সাজিয়েছিলেন, সেই গল্পের ফাঁকগুলো কোথায়। অমিতাভ আপনার হাতে আঁচড় কাটেননি, উপন্যাসটাও তাঁর লেখা নয়। এই দুটোর কথা আগেই বললাম। এ ছাড়াও, ঋষি রোডের বাড়িতে আঁকা ছবিতে দু-রকম রং কেন থাকবে সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। আর একটা প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল যার উত্তর কিছুতেই পাচ্ছিলাম না। যে ড্যানিয়েল আপনাকে নাকি হুমকি দিয়েছিলেন যে অমিতাভর পায়ের ছাপ যেন বাগান থেকে মুছে দেন, তিনি নিজের পায়ের ছাপ মুছে দেবার ব্যাপারে এত উদাসীন ছিলেন কেন? আপনাকে তো অমিতাভর পায়ের ছাপ মুছতে বলেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর উচিত ছিল নিজের পায়ের ছাপও মুছে ফেলবার ব্যবস্থা করা। কবরখানায় কিন্তু ড্যানিয়েল সতর্ক ছিলেন, তাঁর পায়ের ছাপ যেন না বোঝা যায়, অথবা জুতোজোড়া খুঁজে না পাওয়া যায়। সেই জন্যই রেইনকোটের মধ্যে জুতো ভরে নিয়ে যাওয়া। কবরখানায় যিনি এত সতর্ক, অরুণের বাড়িতে পায়ের ছাপ লুকোনোয় তিনি এত অসাবধানী কেন? তিনি তো জানতেনই যে পুলিশ এসে পায়ের ছাপ দেখবে। আর যে প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না—অমিতাভর লাশ উপুড় করা ছিল কেন। ড্যানিয়লের ঘৃণা, মুখ দেখতে চান না? নাটকীয় না? অন্য কোনো বিকল্প কি থাকতে পারে না?

'শেষ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি। কাল দেখেছিলাম, হোটেলের এক ভদ্রলোক হিপ পকেট থেকে পার্স বার করছেন। দুম করে মনে পড়েছিল, অমিতাভর পরনে ছিল জিন্সের প্যান্ট। দার্জিলিং-এর বাজার তখন ছেয়ে গিয়েছিল হংকং থেকে চোরাপথে আসা জিন্সে। জিন্সের প্যান্টে দরকারি কাগজপত্র সাধারণত হিপপকেটে রাখা হয়। মৃতদেহ উপুড় করা ছিল কি তাহলে হিপ পকেটে সেই কাগজ ঢোকাবার জন্য? যদি সেটাই হয়, তার মানে সেই কাগজগুলো হিপ পকেটে গোড়া থেকেই ছিল না। কেন ছিল না? কারণ, যার পকেটে এই কাগজগুলো থাকার কথা, সে এই ব্যক্তি নয়।

'দ্বিতীয়ত, ড্যানিয়েলের পায়ের ছাপ নিয়ে ধাঁধা। আগের দিন যখন আমার সমাধান বলছিলাম, মানে যেখানে ড্যানিয়েলই হত্যাকারী, সেখানে গল্পটা এমন ছিল যে ড্যানিয়েল আর আপনি মিলে প্রশান্ত গুরুঙের পায়ের ছাপ তৈরি করেছেন। মানে, ড্যানিয়েল

এসেছিলেন, প্রশান্ত গুরুং আসেননি। যদি একটা বিকল্প আখ্যানে ব্যাপারটা উলটে যায়, যদি এমন হয় যে প্রশান্ত গুরুং এসেছিলেন, কিন্তু ড্যানিয়েল আসেননি? এবং প্রশান্ত গুরুং-এর পায়ের ছাপ নয়, আপনি ড্যানিয়েলের পায়ের ছাপ বানিয়েছেন? আগের গল্পের একশো আশি ডিগ্রি উলটোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা এই আখ্যানের সুবিধেটা হলো, এর ফলে একটা প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাচ্ছি। ড্যানিয়েল এই বাড়িতে আসেননি, কিন্তু কবরখানায় গিয়েছিলেন, এবং নিজের পায়ের ছাপ লুকোতে সচেষ্ট ছিলেন।

'যদি ওপরের ব্যাখ্যাগুলো মেনে নিই, তাহলে কী দাঁড়ালো? অমিতাভ আপনার হাতে আঁচড়ে দেননি। অমিতাভ এই উপন্যাস লেখেননি। ড্যানিয়েল এই বাড়িতে আসেননি। এবং মৃতদেহটাও অমিতাভর নয়। তাহলে গোটা আখ্যানে অমিতাভর জায়গাটা কোথায়? অমিতাভ বলে কি সত্যিই কেউ আছেন? আমরা যা দেখছি, পুরোটাই কি ধোঁকা? আসল গল্পকে চাপা দেবার জন্য একটা কভার? সেটা জানবার জন্য আমাকে কাল সারাদিন ধরে অনেক কিছু ঘাঁটতে হয়েছে। এবং সত্যিটা আমি এখন জানি। অমিতাভ খুন হয়েছেন, এবং হননি। ঠিক যেমন আনিসুর খুন হয়েছেন, এবং হননি।'

কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কারোর সেদিকে মন ছিল না। 'আমার সিদ্ধান্তটাকেই ব্যাখ্যা করে বলি?'

কেউ উত্তর দিল না।

'আপনারই প্রিয় কবিতা, মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়— জীবনানন্দ দাশ। এটাই আসল ক্লু, তাই তো? সমস্ত রহস্যের মূল সূত্র লুকিয়ে আছে ওই লাইনটাতেই। বারবার, জানেন, বারবার মাথার ভেতর ঘুরে ফিরে আসছিল লাইনটা। এই কয়েকদিনে। কাল বুঝলাম, এটার আসল মানে কী। আপনিও হয়তো কবিতাটা থেকেই প্ল্যান পেয়েছিলেন। তবে এ তো নতুন কিছু নয়। গর্জনতেল মাখানো দিদির মৃতদেহের ইমেজারি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আপনি একটা আস্ত রহস্যকাহিনী লিখেছেন। আগেই বোঝা উচিত ছিল, আপনার লেখালেখির অনেক রেফারেন্স কবিতা থেকে মিলবে। এমনকি বাস্তব জীবনের যে ক্রাইমটা করবেন, সেটাও আদিকবির সূত্র ধরেই।'

সিদ্ধার্থ সামনে ঝুঁকল। 'তুমি বলতে কী চাইছ?'

'অমিতাভ মিত্র, প্রতিশ্রুতিবান তরুণ কবি, ড্যানিয়েল লামার হাতে খুন হয়েছিলেন ১৯৭১ সালে। আর ১৯৭৫ সালে অরুণ চৌধুরী এবং সঞ্জয় অধিকারী, বিশিষ্ট লেখক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক, এই দুজন মিলে খুন করেছেন অপর একজনকে। তাকে এখানে সকলেই নামে চেনে। বাবলা। আপনার বাগানের একসময়কার মালি।'

শান্ত ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও লোকে এত চমকাত না, যেমন চমকালেন অনন্যা ও সিদ্ধার্থ। অনন্যা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো থরথর করে কেঁপে উঠলেন।

সিদ্ধার্থ ফ্যাকাশে মুখে একবার উচ্চারণ করল, 'বাবলা?' শুধু অরুণের কোনো ভাবান্তর হলো না।

'এই গল্পের শুরু ষাটের দশকে। অভিন্নহৃদয় তিন বন্ধু স্কুলজীবন থেকে লেখক হবার স্বপ্ন দেখতো। সবথেকে প্রতিভাবান যে, সে ছিল উন্মার্গগামী। প্রায় স্যোসিওপ্যাথ। তাকে আগলে রাখতো বাকি দুজন। এই তিনজনের ওঠা-বসা, ঘুরে বেড়ানো, দার্জিলিং-এর গলিখুঁজি উপত্যকা জঙ্গলের মধ্যে দিনযাপন – এই সমস্ত কিছুর চিহ্ন রেখে দিয়েছে সেই সময়কার কবিতা, লিটলম্যাগ, লেখালেখি, একসঙ্গে বাঁচার এবং লেখার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবার যে যৌথ পরিবৃত্ত, সেই সমস্তকিছু। মধ্যরাতের দার্জিলিং শাসন করত তিনজন যুবক, এরকম বলাও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। সেই যাপনের প্রতি তিন বন্ধুই আমৃত্যু অনুগত থেকে গিয়েছিলেন। একজনের সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে। তিনি চলে গেছেন কলকাতায়। একজন চলে গিয়েছেন নির্জনে। মরে গিয়ে ভুলে যাওয়া কবিদের কবরখানায় জায়গা পেয়েছেন। আর তৃতীয়জন, মানে আপনি, বিখ্যাত ক্রাইম লেখক অরুণ চৌধুরী, তিনি ক্রমে সাফল্যের শীর্ষে উঠেছেন। কিন্তু একটা জায়গায় তিনজনেই এককাট্টা ছিলেন।

সেটা বন্ধুত্বের প্রতি। ফেলে আসা দিনগুলোর প্রতি। অরুণ চৌধুরী। অমিতাভ মিত্র। সঞ্জয় অধিকারী। বিখ্যাত লেখক। ভুলে যাওয়া কবি। বিশিষ্ট সাংবাদিক। আর সেই আনুগত্য, নিখাদ কমিটমেন্ট, সেখান থেকেই এই গল্পের সূচনা বললে বাড়াবাড়ি হয়তো হবে না।

'স্বভাবপাগল অমিতাভ মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতেন। ফিরে আসতেন কয়েকদিন পরে। কিন্তু একবার গিয়ে আর ফিরলেন না। সেটা ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি। অরুণ এবং মৃত্যুঞ্জয় দুজনেই জানিয়েছেন যে একবার অমিতাভ পালিয়ে গেছিলেন এবং ফিরেছিলেন বহুদিন পর। সেবার অরুণ ভয় পেয়ে থানা পুলিশ করেন। বাস্তবটা হলো, অমিতাভ সেবারে আর ফেরেননি। ড্যানিয়েল লামা সম্ভবত নকশাল সন্দেহে আপনমনে ঘুরতে থাকা পাগলাটে কবিকে তুলে নিয়ে গিয়ে এনকাউন্টার করে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে এরকম সন্দেহের বশে এনকাউন্টার ভুরি ভুরি হতো। অথবা এটাও হতে পারে যে অমিতাভ রাত্রের দার্জিলিঙের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ড্যানিয়েলের কোনো হত্যাকাণ্ড দেখে ফেলেন।

মাথায় গণ্ডগোল ছিল তাঁর। চিৎকার চেঁচামেচি করেন যে তিনি থানা-পুলিশ আদালত করবেন। ড্যানিয়েলের কাছে বুলেট ছিল সস্তা। একজন পাগলকে কে অত বোঝাবে, যেখানে অসংখ্য লাশের ভিড়ে তার লাশ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়? সম্ভবত ঋষি রোডের বাড়ির নীচে যে উপত্যকা, সেই জঙ্গলেই অমিতাভর লাশ ফেলে দিয়েছিলেন ড্যানিয়েল, আরও অন্যান্য মৃতদেহের সঙ্গে। অজ্ঞাতকুলশীল অনাথ যুবক অমিতাভর কথা সকলে ভুলে গেল।

'ভুললেন না দুজন। অরুণ আর সঞ্জয়। সঞ্জয় অধিকারী যে দার্জিলিং-এর স্কুলে পড়েছেন, এটাই জানতাম না। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে অরুণকে তিনি ছোটোবেলা থেকে চিনতে পারেন। প্রথম ইঙ্গিত পেলাম বিনয়েন্দ্র মুস্তাফির কাছ থেকে। কলকাতায় চেনা সাংবাদিকদের ফোন করে সঞ্জয়ের জন্ম সাল এবং কোন স্কুলে পড়েছেন, দুটো মিলিয়ে নেবার পর মনে হচ্ছিল, আমি কী করে এতদিন গোটা গল্পটা থেকে ব্যক্তি সঞ্জয়কে ভুলে গিয়েছিলাম? তবে শুধু আমি নই, পুলিশও একই ভুল করেছিল। একে একে সেইসব প্রসঙ্গে আসছি। অরুণ, অমিতাভ আর সঞ্জয়। তিন বন্ধু। মৃত্যুঞ্জয় সোম সঞ্জয়কেও দেখেছিলেন অরুণের সঙ্গে আদালতে আসতে। ওই সময়টায় সঞ্জয় সবে জুনিয়র সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেছেন কলকাতার কাগজে। সেই সময়ে তাঁর কাছে অরুণ খবর পাঠালেন, অমিতাভ বহুদিন ধরে নিখোঁজ। অরুণ সম্ভবত বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছিলেন যে অমিতাভকে পুলিশ মেরে দিয়েছে। অরুণ বহু থানা পুলিশ করলেন। কাল আমি সেইসব এফআইআর কপি দেখেছি, ৭১-এর জুলাই মাসের। সেটা দেখেই অনুমান করলাম যে অমিতাভ আর বেঁচে নেই। কারণ এফআইআরে অরুণ লিখেছিলেন যে তিনি ভয় পাচ্ছেন অমিতাভকে গুম করে দেওয়া হয়েছে। ড্যানিয়েলের সঙ্গেও দেখা করলেন। ড্যানিয়েল অরুণকে হুমকি দিলেন যে এই বিষয়ে বেশি খোঁচাতে গেলে তাঁর অবস্থাও অমিতাভর মতো হবে। সম্ভবত হেনস্থাও করেছিলেন কি? সেই সময়ে ড্যানিয়েল দার্জিলিং-এর মুকুটহীন রাজা। তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলবে এমন হিম্মত কারোর ছিল না। তিনি চাইলে যে কাউকে গুম করে দেবেন বা ফলস্ কেসে ফাঁসিয়ে জেলে ঢুকিয়ে পচিয়ে মারবেন। অরুণের কিছু করবার ছিল না। তিনি চুপ করে দেখে গেলেন, ড্যানিয়েল কীভাবে তাঁর অবর্ণনীয় সন্ত্রাস এবং নিষ্ঠুরতা দিয়ে একটা জেলার নাভিমূল অবধি আতঙ্কে বরফ করে দিচ্ছেন। কিন্তু খেলা তখনও বাকি ছিল। এক দান, এক দান, এবং তার পরে আরও এক দান।

'ড্যানিয়েল অরুণকে দাবিয়ে রাখলেন ঠিকই। কিন্তু অরুণের মনে জন্ম নেওয়া প্রবল আক্রোশ আর ঘৃণার সন্ধান পেলেন না। সেটা শীতঘুমে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকা একটা সাপের মতো ঘাপটি মেরে থেকেই গেল অরুণের মনে। তিনি দেখলেন, একজন পুলিশ অফিসার শুধুমাত্র নিজের পদাধিকার এবং ক্ষমতার বলে একটার পর একটা অন্যায় করে যাচ্ছেন, এবং হয়ে উঠছেন একচ্ছত্র সম্রাট। অরুণকে শুধুমাত্র হুমকি দিয়ে গলা টিপে ধরেছেন, এবং তাতে কারোর কিছু আসছে যাচ্ছে না। অরুণের আত্মসম্মানকে দশ টাকা দরে খোলা বাজারে বেচে দিচ্ছেন ড্যানিয়েল। এতখানি গ্রহণ করতে অরুণের মতো মেগালোম্যানিয়াক প্রস্তুত

ছিলেন না। তীব্র ঘৃণার বশে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ড্যানিয়েলকে শেষ করতে হবে। সঙ্গে পেলেন সঞ্জয়কে। কারণ সঞ্জয়ও অমিতাভ হত্যার বিচার চাইছিলেন। আইনি পথে না হলে আইন-বহির্ভূত উপায়ে। শুরু হলো প্রতিশোধ নেবার প্ল্যান। ধীর, কিন্তু অব্যর্থ। সময় নিয়ে দুজনের মাথাব্যথা ছিল না। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্ল্যানকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বেশ কিছু বছর ধরে ধীরে ধীরে গল্পটাকে পাকিয়ে তুলতে হবে।

'কীভাবে এই প্রতিশোধ নেওয়া যাবে? ড্যানিয়েলকে হত্যা করে? না। কারণ হত্যা করলে তো হিসেব মিটেই গেল। আর তাতে ঝুঁকিও অনেক। ড্যানিয়েলকে সারাজীবন ধরে দগ্ধে দগ্ধে মারতে হবে। শেষ আঘাত হতেই হবে কালান্তক। তাহলে প্রতিশোধের ধরণ কীরকম হবে? উত্তরটা সহজ। জাত লেখক অরুণই হয়তো সেই উত্তরটা দিয়েছিলেন। একটা গল্প বানানো হবে। জন্ম দেওয়া হবে দৃশ্যের। ড্যানিয়েল অমিতাভকে খুন করেছিলেন, যার বিচার হয়নি। জন্ম নেওয়া দৃশ্যেরা এবার দেখাবে যে ড্যানিয়েল আবার অমিতাভকে খুন করলেন। এবং এবার তাঁর বিচার হবে। মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়। অমিতাভর মৃত্যু হয়েছে, তবুও তাকে থেকে যেতে হবে। বাঁচিয়ে তুলতে হবে অমিতাভকে, যাকে ড্যানিয়েল আবার খুন করতে পারেন। কিন্তু খুন করবার জন্য একটা বডি লাগে। যেখানে বডি নেই, বডি জোগাড় করো। অর্থাৎ, বলি দেবার জন্য প্রস্তুত করো এমন কাউকে, যাকে অমিতাভ বলে চিহ্নিত করা যায়।'

অনন্যা উঠে দাঁড়ালেন। বাগানে নামতে যাচ্ছিলেন, সিদ্ধার্থ ডাকল, 'কাকিমা!' অনন্যা পেছন ফিরে সিদ্ধার্থর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন দুই দিকে। 'ডাকিস না।' তারপর সটান হেঁটে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি যাবে? না হলে কিন্তু আরও অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে।' সিদ্ধার্থ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমি শুনতে চাই। পুরোটা।'

অরুণ এতক্ষণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমার কথা শুনছিলেন। হঠাৎ ভেঙে পড়লেন এবার। সিদ্ধার্থকে ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনন্যা কোথায় গেল?'সিদ্ধার্থ উত্তর দিল না। অরুণ দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে বসে রইলেন।

সেদিকে দৃকপাত না করে আবার বলতে শুরু করলাম, অরুণ এবং সঞ্জয় মিলে পরিকল্পনা করলেন— অনেকটা সময় নিয়ে খুব যত্নে অমিতাভকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে আবার। তারপর খুন করতে হবে এমনভাবে যাতে অরুণের ওপর প্রাথমিক সন্দেহ আসে। কিন্তু সেই সন্দেহের ভিত্তি জোরালো হওয়া চলবে না। নানা পরস্পরবিরোধী ক্লু দিয়ে ঘেঁটে দিতে হবে পুলিশকে। যাতে পুলিশ মন দিয়ে রহস্যের গভীরে প্রবেশ করে। এবং প্রবেশ করবার পর বুঝতে পারে, ড্যানিয়েল খুন করে অরুণের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। সোজাপথে না গিয়ে কেন এরকম জটিল ভাবনা? সম্ভবত ধনরাজ গম্বুর কথা মাথায় রেখে। আনন্দ পাঠক বলেছিলেন, দোষীর ছাড়া পাবার থেকেও ধনরাজের কাছে বেশি অসহনীয় ছিল নির্দোষের শাস্তি পাওয়া। এই মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটায় ঘা দিতে হবে।

'টোকারেভ বুলেট জোগাড় করেছিলেন সঞ্জয়। বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এখানকার নকশালপন্থী তরুণেরা সীমান্তে পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র-ট্রেনিং দিয়েছেন, সেইরকম একটা ক্যাম্পে গিয়ে সঞ্জয় খবর করেছিলেন। সেই রিপোর্ট আমি পড়েছি, আগেই বলেছিলাম। যখন টোকারেভ বুলেট কোথা থেকে সংগ্রহ হলো, সেটা নিয়ে ভাবছিলাম, মাথায় এল এই ক্যাম্পের কথা। এসব ক্যাম্পে পুলিশ ও বিএসএফ সহযোগিতা করত। নিজেদের অস্ত্র এবং বুলেটেও ধার দিত। সঞ্জয় কয়েকটা বুলেট এখান থেকে সংগ্রহ করলেন। অরুণের দাদার বাড়িতে এক রাতে একটা ভুয়ো চুরি ঘটানো হলো, যাতে নিখোঁজ হয়ে গেল একটা রাইফেল। রাইফেলটা সঞ্জয়ের কাছেই ছিল। আর সবশেষে বাবলা অমিতাভর আকৃতি এবং উচ্চতার একজন ভবঘুরে বাঙালি মাতালকে দার্জিলিং শহরে খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হবার কথা না। সজাগ চোখ রেখে কিছুদিন অপেক্ষা করলেই পাওয়া যায়, এত বড়ো শহর আর এত লোকসংখ্যা যেখানে অরুণ বাবলাকে তুলে নিয়ে এসে

নিজের কাছে রাখলেন। নিজের বাগানের দায়িত্ব তুলে দিলেন বাবলার হাতে। সারা পৃথিবী দেখল, এক দরিদ্র ভবঘুরেকে অরুণ চৌধুরী নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবাসছেন। শুধু দুজন জানলেন, বাবলা ছিল বলির পশু।

'এবার কাজ, অমিতাভকে বাঁচিয়ে তোলা। সেটার প্ল্যানও অনুমান করছি অনেকদিন ধরে খুব নিখুঁতভাবে ছকা হয়েছিল। যেহেতু অমিতাভ মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যেতেন এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ পরিচিতদের মধ্যে কেউ জানত না, তাই অমিতাভকে আবার তিন মাস পরে দার্জিলিং-এ ফিরিয়ে আনা হলো। কিন্তু তিনি চলে গেলেন গ্রামে, যাতে শহরের পরিচিতরা তাঁর নাগাল না পান। গ্রামের ঠিকানায় কি দার্জিলিং-এর বন্ধুরা ধাওয়া করেননি? সম্ভবত না। কারণ দার্জিলিং-এ অমিতাভর বন্ধু তেমন কেউ ছিলেন না, অরুণ আর সঞ্জয় বাদে। বাকিদের সঙ্গে, অন্যান্য জেলার যারা, সম্পর্ক মূলত লেখালেখির মাধ্যমেই। সেই লেখালেখি যতক্ষণ অব্যাহত থাকছে, পেছনের মানুষটার খোঁজ না পেলেও চলে। এটাও মনে রাখতে হবে যে উত্তরবঙ্গে অমিতাভর লেখালেখির পরিচিতরাও প্রায় কেউই দার্জিলিং জেলায় থাকতেন না। থাকতেন কুচবিহার, শিলিগুড়ি, দিনাজপুর এসব জায়গাতে, আর নাহলে গ্রামের দিকে। তাই প্রার্থিত আড়ালটুকু জোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল, যেহেতু ওসব জায়গা থেকে হুট করে কেউ দার্জিলিং আসবেন না, অমিতাভর খোঁজে তো আরোই নয়। অরুণ কয়েকটা কবিতা আর গল্প লিখে অমিতাভর নামে এখানে ওখানে পাঠালেন। যতই বারবার বলুন না কেন তিনি কবিতা লিখতে পারেন না, অরুণ কবিতাটা খারাপ লিখতেন না। তার নমুনা নকল অমিতাভর লেখাপত্রে পেয়েছি। কিছু লেখাপত্র ছাপা হলো। সঞ্জয় অমিতাভকে নিজের কাগজে আখ্যা দিলেন প্রতিশ্রুতিবান কবি ও লেখক হিসেবে। এর মধ্যে অরুণের নিজের বই ফ্লপ করল। আস্তে আস্তে অমিতাভর নাম উঠে আসছিল বাংলার পাঠক মহলে। পুরো ব্যাপারটাই তিনচার বছর ধরে ঘটছিল। অমিতাভর সাক্ষাৎকার, তাঁর ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করে তৈরি করা হলো একজন জ্যান্ত মানুষকে। ফোনে কি কথা বলানো হয়েছিল কলকাতার কোনো কবি, অথবা লেখক, বা পত্রিকার সম্পাদক অথবা প্রকাশকের সঙ্গে? সেটাও সম্ভব। মোদ্দা কথা, অমিতাভ তখন বেঁচে উঠেছেন ভরপুর। তাঁকে কলকাতার কেউ দেখেনি কারণ তিনি দার্জিলিং-এ থাকতেন। তাতে সুবিধে যেটা, চট করে কেউ কলকাতা থেকে এত দূরে আসবে না। হুগলি বা বীরভূম হলে ব্যাপারটা এত সহজ হতো না। যেটা আমার মাথায় আসা উচিত ছিল, ১৯৭১ সালের পর অরুণ ছাড়া অমিতাভকে এমন কেউ দেখেননি যিনি এখনও বেঁচে আছেন। এমনকী মৃত্যুঞ্জয় সোমও অমিতাভকে দেখেছিলেন ১৯৭১ পর্যন্তই। এমনিতেই অমিতাভর আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব ছিল না। সেটাকেই ব্যবহার করা হলো এবার। সঞ্জয় এমনভাবে রিপোর্ট লিখলেন যা পড়ে মনে হয় দার্জিলিং-এ অমিতাভ চেনা একজন মানুষ। অরুণও পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর অমিতাভর গল্প করেছেন আমার কাছে। বহুকাল আগে শক্তি মারা গিয়েছেন, তাই তিনি এই বক্তব্য আর খণ্ডন করতে পারবেন না। অমিতাভর মৃত্যুর বহু বছর পরে, ২০০৭ সালে সঞ্জয় স্মৃতিচারণামূলক একটা লেখা লিখেছিলেন। সেখানেও একই কায়দা দেখলাম। সমরেশ বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়দের নাম এবং অমিতাভর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের বিবরণ। যাঁরা সকলেই তখন মারা গিয়েছেন। ড্যানিয়েল যেহেতু বাংলা বইপত্রের খোঁজ রাখেন না, তিনি এসব জানতেও পারলেন না। যেটা আর এক জায়গায় খটকা লেগেছিল, অমিতাভ ১৯৭১ সালের আগে কবিতা ছাড়া কিছু লেখেননি। তিনি দুম করে গল্প লিখতে শুরু করলেন কীভাবে? তাঁর প্রথম বই তো কবিতা হবার কথা ছিল, কিন্তু হয়ে গেল উপন্যাস। ব্যাপারটা অদ্ভুত। কিন্তু এই প্রশ্নগুলো তখন বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি। পরে মেলাতে বসলাম যখন একটার পর একটা খটকার সমাধান, তখন দেখলাম, এই ধাঁধাটার সমাধান হয়ে যায় একইভাবে, যেভাবে অসমাপ্ত উপন্যাসের খটকার সমাধান হয়েছে। অমিতাভ লেখেননি, অমিতাভর নাম নিয়ে লিখেছেন অরুণ। 'যাই হোক, যেটা বলছিলাম। সঞ্জয় অমিতাভর নামে অরুণের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক বক্তব্য ছাপালেন। পরের ঘটনা সবারই জানা। তারপরেও কি দার্জিলিং-এর সাহিত্যজগতের কেউ অমিতাভর সঙ্গে

দেখা করতে আসেননি? হয়তো চেয়েছিলেন, কিন্তু কয়েক বছরের চেষ্টায় অরুণ এই কথাটা ততদিনে রটিয়ে দিতে পেরেছেন যে অমিতাভ স্যোসিওপ্যাথ হয়ে গেছে। গ্রামে চলে গেছে, কারোর সাথে দেখা করে না, শুধু নিজের লেখা নিয়ে থাকে। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলে এটুকু শুনে মুখোমুখি হবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। সে যাই হোক, অরুণ আর সঞ্জয় মিলে গল্প রটাতেন, কোনো এক বড়ো প্রকাশক অমিতাভর সঙ্গে বইয়ের চুক্তি করেছেন দার্জিলিং এসে। বাস্তবে, অমিতাভর বইটা বেরিয়েছিল কোনো বড়ো প্রকাশকের ঘর থেকে নয়। এক ছোটো সংস্থা থেকেই। সম্ভবত সঞ্জয় নিজের যোগাযোগ দিয়ে বইটা ছাপিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কয়েকটা ছোটো বড়ো পত্রিকায় রিভিউ। বই ছাপানোর টাকা অরুণ দিয়েছিলেন ধরে নিচ্ছি। উদ্দেশ্য একটাই, ড্যানিয়েল লামার চোখে যেন পড়ে। সেই কারণেই উপন্যাসের বিষয় ছিল ওরকম, উত্তরবঙ্গে নকশাল আন্দোলনে পুলিশের নিষ্ঠুরতা। অরুণকে একটা কাগজ কীভাবে তাদের শারদ সংখ্যাতে লেখার জন্য যোগাযোগ করেছিল, সেটা আজ আর বলতে পারব না। কাকতালীয় বলে মনে হয় না। হয়তো কলকাতার কবি-সাহিত্যিক মহলে সঞ্জয় নিজের কিছুটা প্রভাব খাটিয়েছিলেন। পুরোটাই করতে হলো ড্যানিয়েল লামাকে টোপ দেবার উদ্দেশ্যে, এবং এই লক্ষ্য মাথায় রেখে যাতে অরুণের অপরাধের একটা ছদ্ম-মোটিভ পাওয়া যায়। কারণ অরুণকে গ্রেপ্তার হতেই হবে। নাহলে শুধু যে অ্যালিবাই তৈরি হবে না, সেটুকুই নয়। এটাও দেখানো যাবে না যে ড্যানিয়েল অরুণকে ফাঁসাতে চাইছেন। ধনরাজকে ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে চালনা করবার জন্য নিরপরাধকে ফাঁসাবার আখ্যান অত্যন্ত জরুরি একটা উপাদান।

'এর পরের কিছুটা গল্প গতকাল ম্যালে ড্যানিয়েলের মুখ থেকে শুনেছি। ড্যানিয়েল প্রমাদ গুনেছিলেন। অমিতাভ মিত্রর নামটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন এতদিন। কিন্তু অরুণ চৌধুরীর সঙ্গে কানেক্ট করে তাঁর মনে পড়লো। তিনি এই ছেলেটিকে এনকাউন্টার করেছেন। এদিকে এখন দেখা যাচ্ছে সে বেঁচে উঠে ড্যানিয়েলের কুকীর্তি ফাঁস করে দিচ্ছে। ড্যানিয়েল বুঝলেন এটা তাঁকে ফাঁসাবার একটা চাল। এদিকে অমিতাভকে তিনি যে হত্যা করেছেন সেটা বাইরে প্রকাশ করা যায় না। তিনি ভাবলেন, কিল খেয়ে আপাতত কিল হজম করবেন। কিন্তু অমিতাভর নাম নিয়ে অরুণ দ্বিতীয় আঘাত হানলেন— একটি মানবাধিকার সংস্থার সাহায্যে জনস্বার্থ মামলা। এর আগেও ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে, সেরকমই একটি মামলা দেখিয়ে পরে ড্যানিয়েলকে বসিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এবারের জনস্বার্থ মামলা অন্যরকম, কারণ এর সঙ্গে অমিতাভ জড়িয়ে, যিনি ড্যানিয়েলের রক্ত দেখতে চান। মামলার পেছনেও অরুণদের উদ্দেশ্য সেই একই। ড্যানিয়েলকে প্রোভোক করা। ফাঁদে টেনে নিয়ে আসা। ভুয়ো সংস্থাটি, তার নাম ঠিকানা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর সহ, পুরোটাই সম্ভবত সঞ্জয়ের বানানো ছিল। অরুণের পক্ষে কঠিন ছিল কারণ তিনি বসে আছেন দার্জিলিং-এ। এগুলো সহজে বানাতে গেলে কলকাতায় থাকা দরকার, তার ওপর সঞ্জয় সাংবাদিক হবার কারণে বাড়তি সুবিধে পাচ্ছেন। এবার এই জনস্বার্থ মামলায় ড্যানিয়েল প্রমাদ গুণলেন। প্র্যাঙ্কটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তিনি অরুণের সঙ্গে দেখা করে হুমকি দিলেন। অরুণ জোর দিয়ে বললেন যে অমিতাভ বেঁচে আছে। এবার, ড্যানিয়েলকে যদি এই দাবি অস্বীকার করতে হয়, তাহলে মেনে নিতে হবে যে অমিতাভকে তিনিই খুন করেছেন। ড্যানিয়েল পালটা চাল চাললেন। তিনি অরুণকে বললেন, অমিতাভর সঙ্গে দেখা করতে চান। অরুণ প্রস্তাব দিলেন, নিউট্রাল জায়গায় সাক্ষাৎ করতে হবে, যাতে ড্যানিয়েল অথবা অরুণ কেউ নিজেদের ক্ষমতা খাটাবার সুযোগ না পান। স্থির হলো, ১১ জুন রাত সাড়ে বারোটায় পুরোনো গোরস্থানে তিনজন আসবেন। নাটকের শেষ অঙ্কের প্লট রচনা হলো।

'এর মধ্যে আরও একটা কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকে যে আখ্যান অরুণ আর সঞ্জয় মিলে রচনা করছেন, তার একটা সমান্তরাল দ্বিতীয় প্রতিলিপি নির্মাণ। একদম পাক্কা পশ্চিমী মিডিয়ার কায়দায় সম্মতি নির্মাণ যাকে বলে। কাহিনী দিয়ে।

আখ্যান বানিয়ে। কিন্তু অরুণ পারফেকশানিস্ট। তাঁর কাজ এবং পরিপার্শ্বে যেন নিখুঁত সমতা থাকে, তিনি সে বিষয়ে খুঁতখুঁতে। তাই এই কাহিনী, যেটা অরুণ লিখবেন, সেটাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সূক্ষ্ম তারের ওপর, একচুল এদিক-ওদিক হলে চলবে না। সম্মতি নির্মাণ হবে, কিন্তু এমনভাবে যাতে নির্মাণকে বোঝা না যায়। অমিতাভকে ড্যানিয়েল খুন করবেন এটা দেখাতে হবে, কিন্তু শুধু দেখালেই হবে না। পুলিশকে বিশ্বাস করতে হবে যে ড্যানিয়েল খুনি। তখনই দুজনের নজর ঘুরে গিয়েছিল ধনরাজ গম্বুর দিকে। পুলিশের সৎ ও জনপ্রিয় অফিসার, এবং নীতিগত কারণেই হোক বা ডিপার্টমেন্টের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের ফলে, ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে। ধনরাজই হতে পারেন অরুণ সঞ্জয়ের ভরসার খুঁটি। কিন্তু ধনরাজকে বিশ্বাস করাতে হবে যে ড্যানিয়েল হত্যাকারী। এক ধরনের বিশ্বাস আসতে পারে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে। কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয়, যদি না ধনরাজের মনের ভেতরে ড্যানিয়েলের অপরাধ নিয়ে পাকাপোক্ত বিশ্বাস তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। আনন্দ পাঠক আমাকে প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পুলিশের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো সিক্সথ সেন্স। এই সিক্সথ সেন্সকেও নির্মাণ করা সম্ভব। দরকার শুধু বিশ্বাসের একটা বীজ পুঁতে দেওয়া। তার জন্য উপযুক্ত মাটি ছিল ধনরাজের মন, যা আগে থেকেই ড্যানিয়েলের প্রতি বৈরি। কিন্তু বীজ পোঁতবার উপকরণ কী হবে? অমিতাভ কি চিঠি লিখবেন, যে চিঠিতে তিনি জানিয়ে যাবেন যে ড্যানিয়েল তাঁকে খুন করতে পারেন? সেটা সম্ভব নয়, কারণ এই শহরে অমিতাভ চিঠি লিখতে পারেন একমাত্র অরুণকে। অরুণকেই তিনি চিনতেন। কিন্তু অরুণ আর অমিতাভর মুখ দেখাদেখি যেখানে বন্ধ, সেই পরিবেশে অমিতাভ চিঠি লিখছেন, সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। উল্টে ধনরাজ সন্দেহ করতে পারেন যে পুরোটা সাজানো। সূক্ষ্মভাবে ধনরাজকে বিশ্বাস করাতে হবে, যাতে ধনরাজ না বোঝেন যে এটার পেছনে অন্য কেউ জড়িত। উপন্যাসের আইডিয়া সম্ভবত অরুণের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। শেষটুকু দেখালে চলবে না। সেটাকে ধনরাজের নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এমনভাবে জিনিসটাকে রাখতে হবে, যাতে সত্যিটা চোখের সামনে থাকে। ওই কারণেই আমি যখন উপন্যাসটা পড়েছিলাম, মনে হয়েছিল বড্ড বেশি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটুকু ধনরাজের জন্য। সেই কারণেই পুলিশের ওসিকে খুনি বানানো। যাতে সেটা পড়ে, এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে চমকে ওঠার মতো মিলগুলো দেখে ধনরাজের মনে হয় যে বাস্তবেও পুলিশের দারোগাই খুনি হতে পারেন। প্রথম থেকে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, অমিতাভ এভাবে ভবিষ্যৎ কী করে দেখতে পেলেন। এটাই বুঝিনি যে অরুণ আর সঞ্জয় আগে থেকে নিখুঁত প্ল্যান করে রেখেছিলেন, খুন কীভাবে ঘটবে। উপন্যাসে সেটুকুই মিলিয়ে মিলিয়ে লিখেছেন। এমনকি, ড্যানিয়েল যে সেই রাত্রে থানায় আসবেন সেটাও দুইয়ে দুইয়ে চার করে অভ্রান্ত বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা। সেই কারণেই বিমলবাবুকে রাত্রে থানায় টেনে আনা। পাণ্ডুলিপিটাকে রেখে আসা হলো অমিতাভর আস্তানা নাম দিয়ে যে ঘরটাকে অরুণ ভাড়া করেছিলেন, সেখানে। সেই ঘরে মাঝেই মাঝেই অরুণ রাত্রিবেলা যেতেন। হয়তো সঞ্জয়ও যেতেন কখনও। অভিনয় করতেন মাতালের। গ্রামের মানুষ দূর থেকে দেখে ভাবতো যে মাতাল অমিতাভ ঘরে ঢুকছেন। পুলিশ কি অমিতাভর হাতের লেখা মিলিয়ে দেখেনি? অবশ্যই দেখেছে। পুলিশ রিপোর্টেও পেয়েছি তার উল্লেখ। কিন্তু কোন নমুনার সঙ্গে মেলাবে? সেই ঘরে পাওয়া অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে। সেগুলো তো সব অরুণেরই লেখা। কারণ ঘর আর তার ভেতরের সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ, কাগজ, চিঠিপত্র, সবই অরুণের হাতের লেখা। তাই উপন্যাসের হাতের লেখাও মিলে গিয়েছিল নমুনার সঙ্গে। অরুণ যখন অমিতাভর নাম নিয়ে লিখতেন, নিজের স্বাভাবিক হস্তাক্ষর পালটে ফেলতেন। পুলিশ তাই ধরতে পারেনি।'

এবার চোখে পড়ল, অরুণের সামনে টেবিলের ওপর রাখা কেবল সাহেবের কবিতার বই। নিজের মনেই হাসলাম। বইটা হাতে তুলে নিয়ে বললাম, 'এক হারানো কবির প্রতি আগ্রহবশত, বা অমিতাভর কথা ভেবে বইটা আপনি নিজের কাছে রাখেননি। বইটার ওপর

অমিতাভর হস্তাক্ষর ছিল। আর অমিতাভর যে পাণ্ডুলিপি আপনি দেখিয়েছিলেন, সেটা অমিতাভর নামে আপনার হাতের লেখা। সন্দেহের বশে আমি যেন মিলিয়ে না দেখতে যাই, তাই বইটা আগেই রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছে। ঠিক সেই কারণেই অমিতাভর কোনো লেখা বা চিঠির অরিজিনাল আমাকে দেননি, দিয়েছেন টাইপ কপি। কিন্তু এবার বইটা নিলাম। ভুলে যাওয়া কবিরা আপনার হাতে নিরাপদ নয় মিস্টার চৌধুরী!'

সিদ্ধার্থ দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। আবার অরুণের দিকে ফিরলাম। 'কিন্তু শত হলেও আপনি তো প্রকৃতই একজন লেখক। সেই লেখক-সত্তা হয়তো চাইছিল, সত্যিটা জানাতে। তাই আপনার অবচেতন আপনার কলমের সাহায্যে নানারকম সূত্র ছড়িয়ে রেখেছিল লেখাটার মধ্যে। ভাগ্যিস রেখেছিল, না হলে তো আমিও সত্যিটায় আসতে পারতাম না।'

অরুণ মুখ তুললেন না।

'হত্যার দিন ঠিক হয়েছিল, এগারোই জুন। তার বেশ কিছু আগে সঞ্জয় দার্জিলিং চলে এসেছিলেন। পরের কাজ হিসেবে, বাবলার কুকুরটাকে বিষ খাওয়ানো হলো, যাতে চর্মরোগ হয়। বাবলাকে দিয়ে গুলি করানো হল। উদ্দেশ্য, রাইফেলের ট্রিগারে বাবলার আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে রাখা। আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল।

'বাবলা নিখোঁজ হয়ে যাবার পরে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে। তাই তার নিরুদ্দেশ হবার পেছনে একটা গল্প খাড়া করবার দরকার। আবারও, দৃশ্য তৈরি। কুকুরকে গুলি করা। শোকাহত বাবলা এবার কোথায় যাবে? কেন, মদের দোকানে? সেখান থেকে বাবলাকে পাকড়াও করলেন সঞ্জয়।

'প্রশ্ন উঠতে পারে, বাবলার কথা আমার কেন মনে হলো? সিদ্ধার্থকে বলেছিলাম খটকার কথা। বাবলা চলে গিয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৮ই মে আর ১১ জুনের মধ্যে কোনো এক দিন। বাবলার চলে যাওয়া আর অমিতাভর হত্যা, পিঠোপিঠি এই দুটো অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে কি তাহলে কোনো যোগ আছে? শুধু সেটাই নয়। বাড়ির অন্য কাজের ছেলেটিকে ছুটি দিয়ে বাড়ি কেন ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছিল, এটা নিয়ে সন্দেহ ছিল। তারপর সিদ্ধার্থ কথায় কথায় জানাল, অরুণ বাবলার খোঁজে তার বর্ধমানের গ্রামে গিয়েছিলেন। কিছু টাকাপয়সা দিয়ে এসেছেন। তারপর বাবলা এসেছিল একবার অরুণকে দেখতে। দুম করে মনে হলো, আরে, এখানেও তো অমিতাভর মতোই ব্যাপার! বাবলাকে ১৯৭৫-এর জুন মাসের পর থেকে অরুণ ছাড়া আর কেউ দেখেনি। অরুণ তার গ্রামে গিয়েছেন। আবার বাবলা ঠিক সেই সময়তেই দার্জিলিং-এ এসেছে যখন এই বাড়িতে সিদ্ধার্থ আর অনন্যা নেই, যারা বাবলাকে দেখতে পারে। শুধু সেটাই নয়, সারাক্ষণের কাজ করে যে ছেত্রীদা, সে-ও দেশে চলে গেছে। নাকি তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল? ফলে তখনও বাবলাকে দেখেছেন শুধুই অরুণ। অরুণ যদি এখানেও মিথ্যে বলেন? যদি অমিতাভর মতোই বাবলাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়? তার মানে কি অমিতাভ আর বাবলা কাছাকাছি সময়েই মরেছিল? এতটা সমাপতন? অবিশ্বাস্য না? এদিকে মৃতদেহটাও অমিতাভর নয়, অন্তত সেরকম একটা সম্ভাবনা সামনে আসছে। তাহলে কি সেটা বাবলার দেহ? দীর্ঘ সময় ধরে আপনাদের, আপনাকে আর সঞ্জয় দুজনকেই, নিজেদের ট্র্যাক করতে হয়েছিল। কারণ ধনরাজ গম্বু তখনও বেঁচে ছিলেন। সেই জন্যে বাবলা যে বেঁচে আছে, সেটাও কিছু সময়ের ব্যবধানের মাঝে মাঝে নিশ্চিত করে যাওয়া। বাবলার কথা আরও একটা ঘটনায় মনে এসেছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'সঞ্জয় বাবলাকে সম্ভবত মদ খাইয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেলেন ঋষি রোডের বাড়িতে। হ্যাঁ, এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন সঞ্জয়। ড্যানিয়েল লামা নন। রামবীরের মনে পড়েছিল, লোকটা গাড়ি চালিয়ে আসত। একজন মাত্রই লোক ছিল। এটা মাথায় আসতে আমি নিঃসংশয় হলাম যে ড্যানিয়েল হতে পারেন না কারণ তিনি গাড়ি চালাতে পারেন না। তাহলে কি ড্যানিয়েল গাড়ির পেছনে লুকিয়ে থাকতেন? সেটা অসম্ভব। কারণ রামবীর বলেছিলেন যে লোকটা যতক্ষণ বাড়ির ভেতর থাকে, প্রচণ্ড জোরে ইংরেজি গান বাজে।

ড্যানিয়েলের নার্ভের সমস্যা। জোরে আওয়াজ তিনি সহ্য করতে পারেন না। তার প্রমাণ আমিও পেয়েছি।

‘সঞ্জয় বাবলাকে এখানে এনে বন্দি করে রেখেছিলেন। হয়তো হাত পা শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল। বাবলাকে মদ খাইয়ে রাখতেন, আর দরকার পড়লে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো। সেই জন্য তার মৃতদেহে অত ছুঁচের দাগ ছিল, আর আমরা ভেবেছিলাম অমিতাভ ড্রাগ নেন। জোরে গান বাজাবার দরকার ছিল, বাবলার আর্ত-চিৎকার চাপা দেবার উদ্দেশ্যে। কারণ রামবীর দুপুরের পর থেকে আর এই চত্বরে না থাকলেও সকালবেলা কয়েক ঘণ্টা বাগানের কাজ করেন। তাঁকে কিছুতেই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেওয়া চলবে না, অথবা তাঁর কানে আসা চলবে না বাবলার চিৎকার। বাবলাকে কী খাওয়ানো হতো জানি না। তবে সে যাতে বেশিক্ষণ জেগে থাকতে না পারে, তার জন্য মদ ও ইনজেকশনের আয়োজন। মদটা সম্ভবত বন্দুকের মুখে জোর করে খাওয়ানো হতো। যতই মাতাল হোক, একসময়ে মানুষের শরীর আর নিতে পারবে না। তখন বন্দুকের ব্যবহার।

ত যখন গল্পটা সাজাচ্ছিলাম, তখন এতটা অসুবিধে হয়নি। কিন্তু বলতে গিয়ে এখন নিজের শরীরের মধ্যে অস্বস্তি লাগছিল। অত্যাচারের গ্রাফিক বর্ণনাগুলো লাফিয়ে উঠছিল চোখের সামনে। সিদ্ধার্থকেও দেখলাম, ফ্যাকাশে মুখে অরুণের দিকে তাকিয়ে। আজ যে কতগুলো বিশ্বাস আর সম্পর্ক নিজের হাতে নষ্ট করে দেব, নিজেও জানি না।

‘আর দুটো জিনিস দরকার। অরুণের ওপর পুলিশের সন্দেহ ফেলবার জন্য একটা মাধ্যম, আর পুলিশকে বিভ্রান্ত করে দেবার জন্য আর একটা মাধ্যম। প্রথমজন হলেন মিসেস বাসু। দ্বিতীয়জন হলেন প্রশান্ত গুরুং। হ্যাঁ, প্রশান্ত গুরুংকে খবর পাঠিয়ে আসতে বলেছিলেন অরুণই। তাঁর সামনে বন্দুক চালিয়েছিলেন, এবং এমনভাবে ঘটনাগুলো সাজিয়েছিলেন যাতে পুলিশের মনে হয় ড্যানিয়েল প্রশান্তর গল্পটা বানিয়েছিলেন। মোদ্দা কথায়, যাতে দ্বিতীয় লেয়ারের গল্পটা পাকাপোক্ত হয় ৷

‘১১ জুন এল। সঞ্জয় প্রথম যেটা করলেন, রাত আটটা নাগাদ বাবলার ডান হাতের কবজিতে ছুরি চালিয়ে গভীর ক্ষত তৈরি করলেন। প্রচুর রক্ত বেরোলো। সেই রক্ত তাঁর লাগবে, অরুণের বাগানে ছড়াবার জন্য। একটা শিশিতে রক্ত ঢাললেন। বাবলার হাতে ব্যান্ডেজ করে হয়তো কিছু ওষুধ খাইয়ে দিলেন। সময়টা আটটা নাগাদ ছিল বলছি এই কারণে যে তার আগে রক্ত সংগ্রহ করলে সেটা জমাট বেঁধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তারপর সঞ্জয় রাইফেল নিয়ে গুলি করলেন বাবলার বাম হাতে। বাবলা সম্ভবত তখন অচেতন। যন্ত্রণায়, ইনজেকশনে বা মদে। এই অবস্থায় তাকে বেঁধে রেখে সঞ্জয় রাইফেল আর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে দার্জিলিং এলেন। জলাপাহাড় রোডে অরুণের বাড়ি ঢুকলেন। কিন্তু সামনের রাস্তা দিয়ে নয়। অরুণের বাড়ি যখন আমি ঘুরে দেখছিলাম, গেস্টহাউসেও গেছিলাম। কিচেন দিয়ে লাগোয়া স্টোররুমে যাওয়া যায়। স্টোররুমের আর একটা দরজা পেছনের বাগানের দিকে মুখ করে ৷ বাগান নেমে গেছে ঢালু হয়ে। সঞ্জয় ঘুরপথ হয়ে সেই বাগান দিয়ে উঠে এসেছিলেন। সেই কারণে বাগান থেকে বাড়ি অবধি তাঁর পায়ের ছাপ পড়েনি। সম্ভবত পুলিশ প্রথমবার এসে সামনের বাগানই দেখেছিল। পরের বার এসে যখন পেছনের বাগানে যায়, ততক্ষণে তাঁর পায়ের ছাপ ধুয়ে গিয়েছে বৃষ্টিতে। অথবা এটাও হতে পারে যে অরুণই পুলিশ আসার আগে পেছনের বাগানের পায়ের ছাপ জল ঢেলে বা অন্য কোনো কিছুর সাহায্যে মুছে দিয়েছিলেন।

‘প্রশান্ত গুরুং এলেন নির্ধারিত সময়ে। অরুণ আর প্রশান্ত ছিলেন বাড়ির ভেতর। আমি যেদিন এই বাড়িতে ডিনারে এসেছিলাম, নীচের ঘরে অরুণের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কথা শেষ করবার পর বেরোতে গিয়ে দেখি, বাইরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, বজ্রপাতও। কিন্তু সেটা বুঝতে পারিনি, কারণ অরুণ বলেছিলেন যে এই বাড়িতে তাঁর বাবা মোটা কাচের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো লাগিয়েছিলেন। আর বাকি দেওয়ালের দুই ধারে ফোম। তাই গেস্টহাউসের কাছ থেকে গুলির আওয়াজ ঘরের ভেতর বসে প্রশান্ত শুনতে পাননি। অরুণ কোনো সংকেত থেকে

বুঝেছিলেন, এবার বাইরে বেরোবার সময়। সঞ্জয় ততক্ষণে বাগানের ঘাসে বাবলার রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর কিছুটা নিজের হাতে। অরুণ কোনো এক অছিলায় প্রশান্তকে অপেক্ষা করতে বলে বাইরে বেরলেন। সঞ্জয় বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লেন। উদ্দেশ্য, মিসেস বাসুর নজর আকর্ষণ করা। ওই সময়টায় মিসেস বাসু যে রোজ ওখানে বসে থাকতেন, সেটা জানা ছিল তাঁদের। তারপর সঞ্জয় দৌড়ে গেলেন গেটের কাছে। তাঁর পেছনে অরুণ। পুরোটাই ঘটল মিসেস বাসুর সামনে, সঞ্জয় বেরিয়ে গেলেন। অরুণ বুলেটের ফাঁকা খোল মাটি থেকে খুঁজে নিজের পকেটে পুরলেন। মিসেস বাসু অরুণকে ওই জন্যই দেখেছিলেন, ঝুঁকে পড়ে কিছু খুঁজতে। বাড়ির ভেতর ফিরে এসে কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে নিজের রাইফেল থেকে গুলি চালালেন। তারপর কি প্রশান্ত গুরুঙের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন? জানি না। কিন্তু নাটকটা ভালোই হয়েছিল। গুরুং বিশ্বাস করলেন। রাইফেলের ট্রিগারে আগেই বাবলার আঙুলের ছাপ ছিল। এবার পড়ল অরুণের আঙুলের ছাপ। প্রশান্ত বেরিয়ে গেলেন। বাগানের মাটিতে স্বাভাবিকভাবে তাঁর আসা এবং যাবার পদচিহ্ন পড়লো। অরুণ জানতেন পুলিশ আসবে। তিনি আর একটা কাজ করলেন। ড্যানিয়েল লামা যে ধরনের বুট পরতেন, সেই মডেলের বুট নিজের পায়ে পরে এক জায়গায় দাঁড়ালেন শক্ত করে। তারপর বাগানের দিকে গেলেন এবং ফিরে এলেন। সকলে ভাবলো, জুতোর মালিক গেট থেকে বাড়ির কাছে এসেছেন, তারপর আবার বাড়ি থেকে গেট অবধি গিয়ে বেরিয়ে গেছেন। বাস্তবে ঘটেছিল উলটো। বাড়ি থেকে গেট এবং গেট থেকে বাড়ি। এত কিছু করবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই। অরুণ ফাঁসাচ্ছেন ড্যানিয়েলকে। আর সেটা করা সম্ভব যদি দেখানো যায় যে ড্যানিয়েল অরুণকে ফাঁসাতে চাইছেন। কীভাবে দেখাবেন? ঠিক সেই গল্পটা বলে, যেটা আমি এর আগে সাজিয়েছিলাম। মানে দ্বিতীয় লেয়ারে। ড্যানিয়েল এসেছিলেন, অরুণকে বলেছিলেন পায়ের ছাপ মুছে দিতে হবে, রাইফেল থেকে আঙুলের ছাপ মুছতে অরুণ ভুলে গেছিলেন ওটা ইচ্ছাকৃত, বাগানের রক্ত কারোর মাথায় ছিল না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রাবিশ গল্পটাই ছিল অরুণের লাইফলাইন। যাই হোক, সঞ্জয় বেরোলেন অরুণের বাড়ি থেকে। কাছাকাছি তাঁর গাড়িতে বা অন্য কোথাও হয়তো রেইনকোট, টুপি ইত্যাদি লুকানো ছিল। সেগুলো পরে নিলেন যাতে নিজের মুখ না দেখা যায়। আর ঠোঁটে ঝোলালেন একটা পাইপ। তারপর জলাপাহাড় রোড ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। বৃষ্টির মধ্যে রেইনকোট গায়ে সঞ্জয়কে যারা দেখল, তারা মূলত খেয়াল করল মুখের পাইপটা। ড্যানিয়েলের সিগনেচার। লোকে বুঝল, ড্যানিয়েল রাত পৌনে দশটা নাগাদ জলাপাহাড় রোডে ছিলেন। কিছুটা হেঁটে নির্জন কোনো জায়গাতে গিয়ে সঞ্জয় রেইনকোট পাইপ ইত্যাদি নামিয়ে ফেললেন। তারপর সেগুলোকে হাতেই রেখে সাধারণ মানুষের মতো হেঁটে এসে গাড়িতে উঠলেন। কেউ ফিরেও তাকালো না। গাড়ি চালিয়ে ঋষি রোডের বাড়িতে এলেন। প্রথম কাজ যেটা করলেন, নিজের পোশাক বাবলাকে পরানো। জিন্স, শার্ট ইত্যাদি। তারপর অর্ধ-অচেতন বাবলাকে নিয়ে গাড়িতে বসালেন। গেলেন কার্ট রোডের কবরখানায়। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে ঋষি রোডের বাড়িতে যাওয়া, বাবলার পোশাক পালটানো, সম্ভবত বাড়ির অন্য কিছু কাজও, যেমন রক্ত পরিষ্কার করা ইত্যাদি, সেসবে সময় লেগেছিল। সেসব করে আবার বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসা, তাতে ঘণ্টা দুই লাগা স্বাভাবিক। কারণ সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। কবরখানায় এসে বাবলাকে গুলি করলেন। বাবলাকে প্রচুর মদ খাইয়ে অর্ধ-অচেতন করে রাখা হয়েছিল। তাই পিস্তল দেখেও তার হৃদস্পন্দন বাড়েনি। মুখে গুলি করতে হতো, যাতে চিনতে না পারা যায়। বাবলা চিৎ হয়ে পড়ে গেল। কিন্তু যেহেতু মুখ বলে কিছু নেই, পুলিশ ভাবতেই পারে যে এটা অন্য কারও লাশ। তাহলে কি মানিব্যাগ বা আইডেন্টিটি কার্ড রাখতে হবে অমিতাভর সঙ্গে? না। অমিতাভর মতো আধা পাগল ভবঘুরে মানিব্যাগ ব্যবহার করছেন, সেটা বাড়াবাড়ি। আইডি কার্ড তো আরোই নয়, কারণ অপরাধকাহিনীর বস্তাপচা টেকনিক সেটা। যেই মুহূর্তে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হবে যে এই লাশ অমিতাভর, সেই মুহূর্তেই পুলিশ বুঝে যাবে যে এ অমিতাভ নয়— যেহেতু মুখ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তাই আইডিকার্ডের

দরকার পড়ছে অমিতাভকে চেনাবার জন্যে। একমাত্র হতে পারে কিছু হাবিজাবি কাগজ, আধা খ্যাচড়া কবিতার খসড়া, সেগুলোর হাতের লেখার সঙ্গে অমিতাভর ডেরা থেকে তুলে আনা কাগজের হস্তাক্ষরের মিল থাকবে। বাবলাকে উপুড় করে হিপ পকেটে ঢোকানো হল সেসব। আগে থেকে সেই কাগজ সঞ্জয় পকেটে রাখেননি কারণ বৃষ্টিতে ভিজে যাবার চান্স ছিল। সঞ্জয় তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঋষি রোডের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

'ড্যানিয়েল নির্ধারিত সময়ে কবরখানায় এসে দেখলেন একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। তিনি বুঝলেন যে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। এবার, সেকেন্ড লেয়ারে যা যা বলেছিলাম, সেটাই করলেন ড্যানিয়েল। নিজের বাড়িতে গিয়ে পোশাক পালটে জুতো জামা ফেলে দিয়ে থানায় এলেন। এসে অরুণকে বসে থাকতে দেখে বুঝতে পারলেন তিনি বিশাল বড়ো চক্রান্তের শিকার। বাঁচবার জন্য কেস নিজের হাতে নিলেন, কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হলো না। এদিকে, অরুণ আর সঞ্জয়ের হিসেবমতো, পরের দিনেই অমিতাভর মৃতদেহ আবিষ্কার হয়ে যাবার কথা। কিন্তু সেই রাত্রে ল্যান্ডস্লাইড ঘটলো। অরুণ দেখলেন, তিনি আরও অন্তত একদিন হাতে সময় পাচ্ছেন। তাঁর মনে হলো, ড্যানিয়েলকে আরও কিছুটা কোণঠাসা করা সম্ভব। ড্যানিয়েলের পায়ে তিনি চটি দেখেছিলেন। তাঁর মনে পড়লো, উপন্যাসেও তিনি ক্যাজুয়ালি লিখেছিলেন যে বিমল সমাদ্দার থানায় সাধারণ জামা প্যান্ট চটি পরে এসেছিলেন। এই মিলটাকে ব্যবহার করতেই হবে। ধনরাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে যে ড্যানিয়েলের মতোই বিমল সমাদ্দারও থানায় চটি পরে এসেছিলেন, যাতে আরও সন্দেহ উসকে দেওয়া যায়। থানা থেকে বাড়ি এসে সঞ্জয়কে খবর পাঠালেন যে করেই হোক অমিতাভর আস্তানা থেকে পাণ্ডুলিপিটা আবার আনতে হবে। সঞ্জয় মনে হয় ভোরবেলায় আবার দার্জিলিং এসেছিলেন, এবং অরুণের বাড়িতেই আগে থেকে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে অমিতাভর আস্তানায় পুলিশ যাবে। কিন্তু ঘরের তালা ভাঙবে না, যতক্ষণ না তার মৃতদেহ আবিষ্কার হচ্ছে। সঞ্জয় সেই ঘরের তালা খুলে পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলেন। অরুণ নিজের বাড়িতে বসে শেষ অধ্যায়টি লিখলেন। মানে অসম্পূর্ণ অধ্যায়টা, যেখানে ধনরাজকে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হলো যে বিমলবাবু চটি পরে এসেছিলেন। প্রাথমিক প্ল্যান অনুসারে, আগের অধ্যায় পর্যন্ত লিখে থেমে যাবার কথা ছিল। কিন্তু চটিটুকুর কথা লিখবার জন্য একটা নতুন অধ্যায় এখন না বানালেই চলছে না। শেষ করবার মতো সময় ছিল না, কারণ পাণ্ডুলিপি আবার সকলের চোখ এড়িয়ে সেই রাতের মধ্যে রেখে আসতে হতো। আর সেই তাড়াহুড়োতেই অরুণ তাঁর প্রথম ভুলটা করলেন। সম্ভবত বাড়িতে তখন রেডিয়ো চলছিল। রেডিয়ো শুনতে শুনতে অরুণ তাঁর লেখায় লিখে দিলেন যে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। সঞ্জয় আবার গিয়ে পাণ্ডুলিপি রেখে এলেন অমিতাভর আস্তানায়। এরপর যা ঘটলো, সবটাই আমাদের জানা। সেকেন্ড লেয়ারে সেগুলো বলা হয়েছে। ধনরাজ সন্দেহ করলেন ড্যানিয়েলকে। অরুণের সঙ্গে চুক্তি করলেন, দুই পক্ষই মুখ খুলবেন না। জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট হলো। ড্যানিয়েল তলিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অতলে। অরুণ আর সঞ্জয় কি আরও নিষ্ঠুর কোনো শাস্তি চেয়েছিলেন? নাকি ধনরাজ গম্বু যে তাঁদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবেন, এটা দুজনের হিসেবের মধ্যে ছিল না? জানি না। আমার প্রথমে অবাক লেগেছিল, ড্যানিয়েলকে এই দুজন আরও বড়ো কোনো আঘাত দিলেন না কেন। পরে মনে হলো, হয়তো চেয়েছিলেন। কিন্তু ওখানেই থেমে যেতে হয়েছিল। ওটুকুই হয়তো যথেষ্ট ছিল। ড্যানিয়েলের মতো প্রবল পুরুষের কাছে এ আঘাত মরণসম। ড্যানিয়েল সেই কারণেই এখনও প্রবল হতাশায় বলে চলেন যে এই শহর তাঁকে ডিজার্ভ করে না। এর থেকে বেশি প্রতিশোধ শুধু রুপোলি পর্দায় হয়। আর সেটা করতে গেলে অরুণ বা সঞ্জয়ের কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারত। পুলিশও চলে যেত বিপক্ষে।

'শুধু একটা জায়গা, যা অনেকদিন বুঝিনি। ঋষি রোডের বাড়ির দেয়ালে আঁকা ছবিতে দু-রকম রং ব্যবহার করা হয়েছিল কেন? পরে বুঝলাম, দুজন আলাদা মানুষ এঁকেছে।

অত্যাচারে অর্ধ-অচেতন বাবলার হাত হয়তো কোনো এক সময়ে খুলে দেওয়া হয়েছিল। খাবার খাওয়ানো, বা টয়লেটে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। অথবা এটাও হতে পারে, বাবলার একটা পা এবং একটা হাতেই হাতকড়া পরানো ছিল। অপর হাত খালি রেখে দেওয়া হয়েছিল। বাবলার হাতে পড়েছিল একটা কালো রংপেনসিল। সে লেখাপড়া জানতো না। যেটুকু জানতো, সেটাই করে গেছে। একজন লোক এক হাতে মদের গ্লাস আর অপর হাতে বন্দুক নিয়ে অন্য একজনকে ভয় দেখাচ্ছে। ঠিক যেরকম সঞ্জয় বন্দুকের মুখে তাকে মদ খেতে বাধ্য করতেন। সঞ্জয় যখন পরে ফিরে এসে বাড়ি পরিষ্কার করছিলেন, তাঁর চোখে পড়লো ছবিটা। মাটিতে তখন গড়াগড়ি যাচ্ছিল একটা লাল পেনসিল। সঞ্জয় পিস্তল হাতে মানুষের মাথায় টুপি এঁকে দিলেন। যাতে দেখে মনে হয় লোকটা একটা পুলিশ। আর অপর লোকের মাথায় নাম লিখে দিলেন, অমিতাভ। পরে যদি পুলিশ এই বাড়ির সন্ধানও পায়, যাতে ভুলপথে চালিত হয়। টুপিটা পরে আঁকা হয়েছিল বলে টুপির ভেতর দিয়ে মাথা দেখা যাচ্ছিল।

'কিন্তু সঞ্জয়ের চোখে আর একটা জিনিস পড়েনি। সম্ভবত তাড়াহুড়োয় ছিলেন বলে। বাবলা অপটু হাতে আরও একটা ছবি এঁকেছিল। দেয়ালের নীচের দিকে। নিজের প্রিয় কুকুরের ছবি। আমিও জানতাম না এটা। যখন বিনয়েদ্র মুস্তাফি বললেন, 'দেখলেন তো, কে মরল? যে গরিব, সে-ই।' আমার মাথায় হঠাৎ খেলে গেল বাবলার কথা। বাবলাও তো গরিব ছিল। তার অন্তর্ধান আর অমিতাভর মৃত্যু পাশাপাশি। তাহলে কি অমিতাভ নয়, মরেছে বাবলা, যেটা আগেও ভেবেছিলাম? ওয়াইল্ড গেস, সন্দেহ নেই। প্রশ্নটা তো বেসিক ছিল যখন লজিক বলছে যে সেই রাত্রে অমিতাভ খুন হননি, তাহলে খুন হলো কে? বডি কার ছিল? মনে হলো, আর একবার ওই বাড়িতে যাওয়া দরকার। যদি আর কোনো চিহ্ন খুঁজে পাই? হয়তো এবার অনেক খোলা মনে দেখব; আর তাই আগে যেগুলো দেখে কিছুই মনে হয়নি, সেটা এখন গুরুত্বপূর্ণ লাগলে ও লাগতে পারে? তাই আনন্দ পাঠককে ধরে আবার গেলাম সেই বাড়িতে। কুকুরের ছবিটা যখন দেখলাম, বুঝলাম, আমার অনুমান ঠিক

'যেদিন বাবলার বডি আবিষ্কৃত হয়, সেদিন বিকেলেই সঞ্জয় দার্জিলিং-এ আবার ঢুকলেন। এবার সাংবাদিক হয়ে। ভাবখানা এমন, তিনি আগের দিন কলকাতায় বসে ফোনে এই সংবাদ শুনেছেন। পুলিশ অরুণের সহযোগীর সন্ধানে চারপাশে তল্লাশি চালাল। কিন্তু আসল সহযোগী তাদের চোখের সামনে বসে ছিলেন সারাক্ষণ। সাংবাদিকের জুতো খুঁটিয়ে কেনই বা দেখবে পুলিশ? হয়তো প্রবল আত্মবিশ্বাসে সঞ্জয় খুনের রাতের জুতোই পরে এসেছিলেন। জানতেন, পুলিশ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাবে না।

'এবার লাশ শনাক্তকরণ। অরুণ করেছেন, যদিও নিশ্চিত না হবার নাটকও করেছেন। তারপর সঞ্জয় শনাক্ত করলেন। এরপরে দুই বন্ধুর মাস্টারস্ট্রোক। তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে বাবলার লাশ অমিতাভর হিসেবে শনাক্ত করানো, যাতে পুলিশের মন থেকে শেষ সন্দেহটুকুও চলে যায়। সত্যি বলতে কি, অমিতাভ খুন হননি, লজিকালি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেও আমি একটা বড়ো সময় অবধি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না, একটাই কারণে। ফাদার স্যামুয়েলস বডি আইডেন্টিফাই করলেন কীভাবে? তারপর বুঝলাম, মনস্তাত্ত্বিক চাল। সঞ্জয় ফাদারের অনাথশ্রমে গেলেন। গিয়ে ভেঙে পড়লেন কান্নায় এই বলে যে অমিতাভ আর নেই। তিনি লাশ শনাক্ত করে এসেছেন। পকেটের কাগজপত্র দেখে বুঝেছেন যে অমিতাভ আরও অনেক অসামান্য কবিতার খসড়া বানাচ্ছিলেন, মৃত্যু তাড়াতাড়ি কেড়ে নিল এসব হাবিজাবি অনেক কথা। দৃশ্যত শকড় ও বিভ্রান্ত ফাদারকে এবার সঞ্জয় নিয়ে এলেন দার্জিলিং। প্রথমে থানায় গেলেন। সেখানে গিয়ে ফাদার জানতে পারলেন যে অরুণ লাশ শনাক্ত করেছেন। অরুণ যে দ্বিধা দেখিয়েছেন সেটা সঞ্জয় ফাদারকে বলেননি। সঞ্জয় হয়তো কথায় কথায় এ-ও জানালেন যে ওই বীভৎস লাশ কোমলপ্রাণ ফাদার সহ্য করতে পারবেন না, তাই তিনি পুলিশকে অনুরোধ করছেন ব্যাপারটা যাতে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেওয়া যায়।

এরপর জেলা হাসপাতাল। মর্গের ঘরে স্যামুয়েলসেকে নিয়ে গেলেন সঞ্জয়, বয়স্ক অসুস্থ অভিভাবককে নিয়ে যাচ্ছেন এই ভান করে। পুলিশ বাধা দেবেই বা কেন! পুরো গল্প এমন সাজিয়েছিলেন যে স্যামুয়েলসর মনে হয়েছিল সকলেই জানে এই বডি অমিতাভর, তার ওপর অরুণও শনাক্ত করে ফেলেছেন। কাজেই তাঁর শনাক্তকরণটা একটা রুটিন চেকআপ মাত্র, কারণ সঞ্জয় জানিয়েছেন যে তিনি শনাক্ত না করা পর্যন্ত অমিতাভর শেষকৃত্য করা যাচ্ছে না, যা একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিকের কাছে খুব বড় ইস্যু। স্যামুয়েলস অমিতাভর আকৃতির আর একটা শরীরকে অমিতাভ হিসেবে শনাক্ত করে দিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে শনাক্তকরণ আগেই হয়ে গিয়েছে। আর পুলিশ জানলো, লাশ শনাক্ত করেছেন অরুণ বাদেও অমিতাভর দুই ঘনিষ্ঠ পরিচিত। এই পুরো ঘটনাক্রমটা আমার বানানো। কিন্তু বিশ্বাস করি, বাস্তবে এর কাছাকাছিই কিছু ঘটেছিল। সাধারণত মর্গে যেতে সকলেই ভয় পায়, অস্বস্তিবোধ করে। চায় যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে আসা যায়। স্যামুয়েলসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। তিনি রুটিন চেক করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন, অথবা তাঁকে তাড়াতাড়ি বার করে আনলেন সঞ্জয় ৷ অমিতাভর পরিচিতি নিশ্চিত হলো। আসল অপরাধী পুলিশের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালেন এতগুলো বছর।

'ঠিক এডগার অ্যালান পো-র গল্পটার মতো। যে চিঠির সন্ধানে সকলে মাথার চুল ছিঁড়ছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেলছে গুপ্তস্থানগুলো, সেটা অতি অবহেলায় সকলের চোখের সামনেই টেবিলের উপর রাখা ছিল। কেউ ভাবেইনি অত গুরুত্বপূর্ণ চিঠিকে এত অসাবধানে রাখা হবে। তাই জটিলতার পথে গিয়েছিল। আবারও, ওকামস রেজর। আমিও ফার্স্ট লেয়ারে অরুণের সহকারীর কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি, সেটা কে হতে পারে। যখন বিনয়েদ্র মুস্তাফি ইঙ্গিত দিলেন, প্রথম যে কথাটা মনে এসেছিল, তাহলে সঞ্জয়ই এতদিনকার সেই ইপ্সিত এবং অদৃশ্য সহযোগী।'

অরুণের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, 'অমিতাভ কতটা রাজনীতি সচেতন ছিলেন সেটা জানি না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুকে এরকম ইনস্টলেশন আর্ট হিসেবে দেখাবার প্রয়াসটা আপনাদেরই ছিল, অমিতাভর নয়। শিল্পের চরম পর্যায় যাকে বলে। একটা মৃত্যুর রিকন্সট্রাকশন। তবে কবিতার প্রতি আপনার অনুরাগটা একদম সত্যি। প্রতিশোধের থিম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন— বন্ধুবান্ধব খুন হয়ে যাচ্ছে, তাই সত্তরের কবিতায় প্রতিশোধ ফিরে ফিরে আসছে। হয়তো অবচেতনে সত্যিটা বলে ফেলেছিলেন।'

অরুণকে দেখলাম, উন্মাদের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বিকৃত স্বরে বললেন, 'একটা চালচুলোহীন ভিখিরিকে নিয়ে আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন?'

'বাবলার মরে যাওয়াতে আপনার কি কিছুই এসে যায় না?'

'না যায় না।' অরুণ গর্জে উঠলেন। 'এরা পৃথিবীর বোঝা বাড়াতে আসে। এদের সমাজে কিছুই কন্ট্রিবিউট করবার নেই। সত্যিটা বুঝুন! একটা কেন, দশটা ভিখিরি মরলেও কারোর কিচ্ছু এসে যায় না।'

'রামবীর মরলেও যেমন কিছু এসে যায় না, তাই তো?'

অরুণ গনগনে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দাঁত চিপে বললেন, 'ফাকিং ইডিয়ট!'

'হ্যাঁ। রামবীরকেও মেরেছেন আপনিই। রামবীর প্রতিদিন সকাল ছ-টার মধ্যে চলে আসেন, বলেছিলাম আপনাকে। আপনি আগে থেকেই এসে অপেক্ষা করছিলেন। রামবীর আসার পর তাকে ভুলিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে আসেন। জানালার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়েন। অপরাধীর পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি, সেটাও স্বাভাবিক। কারণ খুন করবার পর গাড়ি চালিয়ে ফিরে এসেছিলেন দার্জিলিং-এ। পুরো কাজ সেরে সহজেই সাড়ে সাতটার মধ্যে আবার দার্জিলিং ফিরে আসা যায়। তারপর আমার সঙ্গে আবার সাড়ে আটটায় বেরিয়ে এই বাড়িতে এসে এই জুতো পরেই ভেতরে ঢুকেছিলেন। আপনার আগের পায়ের ছাপ পরের ছাপের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। অত কম সময়ের ব্যবধানে দুটো ছাপকে নতুন আর

পুরোনো বলে আলাদা করা সম্ভব নয়। আবারও, ঠিক উপন্যাসটার মতোই সেকেন্ড লেয়ারে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে বিমলবাবু চটি পরে এসেছিলেন, যাতে হোটেলের ঘরের দরজা ভাঙবার পর সেই ছাপ অন্য অনেকের চটির ছাপের সঙ্গে মিশে যায়। ওখান থেকেই কি আইডিয়াটা এসেছিল? পুলিশ এসে আপনার, আমার আর মদনদার পায়ের ছাপ পেয়েছিল। অন্য কারোর ফুটপ্রিন্ট স্বাভাবিকভাবেই মেলেনি। আমার সঙ্গে আবার ওই বাড়ি গিয়েছিলেন সেই কারণেই। যাতে আগের পায়ের ছাপ পরের ছাপের ভিড়ে মিশিয়ে দিতে পারেন।'

অরুণ তীব্র ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, 'সব কিছু বুঝবার চেষ্টা করতে যাবেন না। আপনাদের মতো দুই আনার সাংবাদিকেরা সব বুঝবেও না।'

'কিন্তু রামবীরকে মারতে গেলেন কেন? কারণ আপনি চাননি এই বাড়ির সন্ধান আমি পাই।'

অরুণ গর্জে উঠলেন। 'স্টপ ইট! আমি আপনার কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারি।' কিন্তু এবার গর্জনটার মধ্যে একটা আর্ত ভয়ের সুর মিশে আছে মনে হলো।

'না, বাড়ির সন্ধান আপনি আমাকে দেননি। তাই যখন বলেছিলাম যে আপনি বাড়ির ঠিকানা দিয়ে মেসেজ করেছিলেন, চমকে উঠেছিলেন। তারপর বুঝেছিলেন যে এই ব্যাখ্যাতে আপনারই সুবিধে। কিন্তু বাড়ির সন্ধান দিয়েছিলেন ড্যানিয়েল, কারণ তিনি চাইছিলেন আমি এই কেস সমাধান করি। ড্যানিয়েল কাল আমার কাছে স্বীকার করেছেন, পুলিশের চাকরি থেকে বেরিয়ে বহুদিন ধরে খুঁজবার পর এই বাড়ির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে এই অপরাধের একটা ডেন থাকতেই হবে। নিজের সোর্স খাটিয়ে, নানাবিধ অনুসন্ধান করে সম্ভাব্য বাড়িগুলোর তালিকা বানিয়েছিলেন। তারপর এক এক করে ঘুরেছিলেন সবকটায়। এই বাড়ির দেয়ালে আঁকা ছবি দেখে তিনি নিঃসন্দেহ হন। কিন্তু পুলিশকে জানিয়ে লাভ হতো না কিছুই। উলটে ছবি দেখে তাঁর ওপর সন্দেহ পড়ত। সেই তখন থেকে ড্যানিয়েল বাড়ি আগলে আছেন এই আশায় যে ভবিষ্যতে কেউ না কেউ এর খোঁজ পাবে। রামবীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারবে। হয়তো ছবি দেখলে রামবীর শনাক্ত করবেন। আর অরুণ এটাই চাইছিলেন না। তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন, যে রামবীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হয়তো সত্যিটা জেনে যাব। তাই তাঁর মুখ বন্ধ করতে হতো।

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে অরুণ যেহেতু ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, তাই তিনিই কবিতাটা পাঠিয়েছেন। কিন্তু ড্যানিয়েলের বাড়িতে থরে থরে সাজানো বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান ও ইংরেজি নাটকের বই দেখেছিলাম। তখন বুঝিনি। বুঝলাম পরে। আমেরিকান কবি উইলিয়াম হিউজেস মেয়ান্স অ্যান্টিগোনিস নামের এই ছড়াটা লিখেছিলেন গত শতাব্দীর শুরুতে। কিন্তু ছড়াটা ছিল 'সাইকোএড'nনামের একটা নাটকের অংশ। নাটকটা মেয়ার্স লিখেছিলেন হার্ভার্ডে নিজের ক্লাসে পড়াবার উদ্দেশ্যে। আমেরিকান নাটকের মনোযোগী পাঠক হিসেবে।

ড্যানিয়েলের কবিতাটা জানা ছিল। আর কী ব্যঞ্জনাময় কবিতা!

Yesterday upon the stair
I met a man who wasn't there
He wasn't there again today
I wish, I wish he'd go away

গতকাল ড্যানিয়েলের কাছে যে মৃত ছিল, সেই অমিতাভ আবার জীবন্ত হয়ে আজ ফিরে এসেছে তাঁর সামনে। কিন্তু অমিতাভ তো নেই, তিনিও জানেন। আর তাই সেই নেই মানুষটা যেন তাঁর জীবন থেকে চলে যায়। যেন মুছে যায় পাকাপাকি। '

অরুণ তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'সব মিথ্যে। আপনি কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না।'

সিদ্ধার্থর দিকে তাকালাম। কিন্তু সিদ্ধার্থ ততক্ষণে উঠে বাগানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে

আছে। অরুণের চিৎকারেও ফিরে তাকালো না।

'আর আমার উপস্থিতিতে যখন রামবীর খুন হলেন, ড্যানিয়েল বুঝলেন তাঁর শেষ আশাটুকুও চলে গেল। আমার ওপর ভরসা করেছিলেন। কিন্তু আমিও অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছি। সেই কারণেই হোটেলে দেখা করতে এসেছিলেন, নিজের হতাশাটুকু উগরে দেবার জন্য।

অরুণ আবার বিকৃত গলায় চিৎকার করলেন, 'ড্যানিয়েল একটা শয়তান! ও অমিতাভকে মেরেছে। আমি যা করেছি বেশ করেছি! জাস্টিস পাবার জন্য করেছি। অমিতাভ বেঁচে থাকলে বড়ো কবি হতো। আমার জাস্টিস দরকার ছিল, জাস্টিস।' গলা চিরে চিৎকার করে 'জাস্টিস' শব্দটা বার বার উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন অরুণ।

'মুশকিলটা কী জানেন মিস্টার চৌধুরী? আপনাদের শ্রেণীর মানুষের কাছে জাস্টিসের ধারণাটা এমন যে সেটাকে পাবার জন্য বাবলা অথবা রামবীর সহজেই বলি হয়ে যেতে পারে। তাদের জাস্টিসের কানাকড়িও দাম আপনাদের কাছে নেই। কারণ তারা আপনার শ্রেণীর নয়। আপনাদের মেধারও সমকক্ষ নয়। আর তাই আপনাদের এই ন্যায়ের আখ্যান, অধিকারের দাবিতে সংগ্রাম, সামাজিক সমতার সমস্ত অতিকথা শেষমেশ ওই আলোকপ্রাপ্তির হাতেই কুক্ষিগত থেকে যায়। ঠিক এই জায়গাতে আপনার আর ড্যানিয়েলের মধ্যে কোনো তফাত নেই। ড্যানিয়েলের কাছে অমিতাভ একটা এক্সপেন্ডেবল শরীর মাত্র। আপনার কাছে বাবলা আর রামবীরও তাই। বাবলার কুকুরটাও তাই। আপনারা দুজনে একই কয়েনের দুই পিঠ।' যতটা পারা যায়, চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম। অরুণ দুই হাতে মাথার চুল মুঠি করে চেপে ধরে চিৎকার করতে শুরু করলেন। একটা অসহনীয়, অর্থহীন, জান্তব চিৎকার। আগেকার সেই শান্ত স্থির মানুষটা যেন কোনোদিন ছিলই না। এই আহত পশুটাই আসল সত্যি। উঠে দাঁড়ালাম। 'আমার চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে। এবার সমতলে নেমে যাব। বাবলা হত্যার কেস তামাদি হয়ে গেছে। তার বিচার কী হবে জানি না। ড্যানিয়েলও কী করবেন, জানাননি। আশা করব, নিজের অপরাধ এতদিন পরে এসে স্বীকার করবেন তিনি। আমি তো শুধু আশাই করতে পারি। কিন্তু রামবীরকে হত্যার বিচার যাতে হয়, সেটা আমি দেখবো। আনন্দ পাঠককে চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিয়েছি। তাঁর বাড়িতে এতক্ষণে সে চিঠি হয়তো পৌঁছেও গিয়েছে।'

বাগানে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পেছন ফিরে বললাম, 'ড্যানিয়েলকে শেষ করেও আপনার তৃপ্তি হয়নি। একটা শেষ আঘাত দিতে চাইছিলেন। আগের বার বাইরের পৃথিবী জানতে পারেনি ড্যানিয়েলের অপরাধ। তাই এবার যখন ফোন করলাম, আপনি কি রাগে ঘৃণায় পাগল হয়ে গেলেন? প্রথমে হয়তো অনন্যার কথায় আমাকে প্রত্যাখান করেছিলেন। কিন্তু তারপর কী মনে হয়েছিল, গোটা পৃথিবীর মুখে ছুঁড়ে মারবেন আপনার সাজানো গল্পটাকে? আমার বিশ্বাস যাতে শক্ত হয়, তার জন্যেই কি নিজেকে অপরাধী হিসেবে স্বীকারোক্তি দেবার প্রাথমিক নাটক? কী জানি! তবে একটা কথা ঠিক। আপনি ভেবেছিলেন, আমি সমাধানের দ্বিতীয় লেয়ার অবধিই পৌঁছোব। তার বেশি না। দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় একে! অথবা! আপনারই কথা মতো, ওল্ড সিনস হ্যাভ লং শ্যাডোজ।'

অরুণ তখনও চেয়ারে বসে মাথার চুল আঁকড়ে ধরে উন্মাদের মতো চিৎকার করে যাচ্ছেন। লালা ঝরছে তাঁর ঠোঁট বেয়ে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মনে হচ্ছে। চোখে পড়ল, সেই দাবার বোর্ডের ঘুঁটিগুলো এলোমেলো হয়ে এখানে-ওখানে ছড়ানো। কয়েকটা পড়ে আছে মাটিতেও। শুধু একটা বোড়ে উলটোদিকের শেষ ঘর অবধি পৌঁছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

সিদ্ধার্থর দিকে তাকালাম আমি। তার চোখে জল টলটল করছে। ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে আছে বাগানের দিকে তাকিয়ে। অরুণ, আমি—কারোর দিকেই ফিরে তাকালো না। তার হাতে হাত রাখতে গিয়েও, কী ভেবে, সরিয়ে নিলাম। থাক বরং। এটুকুই।

বাগানের গেটের সামনে অনন্যা স্তব্ধ হয়ে দূরের পাহড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে

আছেন। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখলাম। কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে, চারপাশ, আবারও। বললাম, 'চলি।'

অনন্যা উত্তর দিলেন না।

'আপনি এবং সিদ্ধার্থ দুজনেই প্রথম দিন থেকে চেয়ে এসেছেন, আমি যেন এখানে না আসি। যেন অতীত খুঁড়তে না যাই। কেন?'

অনন্যা তাকিয়েই থাকলেন পাহাড়ের দিকে।

'কারণ, আপনারা দুজনে প্রথম থেকেই মনের গভীরে সত্যিটা জানতেন। জানতেন যে আসল অপরাধী অরুণই।'

অনন্যা আমার দিকে ফিরে স্পষ্ট চোখে তাকালেন। আমাকে আবার এঁফোড় ওফোঁড় করে দিল তাঁর দৃষ্টি। 'ঠিক যেমন আপনিও জানতেন। আপনার মনের একদম গভীরে। প্রথমদিন থেকেই।'

আর কোনো উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ দুজনে তাকিয়ে থাকলাম একে অন্যের দিকে। তারপর আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম গেটের বাইরে। পেছনে তখনও অরুণের উন্মাদের মতো চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

সেই ঘোড়াটা উঠে এসেছে বাড়ির সামনে। তার কালো কেশর থেকে ঝরছে মুক্তোর মতো শিশির। নিশ্চল দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে। পেছন থেকে আততায়ীর মতো ধেয়ে আসছে কুয়াশা।

চোখ বুজলাম। মনে মনে বললাম, 'এই সব, সব মিথ্যে। আমাকে যেতে হবে। এই মৃতের নগরী পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাকে।'

চোখ খুললাম। ঘোড়াটার সারা শরীর কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছি না তাকে ভালো করে। আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সাদা চাদরের তলায়। আমার আঙুল অজান্তে উঠে এল হাতের পোড়া দাগটার ওপর।

দূরে গাড়িতে মদনদা বসে আছেন। আমাকে গাড়িতে উঠতে হবে। সমতলে একটা প্লেন অপেক্ষা করছে। আমাকে নিয়ে যাবে সল্টলেকের বাড়িতে। আমাকে ফিরতে হবে। বাবার কাছে . . . . . .

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৮২ সালে। পেশায় রাশিবিজ্ঞানী। বিশ্বসাহিত্যের নিষ্ণাত পাঠক শাক্যজিৎ বিচিত্র বিষয়ে নিরীক্ষামূলক গল্প, উপন্যাস লিখছেন সাম্প্রতিক সময়ে। এটি তাঁর প্রকাশিত পঞ্চম বই।

প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী